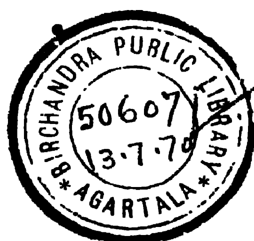
বাল্‌জাক

জনক

অনুবাদঃ প্রফুল্ল চক্রবর্তী



নলেজ হোম
৫৯, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

প্রকাশক :
শ্রীশান্তি কুমার মজুমদার, বি. এ.
নলেজ হোম
৫৯, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

দাম : ছয় টাকা।

মুদ্রণে :
সমীর কুমার মজুমদার, এম. এস-সি.
বেঙ্গল প্রিণ্টার্স
১১৭/১, বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-১২

জনক

দ কঁক্ল্যাঁস পরিবারের মেয়ে মাদাম ভোকে। চল্লিশ বছর ধরে এই প্রবীণা, বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা আর ফোবুর স্যাঁ-মারসেলের মাঝামাঝি রুয় নভ-স্যাঁৎ-জ্যনভিয়েভে এক বোর্ডিং পরিচালনা করে আসছেন। বোর্ডিংটি মেজঁ ভোকে নামে পরিচিত। বৃদ্ধ হোক, যুবক হোক কি মহিলা হোক, সকলেই এখানে থাকতে পারে, আর বোর্ডিংটির সভ্রান্ততা সম্পর্কেও কেউ কোন দিন সন্দেহ প্রকাশ করেনি। তাহলেও গত চল্লিশ বছরে কোন তরুণী এখানে বাস করেনি; আর সাময়িক কোন যুবক যদি এসে থাকে তো বুঝতে হবে, তার পারিবারিক মাসোহারার অঙ্ক খুব মোটা নয়। তবু ১৮১৯ সালে এই নাটক শুরু হবার সময়ে প্রায় নিঃস্ব একটি মেয়ে এখানে বসবাস করত।

আজকের এই নৈরাশ্যভরা সাহিত্যের আমলে নাটক শব্দটি যত বহুল ব্যবহৃত, যত বিকৃত, যতটা কলঙ্কিত হোক না কেন, কথাটি এখানে ব্যবহার না করে উপায় নেই। তার অর্থ এই নয় যে কাহিনীটি খাঁটি অর্থে নাটকীয়। তবে গল্পটি পড়তে পড়তে দু'চার ফোঁটা চোখের জল হয়ত বা পড়তেও পারে।

গল্পটি পারির বাইরে ভাল লাগবে কি? সন্দেহের অবকাশ আছে। শুধু মঁমার্ত্র আর মঁরুজের মাঝামাঝির লোকেরাই খাঁটি বুঝতে পারবে যে কাহিনীটির সঙ্গে সাচ্চা জীবনের সম্পর্ক কত ঘনিষ্ঠ, কত অন্তরঙ্গ।

চুনবালি-খসা বাড়ীতে আর কালো পাঁক-ভরতি নর্দমার জগতে বসবাস করে এখানকার মানুষ। সাচ্চা দুঃখ আর প্রায়শ অলীক আনন্দ-

ভরা এই দুনিয়া। চাঞ্চল্যে এরা এত অভ্যস্ত যে মারাত্মক কিছু না ঘটলে এখানে স্থায়ী প্রভাব রেখে যেতে পারে না। তবু কোন কোন মর্মান্তিক ঘটনায় ভাল-মন্দ এমন বিস্ময়কর ভাবে মিশে থাকে যে এখানকার স্বার্থপর আত্মকেন্দ্রিক মানুষগুলোও নিজেদের অশ্রান্ত জীবন পরিক্রমার মাঝখানে থেমে দাঁড়াতে বাধ্য হয়। মর্মান্তিকতার বেদনা অন্তত সাময়িকভাবেও এদের অন্তর স্পর্শ করে। কিন্তু এই প্রভাব নেহাৎ ক্ষণিকের। রসাল ফল যেমন চটপট মুখের মধ্যে গলে যায়, তেমনি করেই উপে যায় এই প্রভাব। জগন্নাথের রথযাত্রার মত সভ্যতার রথচক্রপথে কোন হৃদয় যদি অন্য হৃদয়ের চাইতে সহজে নিষ্পিষ্ট হয়ে যায় তো সে রথ থামে না; বরং চক্রনেমির চলার পথের বাধা অপসারণ করে জয়যাত্রা অব্যাহত রাখে।

নরম আরাম কেদারায় গা' এলিয়ে বইখানি হাতে করে আপনারাও একই ধরণের নির্লিপ্ততা অনুভব করবেন। ভাববেন, বেশ মজার বই হয়ত। বুড়ো গোরিওর গোপন বেদনার কাহিনী পড়ে অক্ষুণ্ণ ক্ষুধায় আপনারা হয়ত খানা-পিনা করবেন, নিজেদের হৃদয়হীনতার জন্য দোষী করবেন লেখককে— অতিরঞ্জন আর অবাস্তব কাল্পনিকতার দায়ে অভিযুক্ত করবেন তাকে। বিশ্বাস করুন, নাটক, উপন্যাস বা রোমান্স এ নয়। সবই সত্য। এত সত্য যে নিজেদের সংসারে, এমনকি নিজেদের অন্তরেও হয়ত এই ট্র্যাজেডির সত্যতা যে কেউ উপলব্ধি করতে পারবেন।

বোর্ডিংটি মাদাম ভোকের নিজস্ব সম্পত্তি। রুয় ন্যুভ-স্যাঁৎ-জনভিয়েভ রাস্তাটি নীচের দিকে আচমকা মোড় ঘুরে যেখানে রুয় দ লারবালেতের দিকে গড়িয়ে নেমে গেছে, বোর্ডিংয়ের বাড়ীটি সেই মোড়ে। গাড়ী ঘোড়া কচিৎ চলাচল করে এ পথে। গাড়ী চলাচল নেই বলে এখানকার স্তব্ধতা আরও গভীর। শুধু এই পথ কেন, ভাল-দ-গ্রেস্ আর পাতেঁয় এই দুটি অট্টালিকার মাঝামাঝি এই অঞ্চলের সব রাস্তার এক অবস্থা। এই সামরিক হাসপাতাল আর সমাধি মন্দিরের গম্বুজ দুটির নিষ্প্রভ সীসার মত রঙ এখানকার আবহাওয়া যেন ছায়াচ্ছন্ন থমথমে করে রেখেছে। এই মহল্লার ফুটপাত শুকনো।- নর্দমায় কাদা বা জল কোনটাই নেই। ঘাস জন্মে দেয়ালের পাশে পাশে। গাড়ী ঘোড়া যে পথে চলে না, কারা-প্রাচীরের মত যেখানকার প্রাচীর-ঘেরা বাড়ীগুলো বিষণ্ণ, সেই নিঃশব্দ পথে চলতে গিয়ে দিলদরিয়া পথচারীও মনমরা হয়ে পড়ে। পথ ভুলে পারির কোন সৌখীন বাবু এই মহল্লায় যদি

আসেন তো চারপাশে শুধু মেস বাড়ী বা কোন প্রতিষ্ঠানের ভবন, দুঃখ-দুর্দশা কি নীতিভ্রষ্টতা, মামুলি মৃত্যুপথ-যাত্রী কি কারখানার জোয়ালে বাঁধা আনন্দদীপ্ত যুবক ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাবেন না। প্যারির সব চাইতে কদর্য অঞ্চল এটি—সব চাইতে অপরিচিতও বলা চলে। রুয় স্তভ-স্যাং-জনভিয়েভ রাস্তাটি যেন একটা ব্রঞ্জের ফ্রেমের মত। ঠিক এই কাহিনীর উপযোগী। নিরানন্দময় রূপ-রেখা আর বিষাদ ভারাক্রান্ত দৃশ্যের জন্য আগে থেকে মন তৈরী করে নিতে হবে। এ যেন পর্যটকের ভূ-গর্ভস্থ সমাধি দেখার মত। ধাপে ধাপে সিড়ি বেয়ে ভূগর্ভে নামছে আর চোখের সামনে দিবালোক স্তিমিত হয়ে আসছে...কানে আসছে পথ-প্রদর্শকের নিষ্প্রাণ কণ্ঠস্বর। এই উপমা ঠিক ঠিক প্রযোজ্য। কেননা শূন্য কঙ্কাল আর শুষ্ক হৃদয়—এ দুয়ের মধ্যে কোনটা যে বেশী বিভীষিকাময় তা কে বলতে পারে?

বোর্ডিংটির সামনে ছোট্ট একটি বাগান—রুয় স্তভ-স্যাং-জনভিয়েভের ঠিক সমকোণে অবস্থিত। রাস্তা থেকেই বাগানের খানিকটা অংশ দেখা যায়।

বাড়ী ও বাগানের মাঝখানে হাত চারেক চওড়া একটি নুড়ি বসান নালা। তার পাশে কাঁকড় বিছান পথ। পথের পাশে বড় বড় নীল আর সাদা মাটির টবে জেরানিয়াম, অলিণ্ডার আর পোমিগ্রানেট গাছ সাজান। পথের এক প্রান্তে বাড়ীর পাশের দুয়ার। তার উপর বড় বড় হরফে লেখা: মেজঁ ভোকে। তার তলায় ছোট ছোট অক্ষরে লেখা: ভদ্র-লোক ও মহিলাদের আবাস ইত্যাদি।

দিনের বেলা পাশ দিয়ে যাবার সময় কাঁসার ঘণ্টা ঝুলান ফটক আর কাঁকড় বিছান পথটির শেষ প্রান্তে অখ্যাত শিল্পীর আঁকা সবুজ মর্মরের একটি তোরণ নজরে পড়ে। প্রেমের দেবতার এক বিগ্রহ রয়েছে এই নকল মন্দিরে। মন্দিরটির বেদী থাকে থাকে সাজান পাথর দিয়ে তৈরী। এই মেজের উপর বসান মূর্তিটি দূর থেকে পাশাপাশি হাসপাতালের রোগীর মত দেখায়। রূপক আলঙ্কারিকদের পক্ষে দৃশ্যটি সত্যই উপভোগ্য। স্তম্ভমূলে আধ-মোছা একটি ফলক মন্দিরটির নির্মাণকাল ধরিয়ে দিচ্ছে। ১৭৭৭ সালে ভলতেরের পারি প্রত্যাবর্তন উপলক্ষে যে ভাবোচ্ছাস দেখা দেয়, তারই সাক্ষ্য বহন করছে ফলকটি:

'যে-ই তুমি হও, প্রভু তোমায় দেখেছেন;
তিনি আছেন, ছিলেন আর থাকবেনও।'

রাত্রিবেলা মেস বাড়ীর ফটকের উইকেটের দরজা সরিয়ে নিশ্ছিদ্র কপাট আটকে দেওয়া হয়।

বাড়ীর সামনেটা যতটা লম্বা বাগানটিও ততটুকু। সামনের দিকে রাস্তার দেয়াল, আর খানিকটা ঘেরা পাশের বাড়ীর প্রাচীর দিয়ে। সেই প্রাচীরটির আগাগোড়া আবার আইভি লতায় ঢাকা। পাশ দিয়ে যাবার সময় পথচারী এই আইভি দিয়ে ঢাকা মনোরম প্রাচীরটির দিকে চেয়ে থাকে। পারি শহরে এমন দৃশ্য বিরল। বাগানের প্রতিটি দেয়ালের কাছাকাছি আবার লতানে ফলের গাছ আর আঙুর লতার জন্য সযত্নে খোপ খোপ করে মাচা বাঁধা। মাদাম ভোকে প্রতি বছর সাগ্রহে নিজের বাগানের ধুলোমাখা ময়লাটে ফলের দিকে চেয়ে থাকেন। এবং এ নিয়ে বোর্ডিংয়ের ভাড়াটেদের সঙ্গেও হামেশা আলোচনা হয়। প্রতিটি দেয়ালের গা' ঘেঁষে এক একটি সরু পথ গিয়ে লাইম গাছের ঝোঁপের কাছে শেষ হয়েছে। মাদাম ভোকে বরাবর এগুলিকে 'লাইন' গাছ বলে ডাকতেন; বোর্ডিংয়ের ভাড়াটেরা বহুবার তাকে এই ভুলের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছে আর দ কঁন্ফ্লাঁস পরিবারের মেয়ে হিসাবেও এই ভুল সম্পর্কে তার অবহিত থাকা উচিত ছিল। বাগানের চারপাশের রাস্তা দিয়ে ঘেরা জায়গাটুকুর মধ্যে আর্টিচোক শবজির ক্ষেত, তারই প্রান্তে টক পালং, ট্যাড়শ আর পার্সলি শাকের গাছ; আর তার চারপাশে মোচার মত করে ছাঁটা ফলের গাছ। লাইম গাছকটার তলায় সবজে রঙ-করা একখানা গোল টেবিল আছে। তার চারপাশে বসবার আসনও রয়েছে খানকয়েক। বোর্ডিংয়ের ভাড়াটেদের মধ্যে কফি খাবার মত পয়সা যাদের আছে, বিরক্তিকর দিনে এখানে এসে তারা কিছুটা সময় কাটিয়ে যায়। কিন্তু জায়গাটি এত গরম যে বেশীক্ষণ আড্ডা জমান সম্ভব নয়। চিলে কোঠা বাদে কাটা পাথরে তৈরী বাড়ীটি তিনতলা। পারির অন্যান্য বাড়ীর মত এটিরও রঙ ফিকে হলদে। অতি জঘন্য দেখতে। প্রতি তলার সামনের পাঁচ পাঁচটি জানালায় ছোট ছোট চারকোণা সার্সি। আর সেই জানালার পরদাগুলো এমন বিভিন্নভাবে গুটানো যে কোনটার সঙ্গে কোনটার লাইনের সমতা নেই। বাড়ীটির আড়ের দিকে দুটি জানালা, নীচের তলারটিতে লোহার গরাদে। বোর্ডিংয়ের

পেছনে বিশ ফুট একটা চৌকো উঠোন। এক দঙ্গল শূয়োর, মোরগ আর বিলাতি ইঁদুর সেখানে পরমানন্দে চরে বেড়ায়। তার ওধারে জেলা-কাঠের চালা। এই চালা আর রান্নাঘরের জানালার সঙ্গে মাংসের বাক্স ঝুলান। তার নীচে নর্দমার তেলো জল বয়ে যাচ্ছে। উঠোনের লাগোয়া ছোট্ট একটি দরজা দিয়ে পাচক সমস্ত আবর্জনা ঝেঁটিয়ে রুয় অভ-স্যাঁৎ জনভিয়েভে ফেলে দেয়—দেদার জল ঢেলে উঠোন ধুইয়ে দেয় রোগের শঙ্কায়।

মধ্যবিত্তের বোর্ডিংয়ের উপযোগী করে নীচুতলাটি তৈরী করা হয়েছে। রাস্তার মুখোমুখি দুটি জানালা দিয়ে প্রথম কামরাটিতে আলো ঢোকে। ভাঁজ-করা অপর একটি কাঁচের জানালা দিয়েও ঢোকা যায় ঘরটিতে। বৈঠকখানার একটি দরজা দিয়ে খাবার ঘরে যাওয়া যায়। খাবার ঘর আর রান্নাঘরের মাঝখানে কাঠের সিড়ি। এই সিড়ির প্রতিটি ধাপে আবার রঙ-বেরঙের চকচকে টালি বসান। হরেকরকম চেয়ার সাজান এই বৈঠক-খানার চাইতে কোন বিচ্ছিরি দৃশ্য থাকতে পারে না। চেয়ারগুলো আবার ফিকে এবং চটকদার ডোরা কাটা কাপড় দিয়ে মোড়া। ঘরের মাঝখানে স্যাঁতানের শ্বেতপাথর বসান একখানা গোল টেবিল। তার উপরে সাদা চীনা-মাটির চায়ের সরঞ্জাম। কাপগুলির বর্ডারের সোনালী রূপ-সজ্জার কাজ আবার প্রায় অর্ধেক মুছে গেছে। এই ধরণের চায়ের সরঞ্জাম আজকাল প্রায় সর্ব্বত্রই দেখা যায়।

ঘরখানির মেজে অসমতল। দেয়ালগুলো কনুই অবধি কাঠ দিয়ে মোড়া। বাকী অংশে কাগজ লাগান। তার উপর নানা রঙে তেলেমাক নাটকের প্রধান প্রধান দৃশ্যে সুবিদিত নট-নটীর ছবি আঁকা। গরাদে দেওয়া জানালার মাঝখানকার দেয়ালে ইউলিসেসের পুত্রের সংবর্ধনায় ক্যালিপ্সোর ভোজ সভার ছবি। আজ চল্লিশ বছর ধরে বোর্ডিংয়ের তরুণ ভাড়াটেরা এই ছবিখানিকে ঠাট্টা-তামাসা করে আসছে। তাদের ধারণা, দারিদ্র্যের জন্য বাধ্য হয়ে যে খাদ্য তাদের খেতে হচ্ছে, তাকে উপহাস করলে নিজেদের অবস্থা অনুসারে বড়লোকী চাল দেখান হবে।

পাথুরে চিমনির দুই পাশে কাঁচের ঢাকনি লাগান রঙ-চটা কৃত্রিম ফুলের দুটি ফুলদানি। এই দুটির মাঝখানে একটি নীলচে শ্বেত পাথরের ঘড়ি। নেহাৎ অমার্জিত রুচির পরিচয়। ঘরখানির পরিচ্ছন্নতা দেখে পষ্টই মনে হয়, বিশেষ কোন উপলক্ষে ছাড়া এই ঘরে আগুন জ্বলে না।

প্রথম ঘরখানি থেকে যে গন্ধ বেরোয়, ভাষায় তার কোন নাম নেই। একে বোর্ডিংয়ের গন্ধ বলা যেতে পারে। বাতাসে বদ্ধ হাওয়ার ভ্যাপসা গন্ধ। তার সঙ্গে মিশেছে পুরনো ছাতা-পড়া বাড়ীর সোঁদা গন্ধ। শ্বাস নিলেই ঘরের স্যাঁৎসেঁতে ঠাণ্ডায় গা শির শির করে ওঠে। বেশবাস ফুঁড়ে এই ঠাণ্ডা গায়ে লাগে যেন। যত রকম খাবার বোর্ডিংয়ে খাওয়া হয়েছে, তার সব কটির গন্ধ হাওয়ায় ভাসছে। সারা ঘর রান্না-বান্না আর বাসন পত্রের গন্ধে ভুরভুর করছে। আর তার সঙ্গে মিশেছে দুর্ভাগা জীবনের সমস্ত আবর্জনার ঝাঁঝাল বোঁটকা গন্ধ। যুবা-বৃদ্ধ-নির্বিশেষে প্রতিটি ভাড়াটে শ্বাস-প্রশ্বাসে যে পরিমাণ দূষিত জিনিস বাতাসে ছড়ায় তার পরিমাপ করার কোন ব্যবস্থা যদি থাকত তাহলে হয়ত এই গন্ধের বর্ণনা দেওয়া সম্ভব হত। তবু এত পচা বোঁটকা গন্ধ সত্ত্বেও লাগোয়া খাবার ঘরের তুলনায় বৈঠকখানার ঘরখানি মহিলাদের নিভৃত প্রসাধন কক্ষের মত সুবাসিত আর পরিপাটি সম্মত।

কাঠ দিয়ে মোড়া দেয়ালে এককালে যে রঙ লাগান হয়েছে, আজকে আর তা চেনা যায় না। এই রঙের পটভূমির উপর ময়লার দাগ লেগে অদ্ভুত সব ছবি ফুটে বেরিয়েছে। ঘরের কোণে লাইন দিয়ে তেল চটচটে টেবিল সাজান, তার উপর ভাঙা দাগওলা ডিকেন্টার, সিল্কের মত চকচকে ধাতু নির্মিত রেকাব আর তুরনের তৈরী নীল বর্ডারের পুরু মাটির বাসনের পাঁজা। এক কোণে নম্বর দেওয়া খুপরিওলা একটা বাক্স, তার মধ্যে ভাড়াটেদের নিজের নিজের খাবারের টেবিলের দাগওলা মদ ছিটান তোয়ালে। মৌরুসী যে সব আসবাবপত্র প্রতি গৃহস্থ সংসার দূর করে দেয়, তারও কিছু কিছু স্থান পেয়েছে এখানে। কারণ, সভ্য সমাজের চরম বিপর্যস্ত মানুষের শেষ আশ্রয় তো দুরারোগ্যের হাসপাতাল। কাজেই, ঘরের মধ্যে চোখ বুলোলেই একটি তাপমান যন্ত্র, কালো কাঠের ফ্রেমে আঁটা সোনার গিল্টিকরা জঘন্য বিরক্তিকর কিছু ছবি, তামার কাজ করা কচ্ছপের খোলেভরা একটি ঘড়ি, সবজে একটা ষ্টোভ, ধুলোবালি আর তেলমাখা গোল পলতেভরা আরগাঁ ল্যাম্প গোটাকয়েক আর তেল চটচটে অয়েল ক্লথে ঢাকা একখানা লম্বা টেবিল দেখা যাবে। অয়েল ক্লথখানা আবার এত তেলো যে খেয়াল হলে রসিক ভাড়াটেরা নখ দিয়ে অনায়াসে তার উপর নিজেদের নাম সই করতে পারে। এছাড়া পেছন

ভাঙা খানকয়েক চেয়ার আর অতিজীর্ণ এস্‌পারটো ঘাসের তৈরী মাদুরও আছে ঘরে। মাদুরটি বহু জায়গায় ফেটে গেছে, কিন্তু একেবারে টুকরো টুকরো হয়ে যায়নি। আর আছে কালজীর্ণ, ফোকরওলা, কব্‌জা-ভাঙা, ঘুণেধরা পাদপীঠ। সব আসবাবপত্রই পুরনো, ভাঙা-চুরা, নড়বড়ে, পোকে-কাটা, লিকলিকে, জীর্ণপ্রায় আর অন্তিমদশায় উপনীত। তবু কাহিনীর রহস্যের জট না খুলে আর অধীর পাঠকের ধৈর্যের উপর দুর্বহ চাপ না দিয়ে এ-সবের প্রকৃত অবস্থা বর্ণনা করা যায় না। মেজের লাল টালিগুলো ঘর ধোয়ানোর ঘসা-ঘসিতে ক্ষয়ে গর্ত হয়ে গেছে। এক কথায়, জৌলুস-হীন হতদারিদ্র্যের মৌরুসী রাজত্ব এখানে। খাঁটি জঞ্জাল হয়তো নেই, তবু সব কিছুই নোংরা আর অপরিচ্ছন্ন। ছেঁড়া কোন নেকড়াকানি চোখে না পড়লেও সব কিছুই কালজীর্ণ ধ্বংসমুখী।

সকাল সাতটায় ঘরখানির জৌলুস উথলে পড়ে। মাদাম ভোকের বেড়ালটা এই সময় নীচতলায় নেমে আসে। অগ্রদূত দেখেই বোঝা যায় গিন্নীও আসছেন। ঘরে ঢুকেই বেড়ালটা এক লাফে বাসন রাখার টেবিলটার উপর চড়ে দুধের ভারঢাকা পিরিচগুলো শুঁকতে আরম্ভ করে দেয়—অস্ফুট শব্দ করে প্রভাতী অভিনন্দন জানায় দুনিয়াকে। একটু বাদে গিন্নীও রেশমের সূক্ষ্ম জাল লাগান বাঁকা টুপি পরে ঘরে ঢুকে ভাঁজপড়া চটি পায়ে ব্যস্ত সমস্ত হয়ে ঘুরে বেড়ান। বার্দ্ধক্যের ছাপমারা তার গোলগাল মুখে টিয়ার মত নাকটাই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তার টোলপরা খাটো খাটো হাত, গীর্জার ইঁদুরের মত নাদুস-নুদুস চেহারা আর তার বেটপ পোশাক হত দারিদ্র্য তাময় ঘরখানির পক্ষে মানানসই। এই ঘরের প্রতিটি দেয়াল থেকে দীনতা চুইয়ে পড়ছে—কণ্ঠরুদ্ধ পদদলিত আশা হার মেনেছে হতাশার কাছে। এই বদ্ধ হাওয়ার ভ্যাপসানির মধ্যে মাদাম ভোকে বিন্দুমাত্র অস্বস্তিবোধ করেন না। হেমন্তের পয়লা তুষার-ঝরা কনকনে দিনে তার মুখাবয়বের সরসতা, তার বলিরেখাঙ্কিত চোখ কিংবা কখনও ব্যালে নর্তকীর গতানুগতিক মিঠে হাসির মত আর কখনও বা হুণ্ডিওলার ভ্রূকুটির মত তার মুখ-ব্যঞ্জনা—এক কথায় তার গোটা ব্যক্তিত্ব যেন এই বোর্ডিং হাউসের রহস্যের চাবিকাঠি। আবার বোর্ডিংটি দেখেও অনায়াসে এমনি একটি মহিলার অস্তিত্ব অনুমান করা যায়। পাহারাওয়ালা ছাড়া কারাগারের কল্পনা করা যায়না। একটিকে বাদ দিয়ে অপরটির কল্পনা কোনমতেই

সম্ভব নয়। হাসপাতালের দুর্গন্ধ থেকে যেমন টাইফয়েড রোগ জন্মায়, মাদামের বেঢপ গতরও তেমনি এখানকার জীবনযাত্রার পরিণতি। মহিলাটির ইস্ত্রি-করা পুরনো পোশাকে-ঢাকা হাতেবোনা পশমী পেটি-কোটটিতে বৈঠকখানা, খাবার ঘর আর ছোট বাগানটির মর্মবাণী ব্যঞ্জনাময় হয়ে উঠেছে। এই থেকেই বোঝা যায়, রান্নাঘরের চেহারা কি রকম আর ভাড়াটেরই বা কি ধরণের। মাদামের চেহারাই গোটা দৃশ্যে পূর্ণতা এনে দিয়েছে।

বছর পঞ্চাশেক বয়স মাদাম ভোকের। বেশ কিছু ঝামেলা ঝঞ্ঝাট যাদের উপর দিয়ে গেছে, তেমনি আর দশজন মহিলার মতই তাকে দেখতে। কুটনীর মত নিরীহতা-মাখা তার ঢলঢল চোখ দুটি খদ্দেরের কাছ থেকে মোচড় দিয়ে কিছু বেশী পয়সা আদায় করার জন্য যে কোন মুহূর্তে আপনা থেকেই যেন ক্রোধের ভানে শাণিত হয়ে ওঠে। নিজের জীবন নিষ্কণ্টক করার জন্য কোন অপকর্মেই তার অরুচি ছিল না। জর্জ আর পিশগ্রুর মত জেনারেল যদি এখনও নাপলেয়ঁর ভয়ে লুকিয়ে থাকতেন, আর তাদের ধরিয়ে দেওয়া যদি সম্ভব হত, তাহলে মাদাম ভোকে সে কাজ করতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করতেন না। এ সত্ত্বেও মহিলাটির প্রাণটা ভাল। কঁকাতে বা কাশতে শুনে ভাড়াটেদের মধ্যে যারা তাকে বিপন্না বলে মনে করত, তারা অন্তত বলত একথা। মঁশিয় ভোকে কেমন ছিলেন? মৃত স্বামী সম্পর্কে কোন আলোচনাতেই তিনি যোগ দিতেন না। কি করে তিনি অত টাকা খোয়ালেন? জবাবে মাদাম জানাতেন, দুর্ঘটনা—দুর্ভাগ্য। মহিলাটির মতে, স্বামী তার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেছেন, বসবাসের একখানা বাড়ী আর জল ফেলার মত দুটো চোখ ছাড়া আর কিছুই রেখে যাননি। আর সেই সঙ্গে দিয়ে গেছেন বিপন্নের প্রতি কোন সহানুভূতি বোধ না করার অধিকার। মাদাম বলতেন, খাঁটি বিপদ যে কি তা তিনি জানেন, আর স্ত্রীলোকের পক্ষে যত রকম বিপদে পড়া সম্ভব তার অভিজ্ঞতাও হয়েছে।

গিন্নীকে ঘোরাঘুরি করতে দেখে মুটকী পাচিকা সিলভি চটপট ভাড়াটেদের প্রাতরাশ দিয়ে যেত। যারা এখানে খাওয়া-দাওয়া করে কিন্তু থাকে না, সেই বাইরের লোকেরা সাধারণত দুপুরের খাবার সময় আসে। এদের মাসিক খরচ ত্রিশ ফ্রাঁ।

এই কাহিনী আরম্ভ হবার সময় সাতজন ভাড়াটে থাকত বোর্ডিংয়ে। দোতলার ঘরগুলোই সব চাইতে ভাল। মাদাম ভোকে এর মধ্যে খারাপ দু'খানি ঘর নিয়ে থাকতেন। আর বাকী ঘর দুখানা ভাড়া দেওয়া হয়েছিল সাধারণতন্ত্রের এক জেলা শাসকের বিধবা মাদাম কুত্যুরকে। বিধবার সঙ্গে আবার ভিকতরিন তাইফের নামে এক কিশোরী থাকত। মহিলাটিই কিশোরীর অভিভাবিকা। এই দুজনের থাকা-খাওয়ার খরচ আঠার শ' ফ্রাঁ।

তেতলার একখানা ঘরে থাকত পোয়ারে নামে এক বৃদ্ধ। আর এক খানায় থাকত কালো পরচুলাপরা গোঁফে কলপ লাগান বছর চল্লিশেকের একটি লোক। নিজেকে সে পরিচয় দিত সাবেক ব্যবসায়ী বলে। নাম বলত মঁশিয় ভোতর‍্যাঁ।

তেতলার চারখানা ঘরের আর দুখানাতেও ভাড়াটে ছিল। একখানায় থাকত চিরকুমারী মাদমোয়াজেল মিশনো; আর অপর খানায় থাকত সেমুই, ইতালীয় পিঠে আর শ্বেতসারের সাবেক এক ব্যবসায়ী। লোকে তাকে বুড়ো গোরিও বলে ডাকত, কিন্তু লোকটা কোন প্রতিবাদ করত না। বাকী ঘর দুখানা ছিল সাময়িক অতিথি কিংবা মাদমোয়াজেল মিশনো কিংবা বুড়ো গোরিওর মত থাকা-খাওয়ার জন্য মাসিক পঁয়তাল্লিশ ফ্রাঁ'র বেশী ব্যয় করতে অসমর্থ দুঃস্থ ছাত্রদের জন্য। মাদাম ভোকে অবশ্য এই ধরণের ভাড়াটে আদৌ পছন্দ করতেন না এবং ভাল কোন ভাড়াটে না পাওয়া গেলেই শুধু এদের রাখতেন। এরা নাকি বড্ড বেশী রুটি খায়।

এই গল্পের সময়ে এর একখানি ঘর এক যুবককে ভাড়া দেওয়া হয়েছিল। আঁগুলেমের কাছাকাছি থেকে পারিতে আইন পড়তে এসেছিল ছেলেটি। তার বৃহৎ পরিবারের আর সবাই বছরে তাকে বারশ' ফ্রাঁ পাঠাতে হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে। ওজেন দ রাস্তিঞাক্ হচ্ছে সেই দলের যুবক, দারিদ্র্যের পীড়নে আবাল্য যাদের নাক শান দেবার পাথরে বাঁধা! শিশুকাল থেকেই এরা জানে, বাপ-মা এদের উপর কতটা ভরসা করে। তাই সযত্নে এরা উন্নতির সোপান তৈরী করে। আখেরে উন্নতির দিকে লক্ষ্য রেখেই এরা প্রথম থেকে পড়াশোনা আরম্ভ করে এবং সব সময় ভাবীকালের সম্ভাব্য ঘটনা-বিবর্তনের প্রতি হুঁশিয়ার থেকে চলে যাতে

সামাজিক কোন পরিবর্তন ঘটলে তারাই সবার আগে কিছুটা সুবিধা আদায় করে নিতে পারে। কিন্তু রাস্তিঞাকের কৌতুহলী মন আর পারির অভিজাত মহলে পরিচিত হবার ওস্তাদির জন্য এই গল্পের মধ্যে বাস্তবতার রঙ থাকবে না। তবে তার মনের সচেতনতা আর সমাজের জঘন্যতম পরিবেশের রহস্য উদ্ঘাটনের জন্য তার আগ্রহের দরুণ কাহিনীটি অবশ্যই সত্যতা বর্জিত নয়। যারা এই জঘন্য পরিবেশের স্রষ্টা, কিংবা যারা তাদের শিকার, তাদের দুইদলের লোক মিলেই তো সযত্নে এই জঘন্যতা গোপন করার চেষ্টা করে।

তিনতলার ছাতে ধোওয়া জামা-কাপড় শুকোবার একখানা কুঠরি আর দুটো চিলে কোঠা ছিল। বুটজুতো, ক্রিস্তফ্ আর মুটকী পাচিকা সিলভি থাকত এখানে।

এই সাতজন স্থায়ী ভাড়াটে ছাড়া জন-আটেক মেডিক্যাল কি আইনের ছাত্র এবং দু-তিনজন নিয়মিত অতিথি থাকত কাছাকাছি। এরা শুধু দুপুরের খাবার সময় আসত।

খাবার ঘরে জন আঠার লোক ধরে। চাপাচাপি করে বসলে বিশজন বসতে পারে। কিন্তু সকালবেলা টেবিলে মাত্র জনসাতেক লোক থাকে। কাজেই প্রাতরাশের আসরে একটা গেরস্তি আবহাওয়া সৃষ্টি হয়। সবাই চটি পরে আসে আর অন্তরঙ্গতার পরিবেশে জিভটাও আলগা হয়ে পড়ে। সকলেই অবাধে নিজের নিজের মতামত জানায়। মাঝে মাঝে ডিনারের অতিথিদের বেশবাস আর চেহারা সম্পর্কে গোপন মন্তব্য করা হয়। আবার কখনও আলোচনা হয় গত সন্ধ্যার ঘটনা নিয়ে। এই সাতজন ভাড়াটে মাদাম ভোকের বেয়াড়া সন্তানের মত। যার কাছ থেকে যতটা অর্থ আদায় হয় সেই অনুপাতে আকাশ-বিজ্ঞানীর মত চুলচেরা হিসাব করে মাদাম এদের প্রতি দরদ ও আনুকূল্য দেখান।

দৈবক্রমে এরা এক জায়গায় মিলিত হয়েছে। কিন্তু একটি বিষয় এদের সবাইকে প্রভাবিত করত। দোতলার ভাড়াটে দুটি মাসিক মাত্র বাহাত্তর ফ্রাঁ দিত। লা বুর্ব আর লা সালপেত্রিয়েরের মাঝামাঝি একমাত্র ফোবুর স্যাঁ-মারসেলেই এত কমে থাকা-খাওয়া সম্ভব। মাদাম ভোকের বোর্ডিংয়ের ভাড়াটেদের মধ্যে একমাত্র মাদাম কুত্যুরই শুধু এই সুযোগ নিতেন না। তার মানে, এই মহিলাটি ছাড়া ভাড়াটেদের মধ্যে আর সকলেই অল্প-বিস্তর সুস্পষ্ট

দারিদ্র্যের পীড়ন সহ্য করত। তাছাড়া বাড়ীটির ভেতরকার বিচ্ছিরি চেহারাও ভাড়াটেদের বেশবাসের সঙ্গে পুরোপুরি মানানসই। সকলের বেশবাসই জীর্ণ। পুরুষেরা যে কোট পরত তার মূল রঙ এখন আর চেনা যায় না। তাদের পায়ের জুতো অভিজাত মহল্লার পরিত্যক্ত নর্দমার জুতোর মত। জামা-জুতো-বেশবাসের সবটাই সাবেক আদত চেহারার ছায়ামাত্র। মহিলাদের পোশাক সাবেকী ফ্যাশানের। একবার রঙ চটে যাবার পর আবারও রং করা হয়েছে। ফের রঙ করা হয়েছে আরও একবার। পুরনো লেসগুলো রিপু-করা। দীর্ঘদিন ব্যবহারে হাতের দস্তানা পাতলা হয়ে গেছে। সবকটা কলারের রঙ-ওঠা। আর পোশাকের ফ্রিল গেছে ছিঁড়ে। বেশবাসের অবস্থা এমনি হলেও প্রায় সকলেরই দেহের গড়ন মজবুত। জীবনের ঝড়-ঝাপটা সয়ে সয়ে পাকা-পোক্ত হয়ে গেছে। অপ্রচলিত মুদ্রার উপর ছাপমারা মুখের মত এদের কঠোর নিষ্প্রাণ মুখাবয়ব বিশীর্ণ হলেও শুকনো মুখের দাঁতের পাটি বেশ লোভী। ভাড়াটেরা যেন দর্শকের মনে নাটকীয় প্রভাব ছড়ায়। আগেও যেন বহুবার অভিনীত হয়েছে এই নাটক, আর এখনও হচ্ছে। চিত্রিত পট আর পাদ-প্রদীপের সামনে এ নাটক অভিনীত হয় না। নীরবে অভিনয় হয় এই নাটকের···হৃদয়বিদারি হিমশীতল তার দৃশ্য। কোনদিন এই নাটকের যবনিকাপাত হয় না।

প্রবীণা ভদ্রমহিলা মাদমোয়াজেল মিশনো তার ক্লান্ত চোখের উপর লোহার তার দিয়ে বাঁধা একখণ্ড নোংরা সবজে তাফতা পরতেন। এ দৃশ্য পরম করুণাময় দেবদূতকেও ভয়ে দূরে সরিয়ে দেয়। মহিলাটির চেহারা এত রুক্ষ যে সামান্য ঝুরি লাগান শালখানা যেন একটি কঙ্কাল ঢেকে রেখেছে বলে মনে হত। কোন দ্রাবক রসে তার নারীদেহের সুষমা গলে গেছে? এককালে এ দেহ অবশ্যই সুঠাম সুষমামণ্ডিত ছিল। কেন গেল তাহলে? পাপে, দুঃখ-দহনে, না লোভে? প্রাণ ঢেলে এককালে ভালবেসেছিল কি? পুরনো পোশাকের কারবারী ছিলেন? না, শুধুমাত্র পারিষদ ছিলেন? একদিন দুনিয়া যখন সম্ভোগের উপহার নিয়ে তার পদপ্রান্তে ছুটে এসেছে, প্রমত্ত যৌবনের সেই বিজয়-কাহিনী স্মরণ করে আজকে এই বৃদ্ধবয়সে অবজ্ঞাত জীবন যাপন করে তিনি কি প্রায়শ্চিত্ত করছেন? তার শূন্য দৃষ্টি দেখে রক্ত হিম হয়ে আসে। কোঠরাগত চোখ আর গাল-বসা মুখের চেহারা বিভীষিকাময়। মহিলাটির কণ্ঠস্বরে একটা ক্ষীণ তীক্ষ্ম কর্কশতা ছিল। মনে হত যেন শীতাগমে ঝোপ-জঙ্গলে গজা

ফড়িং শিশ্ দিচ্ছে। বলতেন, নিঃস্বজ্ঞানে সন্তান পরিত্যক্ত এক বৃদ্ধ ভদ্রলোককে তিনি পরিচর্যা করতেন। লোকটি নাকি মূত্রাশয়ের রোগে ভুগ্ত। এই ভদ্রলোকই নাকি তার জন্য আজীবন হাজার ফ্রাঁ বাৎসরিক বৃত্তির বন্দোবস্ত করে গেছেন। তার উত্তরাধিকারীরা মাসে মাসে এই বৃত্তির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছে, কলঙ্ক রটিয়েছে তার নামে; কিন্তু আত্মপক্ষ সমর্থনের কোন প্রমাণ তার ছিল না। বেশ বোঝা যায়, সম্ভোগের বিলাসিতায় তার মুখ ভেঙে তচনচ হয়ে গেছে। তবু অবশিষ্ট কমনীয়তাটুকু এখনও কিছুটা সুষমার সাক্ষ্য দিচ্ছে।

মঁশিয় পোয়ারের অবস্থা স্বয়ং সচল যন্ত্রের মত। জারদ্যাঁ দ প্লাতের ফুটপাথ দিয়ে নরম পুরনো টুপি পরে আঙুলের ডগায় হাতির দাঁতের হলদে মুঠিওলা ছড়ি ঝুলিয়ে প্রায়শ তাকে অস্পষ্ট ছায়ার মত চলা-ফেরা করতে দেখা যেত। তার ফ্রক কোটের কোঁচকানো প্রান্ত হাওয়ায় উড়ে ব্রিচেজ পড়া উরুতের অনেকটা অবারিত করে ধরত। ব্রিচেজটা আবার তার বিশীর্ণ পাছার পক্ষে বড্ড বেশী ঢিলে। চলবার সময় নীল মোজা পরা পা দুটো টলে যেত মাতালের মত। সাদা ওয়েস্ট কোটটা আবার নোংরা। মোটা কোঁচকানো মসলিন দিয়ে তৈরী শার্টের ফ্রিল আর তার মোরগের মত লিকলিকে গলায় জড়ান টাইর মাঝখানে একটা ফাঁক বেড়িয়ে পড়ত। তাকে দেখে বহু লোক অবাক হয়ে ভাবত, বুলভার ইতালিয়াঁর রোদে যারা ঘোরাফেরা করে, এই পরদেশী ভূত সেই সাহসী জাতের লোক কিনা। কোন শ্রমে তার দেহ এত বিশীর্ণ হতে পারে? কোন নেশায় লম্বা চোয়াড়ে মুখ অমন কালো হয়ে গেছে? ব্যঙ্গচিত্রের পক্ষেও মুখখানা বড্ড বেশী অতিরঞ্জিত বলে মনে হবে। কি কাজ করত? বিচার বিভাগে কাজ করত বুঝি! সে অফিসে তো জল্লাদরা গিলোতিনের ঝুড়ির করাতের গুড়ো, কুঠারের দড়ি আর পিতৃ-মাতৃ-হন্তার প্রাণদণ্ডকালীন কালো মুখোশের খরচসহ জমা খরচের হিসেব দাখিল করে। লোকটা হয়ত কসাইখানার রিসিভার ছিল, কি জনস্বাস্থ্য বিভাগে কাজ করত। যে বৃত্তিই তার থাক, লোকটি আমাদের বিশাল সামাজিক পেষণ-যন্ত্রের দাস। অন্যের হাতিয়ার হয়ে যারা খেটে মরছে, গরীব সেই হতভাগ্যদের একজন। খেটে মরছে, অথচ জানে না কাদের স্বার্থরক্ষার জন্য হীন কাজ করে যাচ্ছে। তাদের নাম পর্যন্ত শোনেনি। জনস্বার্থের অজুহাতে নোংরা বা অপ্রীতিকর কাজ করাবার জন্য যে যন্ত্রের

প্রয়োজন, এরা সেই বিরাট যন্ত্রের ক্ষুদ্র অংশ মাত্র। এক কথায়, এরা হচ্ছে সেই দলের লোক যাদের সম্পর্কে আমরা বলে থাকি ঃ যাই হোক, এদের না হলে কাজ তো চলে না। সৌখীন ভদ্র পারি এদের মানসিক ও দৈহিক বেদনা ক্লিষ্ট মুখও চেনে না। তবে পারি তো সমুদ্রের মত। এর মধ্যে ওলন ছুঁড়ে মার, কোনদিন সে ওলন তলায় পৌঁছোবে না। ইচ্ছে হয়, জরিপ কর—বর্ণনা কর। কিন্তু সে জরিপ যত নিখুঁত হোক, যত নির্ভুল সে তালিকা হোক, এই সমুদ্রের আবিষ্কারকদের সত্য নির্দ্ধারণের আগ্রহ যত ঐকান্তিক হোক না কেন, খানিকটা অজানা জগতের কিনারা করা যাবে না। স্বপ্নাতীত ফুল, মুক্তা, অতিকায় দানব আর অচেনা জিনিসভরা-এক অজ্ঞাত গুহা চিরদিন থেকে যাবে। মের্জ ভোকে সেই বিস্ময়কর রহস্যলোকের অন্যতম।

বোর্ডিংয়ের ভাড়াটেদের মধ্যে দুটি লোক সম্পুর্ণ আলাদা ধরনের। ভিকতরিন্ তাইফের অবশ্য তরুণ ক্ষয়রোগীর মত পাণ্ডুর ভগ্নস্বাস্থ্য। আর সার্বজনীন দুঃখ-দুর্দশাময় ছবির অংশ হিসাবে স্বভাবতই সে বিষণ্ণ এবং উৎকণ্ঠিত···কেমন যেন ঝিমুঝিমু দুর্ব্বলতাভরা। তবু তার মুখ আর কণ্ঠস্বরে তারুণ্যের লাবণ্য ছিল, চলাফেরা ছিল চটপটে। তরুণ বয়সে এই দুর্ভাগ্যের দরুণ তার অবস্থা প্রতিকূল মাটিতে সদ্য পোঁতা চারা গাছের মত হয়ে পড়েছে। নতুন মাটিতে পাতাগুলো যেন পাটল হয়ে গেছে। তার গড়ন, গায়ের রঙের মনোরম আভা, তার রাঙাটে কটা চুল আর তন্বীদেহ আধুনিক কবি কল্পনায় তাকে মধ্যযুগীয় মূর্তির সুষমা দান করেছে। কটা চোখের কাজল কালো মণি দিয়েছে খ্রীষ্টানোচিত স্নিগ্ধ লাবণ্য আর সহিষ্ণুতা। তার কিশোরী দেহে সাদাসিধে আটপৌরে' বেশবাস। চারপাশের লোকজনের তুলনায় ভিকতরিন সুন্দরী। মনে যদি সুখ থাকত তো মনমোহিনী হতে পারত। কারণ সুখই তো নারীকে কাব্যের সুষমামণ্ডিত করে তোলে। আদব-কায়দা আর পরিপাটি তো তাদের প্রসাধনের মত। ভিকতরিনের বিবর্ণ কপোলে যদি বল-নাচের গোলাপী আভা প্রতিবিম্বিত হত, সুখ শান্তিময় স্বচ্ছন্দ জীবনযাত্রার প্রাচুর্যে তার ঈষৎ বসা গাল যদি নিটোল লালিমামাখা হত, অনুরাগের সঞ্জীবনী সুধায় তার বিমর্ষ দৃষ্টি যদি উজ্জ্বল হয়ে উঠত, মেয়েটাকে তাহলে অনায়াসে অনিন্দ্যসুন্দরীদের সঙ্গে তুলনা করা চলত। যে অরূপ রঙ মেয়েদের নতুন জীবন দেয়, সেই মনোরম বেশবাস আর প্রেমপত্রের অভাব ছিল তার জীবনে। তার জীবন কাহিনীই একখানি উপন্যাসের

পটভূমি হতে পারে। তার বাবার ধারণা, তাকে উত্তরাধিকারচ্যুত করার যথেষ্ট কারণ আছে। তাই সে ওকে নিজের কাছে রাখেনি—বছরে মাত্র ছ'শ ফ্রাঁ বৃত্তির বন্দোবস্ত করে দিয়েছে। পুত্রকে সব কিছু দিয়ে যাবার আগ্রহে আর ভিকতরিনকে উত্তরাধিকারবঞ্চিত করবার জন্য সমস্ত সম্পত্তি সে নিজের নামে লিখিয়ে নিয়েছে। ভিকতরিনের মা মাদাম কুত্যুরের দূর সম্পর্কের আত্মীয়া। ভগ্ন-হৃদয়ে তিনি মারা যান। সেই থেকে মাতৃহীনা মেয়েটিকে নিজের সন্তানের মত পালন করে আসছেন মাদাম কুত্যুর। দুর্ভাগ্যবশত বিবাহের যৌতুক আর পেনসন্‌ ছাড়া সাধারণতন্ত্রের জেলা শাসকের এই বিধবার অপর কোন অবলম্বন ছিল না। একদিন হয়ত অভিজ্ঞতাহীন এই দরিদ্র অনাথা বালিকাকে সংসারের করুণার উপর ছেড়ে দিয়ে তিনি চিরবিদায় নেবেন। প্রতি রবিবার এই নিষ্ঠাবতী মহিলা ভিকতরিনকে উপাসনায় নিয়ে যেতেন, আর প্রতি পক্ষে একবার নিয়ে যেতেন পাপ স্বীকারের জন্য। তাতে আর যাই হোক, মেয়েটি ধর্মের সান্ত্বনা তো পেতে পারে। মাদাম কুত্যুরের এই সিদ্ধান্ত সুবিবেচিত। উত্তরাধিকারবঞ্চিত পিতৃবৎসল কন্যার পক্ষে ধর্মভাব সান্ত্বনাদায়ক বটে। এই নিষ্ঠা তাকে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আশান্বিত করে তোলে। মা যে বাবাকে ক্ষমা করেছেন, এই সংবাদ প্রতি বছর বাবাকে সে জানাতে যায়। কিন্তু পিতৃগৃহের কপাট বন্ধ; তার পক্ষে চিরতরে রুদ্ধ সে কপাট। এই সংবাদ বহনের একমাত্র অবলম্বন তার ভাই। সেও আজ চার বছর দেখা করতে আসেনি, কিংবা কোন সাহায্য পাঠায় নি। বাপের চোখ খোলার জন্য আর ভাইয়ের কঠোর প্রাণ নরম করার জন্য প্রতিদিন সে প্রার্থনা করে। প্রার্থনা করে কিন্তু তাদের কারুকে দোষী করে না। ক্রোড়পতির এই জঘন্য আচরণের নিন্দা করার যথেষ্ট ভাষা মাদাম কুত্যুর আর মাদাম ভোকে গালাগালের অভিধানে খুঁজে পান না। তারা যখন এই কুখ্যাত পিতাকে নিন্দা করেন, ভিকতরিনের মুখ থেকে তখন বিনয়ী কথা শোনা যায়। সে যেন আহত কপোতীর করুণ কঁকানি—ভালবাসামাখা সে বেদনাভরা কান্না।

ওজেন দ রাস্তিঞ্যাকের মুখে দখ্‌নে লোকের বিশিষ্ট ছাপ। ফর্সা রঙ, কালো চুল আর নীল চোখ। চেহারায় হাবভাবে আর স্বাভাবিক চাল-চলনে তাকে সুরুচিসম্পন্ন ভদ্র পরিবারের ছেলে বলে মনে হয়। বেশবাস সম্পর্কে

সে মিতাচারী এবং এক বছরের ভাল পোশাক পরের বছর আটপৌরে ভাবে পরে ছিঁড়ে ফেলত ; তবু মাঝে মাঝে সে সৌখীন বেশবাসপরা চালিয়াৎ যুবকের মত বাইরে বেরুতে পারত। সাধারণত একটা পুরনো কোট, বিচ্ছিরি একটা ওয়েষ্টকোট, তার সঙ্গে মানানসই ব্রিচেজ, বিচ্ছিরিভাবে বাঁধা কালো কোঁচকানো টাই আর নতুন সুকতালা লাগান বুট পরে চলাফেরা করত ওজেন।

এই দুটি ভাড়াটে আর অপরাপর ভাড়াটেদের মধ্যে গোঁফে কলপ লাগান বছর চল্লিশেক বয়সের ভোতর‍্যার স্থান মাঝামাঝি। লোকে যাকে দিলদরিয়া মানুষ বলে, সে হচ্ছে সেই ধরনের লোক। তার বলিষ্ঠ কাঁধ প্রশস্ত. বক্ষদেশ সুগঠিত, বাহু পেশীবহুল আর চৌকো মোটা হাতের আঙুলে টকটকে লাল লোম। তার অপরিণত মুখে বলীরেখা দেখে মনে হয়, লোকটা কঠোর জীবন যাপন করেছে। কিন্তু তার অমায়িক ব্যবহার এই অনুমানের বিরোধী। লোকটার গম্ভীর কণ্ঠস্বর আদৌ অপ্রীতিকর নয়। আর তার প্রাণভরা উচ্চহাসিও এ কণ্ঠস্বরের পক্ষে মানানসই। ভোতর‍্যার স্বভাবটি বিনয়ী—শান্ত প্রকৃতির। যদি কোন তালা আটকে যেত তো টুকরো টুকরো করে সেটা খুলে মেরামত করে তেল মাখিয়ে আবার সে লাগিয়ে দিত। বলত, এই আমার লাইনের কাজ। অবশ্য কোন কাজই তার একতেয়ারের বাইরে ছিল বলে মনে হত না। জাহাজ, সমুদ্র ফ্রান্স, বিদেশ, ব্যবসা, হরেক-রকম মানুষ ও ঘটনা, আইন-কানুন, অভিজাত পরিবার আর কারাগার সম্পর্কে তার বিলক্ষণ জ্ঞান ছিল। কেউ যদি অকারণ অনুযোগ করত তো অমনিই সে সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসত। বার কয়েক সে মাদাম ভোকে আর জনকয়েক ভাড়াটেকে টাকা ধার দিয়েছে। কিন্তু মরে গেলেও তার দেনাদাররা ধার শোধ করতে চাইত না। কারণ, দিল-দরিয়া স্বভাব সত্ত্বেও তার দৃঢ়তাব্যঞ্জক তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ভীতি উৎপাদন করত। তার থুথু ফেলার ধরণ দেখে অনায়াসেই বোঝা যেত, বিপদ থেকে উদ্ধার পাবার জন্য এই অটল মানুষটি কোনও পাপকাজ করতে দ্বিধা করবে না। কঠোর বিচারকের মত তার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি অবলীলাক্রমে সমস্ত প্রশ্নের মূলে পৌঁছোতে. সকলের মনোভাব উপলব্ধি করতে সক্ষম বলে মনে হত।

প্রাতরাশ খেয়ে সে বেরিয়ে যেত, আবার আসত দুপুরের খাবার সময়। ফের গোটা সন্ধ্যা বাইরে কাটাত আর ফিরত রাত দুপুরে। বাড়ীতে ঢুকতে

তার অসুবিধা হত না ; কারণ মাদাম ভোকে বিশ্বাস করে তার হাতে একটা গ্যা-ভালার চাবি দিয়েছিলেন। ভাড়াটেদের মধ্যে এই আনুকূল্য একমাত্র সে-ই লাভ করেছিল। মহিলাটির সঙ্গে তার বিশেষ সদ্ভাব ছিল। ডাকত মা বলে, আর মাঝে মাঝে হাত বাড়িয়ে তার কোমরও জড়িয়ে ধরত। মহিলাটি অবশ্য এই তোষামোদ বিশেষ পছন্দ করতেন না। তার কাছে এই জিনিস অতি সহজ বলে মনে হত। তবে ভাড়াটেদের মধ্যে একমাত্র ভোতর্‌্যাঁর লম্বা হাতই মা য়ের মেদবহুল মোটা কোমর জড়িয়ে ধরতে পারত। দুপুরের খাবার পর কফির সঙ্গে সে খানিকটা ব্রাণ্ডি মিশিয়ে খেত ; আর এ বাবদে খুশি হয়ে মাসে পনের ফ্রাঁ অতিরিক্ত দিত।

পারির শহুরে জীবনের আবর্তে দিশেহারা এই সব যুবকের চাইতে খানিকটা অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন মানুষ,' অথবা নিজের ব্যক্তিগত ব্যাপার ছাড়া সমস্ত বিষয়ে নিরাসক্ত বৃদ্ধ বাদে অপর যে কোন লোক এখানে থাকলে ভোতর্‌্যাঁর আচরণে সন্দেহ পোষণ করে চুপ করে থাকত না। নিজে সে চারপাশের লোকজনের খোঁজ খবর জানত কিংবা তাদের মনোভাব অনুমান করতে পারত। কিন্তু তার মনের কথা জানবার কি তাঁর বৃত্তি আবিষ্কার করার সাধ্য অপর কারও ছিল না। সুস্পষ্ট সদাচরণ, সব সময় অপরকে খুশি করার আগ্রহ আর হাসি-খুশি ব্যবহার দিয়ে নিজের ও অপর সকলের মধ্যে সে একটা মায়া পাহাড়ের বাধা সৃষ্টি করে রেখেছিল। তবু মাঝে মাঝে ইচ্ছে করে এমন আভাস দিত যা থেকে হুঁশিয়ার থাকলে তার চরিত্রের বিভীষিকাময় গভীরতা ধরা যেত। প্রায়ই সে আইন-কানুনকে উপহাস করে আনন্দ পেত, কশাঘাত করত সমাজকে, আর জুভনালের মত শাণিত ভাষায় তার অসঙ্গতি প্রতিপন্ন করত। এ থেকে অনায়াসেই বোঝা যায়, রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে লোকটা বেশ কিছু ক্ষোভ পোষণ করে আর তার অতীত জীবন সযত্ন-রক্ষিত গোপন রহস্যময়।

মাদমোয়াজেল তাইফের লুকিয়ে চুরিয়ে মাঝে মাঝে এই চল্লিশ বছরের মানুষটির দিকে আড়চোখে চাইত, আবার কখনও বা তাকাত ছাত্রটির দিকে। নিজের অজ্ঞাতে একজনের বলিষ্ঠতা আর অপরের সুকুমার সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হয়েছিল বুঝিবা। কিন্তু এদের কেউ তার দিকে নজর দিত না। ভাবতও না তার কথা। অবশ্য ভাগ্যের কথা বলা যায় না! দৈবক্রমে একদিন তার অবস্থা বদলে যেতে পারে আর তার ফলে সেও পয়মন্ত কাম্য বধূ বলে সমাদর পেতে পারে তো!

তাছাড়া, একজনের দুর্ভাগ্যের কাহিনী সত্য কিনা সে কথা পরখ করে দেখার আগ্রহ এদের কারও ছিল না। পরস্পরের প্রতি এরা একটা নিরাসক্তি বোধ করত। খানিকটা সন্দেহও করত পরস্পরকে। এই মনোভাব এদের পারস্পরিক অবস্থার পরিণতি। এরা জানত যে প্রতিবেশীর দুর্দশা মোচনের ক্ষমতা এদের নেই। আর এই ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করে নিজেদের সমবেদনা বোধও যেন নিঃশেষ করে ফেলেছিল। দীর্ঘদিন বিবাহিত দম্পতির মত এখন আর অন্যের কাছে বলার মত কোন অজানা কথা এদের নেই। চেনা-শোনার সামান্য পরিচয় ছাড়া অপর কোন নিবিড় সম্পর্কও নেই পরস্পরের মধ্যে। এ যেন প্যাঁচ-খোলা যন্ত্রের ঘর্ষণের মত। পথের পাশে যদি কোন অন্ধ বসে থাকে তো তার দিকে চোখ না ফিরিয়ে অবলীলাক্রমে এরা চলে যাবে; কিংবা অবিচলভাবে শুনে যাবে দুঃখের কাহিনী। মৃত্যুর মধ্যে এরা দুঃখের সমাধান পায়। নিজেদের অফুরন্ত দুঃখ-দুর্দ্দশা অপরের চরম দুঃখ সম্পর্কেও এদের সমবেদনাহীন করে তুলেছে।

এই নিঃস্ব-হৃদয় মানুষগুলির মধ্যে একমাত্র মাদাম ভোকেই সুখী। এই বেসরকারী আশ্রয়কেন্দ্রের রাণী তিনি। একমাত্র তার দৃষ্টিতেই স্তেপ-ভূমির মত ঊষর, স্যাঁৎ-স্যেঁতে, নীরব আর ঠাণ্ডা ছোট্ট বাগানটি হাসিভরা কুঞ্জের মত। একমাত্র তার কাছেই এই বিদঘুটে গন্ধভরা বিষণ্ণ বাড়ীখানি আনন্দ-ময়। তিনিই এই কারাকক্ষের মালিক। চির-নির্বাসন দণ্ডে দণ্ডিত এই কয়েদীদের তিনি খাওয়ান, আর খবরদারিও করেন তাদের উপর। কয়েদীরাও সসম্মানে মেনে নেয় এই কর্তৃত্ব। পারির আর কোথায় এত কম খরচে এমন পুষ্টি-কর প্রচুর খাদ্য আর থাকবার ঘর এরা পেতে পারত? বসত ঘরখানা বেশ করে সাজিয়ে গুছিয়ে আরামপ্রদ করবার সাধ্য না থাকলেও পরিচ্ছন্ন আর স্বাস্থ্যকর করবার অবাধ অধিকার তো আছে! মাদাম ভোকে যদি কোন অতিগর্হিত অবিচারও করতেন তো কোন অনুযোগ না করে এরা সহ্য করে যেত।

সমাজের মধ্যে যত রকম লোক আছে, এই আড্ডাতেও তেমনি সব রকম মানুষের নমুনা থাকা উচিত। তার অভাবও ছিল না। আঠার জন অতিথির মধ্যে একজন গোবেচারি লোক ছিল যাকে সবাই ঘৃণা করত। সকলেরই উপহাসের পাত্র ছিল সে। প্রতিটি বিদ্যালয়ে, এমনকি

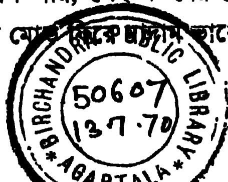
সংসারেও এমন উপহাসের পাত্র থাকে। চার বছর রাস্তিঞ্ঞাককে বাধ্য হয়ে থাকতে হয়েছে এদের সহবতে। কিন্তু দ্বিতীয় বছরের মাথায় এই গোবেচারি মানুষটি তার কাছে বিশিষ্ট মর্যাদা লাভ করে। সাবেক সেমুই ব্যবসায়ী তাপদগ্ধ গোরিওই সেই মানুষ। চিত্রকরের মত এই গল্পের লেখকও তারই মাথায় সমস্ত আলোকপাত করবে। কোন ঘটনাচক্রে এই প্রবীণতম ভাড়াটে নিজের মাথায় এই আধ-বিদ্বেষভরা ঘৃণা, এমন করুণামাখা নিপীড়ন আর দুর্ভাগ্যের জন্য এমন অশ্রদ্ধা বহন করে বেড়াচ্ছে? খেয়াল কি পাগলামির চাইতে পাপ বরং এই সংসারে সহজে ক্ষমা পায়। এই বৃদ্ধ হয়ত নিজের এই পাগলামির দুর্বলতা ধরা দিয়েছিল। সমাজের বহু অবিচারের মুলে একই ধরণের সমস্যা। প্রকৃত বিনয়, কি দুর্বলতা, কি উদাসীনতার জন্য যে মানুষ প্রতিবাদ করতে চায় না তার কাঁধে সমস্ত বোঝা চাপিয়ে দেওয়া হয়ত মানুষের স্বভাব। আমরা সকলেই কি অন্য কোন লোককে জব্দ করে, কিংবা কোন জিনিস তুচ্ছজ্ঞান করে নিজেদের বাহাদুরি দেখাতে চাই না? তুষারপাতে রাস্তা যখন পিছল হয়ে যায়, ক্ষুদ্রতম মানুষ, এমনকি রাস্তার ছোঁড়াগুলোও তখন প্রতিটি দুয়ারে গিয়ে করাঘাত করে কিংবা নতুন কোন স্মৃতিস্তম্ভের উপর চড়ে হিজিবিজি অক্ষরে নিজেদের নাম লিখে রাখে।

বুড়ো গোরিওর বয়স তখন উনসত্তর বছর। ব্যবসা ছেড়ে দিয়ে ১৮১৩ সালে সে মেজঁ ভোকেতে বসবাস আরম্ভ করে। মাদাম কুত্যুর আজকাল যে ঘরখানায় থাকেন, তখন সে ঐ ঘরখানা ভাড়া নিয়েছিল; এবং বড়োলোকী চালে বারশ ফ্রাঁ ভাড়া দিত। ভাব দেখাত যেন দু'পাঁচ লুই (স্বর্ণমুদ্রা) কম বেশীতে তার কিছু এসে যায় না। ঘর তিনখানা গোছ-গাছ করে মাদাম ভোকে তার জন্য একটা নির্দিষ্ট ভাড়া চান এবং সে-ভাড়া তিনি আগাম নিতেন। তার মধ্যে নাকি জঘন্য আসবাবপত্র, হলদে কেলিকোর পরদা, উত্রেখতের ভেলভেটে-মোড়া বার্নিস-করা কাঠের চেয়ার, খানকয়েক জঘন্য রঙ-বেরঙের ছবি আর শহরতলীর শুঁড়িখানা যা ব্যবহার করতে চায় না এমনি দেয়াল মোড়ার কাগজের ভাড়াও ছিল। যে হিসাবী উদারতার জন্য বৃদ্ধ হয়ত এই জুয়াচুরি উপেক্ষা করেছে। কিন্তু মাদাম ভোকে তার ফলে বুড়ো গোরিওকে ব্যবসায় অনভিজ্ঞ বোকা বলে মনে করেছেন। তখন তাকে অবশ্য মঁশিয় গোরিও বলেই ডাকা হত।

এখানে আসাবর সময় চমৎকার পোশাক-পরিচ্ছদ ছিল গোরিওর। ব্যবসায়ীর চটকদার বেশবাস। কারবার বন্ধ করার সময় সেদিকে কোন দৈন্য রাখেনি। আঠারটা মিহি ক্যাম্ব্রিকের শার্ট দেখে মাদাম ভোকের চোখ কপালে ওঠে। তার উপর সেমুই ব্যবসায়ী আবার শার্টের বুকে অলঙ্কার পরত। সরু একগাছা চেনের দুধারে দুটো হীরার পিন লাগান ছিল। পিন দুটোর দু'খানা হীরাই বেশ বড় বড়। বোতলের মত নীল রঙের একটা কোট পরত গোরিও এবং রোজ নতুন এক একটি পরিচ্ছন্ন সাদা কড় কড়ে সূতীর 'পিক্' লাগানো ওয়েস্ট কোট পরে বেরুত। সেই প্রশস্ত ওয়েস্ট কোটের উপর লকেট লাগানো একগাছা মোটা সোনার চেন ঝুলত। সে গাছা আবার হাঁটবার সময় বুড়োর ন্যাসপাতির মত ভূ ড়ির উপর দুলত। তার সোনার নস্যির কৌটার মধ্যে চুল ভরা একটা লকেট ছিল। তাতে বোঝা যায়, মেয়ে মহলে এককালে তার বেশ কিছু প্রতিপত্তি ছিল—বেশ গুটি কয়েক হৃদয় জয় করেছিল হয়ত বা। মাদাম ভোকে যখন তাকে হৃদয় ভেঙে দেবার দায়ে অভিযুক্ত করতেন, বুড়োর ঠোঁটে প্রসন্ন হাসিরেখা দেখা দিত। নিজেদের অন্তরের দুর্বলতার কথা বললে গণ্যমান্য নাগরিকেরা যেমন আত্মপ্রসাদের হাসি হেসে থাকেন, ঠিক তেমনি। গৃহস্থালীর রূপোর বাসন পত্তরে তার দেয়াল আলমারি ঠাসা। এটাকে সে শ্রমিকদের মত 'অর-মোয়ার' বলে ডাকত। বিধবা গিন্নী স্বেচ্ছায় আগ্রহ করে তারে বাসন পত্তরের প্যাকেট খুলতে সাহায্য করেছেন এবং রূপোর নানাবিধ বাসন পত্তর সাজাতে গিয়ে তায় চোখ ঝলসে গেছে। ভারী ভারী মজবুত এই সব জিনিসের ওজন বেশ কয়েক আউন্স। কিন্তু বুড়ো তার একটিও হাতছাড়া করতে রাজী নয়। এ গুলো তার বিবাহিত জীবনের বিভিন্ন উৎসব উপলক্ষে পাওয়া উপহার।

একখানা রেকাব আর ঢাকনির উপর এক জোড়া কপোত-কপোতী খোদাই করা একটা রূপোর বাটি দেখিয়ে সে বলেছিল, আমাদের বিয়ের প্রথম বার্ষিকী উপলক্ষে আমার স্ত্রী সব প্রথম আমায় এই উপহার দেয়। বেচারি! এর জন্য তার বিয়ের আগের সঞ্চিত সব টাকা খরচ হয়ে যায়। জানেন মাদাম, পেটের দায়ে নখ দিয়ে মাটি আঁচড়াতেও রাজী, তবু এ জিনিস আমি হাতছাড়া করব না। ভালোই হয়েছে, বাকী জীবন এই পাত্রে করেই সকাল বেলার কফি খেয়ে যেতে পারব। আমার জন্য ভাবতে হবে না, বহুদিন নিশ্চিন্তে পেট চালিয়ে যেতে পারব।

তাছাড়া কিছু শেয়ারের হিসাবপত্রও মাদাম ভোকের শ্যেনদৃষ্টি এড়ায়নি। তাতে বুড়ো গোরিওর বছরে আট থেকে দশহাজার ফ্রাঁ আয় হয়। সেই দিন থেকে দ কঁফ্লাঁস পরিবারের মেয়ে আটচল্লিশ বছরের বুড়ী মাদাম ভোকের মাথায় নতুন পোকা ঢোকে। বুড়ো গোরিওর চোখের পাতা ফুলে ঝুলে পড়েছিল, অনবরত জল গড়াত চোখ দিয়ে। তবু মাদাম তাকে চমৎকার ভদ্রলোক বলেই গণ্য করতেন। নৈতিক গুণের কদর করতেন মাদাম। বৃদ্ধের প্রশস্ত মাংসল পায়ের গুল আর লম্বা চৌকো নাকের মধ্যেও মহিলাটি নৈতিক গুণপনার সন্ধান পেতেন। তার চাঁদপনা হাঁদার মত সরল মুখখানাও চরিত্রের বৈশিষ্ট্য প্রতিপন্ন করে বলে মনে হত। লোকটা নিশ্চয় বুদ্ধিহীন আর জানোয়ারের মত মজবুত গড়নের। তবু প্রাণঢালা প্রীতি দেবার ক্ষমতা হয়ত আছে। একল্ পলিতে-কৃনিক্ স্কুলের হেয়ার-ড্রেসার রোজ সকালে এসে তার কেশবিন্যাস করে দিয়ে যেত। পায়রার পাখার ছাঁদে চুল আঁচড়ে নীচু কপালের পাঁচ জায়গায় সাজিয়ে রাখা হত। মুখখানা তাতে শোভন দেখাত নিশ্চই। খানিকটা কুৎসিৎ হলেও লোকটার এমন পরিপাটি ছিল, এমন কায়দায় সে সুবাসিত নস্যভরা কৌটা থেকে নস্য টানত যে বৃদ্ধ এখানে আসবার পর প্রতিদিন সন্ধ্যায় মাদাম বিছানায় শুয়ে কামনার দাহে তিতির পাখীর মত ভাজা ভাজা হতেন! ভাবতেন, ভোকের বিধবার সাজ পরিহার করে গোরিও হিসাবে নবজন্ম নেবেন কি না। সাধ হত, আবার বিয়ে করে বোর্ডিং বেচে দিয়ে বুর্জোয়া সমাজের এই ফুলবাবুর পাশাপাশি ঘুরে বেড়ান। তাতে মহল্লার মধ্যে সম্ভ্রান্ত মহিলার মর্যাদা পাওয়া যায়, গরীবের জন্য চাঁদা তোলা যায়, রবিবারে ছোট খাটো পার্টির আয়োজন করে শোয়াসি, সোয়াসি আর জাঁতিইর মত জায়গায় বেড়াতে যাওয়া যায় আর পাকা পাকি ভাবে থিয়েটারের বকস্ ভাড়া করে যখন খুশি যাওয়া যায়। জুলাই মাসে এখন যেমন ভাড়াটেরা দু একখানা পাশ দেয়, তার আশায় আর অপেক্ষা করতে হয় না। পারির দরিদ্র গৃহস্থ বধূরা যে সুখের স্বপ্ন দেখে, মহিলাটিও মনে মনে তেমনি স্বপ্নস্বর্গ রচনা করতেন। কারুর কাছে তিনি বলেননি যে দু চার সৌ করে তিনি চল্লিশ হাজার ফ্রাঁ সঞ্চয় করেছেন। অর্থের দিক বিবেচনা করলে বৃদ্ধের পত্নী হবার যোগ্যা তিনি। রোজ সকালে হোঁতকা সিলভি পালক-শয্যার খাঁজ আর ভাজের মধ্যে যে রূপের আভাস পায়, সেই গতরের সৌন্দর্য সম্পর্কে আত্মপ্রসাদ লাভের জন্য বিছানার উপর মোড় ফিরে মাদাম ভাবেন, বাকী সব ব্যাপারে আমার দশা ওরই মত।



সেই দিন থেকে প্রায় তিন মাস ধরে মঁশিয় গোরিওর হেয়ার-ড্রেসারকে নিয়োগ করে তিনি সৌন্দর্য-চর্চার জন্য কিছু কিছু ব্যয় করতেন। এই ব্যয়-বাহুল্য প্রয়োজন বলেই নিজেকে প্রবোধ দিতেন। মনে করতেন, সম্ভ্রান্ত যে সব লোক তার বোর্ডিংয়ের পৃষ্ঠপোষকতা করছে, তাদের সামনে ভদ্রভাবে চলতে গেলে এটুকুর প্রয়োজন আছে। ভাড়াটেদের তাড়াবার জন্য সব সময় তিনি ছুঁতো খুঁজতেন। বলতেন, এখন থেকে অতি বিশিষ্ট লোক ছাড়া কোন ভাড়াটে তিনি রাখবেন না। কোন আগন্তুক যদি আসত তো পারির অন্যতম সুবিদিত বিশিষ্ট সম্মানী ব্যবসায়ী মঁশিয় গোরিওর দৃষ্টান্ত উল্লেখ করে সগর্বে তিনি নিজের বোর্ডিংয়ের সম্ভ্রান্ততা জাহির করতেন। বড় বড় হরফে মেজঁ ভোকে শিরোনামা দিয়ে তিনি প্রচারপুস্তিকা বিলি করতেন। তাতে লেখা হত: এটি দীর্ঘ দিনের পারিবারিক আবাস-গৃহ এবং বিশ্ববিদ্যালয় এলাকার অন্যতম সুপ্রাচীন অতি উচ্চ-প্রশংসিত প্রতিষ্ঠান। এখান থেকে গবলঁ্যা উপত্যকার অপূর্ব নিসর্গ শোভা দেখা যায় (সত্যিই দেখা যেত চারতলা থেকে), সংলগ্ন একটি মনোরম উদ্যানও আছে আর তার দূর প্রান্তে আছে লিনডেন গাছের একটি এভিনিউ। সেই সঙ্গে স্বাস্থ্যকর আবহাওয়া আর নিরালায় বাস করার সুবিধার কথাও জানান হয়।

এই প্রচারপুস্তিকা দেখেই মাদাম লা কঁতেস দ লাঁবেরমেনি এখানে আসেন। ছত্রিশ বছরের এই বিধবা তখন স্বামীর সম্পত্তি বেচে দেবার আয়োজন করছেন; আর আশা করছেন যে রণক্ষেত্রে নিহত জেনারেলের পত্নী হিসাবে একটা পেনশন্ পাবেন। মাদাম ভোকে তখন নিজের টেবিলের দিকে নজর দেন, ছয় মাস যাবৎ রোজ বসবার ঘরে আগুন জ্বালিয়ে রাখতেন এবং প্রচার পুস্তিকার প্রতিশ্রুতি পূরণের জন্য এমন ব্যবস্থা করেন যাতে তার সঞ্চয় থেকে বেশ দু'-পয়সা খরচ হয়ে যায়। কঁতেসও তাকে প্রিয় বান্ধবী বলে সম্বোধন করে বলতেন, বারন দ ভোমেরলাঁ আর ল কঁৎ পিকোয়াজো নামে এক কর্নেলের বিধবা-পত্নীকে তিনি এখানে নিয়ে আসবেন। এই দুটি সম্ভ্রান্ত মহিলা নাকি তার বান্ধবী। এবং শিগগিরই তারা নাকি মেজঁ ভোকের চাইতে ব্যয়সাধ্য মারের এক বোর্ডিং ছেড়ে দেবেন। সমর দপ্তরের নথিপত্রের কাজ হয়ে গেলে এদের কোন অসুবিধাই থাকবে না। সঙ্গে সঙ্গে জানাতেন, তবে সরকারী দপ্তরের লাল ফিতের ঝামেলা কোনদিনই শেষ হয় না।

দুপুরের খাবার পর এই বিধবা দুটি মাদাম ভোকের ঘরে যেতেন এবং সস্তা মদে চুমুক দিয়ে খানিকটা খোস-গল্প করতেন। সেই সঙ্গে গিন্নীর জন্য আলাদা-ভাবে তৈরী ভাল ভাল খাবারের ভাগও জুটত। গোরিও সম্পর্কে মাদাম ভোকের ধারণা আন্তরিকভাবে সমর্থন করতেন মাদাম দ লাঁবেরমেনি। তারিফ করতেন মাদাম ভোকের চমৎকার পরিকল্পনার। বলতেন, প্রথম দিন এখানে এসেই ব্যাপারটা তিনি অনুমান করতে পেরেছিলেন। তার মতে গোরিও অপূর্ব লোক।

বিধবা বলতেন, জানেন, পাকা স্বাস্থ্য লোকটার—আমার চোখের মতই মজবুত। বিয়ে করলে এখনও স্ত্রীকে সুখী করতে পারে।

কঁতেস তখন মাদাম ভোকের বেশবাস সম্পর্কে এমন গুটিকয়েক মন্তব্য করেন যা তার আশার পরিপূরক নয়। বলেন, আপনাকে এখন রণ-সাজে সাজাতে হবে।

খানিকক্ষণ পরামর্শের পর বিধবা দুটি এক সঙ্গে প্যালে রোয়াইয়ালে গিয়ে একটি পালক লাগান হ্যাট কিনলেন—গালরি দ বোয়া থেকে কিনলেন একটা ক্যাপ। কঁতেস তখন বান্ধবীকে লা পতিৎ জানেতের দোকানে নিয়ে গিয়ে একটা পোশাক এবং একখানা স্কার্ফ পছন্দ করেন। এই সব অস্ত্রে সজ্জিতা হয়ে বিধবা যখন রণ-সাজে সাজলেন, তখন তাকে ঠিক ব্যফ আ লা মদের খাবার দোকানের সাইন বোর্ডের উপর আঁকা জন্তুর মত দেখাচ্ছিল। তবু নিজের চোখে নিজেকে তার ভাল লেগেছিল। মনে হল, এজন্য তিনি কঁতেসের কাছে ঋণী। মাদাম ভোকের হাত দরাজ নয়, তবু বিশ ফ্রাঁর একটি হ্যাট গ্রহণ করার জন্য তিনি কঁতেসকে অনুরোধ জানান। তার অর্থ, কঁতেসের কাছ থেকে তিনি আরও সাহায্য চান। গোরিওর মন বোঝার জন্য কথাটা তার কাছে পাড়তে হবে আর গুণ-কীর্তন করতে হবে মাদাম ভোকের। মাদাম দ লাঁবেরমেনি সানন্দে দূতিয়ালি করতে রাজী হন। বুড়ো সেমুই-ব্যবসায়ীর দরজায় ধর্ণা দিয়ে তিনি তার সঙ্গে এক গোপন সাক্ষাতের আয়োজন করেন। কিন্তু যখন বুঝলেন যে তার ব্যক্তিগত গোপন আশার আভাস বৃদ্ধ বুঝতে পেরেছে এবং এই আভাস বিরক্তি উৎপাদন না করলেও বুড়োকে চরম বিব্রত করে তুলেছে, তখন গোরিওর রূঢ়তায় ক্রুদ্ধ হয়ে চলে আসেন।

প্রিয় বান্ধবীকে বলেন, কি বলব সখি, ওর কাছে কিচ্ছু পাবার আশা নেই। লোকটার এমন সন্দেহ বাই যে ঘেন্না করে। কিপ্‌টে বুড়ো নিরেট বোকা—বুদ্ধি শুদ্ধির কোন বালাই নেই। ওর সঙ্গে ঘর করলে জ্বলে পুড়ে মরতে হবে।

মঁশিয় গোরিও আর মাদাম দ লাঁবেরমেনির মধ্যে একান্তে এমন ব্যাপার ঘটে যায় যে কঁতেস আর একদিনও সে বাড়ীতে থাকতে পারলেন না। পরদিনই. ছ' মাসের বাকী ভাড়া দিতে ভুল করে ফ্রাঁ পাঁচেক দামের পুরনো একটা অব্যবহৃত পোশাক ফেলে চলে যান। মাদাম ভোকে বহু খোঁজ খবর তত্ত্ব-তল্লাস করলেন। কিন্তু পারি শহরে কঁতেস দ লাঁবেরমেনির কোন সন্ধান পাওয়া গেল না।

হামেশা এই শোচনীয় ঘটনার কথা বলতেন মাদাম ভোকে। নিজের সরল বিশ্বাসী প্রকৃতির জন্য নিজেকেই দোষ দিতেন। অথচ আদতে তিনি বিড়ালের চাইতেও বেশী সন্দিগ্ধ। এমন বহু লোক আছে যারা কাছের মানুষ সম্পর্কে খুব হুঁশিয়ার হয়ে চলে, কিন্তু আগন্তুককে অন্ধভাবে বিশ্বাস করে। মাদাম সেই দলের মানুষ। এ এক অদ্ভুত ধরণের প্রকৃতি। তবু প্রায়শ এমনি লোকের দেখা মেলে। মানুষের অন্তরের মধ্যেই এই প্রকৃতির উৎস খুঁজে পাওয়া যায়। হয়ত পরিচিত প্রতিবেশীর সহবতে বাস করে কোন কোন লোক তাদের কাছ থেকে বেশী কিছু আশা করতে পারে না। বন্ধু-বান্ধবের কাছে নিজেদের অন্তরের শূন্যতা ধরা দিয়ে হয়ত ভাবে, বড্ড কড়াভাবে তাদের দোষ গুণ বিচার করা হচ্ছে। তবু শ্রদ্ধা ভক্তি পাবার অজেয় আশা মেটে না; আবার এও হতে পারে, নিজেদের যে সব গুণপনা নেই, তার অধিকারী বলে নিজেদের জাহির করার তীব্র আগ্রহ সব সময় হয়ত অন্তরে জাগরূক থাকে। তার ফলে অপরিচিতের প্রীতি ও শ্রদ্ধা অর্জনের আশায় তারা ভবিষ্যতে সেই শ্রদ্ধা হারাবার ঝুঁকিও নিয়ে থাকে। আবার এমন কিছু লোকও আছে যারা পাটোয়ারী বুদ্ধি নিয়েই জন্মে। দাবী করার অধিকার আছে বলে বন্ধু-বান্ধবের কোন উপকার এরা করে না। কিন্তু অপরিচিতের উপকার করে বেশ আত্ম-শ্লাঘা অনুভব করে। অন্তরঙ্গ বন্ধুদের এরা পছন্দ করে না। পরিচয়ের পরিধি যত ব্যাপক হয়, ততই এরা অল্প-পরিচিতদের অনুরক্ত হয়ে পড়ে। মাদাম ভোকের সঙ্গে এই দুই ধরণের মানুষেরই খানিকটা মিল আছে। মূলত এই দুই দলের মানুষই নীচ, কপট আর ঘৃণ্য।

গল্পের সবটা শুনে ভোতর‍্যাঁ বলত, আমি যদি তখন থাকতাম তো এ ব্যাপার ঘটতেই পারত না। অমন ভাঁড়ের মুখোস দু'দিনেই খুলে ফেলতাম। মুখ দেখলেই ওসব মানুষ আমি চিনে ফেলতে পারি।

সমস্ত সংকীর্ণচেতা মানুষের মত মাদাম ভোকেও কোন ঘটনার পেছনের কারণ বুঝতেন না। কারণের পরিবর্তে ঘটনার প্রতিই তার সমস্ত দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকত। তাছাড়া নিজের ভুলের দোষ অপরের ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া তার স্বভাবের রীতি। এই লোকসানের পর নিরীহ সেমুই-ব্যবসায়ীকেই তিনি দুর্ভাগ্যের হেতু বলে মনে করলেন। তার কথায়, সেই থেকেই গোরিও সম্পর্কে তার ভুল ধারণা কাটতে আরম্ভ করে। যখন বুঝলেন, মিঠে কথায় কাজ হবে না, আর নিজের সৌন্দর্য-চর্চ্চায় যে অর্থ ব্যয় করেছেন তাও অপচয় হয়ে গেছে, তখন গোরিওর আচরণের কারণ বুঝতে বিলম্ব হল না। তিনি ধরে নিলেন যে তার এই ভাড়াটের অপর কোন আকর্ষণ নিশ্চয়ি আছে। এক কথায়, তার এতদিনের সযত্নে লালিত সাধ অলীক স্বপ্ন মাত্র। কঁতেসের জোরালো ভাষায় বলতে গেলে, এ মানুষ দিয়ে তার কোন কাজ হবে না। কঁতেসকে তিনি মানব চরিত্রের নির্ভুল বিচারক বলেই গ্রহণ করেছেন। ভালবাসার মোহে যতটা এগিয়ে গিয়েছিলেন, প্রয়োজনের খাতিরে বিরক্তির আতিশয্যে তার চাইতে অনেক বেশী পিছিয়ে যান। কারণ তার ঘৃণার সঙ্গে তো ভালবাসার কোন সম্পর্ক ছিল না—ছিল ব্যর্থ আশার। মানব হৃদয় ভালবাসার শিখরে চড়বার সময় হয়ত বা থেমে দাঁড়াতে পারে, কিন্তু ঘৃণার পিছল ঢালু পথে চলতে গিয়ে কদাচিত থামে। কিন্তু মঁশিয় গোরিও ভাড়াটে ; তাই বিধবাকে বাধ্য হয়ে অপমানাহত গর্বের বিস্ফোরণ মোলায়েম করতে হয়েছে। কণ্ঠরোধ করতে হয়েছে হতাশার দীর্ঘশ্বাসের। উপরিওলার নির্যাতনে অতিষ্ঠ সন্ন্যাসীর মত হজম করতে হয়েছে প্রতিশোধ-স্পৃহা।

ছোট মনের লোক ভাল হোক কি মন্দ হোক, অসংখ্য ছোটখাটো কাজের মধ্য দিয়েই তারা মনোভাব প্রকাশ করে। এই বিধবাও মেয়েলী হিংসাবশে প্রকারান্তরে বৃদ্ধকে উত্যক্ত করার ফন্দী আঁটেন। খাবার টেবিলে তিনি যে অতিরিক্ত সুস্বাদু খাদ্যের প্রবর্তন করেছিলেন প্রথমত তাই তুলে দিলেন।

একদিন সকালবেলা সিলভিকে বলে দিলেন, আর ঘেরকিন কুমড়ো বা এন্কোভি মাছ হবে না। বড্ড বেশী খরচ পড়ে !

মিতব্যয়ী লোক মঁশিয় গোরিও। নিজের চেষ্টায় যারা সংসারে প্রতিষ্ঠা অর্জন করে কতকটা মিতব্যয় করতে তারা বাধ্য হয়। গোরিওর পক্ষে ওটা স্বভাব হয়ে দাঁড়িয়েছে। খাবার টেবিলে সুপ, গোমাংস সেদ্ধ আর কিছু শবজি পেলে সে পরম সন্তুষ্ট। কাজেই এই দিক থেকে ভাড়াটেকে উত্যক্ত করা

মাদাম ভোকের সাধ্যাতীত। কোন দিক থেকেই তার অরুচি ধরাতে পারলেন না। এই নির্বিকার মানুষটির বিরুদ্ধে কোনদিন প্রকাশ্য শত্রুতাচরণ করা যাবে না বুঝে তিনি তাকে ছোট করার, বে-ইজ্জত করার চেষ্টা করেন। গোরিও সম্পর্কে অন্যান্য ভাড়াটের মনও বিষিয়ে তুলবার চেষ্টা করেন। নিজের প্রতিহিংসার হাতিয়ার করে তোলেন তাদের। খানিকটা মজা পাবার জন্য তারাও না বুঝে-সুঝে তার ফাঁদে পা দেয়।

প্রথম বছরের শেষের দিকে গোরিও সম্পর্কে তার বিদ্বেষ এমন পর্যায়ে ওঠে যে আপন মনে তিনি জিজ্ঞাসা করেন, সাত আট হাজার লিভার আয়ের এই সম্পন্ন ব্যবসায়ীর কাছে রক্ষিতাদের মত অত হীরা, রূপা থাকতে কেন সে তার বাড়ীতে থাকবে ? আর কেনই বা সে এত কম ভাড়া দেবে ?

প্রথম বছরের অধিকাংশ সময় সপ্তাহে দুই এক বার বাইরে খাওয়া-দাওয়া করেছে গোরিও। ক্রমেই সে বাইরে খাওয়া কমিয়ে দেয় এবং শেষ অবধি মাসে দুবারের বেশী শহরে ডিনার খেত না। মাঝে মাঝে গোরিওর এই ছোট-খাটো বাইরে খাওয়ায় মাদাম খুব খুশি হতেন। কারণ, এতে রোজ খাবার টেবিলে এই ভাড়াটের উপস্থিতিতে তাকে বিরক্ত হতে হত না। কিন্তু গোরিও অভ্যাস পরিবর্তন করায় বিধবা ভাবলেন, তাকে বিরক্ত করার জন্যই ইচ্ছে করে এটা করা হচ্ছে। এর পেছনে যে ক্রমান্বয় আয় হ্রাসের সম্পর্ক ছিল, একথা পলকের জন্যও তার মাথায় এল না। ছোট মনের লোকের এমন জঘন্যতম স্বভাব যে অপরকেও তারা নিজেদের মতই ছোট মনে করে।

গোরিওর সুখ্যাতিই তার কাল হল। দ্বিতীয় বছরের শেষের দিকে মঁশিয় গোরিও তেতলার একখানা ঘর চায় এবং থাকা-খাওয়ার খরচ ন'শ ফ্রাঁ করে দেবার অনুরোধ জানায়। এতে তার সম্পর্কে গুজব আরও চাঙ্গা হয়ে ওঠে। ব্যয় সঙ্কোচের প্রয়োজন এত জরুরী হয়ে পড়ে যে শীতকালে কোনদিন সে ঘরে আগুন জ্বালাল না। বিধবা ভোকে আগাম টাকা দাবী করেন। তাতেও রাজী হল মঁশিয় গোরিও। এই দিন থেকে মাদাম ভোকে তাকে বুড়ো গোরিও বলে ডাকতে আরম্ভ করেন।

এই অবনতি ও পতনের কারণ অনুমান করা করা সহজ, কিন্তু অনুসন্ধান করা কষ্টসাধ্য। বেহায়া সেই কঁতেসের ভাষায়, হাড়ে হাড়ে শয়তান বুড়ো, কিন্তু মুখে রা-টি করে না। ফরফরে কিছু অবিবেচক লোক আছে যাদের

গোপন করার মত কোন কথাই নেই। এদের মতে, যে সব লোক নিজেদের .সম্পর্কে কোন কথা বলে না তাদের না বলার পেছনে নিশ্চয় কোন ভাল কি মন্দ.গূঢ় কারণ আছে। কাজেই যে ব্যবসায়ীকে আগে বিশিষ্ট জ্ঞান করা হয়েছে, এখন তাকে স্কাউণ্ড্রেল বলা হত। রমনীরঞ্জন প্রণয়ী বদমায়েস আখ্যা পেল। ভিন্নলোকে ভিন্নমত পোষণ করত। ভোতর‍্যাঁ এই সময় এই বোর্ডিংয়ে আসে। তার মতে, বুড়ো গোরিও শেয়ারের বাজারে ঘোরা-ফেরা করে। আগে বেশী লাভের আশায় চড়া দামে মাল কিনে সর্বস্ব খুইয়েছে বলে এখন নতুন কোম্পানীর শেয়ার কিনে সঙ্গে সঙ্গে চড়া দামে বেচে দেবার তালে থাকে। কখনও বা তাকে ক্ষুদে জুয়ারা মনে করা হত। রোজ অন্তত দশ ফ্রাঁ জেতার আশায় এরা জুয়ার আড্ডায় ঘোরা-ফেরা করে। কেউ বলত স্বরাষ্ট্র দপ্তরের গুপ্তচর। কিন্তু ভোতর‍্যাঁর মতে ও দলের লোক হবার মত বুদ্ধি বুড়োর নেই। আবার কারও মতে কিপটেটা চড়া সুদে অল্প মেয়াদী কর্জ দেয়, নয়তো লটারির টিকেট বিক্রী করে। এদের মতে, রহস্যময় গুপ্ত-জীবনের প্রতীক গোরিও—পাপ, কলঙ্ক আর দুর্বলতার সৃষ্টি। তবু তার জীবন যত কলঙ্কময় হোক না কেন তাকে এই বাড়ী ছাড়া করবার মত ঘৃণা এরা পোষণ করত না। শক্ত হলেও সে ভাড়া দিচ্ছে তো! তাছাড়া বুড়ো এদের প্রয়োজন ছিল। কোন কারণে মেজাজ খারাপ হলে তার উপর ঝাল ঝাড়া যেত, কিংবা মেজাজ ভাল থাকলে তাকে নিয়ে বেশ কিছুক্ষণ রসরঙ্গ করা চলত।

কিন্তু যে মতবাদ সম্ভাব্য বলে সাধারণ স্বীকৃতি পেয়েছে তার স্রষ্টা মাদাম ভোকে স্বয়ং। একদিন যাকে তিনি স্বাস্থ্যবান ও স্ত্রীকে সুখী করতে সক্ষম বলে মনে করতেন, আজ তার মতে সে বিকৃতরুচির লম্পট। নিম্নোক্ত কারণের ভিত্তিতে তিনি এই কলঙ্ক রটান।

বিভীষিকাময়ী যে কঁতেস ছয় মাস মাদাম ভোকের মাথায় হাত বুলিয়ে থেকে গেছেন, তিনি চলে যাবার মাস কয়েক আগে বিধবা মাদাম একদিন ভোরবেলা বিছানায় শুয়ে সিড়িতে রেশমী পোশাক আর চটপটে এক তরুণীর চটুল পায়ের শব্দ শুনতে পান। গোরিওর ঘরের দিকেই যায় তরুণী। লোকটা আবার বদমায়েসী করে দরজা খুলে রাখে। সিলভি অমনিই ছুটে এসে গিন্নীকে খবর দেয়: দেবীর মত পোশাকপরা অপরূপ সুন্দরী এক তরুণী প্রুনেল্যা কাপড়ের বুট পরে বান মাছের মত সুট করে গাড়ি থেকে

নেমে রান্নাঘরে ঢুকে মঁশিয় গোরিওর ঘর কোথায় জিজ্ঞাসা করেছে। মাদাম ভোকে আর তার পাচিকা আড়ি পেতে থাকেন। সস্নেহ কয়েকটি কথাও তাদের কানে আসে। বেশ কিছুক্ষণ গোরিওর ঘরে ছিল মেয়েটি। মঁশিয় গোরিও যখন তার 'প্রণয়িনীকে' নিয়ে বাইরে আসে, সিলভি একটা ঝুড়ি তুলে নিয়ে বাজারে যাবার ভান করে 'প্রণয়ী- যুগলের' অনুসরণ করে।

ফিরে এসে গিন্নীকে জানায়, কি বলব মাদাম, নিশ্চয়ি মঁশিয় গোরিওর অঢেল টাকা আছে, না হলে এমন চালে চলতে পারে! ভেবে দেখুন, এস্‌ত্রাপাদের মোড়ে চমৎকার একখানা জুড়ি-গাড়ি ছিল, মেয়েটি সেই গাড়িতে উঠে বসল!

সেদিন সান্ধ্যবেলা খাবার সময় গোরিওর জানালার কাছে গিয়ে মাদাম ভোকে তার আলোর জন্য পর্দা ঝুলিয়ে দেন। তার চোখে নাকি রোদ পড়ছিল।

সকাল বেলার এই সাক্ষাতের ইঙ্গিত করে মাদাম বলেন, সুন্দরীরা আপনার পেছু নিয়েছে মঁশিয়-গোরিও, এমন কি সূর্যও আপনাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। তা ভাল, আপনার রুচির প্রশংসা করতে হবে—মেয়েটি অপরূপ সুন্দরী।

—ও আমার মেয়ে! খানিকটা গর্বভরেই কথাটা বলে গোরিও। কিন্তু উপস্থিত ভাড়াটেদের কাছে এই জবাব মুখরক্ষার সাফাই বলে মনে হয়।

এর মাস খানেক পরে আবারও গোরিওর ঘরে আসে মেয়েটি। প্রথম দিন এসেছিল সকালের বেশবাস পরে, কিন্তু এবার এল ডিনারের পরে সান্ধ্য বেশবাশে। ভাড়াটেরা তখন বৈঠকখানায় বসে গল্প করছিল। তন্বী এই অপরূপ সুন্দরীকে তারা গোরিওর মেয়ে বলে গ্রহণ করতে পারল না। আভিজাত্য-মণ্ডিত এই মনোরমা কি করে বুড়ো গোরিওর মত লোকের সন্তান হতে পারে?

সিল্‌ভি তাকে চিনতে পারল না। তাই মুটকী বলল, এই নিয়ে দুটি হল!

দিন কয়েক পরে ছিপ্‌ছিপে লম্বা সুঠাম এক শ্যামা গোরিওর সঙ্গে দেখা করতে আসে। এর চুল কালো—চোখ হাস্যোজ্জ্বল।

—তিনটি হল এই নিয়ে। সিলভি বলে।

দ্বিতীয় মেয়েটি আবারও দিন কয়েক পরে বলনাচের পোশাকে গাড়ি করে আসে। সে-ই প্রথম দিন এসেছিল সকাল বেলা। —চার জন! মাদাম ভোকে

আর সিল্‌ভি উভয়েই বলে। এই বিলাসী বেশবাসপরা মহিলার মধ্যে তারা সেদিনকার সেই আটপৌরে পোশাকপরা বালিকার কোন লক্ষণ দেখল না।

গোরিও তখনও বারশ ফ্রাঁ দিচ্ছে। মাদাম ভোকের ধারণা, বড় লোকদের পক্ষে তিন-চার জন রক্ষিতা রাখা খুবই স্বাভাবিক। মেয়ে বলে এদের পরিচয় দেওয়া বেশ চালাকি বলে মনে হল। মেজঁ ভোকে বোর্ডিংয়ে এদের ডেকে নিয়ে আসায় মাদামের আপত্তি নেই। কিন্তু তার প্রতি ভাড়াটের উদাসীনতা লক্ষ্য করে তিনি এতদূর এগিয়ে যান যে দ্বিতীয় বছরের শেষের দিকে গোরিওকে বিরক্তিকর বুড়ো বলে ডাকতেও দ্বিধা করেননি। অবশেষে গোরিও যখন ন'শ ফ্রাঁর বেশী দিত না, তখন একদিন বহিরাগত মহিলার এক জনকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবার সময় বৃদ্ধকে ডেকে বলেন, এ বাড়ীকে সে কি মনে করেছে? জবাবে গোরিও জানায় যে মহিলাটি তার বড় মেয়ে।

ঝাঁঝি মেরে মাদাম বলে ওঠেন, এ রকম ডজন তিনেক মেয়ে আপনার আছে, তাই না?

দারিদ্র্য এই সময় গোরিওকে এমনভাবে আঁকড়ে ধরেছে যে নীরবে সব অপমানভার নতশিরে বইতে সে প্রস্তুত। তাই বিধ্বস্ত মানুষের মত ভীরু মিয়নো গলায় সে জানায়, দুটি মাত্র মেয়ে আমার।

তৃতীয় বছরের শেষের দিকে গোরিও আরও ব্যয় সংক্ষেপ করে। ঘর বদলে সে চারতলায় যায় এবং ভাড়া বাবদ মাসে মাত্র পঁয়তাল্লিশ ফ্রাঁ দিত। তামাক খাওয়া সে ছেড়ে দেয়। হেয়ার ড্রেসারকেও বিদায় করে, এমন কি চুলের জন্য কোন কলপ পর্য্যন্ত ব্যবহার করত না। কলপ ছাড়া প্রথম যেদিন গোরিও নীচে নামে সেদিন তার কালচে সবজে কটা চুল দেখে অতর্কিতে গিন্নীর মুখ দিয়ে কস্ করে একটা বিস্ময়সূচক শব্দ বেরিয়ে যায়। কোন গোপন বেদনা প্রতিদিন বৃদ্ধের মুখ বিষণ্ণতর করছিল? সেদিন তার মুখখানা টেবিলের অপর সকলের চাইতে বেদনার্ত দেখাচ্ছিল।

তখন আর এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ ছিল না যে লোকটা বহুদিনের পাকা লম্পট এবং শুধু ডাক্তারের কৃতিত্বের জন্যই ওষুধের জোরে তার দৃষ্টি শক্তি তখনও অক্ষুণ্ণ ছিল। আর লাম্পট্যের মাত্রাধিক্য এবং সেই লাম্পট্য চালিয়ে যাবার জন্য যে ওষুধ সে ব্যবহার করেছে তার ফলেই তার চুলের অমন

বিচ্ছিরি অবস্থা হয়েছে। বৃদ্ধের যা দৈহিক ও মানসিক অবস্থা তাতে এ রকম আজগুবি কাহিনীও সত্য বলে মনে হয়। পুরনো সাজ পোশাক ছিঁড়ে গেলে প্রতি পঁয়তাল্লিশ ইঞ্চি ক্যালিকো কাপড় চৌদ্দ স্যু দরে কিনে সে সস্তায় পোশাক তৈরী করত। একে একে তার হীরা, সোনার নস্যের কৌটা, চেন—এককথায় তার সব দামী অলঙ্কার উধাও হয়ে যায়। চকচকে নীল কোটটা পরাও সে ছেড়ে দেয়। কি শীত, কিবা গ্রীষ্ম, সব সময় সে একটা সূতীর মোটা রাঙাটে-কটা রঙের ওভারকোট, ছাগলের লোমের একটা ওয়েস্টকোট আর খাপি বুননো মোটা একটা কটা পশমী ব্রিচেজ পরে কাটাত। ক্রমান্বয় তার শরীর শীর্ণতর হয়ে আসে। পায়ের গুল শুকিয়ে যায়—এককালের সমৃদ্ধ ব্যবসায়ীর সন্তোষ ভরা প্রসন্ন গোলগাল মুখে অস্বাভাবিক ভাঁজ পড়ে। কপালেও বলীরেখা দেখা দেয়—চোয়ালটা আরও উঁচু হয়ে পড়ে। রুয় নভ-স্যাঁৎ জনভি য়েভে বসবাসের চতুর্থ বছরে তাকে আর আগের মানুষ বলে চেনা যেত না। বাষট্টি বছর বয়সেও সদাশয় সেমুই ব্যবসায়ীকে চল্লিশ বছরের মত দেখাত। সাচচা সজীবতা ভরা এই সবল সম্পন্ন ব্যবসায়ীর মুখে কেমন যেন একটা কমিক ভাব ছিল। পথে ঘাটে তার চটপটে হাবভাব অপরিচিতদের কাছে কৌতুককর মনে হত। কখনও বা তারা অন্যমনস্ক হয়ে পড়ত। এতদিন যার হাসির মধ্যে তারুণ্য ছিল সেই মানুষকে দেখে এখন কমপক্ষে সত্তর বছরের বুড়ো বলে মনে হয়। কেমন হাবা, বিমর্ষ আর বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছে যেন! নীল চোখ দুটো আগে সব সময় প্রাণোচ্ছল ছিল। আজকাল যেন কেমন সীসের মত বিবর্ণ বিষণ্ণ হয়ে পড়েছে। শুকিয়ে কেমন নিষ্প্রভ হয়ে পড়েছে যেন। চোখের লাল শিরাগুলো থেকে রক্ত চুইয়ে পড়ছে বলে মনে হয়। তাকে দেখে লোকের করুণা হত' কিম্বা আঁৎকে উঠত হয়ত। তরুণ মেডিক্যাল ছাত্রেরা কিছুক্ষণ তাকে ঠাট্টা-তামাসা করেও কোন সাড়া পেত না। তখন বৃদ্ধের ঝুলে পড়া ঠোঁট আর মুখের ব্যঞ্জনা দেখে তারা সাব্যস্ত করে যে গোরিও ক্রমান্বয় জরাগ্রস্ত হয়ে পড়ছে।

একদিন ডিনারের পর গোরিওর পিতৃ-সম্পর্ক সম্বন্ধে প্রচ্ছন্ন সন্দেহ প্রকাশ করে ব্যঙ্গভরে মাদাম ভোকে বলেন, আচ্ছা, আপনার সেই মেয়েরা এখন আর আপনার সঙ্গে দেখা করতে আসে না কেন?

গোরিও এমন ভাবে মুখ খিঁচোয় যেন তরোয়ালের ডগা দিয়ে কেউ তাকে খোঁচা মেরেছে। তারপর কাঁপা গলায় বলে, এখনও মাঝে মাঝে আসে তো!

—বটে ! বটে ! এখনও মাঝে মাঝে তাদের সঙ্গে দেখা করেন তাহলে ! ছাত্রদল চেঁচিয়ে ওঠে।—সাবাস বাবা গোরিও ! সাবাস !

এই রসিকতা বুড়োর কানে গেল না। মনে হল যেন স্বপ্নের ঘোরে আছে। আপাতদৃষ্টিতে এই অবস্থা নির্বোধ গোরিওর বার্ধক্যের জড়ত্ব বলে মনে হয়। তারা যদি সঠিক জানত তো নিশ্চয়ি বুড়োর দৈহিক ও মানসিক অবস্থা সম্পর্কে তীব্র আগ্রহ বোধ করত। কিন্তু সে খবর একেবারেই অজ্ঞাত। অবশ্য গোরিও সেমুই ব্যবসায়ী ছিল কিনা, কিংবা তার বৈভবের পরিমাণ কত, সে খোঁজ বার করা সহজ। কিন্তু কৌতূহলী বৃদ্ধেরা মহল্লা ছেড়ে এক পা'ও নড়তেন না—বোর্ডিংয়ে লেগে থাকতেন পাথরে আটকান শুক্তির মত। বাকী আর সবাই রাস্তার মোড় ঘুরে পারির জটিল জীবনধারার আবর্তে এমন ভাবে জড়িয়ে পড়ত যে, ক্ষণিকের জন্যও এই উপহাসের পাত্রের কথা মনে পড়ত না। সংকীর্ণচেতা বৃদ্ধ আর বেপরোয়া যুবকদের দৃষ্টিতে বুড়ো গোরিওর মুখ ব্যঞ্জনা আর নির্বোধ নিরাসক্তির সঙ্গে ধনসম্পদ আর বুদ্ধি-বৃত্তির কল্পনা সামঞ্জস্যহীন। এ দুটো তার আছে বলে মনে হয় না। আর গোরিও যাদের কন্যা বলে পরিচয় দিত সেই মেয়েদের সম্পর্কে সকলেই মাদাম ভোকের সিদ্ধান্তে সায় দিল। বুড়ীদের সঙ্গে বিকেল বেলা গালগল্প করবার সময় প্রতিটি প্রশ্নের জবাবে নির্ভুল যুক্তি দেখিয়ে তিনি বলতেন, যে সব মহিলা এখানে আনাগোনা করে, বুড়োর যদি অমন বড় লোক মেয়ে থাকত তো এ বাড়ীর চারতলায় মাসে পঁয়তাল্লিশ ফ্রাঁ ভাড়া দিয়ে থাকত না—অমন ভিখিরীর মত পোশাক পরেও চলাফেরা করত না তাহলে।

এই সিদ্ধান্ত অস্বীকার করা যায় না। কাজেই ১৮১৯ সালের নভেম্বর মাসে এই নাটকের পর্দা যখন ওঠে, বুড়ো গোরিও সম্পর্কে বোর্ডিংয়ের সকলেরই তখন সুস্পষ্ট ধারণা ছিল। তারা মনে করত, কন্যা বা স্ত্রী তার কোনকালেই ছিল না; দীর্ঘদিন লাম্পট্য করে আজ সে অথর্ব হয়ে পড়েছে। মাদাম ভোকের প্রাত্যহিক অতিথিদের মধ্যে যাদুঘরের এক কর্মচারী ছিল। রসিকতা করে তিনি বলতেন: লোকটা কোমলাঙ্গ শুক্তির অবতার বিশেষ। পোয়ারেকে ঈগলের সঙ্গে তুলনা করা যায়। গোরিওর তুলনায় সে ভদ্রলোক। কথা বলতে সে জানে, আর যুক্তি দিয়ে জবাব দিতেও আটকায় না। আসলে কোন নতুন কথাই সে বলে না। কারণ নিজের ভাষায় অন্যের কথার পুনরাবৃত্তি করাই তার অভ্যাস, তবু সে আলোচনায় যোগ দেয়।

নিজের পরিবেশ সম্পর্কে তাকে বেশ সচেতন, বেশ হুঁশিয়ার বলেই মনে হয়। কিন্তু যাদুঘরের কর্মচারীর ভাষায়, গোরিও সব সময় রেওমুারের (১) শূন্য ডিগ্রীতে থাকে।

ওজেন দ রাস্তিঞাক এই সময় পারি এসেছে। সাধারণ যুবকের চাইতে নিজের বুদ্ধির শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে সে সচেতন...নিজের দুরবস্থার প্রেরণায় সমবয়সী-দের ডিঙিয়ে যাবার জন্য সমুৎসুক হয়ত বা।

প্রথম বছর আইনের ছাত্রদের এত কম পড়া-শুনা করতে হয় যে পারি এসে অবাধে তারা ঘোরাফেরা করা আর শহরে জীবনের আনন্দ উপভোগ করার সুযোগ পায়। খুশিমত কলেজের বক্তৃতা শুনে আর যাদুঘরের সঞ্চিত সমস্ত প্রাচীন সম্পদের হিসাব নিয়ে কোন ছাত্র যদি প্রতিটি থিয়েটারের যাবতীয় অভিনয় দেখতে চায়, যদি এই বিরাট শহরের অলিগলির মোড়ের সঙ্গে পরিচিত হতে চায়, কিংবা এখানকার রীতিনীতি, ভাষা আর অদ্ভুত আনন্দের সঙ্গে পরিচিত হয়ে রাজধানীর নাগরিক হতে চায়—যদি এর ভাল মন্দ সমস্ত মহল্লার হদিস জানতে চায় তো তার খুব সামান্য অবসরই জোটে।

জীবনের এই অবস্থায় মোহমুগ্ধ ছাত্রেরা মরীচিকার পেছনে ছুটে মরে...... বীর পূজারী হয়ে পড়ে। ছাত্রদের মানসিক স্তরের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাওয়াতে সমর্থ কলেজ ফ্রান্সের কোন অধ্যাপককে হয়ত শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি জ্ঞানে পূজা করে; ওপেরা কমিকের প্রথম সারির গ্যালারির মহিলাদের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য হরেক রকম ভঙ্গী করে বারে বারে গলাবন্ধ ঠিকঠাক করে দেয়। একটির পর একটি নতুন অভিজ্ঞতা লাভ করে ক্রমান্বয়ে সে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব বোধ হারিয়ে ফেলে—চোখের সামনে জীবনের দিগন্ত বেড়ে যায়। পরিশেষে উপলব্ধি করে যে সমাজের বিরাট কাঠামোর মধ্যে সমস্ত মানুষ একটির পরে একটির স্তরে সাজান। সোনালী রোদভরা কোন বিকেলে সাঁজে লিজে দিয়ে চলমান জুড়িগাড়ি দেখে যদি সে তারিফ করে তো আজকেই তেমনি একখানা গাড়ির মালিক হবার লোভ হবে।

কলা বিভাগ আর আইন শাস্ত্রের স্নাতক উপাধি নিয়ে দীর্ঘ অবকাশে ওজেন যেদিন পারি ছেড়ে যায়, শহরে জীবনের শিক্ষানবিশী তার মানসিক অবস্থাকে তখন এই পর্যায়ে নিয়ে গেছে। উধাও হয়ে গেছে ছেলেবেলার

(১) রেওমার: এক ধরণের তাপমান যন্ত্রের আবিষ্কর্তা ফরাসী পদার্থ বিজ্ঞানী।

ভ্রান্তি আর গ্রামীন ধ্যান ধারণা। জ্ঞান বৃদ্ধি আর অতৃপ্ত উচ্চাশা তার চোখ খুলে দিয়েছে। তাই গ্রাম্য পারিবারিক পরিবেশে ফিরে এসে সব কিছুর আসল রূপ সে চিনতে পারে। সংসারে বাপ-মা, দুটি ভাই, দুটি বোন আর এক পিসি আছে। পিসির একমাত্র সম্বল মাসোহারা। সকলেই রাস্তি-এ্যাকদের ছোট্ট এষ্টেটে বাস করে। সম্পত্তির বাৎসরিক আয় প্রায় হাজার তিনেক ফ্রাঁ। তাও আবার আঙুরের দামের উঠতি-পড়তির উপর নির্ভরশীল। এই আয় থেকেই তাদের জন্য বারশ ফ্রাঁ আলাদা করে রাখতে হয়। সে বুঝতে পারে যে এই অর্থ পাঠাবার জন্য গোটা পরিবারকে সারা বছর উৎকণ্ঠায় কাটাতে হয়। ছেলেবেলায় বোনেদের অপরূপ সুন্দরী বলে মনে হয়েছে; কিন্তু পারির মেয়েদের সঙ্গে তাদের তুলনা হয় না। পারির পরীরাই এখন তার মানস সুন্দরী। সে বুঝত যে এই বৃহৎ পরিবারের অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ তার উপর নির্ভরশীল। নিজের চোখে দেখল, প্রতিটি কপর্দক বাবার জন্য ব্যয়সঙ্কোচ করা হচ্ছে—আঙুরের রসের তলানি থেকে তৈরী মদ খাচ্ছে গোটা পরিবার। মোট্কথা, ছোটখাট বহু কারণে সে কর্ম জীবনে বিশিষ্টতা লাভের জন্য উদ্বুদ্ধ হয়—দশ গুণ বেড়ে যায় সাফল্যের উচ্চাশা।

বড় বড় চিন্তানায়কদের মত নিজের যোগ্যতার বলে সাফল্য অর্জন করতে চেয়েছে ওজেন। কিন্তু মেজাজটা ছিল প্রধানত দখনেদের মত। সঙ্কল্প কার্যকরী করার সময় ইতস্তত না করে পারে না। খোলা সমুদ্রে পড়ে দিক হারিয়ে ফেলে, ঠিক বুঝে উঠতে পারে না কোন ভাবে পাল খাটালে হাওয়া লাগবে। সর্বান্তঃকরণে কাজে লাগতে গেলে সামাজিক সম্পর্ক স্থাপনের প্রায়োজনীয়তা অনুভব করে থমকে দাঁড়াতে হয়; তখনই বুঝতে পারে, সামাজিক জীবনে মেয়েদের প্রভাব কত বেশী। সংসারে প্রবেশের আগে আচমকা তাই সে পৃষ্ঠপোষিকা সংগ্রহের সিদ্ধান্ত করে বসে। ঐকান্তিক আদর্শবাদী যুবককে কি করে তারা নিরাশ করবে? আগ্রহ ও বুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সুচারু ছিমছাম চেহারা আর বলিষ্ঠ সৌন্দর্যও তার আছে। এই সব গুণপণা সহজেই মেয়েদের আকর্ষণ করে নাকি? বোনদের সঙ্গে মাঠে-ঘাটে বেড়াবার সময় এই চিন্তা বারংবার তাকে উতলা করে তুলেছে। বোনেরা বুঝতে পেরেছে, দাদা বদলে গেছে।

ওজেনের মাসী মাদাম দ মার্সিয়াকের রাজদর্শনের সৌভাগ্য হয়েছিল। দেশের সেরা অভিজাতদের সঙ্গে সেখানে তিনি পরিচিত হতে পেরেছিলেন।

ছেলেবেলা ঘুম পাড়াবার সময় এদের অনেক গল্প বলেছে মাসি। এই সব গল্পের মধ্যেই এই উচ্চাভিলাষী যুবক সহসা সামাজিক সাফল্যের সূত্র খুঁজে পায়। মনে হয়, এই সাফল্য তার আইন কলেজের আদর্শের সাফল্যের চাইতে কোন অংশে হীন নয়। কোন্ কোন্ আত্মীয়ের সঙ্গে নতুন করে সম্পর্ক পাতান যায় সে সম্বন্ধে মাসির কাছে রোজ সে খবর নিত। বংশ-লতার ডাল ঝেঁকে শেষ অবধি বৃদ্ধা স্থির করলেন যে স্বার্থপর ধনী আত্মীয়ের মধ্যে একমাত্র মাদাম লা ভিকঁতেস দ বোসেয়াঁ এই বোনপোর সব চাইতে বেশী কাজে লাগতে পারে। সেকেলে রীতি অনুসারে এই মহিলাকে তিনি একখানা পত্রও লিখলেন। এবং পত্রখানা বোনপোর হাতে দিয়ে বললেন, ভিকঁতেসের সঙ্গে পরিচিত হবার চেষ্টা যদি সফল হয় তো অন্যান্য আত্মীয়-আত্মীয়ার সঙ্গে তার পরিচয় করিয়ে দেবেন। পারি ফেরার দিন কয়েক পরেই মাসির পত্রখানা মাদাম দ বোসেয়াঁর কাছে পাঠিয়ে দেয় রাস্তিঞাক। পরের দিন বল-নাচের আসরে নেমন্তন্ন সহ ভিকঁতেসের জবাব আসে।

১৮১৯ সালের নভেম্বর মাসের শেষাশেষি মোটামুটি এই ছিল মাদাম ভোকের বোর্ডিংয়ের অবস্থা।

দিন কয়েক পরে রাত দুটোয় মাদাম দ বোসেয়াঁর বল-নাচের আসর থেকে ফিরল ওজেন। নাচের সময়ে এই উৎসাহী ছাত্রটি স্থির করল যে হারানো সময়ের ক্ষতিপূরণের জন্য ভোর অবধি সে পড়াশোনা করবে। এই নিস্তব্ধ মহল্লায় এই প্রথম সে সারা রাত জাগবে। সৌখীন সমাজের জৌলুসের যাদুমন্ত্র তাকে কৃত্রিম উৎসাহে অনুপ্রাণিত করেছে। বোর্ডিংয়ে সে খেল না। ভাড়াটেরা ভেবেছে, সকাল বেলা বলনাচ থেকে ফিরবে। প্রাদোতে কোন ভোজসভা কিংবা ওদেয়ঁতে বল নাচের পর মাঝে-মাঝে এমন না হয়েছে নয়। রেশমি মোজায় কাদা মাখিয়ে পাম্পসু নষ্ট করে সকাল বেলা সে হেঁটে হেঁটে বোর্ডিংয়ে ফিরেছে।

দরজা বন্ধ করার আগে রাস্তায় উঁকি মেরে দেখল ক্রিস্তফ। রাস্তিঞাক ঠিক সেই সময়ে হাজির হল। তাই সোরগোল না করে উপরে উঠে যেতে পারল। ক্রিস্তফও বক বক করতে করতে তার পেছু পেছু গেল। বেশভূষা খুলে চটি আর পুরনো কোটটা পরল ওজেন। তারপর আগুন জ্বে

চটপট পড়ার আয়োজন করল যে ক্রিস্তফের ভারী বুটের শব্দে তার ঘরের ছোটখাটো আওয়াজ তলিয়ে গেল।

আইনের বইয়ে মনোনিবেশ করার আগে চিন্তামগ্ন হয়ে মিনিট কয়েক সে চুপচাপ বসে রইল।

সবে সে বুঝতে পেরেছে যে মাদাম দ বোসেয়ঁা পারির বিলাসী সমাজের শ্রেষ্ঠ পরীদের অন্যতমা। এবং ফোবুর স্যাঁ-জেরমঁ্যার অভিজাত মহল্লায় তার বাড়ী সব চাইতে আরামপ্রদ বলে পরিচিত। তাছাড়া বংশ কৌলীন্য আর বৈভবের দরুণ তিনি অভিজাত জগতের অতি বিশিষ্টা মহিলা বলে সুপরিচিতা। মাসি মাদাম দ মার্সিয়াককে শত ধন্যবাদ। ছাত্র বেচারী এ গৃহে সাদর অভ্যর্থনাই পেয়েছে। এ যে কত বড় আনুকূল্য তার মর্ম তখনও তার উপলব্ধি হয়নি। এই সব অভিজাত সাঁলোতে (বৈঠকখানায়) সংবর্ধনা লাভ করা আভিজাত্যের টীকা পরার সামিল। এই অতি বিশিষ্ট মহলে উপস্থিত থেকে সে সর্বত্র প্রবেশের অধিকার অর্জন করেছে।

মজলিসের জাঁকজমক তার চোখ ধাঁধিয়ে দিয়েছিল। ভিকঁতেসের সঙ্গে তার সামান্য কথাই হয়েছে। পারির পরীদের এই ভীড়ের মধ্য থেকে তিনি যে তাকে চিনে বার করতে পেরেছেন তাতেই সে সন্তুষ্ট। মনে হয়েছে, প্রথম দর্শনেই এমন নারীর পায়ের তলায় যে কোন যুবকের লুটিয়ে পড়া উচিত। কঁতেস আনাস্তাজি দ রেস্তো পারির শ্রেষ্ঠ সুন্দরী বলে সুবিদিতা। ছিপছিপে লম্বা আর সুঠাম তার দেহবল্লরী। আয়ত কালো চোখ, সুগোল কোমল হাত, সুঠাম পায়ের গড়ন আর চলাফেরায় ব্যক্তিত্বের ঝিলিকভরা এক গরবিনী সুন্দরীর কল্পনা করুন, তাহলেই বুঝতে পারবেন। মার্কি দ রঁকরল তাকে পুরোপুরি অভিজাত বলে স্তুতি করতেন। মেজাজটা কড়া হলেও অপর কোন ত্রুটি তার ছিল না। আদিরসাত্মক প্রাচীন উপকথার অনুকরণে 'স্বর্গের পরী' জাতীয় যে সব বিশেষণ কপট স্তুতিবাদের ক্ষেত্রে সৌখীন বাবুমহলে ব্যবহৃত হত, ইদানিং তার বদলে 'পুরোপুরি অভিজাত' 'সদ্বংশের সুশিক্ষিতা মহিলা' ইত্যাদি বিশেষণ ব্যবহার হতে শুরু করেছে। কিন্তু রাস্তিঞাকের চোখ মাদাম আনাস্তাজি দ রেস্তো আদর্শ মহিলা। এমন এক নারীর কামনাই সে করেছে। চালাকি করে দুবার সে পাখার উপর তার নাচের জুটির তালিকার মধ্যে নিজের নাম লিখে রেখেছে এবং প্রথম নাচের সময়েই তার [illegible] থেকে দু'চারটে কথা বার করতে পেরেছে।

—আবার কোথায় আপনার সঙ্গে দেখা করতে পারি মাদাম? সুতীব্র আবেগভরা কণ্ঠে হঠাৎ সে জিজ্ঞাসা করে বসে। স্বভাবতই এই আগ্রহে আত্মপ্রসাদ লাভ করে মেয়েরা। —যেখানে খুশি! বোয়া, বুর্ফঁ কি আমার বাড়ীতে ···যেখানে ভাল লাগে!

মোহিনী এই কঁতেসের সঙ্গে অন্তরঙ্গতা প্রতিষ্ঠার জন্ম দুঃসাহসী দখনে যুবক সাধ্যায়ত্ত কোন চেষ্টার ত্রুটি করল না। অবশ্য ওয়ালজ নাচ কি স্কোয়ার নাচের সময় যতটা ঘনিষ্ঠতা অর্জ্জন করা সম্ভব তার বেশী কিছু হল না। সে যখন মাদাম রেস্তোকে জানাল যে সে মাদাম দ বোসেয়ঁার সম্পর্কে ভাই হয়, তার মনে হল যেন এই মহীয়সী মহিলা এই পরিচয় শুনেই তার সঙ্গে দেখা করতে রাজী হলেন। মহিলাটির বাড়ীতে যাবার আমন্ত্রণও সে পেল। বিদায়ের সময় তার উদ্দেশ্যে মহিলাটি যে হাসি ছুঁড়ে মারলেন তাতে তার সঙ্গে দেখা করা সামাজিক কর্তব্য বলেই ওজেনের মনে হল।

সৌভাগ্যবশত নিজের অজ্ঞতাকে উপহাস না করার মত সুবুদ্ধি তার হয়েছিল। মোলাকুঁর, রঁকরল, মাকস্মি দ ত্রাই, দ মার্সি, দাজুদা প্যাঁতো আর ভাঁদনেসের মত চরম সৌখীনতার খ্যাতিমান যুবক আর লেডি ব্রঁদঁ, দুশেস দ লাঁজে, কঁতেস দ কেরগারুয়ে, মাদাম দ সেরজি, দুশেস দ করিলিয়ানো, কঁতেস ফেরো, মাদাম দ লাঁতি, মার্কিজ দেগলমঁ, মাদাম ফিরমিয়ানি, মার্কিজ দ লিস্তোমের, মারকিজ দেসপার, দুশেস দ মোফ্রাঞেজ এবং গ্রঁলিয়োর মত সৌখীন সমাজের সুচারু মহিলাদের সঙ্গে মেলামেশার সুযোগ সে পেয়েছে। নিজের সম্পর্কে এমন কোন ধারণা পোষণ করা চোস্ত সাজপোশাকপরা এই নির্বোধ অভিজাত বাবুদের দৃষ্টিতে অমার্জ্জনীয় অপরাধ। তারপর অনভিজ্ঞ যুবকের পক্ষে এও সৌভাগ্য বলতে হবে যে, দুশেস দ লাঁজের প্রণয়ী শিশুর মত সরল জেনারেল মার্কি দ মত্রিভোর কাছ থেকে সে জানতে পারে যে কঁতেস দ রেস্তো রুয় দ হেদেরে থাকেন।

তারুণ্য, সম্ভোগলিপ্সা আর নারীসঙ্গ লাভের উদগ্র কামনা কত উদ্দীপনাময়! দুটি সুখ্যাত পরিবারের দুয়ার আজ ওজেনের কাছে উন্মুক্ত! এই অনুভূতিও কত আনন্দময়! ফোবুর সঁ্যা জেরমঁ্যার অভিজাত পাড়ায় অবাধে সে ভিকঁতেস দ বোসেয়ঁার বাড়ীতে ঢুকতে পারে, শোসে দাঁত্যাঁয় নতজানু হতে পারে কঁতেস দ রেস্তোর সামনে! পারির সমস্ত সালোর ছবি তার

চোখের সামনে ভেসে ওঠে। মনে হয়, তার মত সুযোগ্য যুবক অনায়াসেই দরদী নারী হৃদয়ের আশ্রয় খুঁজে বার করতে পারবে। আত্মবিশ্বাসী বাজীকরের মত তার অন্তরে উচ্চাশা উঁকি মারে। মনে হয়, সব তুচ্ছ করে নির্ভয়ে সে দড়ির উপর দিয়ে হেঁটে যেতে পারে—পড়ে যাবার কোন শঙ্কা নেই। কারণ সে ভয় দেখা দিলে টাল সামলাবার মত নারী অবশ্যই পাওয়া যাবে। মাথায় এই চিন্তা ঘুরপাক খাচ্ছে, মানস চক্ষে ফুটে উঠছে অপরূপ এক মোহিনীর ছবি। এই অবস্থায় হাতে আইনের বই আর অপরদিকে দারিদ্র্যের মধ্যে থেকেও আগুনের তাপে বিশ্রাম করার সময় কোন্ যুবক ওজেনের মত ভবিষ্যতের দিকে সাগ্রহে দৃষ্টিপাত করবে না? কে স্বপ্ন দেখবে না সাফল্যমণ্ডিত ভাবীকালের? বলগাহীন অসংলগ্ন চিন্তা এত দ্রুত ভাবী সুখের স্বপ্নে বিভোর হয়ে পড়েছিল যে নিজকে সে মাদাম দ রেস্তোর সঙ্গীরূপে কল্পনা করে। ঠিক এই সময় ক্লান্ত স্যাঁ যোসেফের ঘড় ঘড় শব্দের মত একটা দীর্ঘশ্বাস রাত্রির স্তব্ধতা আলোড়িত করে তোলে। যুবকের ব্যথিত অন্তরে এই দীর্ঘশ্বাস মুমূর্ষুর কঁকানি বলে প্রতিভাত হয়। আস্তে আস্তে সে কপাট খোলে। দেখে, বুড়ো গোরিওর কপাটের ফাঁক দিয়ে চলাচলের পথে একটি আলোর রেখা পড়েছে।

ওজেনের শঙ্কা হয়, পাশের ভাড়াটে বুঝি অসুস্থ হয়ে পড়েছে। চাবির ফুটো দিয়ে সে ঘরের মধ্যে তাকায়। কিন্তু বুড়োকে সে এমন অন্যায় কাজ করতে দেখে যে সে সম্পর্কে অনুসন্ধান করা পষ্টতই সামাজিক কর্তব্য বলে মনে হয়। এত রাত্রে এ কি করছে সেমুই ব্যবসায়ী? একখানা টেবিল উল্টে তার পায়ায় লাগানো কাঠের উপর রূপোর একখানা রেকাব আর স্যুপপাত্রের মত একটি বাসন রেখে মোটা দড়ি দিয়ে জড়িয়ে এমন জোরে সে ঘোরাচ্ছে যে দেখলেই বোঝা যায়, মূল্যবান বাসন দুটি ভেঙে বাট বানাবার চেষ্টা করা হচ্ছে।

—কি মানুষ রে বাবা! দড়ি দিয়ে নিঃশব্দে রূপোর বাসন দুটি দুমড়াবার সময় বৃদ্ধের পেশল বাহু দেখে আপনমনে বলে ওঠে রাস্তিঞাক্। মনে হয়, রুটির নেচি তৈরী করছে বুঝি! লোকটা কি চোর না চোরাই মালের কারবারী? নিরাপদে চোরা কারবার চালাবার জন্যই কি অনাথ আর নির্বোধের ভান করে ভিখারীর মত বসবাস

করছে? মনে মনে এইসব কথা আলোচনা করার সময় মুহূর্তের জন্য ছাত্রটি মাথা তোলে। তারপর আবারও চাবির ফুটো দিয়ে উঁকি মারে। বুড়ো গোরিও তখন দড়ি খুলে দুমড়ানো পাতটি টেবিলের উপর রেখেছে। তারপর চ্যাপটা রূপোর পাতটি চাপ দিয়ে মুড়ে অনেকটা ধাতুর বাটের মত করল। এ কাজও এত অনায়াসে সে করে যায় যে বিস্ময় লাগে।

বাট তৈরী করা প্রায় শেষ হয়ে গেলে যুবক ভাবে, বুড়ো নিশ্চয় পোলাণ্ডের রাজা আগস্তাসের মত বলবান।

বিষণ্ণ চোখে বাটটির দিকে চেয়ে থাকে বুড়ো গোরিও। গাল বেয়ে চোখের জল গড়িয়ে পড়ে। কাজের জন্য যে মোমখানি জ্বেলেছিল সেখানি নিভিয়ে দেয়। বিছানায় শোবার সময় ওজেনের কানে একটা অস্ফুট কাতরোক্তির আওয়াজ আসে।

—লোকটা নিশ্চয় মাথা পাগলা। ছাত্রটি ভাবে।

—হায়রে সন্তান! জোরে জোরে বলে ওঠে গোরিও।

এই কথা শুনে ব্যাপারটি চাপা রাখাই সমীচীন মনে করে রাস্তিঞ্যাক। হুট করে প্রতিবেশীর নিন্দা করতে মন চাইল না। নিজের ঘরে ফেরার মুখে সহসা অনির্বচনীয় একটা শব্দ কানে আসে। চটি পরা জন কয়েক লোক যেন উপরে উঠে আসছে। কান খাড়া করে থাকে ওজেন। বেশ বুঝতে পারে, দুটি লোক শ্বাস-প্রশ্বাস নিচ্ছে। কপাট খোলার শব্দ বা পদধ্বনি সে শোনেনি। সহসা দোতলায় মঁশিয় ভোতর‍্যাঁর ঘরে ক্ষীণ আলো জ্বলে উঠল। আপন মনে বলল, বোর্ডিংয়ে বেশ মজার জিনিস চলছে তো!

কয়েক ধাপ নেমে সে উৎকর্ণ হয়ে শোনে। টাকার ঠুনঠান শব্দ কানে আসে। একটু বাদেই আলোটি নিভে যায়। আবারও শ্বাসের শব্দ শোনা যায়; অথচ কপাট খোলার টের পাওয়া গেল না। লোক দুটি নেমে যাবার সঙ্গে সঙ্গে ফোঁস ফোঁস শব্দটি মিলিয়ে যায়।

—কে? শোবার ঘরের জানলা খুলে মাদাম ভোকে জিজ্ঞাসা করেন।

—আমি এলাম ভোকে মা! গম্ভীর গলায় ভোতর‍্যাঁ জবাব দেয়।

—এ ভাল নয়! ক্রিস্তফ কপাটে খিল আটকে দিয়েছিল! নিজের ঘরে ফিরে আসার পথে ভাবে ওজেন।—চার পাশের ভাবসাব লক্ষ্য করার জন্য রাতের বেলা প্যারিতে সব সময় হুঁশিয়ার থাকতে হয়।

অভিজাত প্রণয়িনীর স্বপ্ন তলিয়ে যায় এই সব ঘটনায়। কাজ করতে বসে ওজেন। কিন্তু তার চিন্তা খেই হারিয়ে বুড়ো গোরিও সম্পর্কে সন্ধিগ্ধ হয়ে ওঠে। এর মধ্যেও বার বার মাদাম দ রেস্তোর মুখছবি ভেসে ওঠে। মুখখানি যেন উজ্জল ভবিষ্যতের বার্তা বহন করে আনে। অবশেষে বিছানায় গিয়ে সে হাত মুঠ করে ঘুমোয়। যুবকেরা যদি দশ রাত কাজ করব বলে ঠিক করে তো তার মধ্যে সাত রাত ঘুমোয়। সারা রাত জাগতে হলে বয়সটা কুড়ির বেশী হওয়া দরকার।

নিশ্ছিদ্র কুয়াশা মাঝে মাঝে পারি শহর গ্রাস করে। এমন জমাট অন্ধকার হয়ে আসে যে নেহাৎ সতর্ক সময়নিষ্ঠ লোকও পথ-ঘাট ভুল করে বসে। ব্যবসায় সংক্রান্ত দেখা-সাক্ষাতের ব্যবস্থা ভেস্তে যায়। দুপুরের সময়েও লোকে ভাবে, আটটা বেজেছে। এর পরের দিনের দশাও তাই হল।

সাড়ে নটা বেজে গেল তবু মাদাম ভোকে বিছানা থেকে নড়লেন না। অন্যান্য দিনের তুলনায় খানিকটা পরে হলেও ক্রিস্তফ আর মুটকি সিলভি নির্বিবাদে বসে কফি খাচ্ছিল। ভাড়াটেদের জন্য যে দুধ জাল দেওয়া হয় তার সর দিয়ে কফি তৈরী করা হয়েছে। তাদের ভাগের দুধ ভাল ভাবেই জাল হচ্ছে। কাজেই মাদাম ভোকে কোন মতেই টের পাবেন না যে গোপনে সর তুলে নেওয়া হয়েছে।

কফির মধ্যে প্রথম টোষ্টের টুকরোটি ভিজিয়ে ক্রিস্তফ বলে, সিলভি, কাল আবার দুজন লোক মঁশিয় ভোতর‍্যাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল। মাদাম যদি কিছু জিজ্ঞাসা করেন তো কিছু বলবে না। খেয়াল থাকে যেন। লোকটা তেমন খারাপ নয়!

—তোমায় কিছু দিয়েছে নাকি?

—এ মাসে একশ' স্যু দিয়েছে। তার অর্থ, মুখ বুজে থাকবে।

—ঐ লোকটা আর মাদাম কুত্যুরই শুধু পেনির হিসেব করে চলে না। বাকী আর সবাই নববর্ষে কিছু দিলে অপর হাতে তা ফিরিয়ে নিতে চায়। সিলভি বলে।

ক্রিস্তফ বলে, আর কি-ই বা দেয়! খুব বেশী হলে শ' খানেক স্যু। বুড়ো গোরিও আজ দু' বছর নিজের হাতে জুতো সাফ করছে। পোয়ারে লোকটা এমন কিপ্‌টে যে জুতো সাফই করে না। জুতোর কালি লাগাবার চাইতে কালি খেতে পারলে ব্যাটা খুশি হত। আর ছাত্র ছোক্‌রা

শুধু চল্লিশ স্যু দেয়। তাতে আমার বুরুশের খরচও পোষায় না। ও আবার পুরনো জামা-কাপড় বেচে দেয়। কি বিচ্ছিরি বাড়ীতেই যে থাকতে হচ্ছে!

কফিতে চুমুক দিয়ে সিলভি বলে ওঠে, দূর বোকা! তেমন খারাপ কি আছি? আমি যতদূর জানি, তাতে আশপাশের মধ্যে আমাদের জায়-গাই ভাল। কিন্তু ঐ ভোতর্‍্যা লোকটার ব্যাপার কি? কেউ কিছু বলেছে নাকি ওর সম্পর্কে?

—হাঁ। দিন কয়েক আগে রাস্তায় এক ভদ্দরলোকের সঙ্গে দেখা হয়, তিনি ওর খোঁজখবর জিজ্ঞাসা করলেন। বললেন, তোমাদের ওখানে গোঁফে কলপ লাগান লম্বা মত এক ভদ্দরলোক থাকেন না? আমি বললাম, না মশাই, তিনি তো গোঁফে কলপ লাগান না। তার মত দিলদরিয়া লোকের সে ফুরসত কোথায়? মঁশিয় ভোতর্‍্যাকে যখন এ কথা বল-লাম, তিনি বললেন, বেশ করেছ ছোকরা। ওদের ঠিক অমনিভাবেই শুনিয়ে দিতে হয়। নিজের দুর্বলতার কথা অপরকে জানতে দেবার চাইতে বিরক্তিকর কিছুই নেই। তাতে ভাল বিয়ের সম্বন্ধও ভেস্তে যেতে পারে।

—বাজারের মধ্যেও তারা আমার কাছ থেকে কথা বার করবার চেষ্টা করে। জানতে চায়, কখনও তাকে শার্ট পরতে দেখেছি কি না। কি বোকামি স্থাখ! তারপর নিজের কথায় বাধা দিয়ে বলে ওঠে, সে কি! ভাল দ গ্রেসের ঘড়িতে যে দশটা বাজতে পনের মিনিট বাকি! এখনও কেউ নড়বার নাম করছে না!

—কি আসে যায়? সবাই বেরিয়ে গেছে। মাদাম কুত্যুর আর তার সঙ্গের মেয়েটি আটটার সময় স্যাঁতেনের গীর্জায় উপাসনা করতে গেছে। বুড়ো গোরিও যেন একটা পার্শেল নিয়ে কোথায় গেল। ছাত্রটিও কলেজের বক্তৃতা শেষ না করে দশটার আগে আসছে না। সিঁড়ি সাফ করার সময় এদের সবাইকে যেতে দেখেছি। বুড়ো গোরিও হাতের মোঠাটা দিয়ে আমায় একটা বাড়ি দেয়...লোহার মত শক্ত কি যেন ছিল তার মধ্যে। বুড়োকেও কি চিনবার জো আছে? ভাড়াটেরা সব সময় জ্বালায় বেচারিকে। খেলার পুতুল বলে মনে করে। তাহলেও লোকটার প্রাণটা ভাল—এ বাড়ীর সকলের বৈভব জড়ো করলেও তার সমান হবে না। লোকটা

নিজে মিতব্যয়ী, কিন্তু মাঝে মাঝে আমাকে যে সব মহিলার বাড়ী পাঠায়. তাদের পোশাক দেখলে চোখ ধেঁধে যায়, আর তারা বকসিসও দেয় প্রচুর।

—মেয়ে বলে যাদের ডাকে তাদের কথা বলছ কি? অমন জন বারো মেয়ে আছে ওর।

—আমি মাত্র দুটি দেখেছি। তারাই এসেছিল এখানে।

—ঐ মাদাম উঠেছেন। আজ নিশ্চয়ই একটা কাণ্ড বাঁধাবেন! আমি বরং যাচ্ছি। দুধটার দিকে খেয়াল রেখ ক্রিস্তফ! দেখ, বেড়ালে খায় না যেন।

উপর তলায় গিন্নীর কাছে চলে যায় সিলভি।

—এ কি হচ্ছে সিলভি! দশটার মিনিট পনের বাকী, আর তুই আমায় নিশ্চিন্তে ঘুমোতে দিলি? এমন বিচ্ছিরি ব্যাপার আমি জীবনে দেখিনি।

—কুয়াশার জন্যই হয়েছে। এমন ঘন কুয়াশা করেছিল যে ছুরি দিয়ে কাটা যায়।

—কিন্তু প্রাতরাশের করেছিস কি?

—আর বলবেন না! আপনার ভাঁড়াটেদের মাথায় ভূত চেপেছে! মোরগ ক-কড়া-কড় করে উঠতে না উঠতেই সবাই বেরিয়ে গেছে।

—ভাল ভাবে কথা বলতে শেখ সিলভি। মাদাম ভোকে ভৎর্সনা করে বলেন।—মোরগ ডাকতে না ডাকতেই বলা উচিত।

—যাতে আপনি খুশি হন তাই বলব মাদাম। কিন্তু কথা হচ্ছে, দশটার সময়ে তো আর প্রাতরাশের ব্যবস্থা করা যায় না! মিশনেৎ আর পোয়ারে জুটি এখনও পাশ ফেরেনি। তারাই শুধু বাড়ীতে আছে আর পড়ে পড়ে অসাড়ে ঘুমোচ্ছে।

—যাঃ, এমন ভাবে এদের জুটির কথা বললি যেন······

—যেন কি? হাঁদার মত খিল খিল করে হেসে ওঠে সিলভি।—ও যুগলকে বেশ তো মানিয়েছে!

—আমি অবাক হয়ে যাচ্ছি সিলভি, ক্রিস্তফ কপাটে খিল দেবার পর মঁশিয় ভোতর‍্যাঁ কাল রাত্রে বাড়ীতে ঢুকলেন কি করে?

—অবাক হবার কি আছে? তার আসার টের পেয়ে ক্রিস্তফ নীচে গিয়ে দরজা খুলে দিয়েছে। আর আপনি এদিকে ভেবে মরছেন যে......

—আমার বডিস্‌টা দে—দৌড়ে যা! আর প্রাতরাশের কি হল দেখ। কালকের ভেড়ার মাংসের যেটুকু আছে তার সঙ্গে আলু দিয়ে দিস্‌। হাঁস-পাতি সেদ্ধও দিতে পারিস্‌—এক ফার্দিং করে যেগুলোর দাম তাই দিবি।

মিনিট কয়েক পরে মাদাম ভোকে নীচে নাবেন। বেড়ালটা ঠিক সেই মুহূর্তেই দুধের ভাড়ের ঢাকনাটা ঠেলে ফেলে জিভ দিয়ে চক চক করে খেতে শুরু করে।

—মিস্তিগ্রিস! শাসানির স্বরে মাদাম হাঁক দেন।

বেড়ালটা অমনিই পালিয়ে যায় এবং পরক্ষণেই ছুটে এসে মাদামের পায়ে গা ঘষতে আরম্ভ করে।

—আহা-হা! ভাব দেখে মনে হয় যেন মুখে মাখনও গলবে না। ধাড়ী শয়তান কোথাকার! সিলভি, সিলভি!

—কি হল মাদাম?

—ছাখ না, বেড়ালটা কি করেছে!

—ঐ হাঁদা ক্রিস্তফের কাণ্ড! আমি তাকে টেবিল সাজাতে বলে গিয়েছিলাম। গেল কোন চুলোয়? ভাববেন না মাদাম, ঐই দিয়েই আমরা বুড়ো গোরিওর কফি বানিয়ে দেব। খানিকটা জল ঢেলে দিচ্ছি। দেখবেন, ওর নজরে পড়বে না। কোন জিনিসের দিকেই খেয়াল নেই—খাবারের দিকেও না!

—বুড়ো হাবা গেল কোথায়? টেবিলের চারিদিকে প্লেট সাজাতে সাজাতে মাদাম ভোকে বলে ওঠেন।

—কে জানে! কত কাণ্ডই যে করছে!

—আজ বড্ড বেশী ঘুমিয়েছি। মাদাম ভোকে বলেন।

—তাহলেও মাদামকে টাটকা গোলাপের মত দেখাচ্ছে।

এই সময় তাদের কানে ঘণ্টার শব্দ আসে। গলা ছেড়ে গান গাইতে গাইতে ঘরে ঢোকে ভোতর‍্যাঁ।

'বহু বছর ঘুরেছি জগৎ-জুড়ে
লাভালাভ যাই হোক না……'

—আরে! হ্যালো ভোকে মা, সুপ্রভাত! গিন্নীকে দেখেই দুই হাতে তার কোমর জড়িয়ে ধরে বলে ওঠে ভোতর‍্যাঁ।

—ছাখ, ছাখ! খুব হয়েছে……ঢের হয়েছে……

—বলুন, আরে চালাক! বলে যান! তাই বলতে যাচ্ছিলেন না? থামুন,

আমি সাজিয়ে দিচ্ছি টেবিল। ওঃ, কত ভাল লোক যে আমি! কেমন, ভাই না?

'প্রেমে পড়েছি বহু মেয়ের
কালো কি সুরূপা সে থাকনা।......

—ভারী একটা মজার জিনিস দেখেছি!

'তবু আমার চোখে সব এক—
কালো কি সুরূপা যা-ই থাকনা।'

—কি দেখলে? বিধবা জিজ্ঞাসা করেন।

—বেলা আটটার সময় বুড়ো গোরিওকে দেখেছি রুয় দোফিনের এক পোদ্দারের দোকানের সামনে। দোকানটা পুরনো গহনা কেনাবেচা করে। তাদের কাছে একখানা রূপোর প্লেট বেচেছে। এ নিয়ে যারা নাড়াচাড়া করে, তাদের খুবই পছন্দ হবে জিনিসটি। দামও পেয়েছে ভাল।

—যাঃ, সত্যি?

—তবে! আমার এক বন্ধু আজ রয়েল মেল ষ্টিমারে বিদেশে যাচ্ছে। তার সঙ্গে দেখা করে ফেরার পথে দেখলাম। কি হয় দেখার জন্ম অপেক্ষাও করলাম বুড়ো গোরিওর জন্ম। ভারি মজার ব্যাপার! ফিরে সে এদিকের রুয় দে গ্রেজে আসে। সেখানে গবসেক নামে সুপরিচিত এক সুদখোর মহাজনের বাড়ী যায়। ভারি পাজি লোক। বাপের হাড় থেকে কি করে পুরোহিতের পোশাক তৈরী করতে হবে সে বিদ্যেও ভালমত জানা আছে গবসেকের। ইহুদি, আরবী, তুর্কী—যা খুশি বলতে পারেন। তাকে ঠকান মুশকিল। প্রতিটি পেনি ব্যাটা ব্যাঙ্কে জমা রাখে।

—গোরিওর সেখানে কি দরকার থাকতে পারে?

—কিস্যু না, জাহান্নামে যাবার পথ তৈরী করছে। লোকটা পাগল হয়ে গেছে—ওই মেয়েদের পেছনে ঘোরাঘুরির বোকামির জন্মই মারা পড়বে।

—এই তো এসে গেছে! সিলভি বলে ওঠে।

—আমার সঙ্গে উপরে এসো তো ক্রিস্তফ। গোরিও ডাক দেয়।

গোরিওর পেছু পেছু যায় ক্রিস্তফ। আবার পরক্ষণেই নেমে আসে।

—কোথায় চললি? চাকরকে জিজ্ঞাসা করেন মাদাম।

—মঁসিয় গোরিওর কাজে।

—কি আছে ওটার মধ্যে? ক্রিস্তফের হাতের খামখানা ছোঁ মেরে কেড়ে নেয় ভোতর্‍্যাঁ। তারপর জোরে জোরে পড়ে: মাদাম লা কঁতেস আনা-স্তাজি দ রেস্তো। কোথায় নিয়ে চলেছিস এখানা? চিঠিটা ফিরিয়ে দিতে দিতে আবারও জিজ্ঞাসা করে।

—রুয় দ হেদেরে। কঁতেস ছাড়া আর কারও কাছে দিতে পারব না।

—কি আছে ভেতরে? আলোর সামনে চিঠিখানা তুলে ধরে বলে ভোতর্‍্যাঁ; খামের ভেতরে কি আছে দেখার জন্য সে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে।—ব্যাঙ্ক নোট? না, রসিদ! যা বলেছি! বুড়োর খুব যে রস দেখছি! যা রাস্‌কেল! বিশাল হাত বাড়িয়ে ক্রিস্তফকে একটি অর্ধচন্দ্র দিয়ে বলে। লোকটা গোটা কয়েক পাক খায়।—বেশ ভাল বকসিসই পাবি।

ইতিমধ্যে টেবিল সাজান হয়ে যায়। সিলভি দুধ জ্বাল দিচ্ছিল। ভোতর্‍্যাঁর সাহায্যে ষ্টোভটা জ্বেলে দেন মাদাম ভোকে। ভোতর্‍্যাঁ তখনও আপন মনে গুন গুন করে গাইছে:

'বহু বছর ঘুরেছি জগৎ জুড়ে
লাভালাভ যাই হোক না………'

সব কিছু তৈরী হয়ে গেলে মাদাম কুত্যুর আর মাদমোয়াজেল তাই-ফের ঘরে ঢোকে।

—কোথায় ছিলেন আজ সকালে? মাদাম কুত্যুরের দিকে ফিরে জিজ্ঞাসা করেন মাদাম ভোকে।

—স্যাঁতেন-দ্যু-মঁ'তে উপাসনা করতে গিয়েছিলাম। জানেন বোধ হয়, আজ আমাদের মঁশিয় তাইফেরের কাছে যাবার কথা আছে। মেয়ে বেচারি তো পাতার মত কেঁপেই অস্থির! ষ্টোভের সামনে বসে ধোঁয়ানো জুতো জোড়া আগুনের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলেন মাদাম কুত্যুর।

—গরম হয়ে নাও ভিকতরিন। মাদাম ভোকে বলেন।

—বাপের মন গলাবার জন্য ভগবানের কাছে প্রার্থনা করা খুবই ভাল কথা! মেয়েটির দিকে একখানা চেয়ার বাড়িয়ে দিয়ে বলে ভোতর্‍্যাঁ।

—কিন্তু সেইটেই যথেষ্ট নয়। এমন বন্ধু তোমার চাই যে পাজিটার মুখের উপর দু' কথা শুনিয়ে দিতে পারে। লোকে বলে, তার নাকি ত্রিশ লাখের মত বৈভব আছে। তবু সে যদি তোমায় কিছু যৌতুক

দিতে আপত্তি করে তো তাকে অসভ্য বর্বর ছাড়া কি বলা যায়? আজকের এই দুর্দিনে তোমার মত সুন্দরী মেয়ের যৌতুক না হলে চলে!

—আহা, বেচারি! মাদাম ভোকে সমবেদনা জানান।—কোন চিন্তা কর না দুলালী! তোমার বাবা যদি জানোয়ারের মত আচরণ করেন তো নিজের পাপে নিজেই ডুবে মরবেন।

এই সব কথাবার্তা শুনে ভিকতরিনের চোখ টলটল করে ওঠে। মাদাম কুত্যুরের ইশারায় মুখ বন্ধ করেন মাদাম ভোকে।

—একবার যদি তার দেখা পেতাম—যদি নিজে তার সঙ্গে দুটো কথা কয়ে স্ত্রীর শেষ চিঠিখানা তার হাতে দিতে পারতাম। জেলা-শাসকের স্ত্রী বলে ওঠেন।

—চিঠিখানা আমার ডাকে পাঠাতে সাহস হয় না—আমার হাতের লেখা তিনি চেনেন!

—হায় নিরপরাধ হতভাগিনী নির্যাতিতা নারী! তাকে বাধা দিয়ে বলে ওঠে ভোতর‍্যাঁ।

—অবস্থা এতদূর গড়িয়েছে? দিন কয়েক পরে আমি নিজে তোমার ব্যাপার দেখাশোনা করব। সব ঠিক হয়ে যাবে জেনো!

জলভরা কাতর চোখে ভোতর‍্যাঁর দিকে চেয়ে ভিকতরিন্ তখন বলে, কি আর বলব মঁশিয়, আমার বাবার সঙ্গে আলাপের কোন পথ যদি আপনার জানা থাকে তো বলবেন, তার স্নেহ আর আমার মায়ের ইজ্জত দুনিয়ার সমস্ত সম্পদের চাইতে আমার কাছে মূল্যবান। কোন মতে যদি আমার সম্পর্কে তার মন নরম করতে পারেন তো আপনার মঙ্গলের জন্য উপাসনা করব। চির কৃতজ্ঞ থাকব আপনার কাছে।

ভোতর‍্যাঁ তখন আবারও গুন্ গুন্ করে শ্লেষভরে গায়ঃ বহু বছর ঘুরেছি জগৎ জুড়ে.........

গোরিও, মাদমোয়াজেল মিশনো আর পোয়ারে এক সাথে নীচে নামে। উদ্বৃত্ত ভেড়ার মাংস দিয়ে সিলভি যে সস্ তৈরী করছিল, তারই গন্ধ হয়ত এদের খাবার ঘরে টেনে এনেছে। পারস্পরিক প্রাতঃসম্ভাষণ শেষ করে, দশ জন অতিথি ও গিন্নী দশটার সময় খাবার টেবিলে বসলেন। এই সময় বাইরে ছাত্রটির পায়ের শব্দ শোনা যায়।

—আজ আপনি সবার সঙ্গে বসে প্রাতরাশ খেতে পারবেন ওজেন। সিলভি বলে ওঠে।

—এখুনি একটা বিচ্ছিরি অভিজ্ঞতা হল আমার। এক টুকরো রুটি কেটে নিয়ে বেশ খানিকটা মাংস মুখে পুরে বলে ওজেন। মাদাম ভোকে এতক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে রুটির পরিমাণ লক্ষ্য করছিলেন।

—বিচ্ছিরি অভিজ্ঞতা! সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করে পোয়ারে।

—তাতে অবাক হবার কি আছে হাঁদারাম? পোয়ারেকে জিজ্ঞাসা করে ভোতর্যাঁ।—ওদের মত লোকেরই তো অভিজ্ঞতা হবার সময় এখন।

ছাত্রটির দিকে আড় চোখে সলজ্জ দৃষ্টি হানে মাদমোয়াজেল্ তাইফের।

—কি অভিজ্ঞতা হল বল না! মাদাম ভোকে হুকুম করেন।

—গতকাল ভিকঁতেস দ বোসেয়াঁ নামে আমার এক আত্মীয়ার বাড়ীতে ব ল-নাচের আসরে গিয়েছিলাম। বিরাট বাড়ী—প্রতিটি ঘরে সিল্কের পর্দা টাঙানো। আর খাওয়ালেও প্রচুর। রাজার মত সুখে............

—মাছ রাঙার মত বল! সহসা তাকে বাধা দিয়ে বলে ওঠে ভোতর্যাঁ।

—কি আপনি বলতে চান বলুন! কড়া মেজাজে বলে ওজেন।

—মাছরাঙা বললাম এই জন্য যে তারা রাজা রাজড়ার চাইতে অনেক বেশী আরামে থাকে।

—তা বটে! রাজা হওয়ার চাইতে অমন চিন্তাভাবনাহীন ছোট পাখি হতে পারলে আমি বেশী খুশি হতাম। কারণ......। পরের মন্তব্যের প্রতিধ্বনি করতে অভ্যস্ত পোয়ারে বলে ওঠে।

কিন্তু তাকে বাধা দিয়ে ছাত্রটি বলে, যাই হোক, অপরূপ এক সুন্দরীর সঙ্গে নেচেছিলাম—মনমোহিনী এক কঁতেস। অমন লাস্যময়ী ললিতা আমি জীবনে দেখিনি। তার চুলে ছিল পীচের মঞ্জরী, আর পোশাকে পরেছিল মধুর গন্ধভরা একটি ফুলের তোড়া। ওঃ, যদি দেখতেন! লাস্যময়ী রমণীর বর্ণনা করা অসম্ভব। তারপর শুনুন, আজ সকালে প্রায় নটার সময় রুয় দ গ্রেজে সেই অপ্সরীর সঙ্গে দেখা। মহিয়সী কঁতেস হেঁটে আসছিলেন। আমার বুক ধরাস্ ধরাস্ করে ওঠে। বিশ্বাস করুন.........

—তিনি এদিকেই আসছিলেন, কেমন তো! ছাত্রটির দিকে সন্ধানী চোখে চেয়ে পাদপূরণ করে ভোতর্যাঁ।—খুব সম্ভব বুড়ো মহাজন গবসেকের ওখানে যাচ্ছিলেন। পারির কোন মহিলার অন্তরের হদিস যদি জানতে পাও তো

দেখবে, প্রণয়ীর চাইতে মহাজন সেখানে অনেক বেশী জায়গা জুড়ে আছে। তোমার কঁভেসের নাম আনাস্তাজি দ রেস্তো—থাকেন রুয় দ হেদেরে।

এই নামোচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে অপলক দৃষ্টিতে ভোতর‍্যাঁর দিকে চেয়ে থাকে ছাত্রটি। বুড়ো গোরিওও আচমকা মাথা তুলে এমন সপ্রতিভ উৎকণ্ঠিত চোখে বক্তা দুটির দিকে তাকায় যে উপস্থিত ভাড়াটেরা সবাই অবাক হয়ে যায়।

—তাহলে ক্রিস্তফ বড্ড দেরি করে ফেলেছে তো! সে নিশ্চয়ই গেছে ওখানে। ক্লিষ্ট কণ্ঠে বলে ওঠে বৃদ্ধ।

—ঠিক অনুমান করেছিলাম। কাত হয়ে মাদাম ভোকের কানে ফিসফিস করে বলে ভোতর‍্যাঁ।

কি খাচ্ছে খেয়াল না করে যন্ত্রের মত গিলে যায় গোরিও। এমন নির্বোধ, এমন গভীরভাবে আপন চিন্তায় মগ্ন তাকে কোনদিন দেখা যায়নি।

—কার কাছে তার নাম শুনলেন মঁশিয় ভোতর‍্যাঁ? ওজেন জানতে চায়।

—ত্যাখ, বুদ্ধির দৌড় ত্যাখ! বুড়ো গোরিও যখন সবই জানে, আমিই বা জানতে পারব না কেন?' জবাবে বলে ভোতর‍্যাঁ।

—মঁশিয় গোরিও জানে? সবিস্ময়ে বলে ছাত্রটি।

—কি হয়েছে? বৃদ্ধ বেচারি বলে।—কালকে তাকে খুব মানিয়েছিল তাহলে?

—কাকে?

—মাদাম দ রেস্তোকে!

—বুড়ো হাঁদার কাণ্ড দেখ। ভোতর‍্যাঁকে বলেন মাদাম ভোকে।—দেখ না, চোখ দুটো কেমন চকচক করে উঠেছে।

—মেয়েটি তাহলে সত্যিই কি ওর রক্ষিতা? চাপা গলায় ছাত্রটিকে জিজ্ঞাসা করেন মাদমোয়াজেল মিশনো।

—সে আর বলতে! এত মানিয়েছিল যে ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। ওজেন বলে যায়। সাগ্রহে তাকে লক্ষ্য করে বুড়ো গোরিও।—মাদাম দ বোসেয়ঁা যদি সেখানে না থাকতেন তো তাকেই নাচের আসরের রাণী বলা চলত। লোকগুলো শুধু তার দিকেই চেয়েছিল। আমার নাম তার নাচের জুটির তালিকার বার নম্বরে ছিল। প্রতিটি চার কোয়াড্রিলে সে নেচেছে। বাকী মেয়েরা তো চটেই অস্থির। তার চাইতে সুখী কালকে কেউ ছিল না।

কথায় বলে, পাল তোলা নৌকো, ছুটন্ত ঘোড়া আর লাস্যময়ী নারীর চেয়ে সুন্দর কিছুই নেই। এর চেয়ে খাঁটি কথা হতে পারে না।

ভোতর‍্যাঁ তখন বলে ওঠে, কালকে হুশেসের আসরে নৃত্য আর আজ সকালে মহাজনের দুয়ারে ধর্ণা। ভাগ্যচক্রের সর্বোচ্চ ধাপ থেকে সমাজের সর্বনিম্ন স্তরে অবনয়ন। পারির মহিলাদের উন্নতি দেখুন! স্বামীরা যদি এদের বলগাহীন বিলাসিতার ব্যয়ভার বহন করতে না পারে তো নিজদের বিকিয়ে দিতেও এরা দ্বিধা করে না। তা' যদি না পারে তো মায়ের রক্ত চুষেও বিলাসিতার জাঁক বজায় রাখে। এমন কাজ নেই যা এরা করতে পারে না। ওদের আমি ভালভাবেই চিনি।

ছাত্রটির কথা শোনার সময় গোরিওর মুখ রৌদ্রদীপ্ত দিনের মত উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল; কিন্তু ভোতর‍্যাঁর নির্মম ভাষণে সে-মুখে মেঘ দেখা দেয়।

মাদাম ভোকে জিজ্ঞাসা করেন, বিচ্ছিরি ব্যাপারটা কি বললে না তো! তার সঙ্গে কোন কথা হল? আইন পড়তে চায় কিনা জিজ্ঞেস করনি?

—আমায় দেখেনি। ওজেন বলে।—কিন্তু সকাল নটার সময় রুয় দ গ্রেজে পারির কোন রূপসীকে দেখতে পারা অবাক কাণ্ড নয় কি? বল নাচ থেকে তো রাত দুটোর আগে ফিরতে পারেনি নিশ্চয়ই। এ রকম অভিজ্ঞতা একমাত্র পারিতেই সম্ভব।

—দূর! তার চাইতেও মজার জিনিস আছে। ভোতর‍্যাঁ বলে ওঠে।

এ সব মাদমোয়জেল তারইফেরের কানে যায়নি। সে তখন নিজের চিন্তায় অনন্যমনা। মাদাম কুত্যুর তাকে ইশারায় জানান সে খাবার সময় হয়েছে—বেশবাস পরে নিতে হয়। মহিলা দুটি চলে খাবার সঙ্গে সঙ্গে গোরিও টেবিল ছেড়ে তাদের পেছু পেছু যায়।

—দেখলেন তো ভাবখানা! ভোতর‍্যাঁ এবং অন্যান্য ভাড়াটেদের লক্ষ্য করে মাদাম ভোকে বলে ওঠেন।—এই সব মেয়ের পেছনে ঘুরেই নিজের সর্বনাশ করেছে।

—এ আপনি কিছুতেই বিশ্বাস করাতে পারবেন না যে অমন সুন্দরী কঁতেস গোরিওর প্রণয়িনী। প্রতিবাদ জানায় ছাত্রটি।

কিন্তু ভোতর‍্যাঁ তাকে বাধা দিয়ে বলে, তোমার বিশ্বাস অবিশ্বাসের পরোয়া আমরা করি না। পারিকে চিনবার মত বয়েস তোমার এখনও

হয়নি। পরে বুঝবে যে লোকে যাদের 'কামুক লোক' বলে এখানে তাদের অভাব নেই।

এই কথা শুনে তূর্যনিনাদে সচকিত ঘোড়ার মত চাঙ্গা হয়ে ভোতর‍্যাঁর দিকে তাকান মাদমোয়াজেল মিশোনো।

সন্ধানী চোখে মহিলাটির দিকে চাইবার জন্য সহসা থেমে যায় ভোতর‍্যাঁ। তারপর বলে, ও, আমাদের মধ্যেও সে দোষ কিছু কিছু আছে তাহলে!

বৃদ্ধা কুমারী অমনিই দৃষ্টি নত করেন—যেন কোন সন্ন্যাসিনী দেবমূর্তি দেখছে।

ভোতর‍্যাঁ তখন বলে যায়, হাঁ, যা বলছিলাম। এই সব লোক এক একটা বিশ্বাস কামড়ে পড়ে থাকে। কিছুতেই তাদের সেই বিশ্বাস টলানো যায় না। তৃষিত এরা—কিন্তু তাও আবার একটিমাত্র কুয়ার জল খাবার জন্য। প্রায়ই সে জল পচা হয়। তবু এই জল খাবার লোভে এরা অনায়াসে স্ত্রী-পুত্র বিকিয়ে দেয়—নিজেদের বিবেক পর্যন্ত শয়তানের কাছে বন্ধক রাখে। কোন কোন লোকের পক্ষে এইসব কুয়া জুয়ার খেলার মত —শেয়ারের বাজারে ফাটকা বাজির মত; নয়তো সঙ্গীত চর্চা, কিংবা ছবি কি পোকা সংগ্রহের মত খেয়ালও হতে পারে। আবার কিছু কিছু লোকের প্রকৃতি এমন যে শুধু একটিমাত্র স্ত্রীলোক তাদের রুচি মাফিক কাজ করতে পারে। সারা দুনিয়ার নারী এনে দিলেও এই শেষের দলের লোক তাদের দিকে ফিরে চাইবে না। যে তাদের কামনা চরিতার্থ করতে পারে একান্ত-ভাবে এরা শুধু সেই নারীকেই চায়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এ সব নারী পুরুষদের ভালবাসে না; বরং কুকুরের মত ব্যবহার করে। তাদের সামান্য খুশির জন্য পুরুষেরা প্রাণান্ত করতেও প্রস্তুত। কিন্তু তাতে কি হবে, এ সব জঘন্য শিকারী কোনদিন ক্লান্তি বোধ করে না—প্রয়োজন হলে শেষ সম্বল বিক্রী করে প্রণয়িনীর টাকা যোগায়। বুড়ো গোরিও এই দলের মানুষ। সে অবিবেচক বলে কঁতেস তাকে শোষণ করতে পারছে। এবং এইটেই সৌখীন জগতের রীতি! দীন ভিখারী ব্যাটার মাথায় এ বুদ্ধি হল না যে মহিলাটি তার অনুগত নয়। কামনার কথা বাদ দিলেও লোকটা অসভ্য জানোয়ার। কিন্তু যখনই ঐ প্রসঙ্গ তোলা যায়, অমনিই তার মুখখানা হীরার মত চকচক করে ওঠে। এ রহস্য বোঝা কঠিন নয়।

আজ সকালে রুপো গলাতে নিয়ে যায়। তারপর ঢুকতে দেখেছি পোদ্দার গবসেকের দোকানে। তারপর কি হ'ল বুঝতেই পারছেন! ফিরে এসে ক্রিস্তফ ব্যাটাকে পাঠাল মাদাম দ রেস্তোর বাড়ী। ক্রিস্তফ তো দেখাল চিঠিখানা আমাদের। ভেতরে একখানা বিল শোধের রসিদ ছিল।' কঁতেস যদি হন্তদন্ত হয়ে বুড়ো মহাজনের বাড়ী ছুটে থাকেন তো পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে ব্যাপারটা জরুরী। বুড়ো ব্যাটা চাল দেখিয়ে তার হয়ে ধারটা শোধ করে দিল। দুয়ে-দুয়ে চারের মত এই সহজ কথাটা বুঝতে কোন বুদ্ধির দরকার হয় না। তাহলেই বুঝতে পারছ ছাত্রভায়া যে তামার কঁতেস যখন পীচ-মঞ্জরীর মুকুট পরে হাতে ঘাঘড়ার প্রান্ত ধরে হাস্তে-লাস্তে অভিজাত মজলিস মাতিয়ে তুলেছিলেন, তখন তার পদযুগল ছিল কাঁটার উপর। মনে মনে ভাবছিলেন হয়ত পাওনাদারের বিল শোধ কি প্রেমিকের কথা।

—আপনার রূঢ় সত্যকথা শুনলে পাগল হয়ে যেতে হয়। রাস্তিঞাক বলে ওঠে।—কালই যাব মাদাম দ রেস্তোর বাড়ী।

—নিশ্চয়! নিশ্চয়! কালই যেও মাদাম দ রেস্তোর ওখানে। সায়-দেয় পোয়ারে।

—গিয়ে হয়ত দেখবে যে তোমার বন্ধু গোরিও ও আছেন সেখানে পুরস্কারের আশায়।

—আপনাদের এই পারি শহরে নোংরামি কোথায় নেই বলতে পারেন! বিরক্তিভরে বলে রাস্তিঞাক।

—এ বড় মজার নোংরা ভায়া! টিপ্পনী কাটে ভোতর্যা।—গাড়ি চড়ে যাবার সময় এই কাদা ছিটকে যদি গায়ে লাগে তো লোকে তোমায় সৎলোক বলেই জানবে। কিন্তু পায়ে হেঁটে যাবার সময় লেগেছে তো রক্ষে নেই। লোকে বলবে বদমায়েস! ভাগ্যদোষে যদি দু'চার পয়সার জন্য পকেটমার তো হাইকোর্টের আসামীর কাঠগড়ায় তোমায় দেখার জন্য লোকের ভীড় জমবে। কিন্তু লাখ দশেক যদি মারতে পার তো অভিজাত মজলিসে তোমায় ধন্য ধন্য করবে। বুঝলে হে, এই সামাজিক রীতি বজায় রাখার জন্যই পুলিস খাতে প্রতি বছর আমরা তিনকোটি ফ্রাঁ খরচ করি। মজা মন্দ নয়!

মাদাম ভোকে তখন বলে ওঠেন, কি বলছিলেন যেন? গোরিও তার প্রাতরাশের রুপোর বাসন-পত্তর গালাতে নিয়ে গেছে?

—ঢাকনির উপর দুটো কপোতের ছবি ছিল? ওজেন জিজ্ঞাসা করে।

—হ্যাঁ, সেইটার কথাই বলছিলাম।

—আর অনেক ভেবেছে এ নিয়ে। রেকাব আর পাত্রটি ভাঙবার সময় কেঁদেছে। হঠাৎ আমার চোখে পড়ে যায়। ছাত্রটি জানায়।

—জিনিস দুটি লোকটা প্রাণাধিক ভালবাসত। মহিলাটি জানান।

ভোতর‍্যাঁ অমনিই বলে ওঠে, তাহলেই দেখুন কতটা উদভ্রান্ত হয়ে পড়েছে। কি করে ওর অন্তর নিঙড়াতে হবে সে কায়দাও নিশ্চয়ি জানে মেয়েটি।

ওজেন তখন নিজের ঘরে চলে যায়। ভোতর‍্যাঁ বেরিয়ে পড়ে। মিনিট কয়েক পরে মাদাম কুত্যুর আর ভিকতরিন গাড়িতে চড়ে বসে। সিলভি ডেকে দিয়েছে গাড়ি। মাদমোয়াজেল মিশোনোর হাত ধরে জারদাঁ-দে প্লাতেতে ঘণ্টাদুয়েক বেড়াবার জন্য বেরিয়ে পড়ে পোয়ারে।

—দেখলেন তো, বিবাহিত দম্পতির মতই ওরা চলাফেরা করে। শুঁটকি সিলভি বলে।—এই প্রথম দুজনে এক সাথে বেরুলো। উভয়েই এত শুকনো আর কঠোর যে ঠোকাঠুকি হলে চকমকি আর ইস্পাতের মত ফুলকি ছুটবে।

—মাদমোয়াজেল মিশোনোর শালের খোঁজ কর। শুকনো কাঠের মত আমিও তাহলে দপ করে জ্বলে উঠব। হেসে বলেন মাদাম ভোকে।

চারটের সময় বোর্ডিং ফিরে দুটি ধোঁয়ান প্রদীপের আলোয় গোরিও দেখল যে ভিকতরিনের চোখ লাল হয়েছে। মাদাম ভোকে বসে বসে তাদের সকালবেলার অভিযানের ব্যর্থ কাহিনী শুনছিলেন। কন্যা ও মাদাম কুত্যুরের উপর অসন্তুষ্ট হয়েছেন মঁশিয় তাইফের এবং নিজের মতামত স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেবার শর্তে তাদের সঙ্গে দেখা করতে রাজী হয়েছিলেন।

মাদাম ভোকেকে বলছিলেন মাদাম কুত্যুর, ভেবে দেখুন, ভিকতরিনকে তিনি বসতেও বললেন না। খুব যে চটেছিলেন তা নয়, তবে কঠোর নিষ্প্রাণ ভাব দেখলাম। আমায় বললেন, তার সঙ্গে দেখা করার মেহেনত যেন আর আমরা না করি। মেয়েটিকে তিনি কন্যা বলেও সম্বোধন করলেন না। বললেন, বার বার দেখা করতে এসে এই তরুণী তার চোখে অকারণ নিজেকে ছোট করছে। জানোয়ারটার কথা শুনুন, বছরে তো একবার মাত্র যাওয়া হয়। আরও বললেন, বিয়ের সময় ভিকতরিনের মা'র কোন সম্পত্তি ছিল না,

কাজেই ভিকতরিনের কোন দাবী থাকতে পারেনা। মোটকথা, এমন সব নিষ্ঠুর কথা বললেন যে মেয়েটা কেঁদে ফেলে। বাবার সামনে নতজানু হয়ে বেশ জোর দিয়ে ভিকতরিন বলে, মায়ের ইচ্ছা অনুসারেই সে দেখা করার চেষ্টা করেছে এবং বিনা প্রতিবাদে সে তার কথা মেনে নেবে। তবে মরা-মায়ের শেষ কটি কথা তাকে একবার পড়ে দেখতে মিনতি জানায়। চিঠিখানা নিয়ে সে পরম বিনয়ী ভাবে বাবার দিকে বাড়িয়ে ধরে। তার অভিব্যক্তিও অনবদ্য হয়েছিল। জানিনা কোত্থেকে শিখল। হয়ত ভগবান নিজেই শিখিয়েছেন। মেয়েটা এমন অনুপ্রাণিত হয়ে পড়েছিল যে তার কথা শুনে আমি ঝর ঝর করে হাঁদার মত না কেঁদে পারলাম না। আর মেয়েটা কথা বলবার সময় সেই নীচ লোকটা কি করছিল জানেন? নখ কাটছিল। মাদাম তাইফেরের চোখের জলে ভেজা চিঠিখানা নিয়ে দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বলে, ঠিক আছে! মেয়েটিকে সে হাত ধরে তুলবার উদযোগ করেছিল। ভিকতরিন অমনিই তার হাত ধরে চুমু খেতে যায়। কিন্তু লোকটা তাকে দূরে ঠেলে দেয়। কি কেলেঙ্কারি বলুন তো! ওর নির্বোধ ছেলেটা এই সময় ঘরে ঢোকে—সেও ভিকতরিনের দিকে ফিরে তাকাল না।

—নিশ্চয় জানোয়ার এরা! বুড়ো গৌরিও বলে ওঠে।

বুড়োর দিকে দৃকপাত না করে মাদাম কুত্যুর বলে যান, তারপর বাপ-ছেলে বেরিয়ে যায়। কিন্তু প্রথমে আমার দিকে ফিরে মার্জ্জনা চায়—তাদের নাকি জরুরী কাজ আছে। দেখা করতে গিয়ে এইটুকুই হল। যাই হোক, নিজের চোখে মেয়েটাকে দেখেছে তো! জানি না কি করে মেয়েটাকে উত্তরাধিকারচ্যুত করতে পারে! ছেলে-মেয়ে তো একই জলের দুটি ফোঁটার মত।

বোর্ডিংয়ের স্থায়ী ভাড়াটে এবং প্রাত্যহিকের অতিথিরা এই সময় একে একে ঘরে ঢুকে সম্ভাষণচ্ছলে এমন কতগুলি অর্থহীন মন্তব্য করে, যা প্যারির কোন কোন শ্রেণীর মধ্যে রসিকতা বলে গণ্য হয়। ভাঁড়ামিই এই সব মন্তব্যের মূল উপাদান—বাচনভঙ্গী আর বক্তার অঙ্গভঙ্গীই তার সর্বস্ব। এই জাতের ইতর রসিকতা সদা-পরিবর্তনশীল। মূল যে কথা থেকে এগুলির উৎপত্তি, মাসখানেকের বেশী তা কারও মুখেই থাকে না। যে কোন রাজনৈতিক ঘটনা, আদালতে বিচারাধীন যে কোন মামলা, পথে ঘাটের যে কোন গান, অভিনেতাদের চুটকি কিংবা যা-কিছু থেকে এই

সব ভাঁড়ামির সূত্রপাত হতে পারে। তারপর এই সব ভাব বা ভাষাকে মাকুর মত ব্যবহার করা, কি ব্যাট দিয়ে বল মারার মত অপরের গায়ে ছুঁড়ে মারাই রেওয়াজ। আগে সমতল পটের উপর স্তরে স্তরে সাজিয়ে দিগন্ত-বিসারী নিসর্গ-শোভার ছবি আঁকা হত। এ চিত্রাঙ্কণ রীতির নাম 'প্যানোরামা'। ইদানীং বিভিন্ন স্তরের উপর বিভিন্ন কোণ থেকে বিবিধ-ভাবে আলোকসম্পাত করে বিচিত্র বর্ণরাগ সৃষ্টি করা হচ্ছে। নিসর্গ চিত্রাঙ্কণের এই নতুন রীতির নাম 'ডাইওরামা'। নতুন এই আবিষ্কারটি কোন কোন চিত্রশালায় 'রামা' শব্দটির খেয়ালমাফিক ব্যবহার প্রচলন করেছে। যে কোন শব্দের সঙ্গে 'রামা' শব্দটির যোগ করা ইদানীংকালের রেওয়াজ। তরুণ এক চিত্রকর হামেশা যাতায়াত করত মেঁজ ভোকেতে। সে-ই ভাড়াটেদের মধ্যে এ রোগ সংক্রামিত করে।

যাদুঘরের অফিসারটি স্বাস্থ্য শব্দের সঙ্গে 'রামা' শব্দটি প্রয়োগ করে বলে, আপনার হেলথোরামা (স্বাস্থ্য) কেমন আছে মঁশিয় পোয়ারে? তারপর মাদাম কুত্যুর ও ভিকতরিনের দিকে ফিরে বলে, এর মধ্যে কোন দোষ আছে?

রাস্তিঞাকের বন্ধু ওরাস বিয়াশঁ নামে এক মেডিক্যাল ছাত্র বলে, ডিনার এখন খাওয়া হবে কি? 'রামা'-রোগ ভোতরঁ্যাকেও ধরেছে। সে বলে ওঠে, আজ বড্ড চিলিওরামা (কন কনে ঠাণ্ডা)। বাবা গোরিও, একটু সরে বস না। দুত্তোর ছাই! তোমার পা দুটো যে ষ্টোভের সবটা আড়াল করে রেখেছে!

—মঁশিয় ভোতরঁ্যা, আপনি 'চিলিওরামা' বললেন কেন? ওটা ভুল। হবে 'চিলিরামা'। বিয়াশঁ টিপ্পনী কাটে।

যাদুঘরের কর্মচারীটি অমনিই মুরুব্বিয়ানার চালে বলে ওঠে, উহুঁ, ঠিকই বলেছেন। 'চিলিওরামাই' হবে। আমার পা'আপনার পায়ের চাইতে ঠাণ্ডা বলতে গিয়ে আমরা যে নিয়মে 'চিলিয়র' শব্দ ব্যবহার করি সেই নিয়মে।

—তা বটে! তা বটে!

ওজেন এই সময় ঘরে ঢোকে। অমনিই তার গলা ধরে প্রায় শ্বাস-রোধ করবার উপক্রম করে বিয়াশঁ বলে ওঠে, এই-যে, আইনের 'ডক্টর' আমাদের মাননীয় মার্কি দ রাস্তিঞাক এসে গেছেন! আরে, আপনারা আসুন সব—আসুন!

মাদমোয়াজেল মিশোনো তখন ঘরে ঢুকে নীরবে মাথা নেড়ে পরিহাসোচ্ছল সঙ্গীদের সম্ভাষণ জানিয়ে মহিলা তিনটির পাশে নিজের আসনে বসে পড়েন। মুখে একটি কথাও বললেন না।

—বুড়ো বাদুরটাকে দেখলে আমার গা ঘিন ঘিন্ করে! মাদমোয়াজেল মিশোনোর দিকে ইশারা করে চাপা গলায় ভোতর‍্যাকে বলে বিয়াশঁ। —ভেবে দেখুন, মস্তিকতত্ত্ববিদ্যা এখন পড়তে হচ্ছে আমাকে···ওকে দেখলে মনে হয়, মাথার খুলিটা যেন জুদাসের মত নিরেট।

—বটে, মঁশিয়ের সঙ্গে হু'একবার দেখা-সাক্ষাতের সুযোগ ঘটেছে নাকি? ভোতর‍্যা জিজ্ঞাসা করে।

—কার সঙ্গে হয়নি? পালটা জবাব দেয় বিয়াশঁ।—কড়ির মধ্যে লম্বামত এক রকম পোকা থাকে দেখেছেন? আস্তে আস্তে কড়ি কেটে তেলকাটা তারা ঝাঁঝরা করে দেয়। হলপ করে বলতে পারি, বিদঘুটে সাদা ঐ কুমারী বুড়ীকে দেখলেই আমার সেই পোকার কথা মনে পড়ে।

—ঠিকই বলেছ ছোকরা! গোঁফের মধ্যে আঙুল গলিয়ে দিয়ে চল্লিশ বছরের লোকটি বলে ওঠে।—গোলাপ হে—গোলাপ! গোলাপের মতই ওর জৌলুস, ভোরের দিকে মাত্র ঘণ্টা তিনেক।

ক্রিস্তফ সসম্ভ্রমে স্যুপ্ নিয়ে ঘরে ঢুকতেই পোয়ারে বলে ওঠে, আরে! কি চমৎকার স্যুপোরামা এসে গেছে দেখ।

—মাফ করবেন মশাই, ওটা বাঁধাকফির ঝোল। মাদাম ভোকে জানিয়ে দেন।

যুবকদের মধ্যে অমনিই হাসির হররা পড়ে যায়।

—তোমাকেই ডিসে করে এনেছে পোয়ারে!

—পোয়ারেৎকে পরিবেশন করছে!

—মাদাম ভোকে জিতলেন হু'পয়েন্ট! ভোতর‍্যা বলে।

—আজ সকালের কুয়াশাটা লক্ষ্য করেছেন কেউ? যাদুঘরের কর্মচারিটি জিজ্ঞাসা করে।

—বেধড়ক কুয়াশা। বিয়াশঁ বলে।—এমন কুয়াশা দেখা যায় না। যেমন বিদঘুটে তেমনি বিষণ্ণ! রঙটা ঠিক কড়াইর মত সবুজ—দম যেন আটকে আসে! অবিকল গোরিওর মত।

—অবিকল গোরিওরামা। তরুণ চিত্রকর বলে।—মাথামুণ্ড কিচ্ছু বোঝার উপায় নাই।

—লর্ড গাওরিয়ৎ, এবার আপনার পালা, বুঝলেন?

ক্রিস্তফ যে দরজা দিয়ে খাবার নিয়ে আসে তারই কাছাকাছি টেবিলের এক প্রান্তে বসেছিল গোরিও—নাক দিয়ে শুঁকছিল তোয়ালে-ঢাকা রুটির টুকরোখানা। এ তার ব্যবসায়ী জীবনের পুরনো অভ্যাস। মাঝে মাঝে এ অভ্যাস চাগা দিয়ে ওঠে।

তাই দেখে চামচ আর পিরিচের ঠুন্‌ঠান্‌ আর লোকজনের কলগুঞ্জন ছাপিয়ে মাদাম ভোকে সোচ্চারে বলে ওঠেন, আচ্ছা, রুটিটা কি খারাপ?

—ঠিক তার উলটো মাদাম! এ তো এতাঁপ ময়দায় তৈরী—চমৎকার জিনিস।

—কি করে বুঝলেন? ওজেন জিজ্ঞাসা করে।

—সাদা রঙ দেখে—খোশবায় থেকে!

—শুঁকছিলেন বলেই গন্ধের, কথা বলতে পারলেন বুঝি! মাদাম ভোকে বলে ওঠেন।—আজকাল যা মিতব্যয়ী হয়েছেন তাতে রান্নাঘরের পুষ্টিকর গন্ধ শুঁকে আর বেশীদিন বাঁচতে হবে না।

—তৈরী করার নিয়মটা তাহলে পেটেণ্ট করে ফেলুন! চট করে বড়লোক হয়ে যাবেন!· যাদুঘরের কর্মচারীটি পরামর্শ দেয়।

—ওর কথায় কান দেবেন না। ও আমাদের বুঝিয়ে দিতে চায় যে এককালে সেমুই ব্যবসায়ী ছিল। চিত্রকর বলে'।

—ওর নাকটা তাহলে কি গম পরীক্ষার যন্ত্র নাকি? যাদুঘরের কর্মচারীটি জিজ্ঞাসা করে।

—গম পরীক্ষার কি বললেন? বিয়াশঁ জানতে চায়।

অমনিই টেবিলের চারপাশ থেকে একসঙ্গে 'কর্ণ' শব্দ নিয়ে অর্থহীন ও অর্থসূচক আটটি জবাব বুলেটের মত বর্ষিত হয়। এ সব রসিকতা বুড়ো গোরিওর কাছে দুর্বোধ্য বিদেশী ভাষার মত লাগে। বিস্ময়-বিমূঢ় দৃষ্টিতে সে আর সকলের দিকে তাকায়। তাই দেখে রঙ্গ-রসেমত্ত সঙ্গীরা অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে।

এরা কি বলছে ভোতর‍্যাকে জিজ্ঞাসা করে বৃদ্ধ। ভোতর‍্যাও রসিকতা

করে তার মাথায় একটা ঠোক্কর দিয়ে বলে, তোমার পায়ের কড়ার কথা বলছে, হাঁদা বুড়ো কাঁহাকার!

ভোতর্‍্যাঁর ঠোক্করে বৃদ্ধের টুপিটা কপালের উপর ঝুলে পড়ে। এই আকস্মিক বদ-রসিকতায় হতবাক হয়ে যায় বেচারি। নিশ্চল হয়ে রইল মিনিট কয়েক। ঝোল খাওয়া শেষ হয়েছে মনে করে ক্রিস্তফ তার প্লেটটা নিয়ে যায়। কাজেই টুপিটা ঠিক করে দিয়ে বৃদ্ধ আবার যখন চামচ ব্যবহার করতে যায়, চামচটা তখন টেবিলের ওপর লাগে। হো-হো করে হেসে ওঠে ভাড়াটেরা।

—বেয়াড়া ভাঁড় কোথাকার! বৃদ্ধ বলে ওঠে। —ফের যদি কখনও আমার সঙ্গে ইয়ার্কি করতে আসেন তো…

—কি তাহলে হবে বাবা? বাধা দিয়ে জিজ্ঞাসা করে ভোতর্‍্যাঁ।

—তাহলে…তাহলে একদিন এর জন্য আচ্ছা শাস্তি পেতে হবে।

—নরকে? চিত্রকর জিজ্ঞাসা করে। —বেয়াড়া ছেলেদের যে ছোট অন্ধকার খুপরির মধ্যে রাখা হয়, তার কথা বলছেন কি?

ভোতর্‍্যাঁ তখন ভিকতরিনকে লক্ষ্য করে বলে, আচ্ছা মাদমোয়াজেল, তুমি কিছু খেলে না তো! বাবা বুঝি কিছুতেই নরম হলেন না?

—আর বলবেন না, অতি জঘন্য লোক! মাদাম কুতুর্য বলেন।

—লোকটাকে তাহলে সমঝে দিতে হবে তো! ভোতর্‍্যাঁ বলে।

বিয়াশঁর পাশে বসেছিল রাস্তিঞাক। সে বলে ওঠে, মাদমোয়াজেল ভিকতরিনের যখন খাওয়া-পরার টানাটানি, উনি তখন তো খোরপোষের মামলা করতে পারেন! আরে, বুড়ো গোরিও ওর দিকে কেমন একদৃষ্টে চেয়ে অছে ছাখ না!

বাপকে ভালবাসে মেয়েটি। অথচ সে ওকে ত্যাজ্য কন্যা করেছে। সুস্পষ্ট বেদনার ছবি ফুটে উঠেছে কিশোরীর মুখে। অনাথা এই মেয়েটির দিকে চেয়ে খেতে ভুলে যায় বুড়ো গোরিও।

ওজেন তখন চাপা গলায় বলে, বুড়ো গোরিও সম্পর্কে আমরা ভুল ধারণা করেছি। লোকটা অক্ষমও নয়—হৃদয়হীন নির্বোধও নয়। তোর মস্তিষ্ক তত্ত্ববিদ্যা প্রয়োগ করে বল তো ওকে কি বলে মনে হয়? কাল রাতে আমি ওকে মোমের মত করে একটা রূপোর রেকাব ভাঙতে দেখেছি। ওর

আজকের মুখভঙ্গী অস্বাভাবিক দরদী। লোকটার জীবন এত রহস্যময় যে সে-সম্পর্কে খোঁজ-খবর নেবার কৌতূহল হওয়া উচিত। না বিয়াশ, হাসিস্ না! আমি পরিহাস করছিনে।

—চিকিৎসা শাস্ত্রের দিক থেকে লোকটার সম্পর্কে কৌতূহল জাগে বটে! এ তুই ঠিকই বলেছিস্। বিজ্ঞোচিতভাবে বলে বিয়াশ।—যদি রাজী হয় তো আমি ওকে কেটে-কুটে পরীক্ষা করতে পারি।

—না হে, মাথাটার দিকে চেয়ে ছ্যাখ না!

—তা বটে, ঠিকই বলেছিস! লোকটার হাঁদা ভাব দেখে কৌতূহল জাগে বটে!

* * * *

পরদিন চোস্ত পোশাক পরে বেলা প্রায় তিনটের সময় মাদাম দ রেস্তোর সঙ্গে দেখা করতে যায় ওজেন। যাবার পথে মনে মনে পাগলের মত চটপট বহু স্বপ্নসৌধ তৈরী করে। এই কল্পনাবিলাসই তো তরুণ মনে বিচিত্র বর্ণরাগ, অফুরন্ত ভাবাবেগ সঞ্চার করে। এই সব চিন্তায় মগ্ন থাকার সময় কোন বাধা, কোন বিঘ্নের কথা এদের মনে জাগে না। সমস্ত প্রচেষ্টাই সাফল্য লাভ করবে বলে মনে হয়। নিছক কল্পনার এই খেলা এদের জীবন মধুর রোমাঞ্চময় করে তোলে। আবার বিকারগ্রস্ত কল্পলোকের বাইরে যে জীবনের অস্তিত্ব ছিল না, তাতে ব্যর্থতা দেখা দিলে হতাশ্বাস আর মনমরা বিষাদে মুহ্যমান হয়ে পড়ে। এরা যদি অনভিজ্ঞ কি লাজুক না হত তো সামাজিক জীবন অচল অসম্ভব হয়ে পড়ত।

কাদা ছিটে যাতে গায়ে না লাগে সেদিকে হাজারো সতর্কতা নিয়ে পথ চলে ওজেন। কিন্তু মনটা তখন একটি জিনিসের দিকে নিবদ্ধ। কি বলবে মাদাম দ রেস্তোকে? মনে মনে সে বেশ কয়েকটি রসাল সপ্রতিভ জবাব জমা করে রাখে। কাল্পনিক মন্তব্যের প্রত্যুত্তরে গুটিকয়েক ধারাল ঝকঝকে উত্তর আবিষ্কার করে। আর নিজের ভবিষ্যতের সুরাহা হতে পারে এমন কাল্পনিক অবস্থার আভাসেও যাতে যথার্থ জবাব মুখে আসে তার জন্য তালের‍াঁর ছাঁদে চোস্ত ভাষা বলার জন্য আগে থেকেই নিজেকে তালিম দেয়। এই অন্যমনস্কতায় কাদা-লাগা এড়ান গেল না। বেচারিকে তাই বাধ্য হয়ে পালে রোয়াইয়ালে ঢুকে জুতো পালিশ আর ব্রিচেজ বুরুশ করে নিতে হয়।

প্রয়োজনে লাগাতে পারে এই মনে করে সে একটি পাঁচ ফ্রাঁ মুদ্রা নিয়ে

এসেছিল। সেটি দেবার সময় মনে মনে ভাবে, যদি বড়লোক হতাম তো গাড়ি করে যেতে পারতাম—গাড়িতে বসে বসেই খেয়ালখুশিমত চিন্তা ভাবনা করা যেত।

অবশেষে সে রুয় দ হেদের পৌঁছোয়। দেখা করতে চায় কঁতেস দ রেস্তোর সঙ্গে। কোন গাড়ি আসার শব্দ না শুনে এবং পায়ে হেঁটে তাকে উঠোন পার হতে দেখে অনুচরেরা ঘৃণাভরা দৃষ্টিতে তার দিকে তাকায়। কিন্তু মনে মনে ভবিষ্যৎ সাফল্য সম্পর্কে কৃতনিশ্চয় হয়ে নীরব ক্ষোভে সে এই অবজ্ঞা-ভরা চাহনি উপেক্ষা করে। অনুচরদের বিস্মিত স্থিরদৃষ্টি সম্পর্কে সে অতিমাত্রায় সচেতন ছিল। কারণ, উঠোনে ঢোকাবার মুখে জৌলুসভরা অপব্যয়ী বিলাসী জীবনের প্রতীক ঝকঝকে একখানা জুড়ি গাড়ি আর দামী বেশবাসপরা তেজীয়ান একটা ঘোড়া দেখে নিজের মনে সে হীনমন্যতার বেদনা অনুভব করে। এ দুটি থেকেই তো বোঝা যায়, পারির জীবনের যাবতীয় কাম্যবস্তু এদের করায়ত্ত। অমনিই ছাত্রটির খোশমেজাজী ভাব উপে যায়। এতক্ষণ তার মস্তিষ্কের কপাটখোলা প্রকোষ্ঠে বুদ্ধির খেলা চলছিল। সে কপাট সহসা বন্ধ হয়ে যায়। মনটা কেমন শূন্য লাগে। খানসামা কঁতেসকে তার আসার সংবাদ জানাতে চলে যায়। ছাত্রটি পাশের একটা ঘরে জানালার উপর কনুই দিয়ে ভর করে একপায়ে শূন্যদৃষ্টিতে বাইরে চেয়ে জবাবের প্রতীক্ষা করে। মিনিটের পর মিনিট চলে যায়। দখনে লোকের মত উদ্দেশ্যের একাগ্রতা যদি না থাকত তো সে চলেই যেত হয়ত বা। চোখের সামনে সোজা রাস্তা দেখলে এই একাগ্র দৃঢ়তার বলেই তো দখনে লোক অসাধ্য সাধন করে বসে।

চাকরটি ফিরে এসে বলে, মাদাম তার নিভৃত কক্ষে রয়েছেন স্যর—বড্ড ব্যস্ত! আপনি বৈঠকখানায় আসুন না স্যর, আর একজনও রয়েছেন সেখানে।

সঙ্গে সঙ্গে চাকর-বাকরদের মারাত্মক ক্ষমতার কথা সবিস্ময়ে উপলব্ধি করে ছাত্রটি। এক কথায় এরা মনিবের অপবাদ কি কুৎসা রটনা করতে পারে। তারপর এ বাড়ীর সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের কথা খানসামাকে বুঝিয়ে দেবার উদ্দেশ্যে চাকরটি যে দরজা দিয়ে এসেছিল নিজের হাতে সেই কপাট খুলে ফেলে রাস্তিঞ্যাক। কিন্তু ভুল করে সে প্রদীপ, ড্রেসার আর স্নানের তোয়ালে গরম করার পাইপ ভরতি একটি প্রকোষ্ঠের মধ্যে ঢুকে পড়ে। এ ঘরের

ওপাশে আবছা কালো একটি পথ। তার ওধারে হয়ত অন্দরমহলের সিঁড়ি। পেছনের ঘরে চাপা হাসি শুনে সে নিজের চরম বেকুবি উপলব্ধি করে।

কপট শ্রদ্ধার ভাব দেখিয়ে খানাসামাটি বলে, এইটে বৈঠকখানায় যাবার পথ স্তর! এ কপট শ্রদ্ধা বিদ্রূপের সামিল।

এমন হুট্‌হাট্‌ করে ওজেন পেছন হটে যায় যে একটা স্নানের টবে হোঁচট খায়। সৌভাগ্যবশত টুপিটা ধরেছিল বলে সেটা আর স্নান করল না। এই সময় ক্ষীণ প্রদীপের আলোয় দেখা গেল যে দীর্ঘ পথটির অপরপ্রান্তে একখানা কপাট খুলে গেল। সঙ্গে সঙ্গে সে মাদাম দ রেস্তো আর বুড়ো গোরিওর গলা শোনে, আর কানে আসে একটি চুমুর শব্দ। সে খাবার ঘরে ফিরে আসে এবং খানসামার পেছু পেছু সেই ঘর অতিক্রম করে অভ্যর্থনা গৃহে প্রবেশ করে। এই ঘর থেকে উঠোন দেখা যায়। ব্যাপারটা নজরে পড়তেই ছুটে সে জানলার কাছে যায়। কেননা সে ভাল করে দেখতে চায়, এই গোরিও তাদের সেই বুড়ো গোরিও কিনা! বুকের মধ্যে সহসা কেমন ধড়াস্ ধড়াস্ করে ওঠে। মনে পড়ে ভোতর‍্যাঁর বীভৎস অনুমানের কথা। ওদের জন্য বিশাল বৈঠকখানার দোর গোড়ায় অপেক্ষা করছিল খানসামাটি। সৌখিন এক যুবক তখন বৈঠকখানার দরজায় এসে অধীরভাবে বলে, আমি যাচ্ছি মরিশ। মাদাম দ কঁতেসকে বলো, আধ ঘন্টার উপর আমি তার জন্য অপেক্ষা করেছিলাম।

নিঃসন্দেহে বোঝা যায়, শালীনতার পরোয়া না করার অধিকার ছিল এই উদ্ধত যুবকের। ইতালীয় একটা সুর গুণ গুণ করে ভাঁজতে ভাজতে সে জানলার কাছে এগিয়ে আসে। উদ্দেশ্য, ওজনের মুখখানা আর উঠোনটা একই সঙ্গে দেখে নেবে।

—মঁশিয় দ কঁৎ আর একটু অপেক্ষাকরলেই পারতেন। মাদামের কাজ হয়ে গেছে। পাশের ঘরে যেতে যেতে মরিশ বলে।

ঠিক সেই সময়ে সিড়ির সামনের কপাট খুলে গাড়ি ঢোকার পথের মুখোমুখি উঠোনে বেরোয় গোরিও। ছাতিটি বুড়োর সঙ্গেই ছিল। সেটি খোলার সময় লক্ষ্য করেনি যে একখানা টিলবারি (এক ধরনের শকট) ঢোকার জন্য সদর ফটক খুলে দেওয়া হয়েছে। জমকাল পোশাকপরা এক যুবক চালাচ্ছিল গাড়িখানি। আর একটু হলেই বুড়ো গাড়িচাপা পড়ত। কোনমতে পেছু হটে সামলে যায়। ছাতির রেশমী কাপড় দেখে ঘোড়াটা ভড়কে যায়

এবং সিঁড়ির সামনে হুড়হুড় করে এগিয়ে যাবার আগে চিঁহিঁহি করে ওঠে। যুবক ক্ষুব্ধভাবে ঘাড় ফেরায়। তাকায় বুড়ো গোরিওর দিকে। এবং লাফিয়ে নামবার আগে নেহাৎ সৌজন্যের খাতিরে সসংকোচে অভিবাদন করে বৃদ্ধকে।

মহাজনদের কাছে হাত পাতবার প্রয়োজন থাকলেই লোকে এইভাবে তাদের অভিবাদন করে থাকে। কিংবা একে কুখ্যাত কলঙ্কিত লোকের প্রতি নিছক লৌকিক সম্ভাষণও বলা যেতে পারে। পরে অবিশ্যি এজন্য লজ্জা হয়। অকপট সহৃদয়তায় হাত নেড়ে প্রত্যাভিবাদন জানায় গোরিও। বিদ্যুৎগতিতে এইসব ঘটনা ঘটে যায়। অনন্যমনা হয়ে লক্ষ্য করছিল ওজেন। পেছনে যে লোক দাঁড়ান ছিল সে খেয়ালও ছিল না। সহসা কঁতেসের গলা কানে আসে।

—তুমি চলে যাচ্ছ মাকসিম? তিরস্কারের সুরে বলেন। খানিকটা ক্ষোভের আভাসও ছিল তার মধ্যে!

কঁতেসও টের পাননি যে টিলবারি এসেছে। আচমকা পেছন ঘুরে তাকে দেখতে পায় রাস্তিঞ্যাক। গেরো দেওয়া গোলাপী ফিতে লাগান মিহি সাদা পশমী পোশাক পরেছে মহিলাটি। বড় লোভনীয় দেখাচ্ছে। পারির সৌখিন মহিলাদের প্রভাতী কেশ-বিন্যাসের রীতি অনুযায়ী তার চুল এলোভাবে আঁচড়ান। প্রসাধনের সুবাসে ভুর ভুর করছে বৈঠকখানা। সদ্য স্নান সেরে এসেছে সম্ভবত। রূপের ছটা তাই যেন এমন কমনীয়, এত মনমাতানো মদিরাভরা লাগছে। চোখে তরল চপলতার ঝিকিমিকি। যুবকের চোখে সবই ধরা পড়ে। গাছ-গাছালি যেমন অদৃশ্য বায়ুমণ্ডল থেকে অনায়াসে প্রাণরস আহরণ করে নেয়, ঠিক তেমনি ভাবেই যুবকেরা আপনা থেকে নারীর রূপের ছটা উপলব্ধি করতে পারে। তাই, চপল কঁতেসের সুষমা অনুভব করার জন্য ওজেনের পক্ষে করমর্দনেরও প্রয়োজন হল না। মিহি পোশাকের অন্তরাল থেকে তার গোলাপী রঙের আভা ঝিকমিক করছে। গাউনের গলার কাছের ভাঁজকটি নুইয়ে পড়ে মাঝে মাঝে নগ্ন গলা অবারিত হচ্ছে। ওজেনের অপলক দৃষ্টি ওই ভাঁজ কটির কাছেই বাঁধা পড়েছে যেন। কাঁচুলির সাহায্য নেবার আবশ্যক তার ছিল না। ঋজু কটিদেশ শুধু পোশাকের কোমর-বন্ধনীতেই উদ্ঘাটিত। মহিলাটির কাঁধে পুষ্পধনুর আমন্ত্রণ—চটি-পরা সুডোল পা দু'খানি অনবদ্য। চুমু খাবার জন্য

মাক্‌সিম যখন তার করস্পর্শ করে, ওজেন তাকায় মাকসিমের দিকে আর কঁতেস চান ওজেনের দিকে।

—ও, আপনি এসেছেন মঁসিয় দ রাস্তিঞাক! বড় খুসী হলাম! হুকুম করতে অভ্যস্ত লোকের মতই কথাটা বলা হল। কিন্তু বিচক্ষণ লোক নীরবে এই প্রভুত্ব মেনে নেয়।

ওজেনের দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে কঁতেসের দিকে চায় মাক্‌সিম। তার সে চাহনির আভাসে সুস্পষ্ট ধরা পড়ে যে তার মতে, কোন ঝামেলা না করে এই অবাঞ্ছিত লোকটির এখুনি বেরিয়ে যাওয়া উচিত। কঁতেস যাকে মাকসিম বলে ডেকেছেন, বিনয়নম্র ইংগিতময় দৃষ্টিতে যার মুখ এখন তিনি লক্ষ্য করছিলেন এবং সেই সংকোচভরা চাহনির মধ্য দিয়ে নিজের অজ্ঞাতে নারী হৃদয়ের গোপন কথা ধরা দিচ্ছিলেন, সেই গর্বোদ্ধত যুবকের চাহনির সহজ সুস্পষ্ট অর্থ: আচ্ছা প্রেয়সী, যে কোন অছিলায় এই অবাঞ্ছিত যুবককে বাইরে পাঠাবার অনুগ্রহটুকু করবে না কি? মনে মনে যুবকটির প্রতি বেদম ঘৃণা হয় রাস্তিঞাকের। প্রথমত, মাকসিমের সুন্দর সুবিন্যস্ত সযত্নে কোঁকড়ান চুলের বাহার থেকেই আন্দাজ করা যায় কতটা বেপরোয়া সে। তার উপর মাকসিমের বুট যেমন ভাল চামড়ায় তৈরী তেমন চকচকে। আর হেঁটে আসার সময় শত যত্ন সত্ত্বেও ওজেনের বুটে যে কাদা লেগেছিল, তার ক্ষীণ আবছা দাগ এখনও আছে। তাছাড়া ওভারকোটটিতে মাক্‌সিমকে এমন অপূর্ব মানিয়েছে যে তাকে মহিলাদের মত দেখাচ্ছে বলা চলে। এদিকে বেলা ছুটোর সময়েও রাস্তিঞাকের গায়ে একটা কালো কোট মাত্র। শাঁরেতের এই স্পর্শকাতর যুবক মর্মে মর্মে উপলব্ধি করে যে, প্রণয়ের ভান করে অবলা মেয়েদের নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে অভ্যস্ত স্বচ্ছ চোখ আর পাণ্ডুর মুখের এই লম্বা ছিপছিপে চেহারার চালবাজ সৌখিন বাবুর তুলনায় সে বেশ খানিকটা অসুবিধাগ্রস্থ।

ওজেনের জবাবের প্রতীক্ষা না করেই মাদাম দ রেস্তো লঘু পায়ে চটপট পাশের আর একটা বৈঠকখানায় চলে যান। চলার ভঙ্গী দেখে ভ্রম হয় যেন উড়ে গেলেন। ঢিলে গাউনের ঘাঘড়ার তরঙ্গায়িত ছন্দ আর খস্‌খস্‌ শব্দে প্রজাপতির মত দেখাল তাকে।

মাকসিমও তার অনুগমন করে। ক্ষিপ্ত ওজেনও যায় কঁতেস আর মাক্‌সিমের পেছু পেছু। কাজেই তিন জনেই আবার লম্বা বৈঠকখানার মাঝামাঝি অগ্নিকুণ্ডের কাছে একসাথ হয়। ছাত্রটি বেশ জানত যে মাকসিমকে সে

উত্যক্ত করছে। তবু মাদাম দ রেস্তোর বিরাগভাজন হবার ঝুঁকি নিয়ে ইচ্ছে করেই এ কাজ সে করে। সহসা মনে পড়ে, এই যুবককে সে মাদাম দ বোসেয়াঁর বল-নাচের আসরে দেখেছে। কাজেই মাদাম দ রেস্তোর সঙ্গে এর সম্পর্ক অনুমান করতে বিলম্ব হল না। যুবকদের জিদ যদি মারাত্মক ভুল না করে তো অনিবার্য বিস্ময়কর সাফল্য অর্জন করে। তেমনি দৃপ্ত ঔদ্ধত্য নিয়েই মনে মনে ভাবে ওজেন, লোকটা আমার প্রতিদ্বন্দ্বী, আজকেই একটা হেস্তনেস্ত না করে ছাড়ব না।

কি অদ্ভুত বেপরোয়া! ঘুণাক্ষরেও সে জানত না যে অপমান করার সুযোগ দিয়ে পয়লা গুলিতে প্রতিদ্বন্দ্বীকে খতম করাই কঁৎ মাকসিম দ ত্রাই-এর রীতি। স্পোর্টসম্যান হিসাবে সুনাম ওজেনরও ছিল। তার গুলি ছোঁড়ার হাতও ভাল। কিন্তু বাইশটা মাটির পায়রার মধ্যে বিশটার লক্ষ্যভেদ করার মত পারদর্শিতা ওজেনের ছিল না।

আগুনের পাশে নীচু একটা চেয়ারে বসে কঁৎ চিমটে জোড়া তুলে নিয়ে এমন ক্ষুব্ধভাবে জোরে জোরে আগুনে খোঁচা মারতে থাকে যে আনাস্তাজির মুখে বিরক্তির ভাব ফুটে বেরোয়। যুবক তখন ওজেনের দিকে রূঢ় জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকায়। তার অর্থ, এখনও যাচ্ছ না কেন? অভিজাত সমাজে ঐ চাহনি বিদায় সম্ভাষণ বলেই অভিহিত হয়।

ওজেন তখন অতি মধুর ব্যঞ্জনাময় ভঙ্গীতে বলে ওঠে, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আপনার সঙ্গে দেখা করার জন্য আমি উৎসুক হয়ে পড়েছিলাম মাদাম! কারণ···। কথা শেষ না করেই আচমকা সে থেমে যায়। ·· খানা কপাট খুলে গেল। যে ভদ্রলোক টিলবারি চালিয়ে এসেছিলেন, সহসা তিনি খালি মাথায় ঘরের মধ্যে ঢোকেন। কঁতেসকে কোন সম্ভাষণ তিনি করলেন না। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ওজেনের দিকে চেয়ে মাক্‌সিমের দিকে হাত বাড়িয়ে বলে ওঠেন, কেমন আছেন? এমন আন্তরিকভাবে লোকটা করমর্দন করল যে ওজেন অবাক হয়ে গেল। তিনজনের অংশীদারীত্বের জীবন যে কত মধুময় হতে পারে, গ্রামের অনভিজ্ঞ যুবক তার কি জানে?

—মঁশিয় দ রেস্তো! স্বামীর দিকে হাত বাড়িয়ে ছাত্রটিকে বলেন কঁতেস।

অমনি মাথা নত করে সসম্ভ্রম অভিবাদন জানায় ওজেন।

কঁৎ দ রেস্তোর সঙ্গে রাস্তিঞাকের পরিচয় করিয়ে দিতে গিয়ে মহিলাটি বলেন, এ ভদ্রলোকের নাম মঁশিয় দ রাস্তিঞাক—মার্সিয়াকদের সূত্রে মাদাম দ্য

ভিকঁতেস দ বোসেয়ঁার আত্মীয়। মাদাম দ বোসেয়ঁার গত বল-নাচের আসরে এর সঙ্গে পরিচয় হল।

বিশিষ্ট লোক ছাড়া কারও সঙ্গে যে তিনি মেলামেশা করেন না, একথা সগর্বে বুঝিয়ে দিতে চাইলেও 'মার্সিয়াকদের সূত্রে মাদাম লা ভিকঁতেস দ বোসেয়ঁার আত্মীয় এই' কথাকটির উপর তিনি বিন্দুমাত্র জোর দিলেন না। তবু কথাকটি ভেলকির কাজ করে। কঁতে'র দরদহীন রূঢ় লৌকিকতার ভঙ্গী নরম হয়। ছাত্রটিকে তিনি প্রত্যভিবাদন জানালেন। বললেন, আপনার পরিচয় লাভের সুযোগ পেয়ে খুশি হলাম।

কঁৎ মাক্সিম দ ত্রাই-ও এই সময় অস্বস্তিভরে পলকের জন্য তাকায় ওজেনের দিকে। তার উদ্ধতভাবও সহসা যেন মোলায়েম হয়ে আসে।

একটি মাত্র নাম যাদুদণ্ডের কাজ করল। এই ভাবান্তর দখনে যুবকের মস্তিষ্কে কমপক্ষে ত্রিশটি খুপরির অর্গল খুলে দেয়; আবার ফিরিয়ে দেয় তার সযত্নসঞ্চিত বুদ্ধির ঝাঁপি। পারির সৌখিন সমাজের পঙ্কিল আবহাওয়ায় সহসা যেন তীব্র এক আলোর উদ্ভাস দেখা দেয়। এ আলোর ঝলকানি অচঞ্চল হলেও স্তিমিত। তবু দেখতে পাচ্ছে ওজেন। মেজঁ ভোকে আর বুড়ো গোরিও তখন তার কল্পনা থেকে বহুদূরে সরে গেছে।

—আমি ভেবেছিলাম, মার্সিয়াক বংশ লোপ পেয়েছে। ওজেনকে লক্ষ্য করে বলেন কঁৎ দ রেস্তো।

—বলতে পারেন! আইনের ছাত্রটি বলে ওঠে।—আমার জ্যেঠামশাই শাভ লিয়ে দ রাস্তিঞাক মার্সিয়াক বংশের একমাত্র উত্তরাধিকারিণীকে বিয়ে করেছিলেন। একটি মাত্র মেয়ে হয় তাদের। সে আবার মারেশাল দ ক্লারঁ্যা বোকে বিয়ে করে। ইনি আবার মাদাম দ বোসেয়ঁার মাতামহ। আমরা সেই পরিবারের ছোট তরফ। জ্যেঠামশাই ভাইস এডমিরাল ছিলেন। রাজা যদি সর্বস্বান্ত না হতেন তো আমরা এতটা হীনাবস্থায় পড়তাম না। কোঁপাঞি দেজঁ্যাদ (ভারতীয় কোম্পানী) উঠে গেলে বিপ্লবের সময়কার গবর্ণমেন্ট আমাদের দাবী মেনে নিতে অস্বীকার করে।

—১৭৮৯ সালের আগে আপনার জ্যেঠামশাই ভাঁজোর জাহাজের কমাণ্ডার ছিলেন না?

—হ্যাঁ, ছিলেন।

—তাহলে নিশ্চয়ি আমার পিতামহকে চিনতেন—ওয়ারউইক জাহাজের কমাণ্ডার ছিলেন তিনি।

মাক্‌সিম এই সময় ঈষৎ কাধ ঝাঁকানি দিয়ে মাদাম দ রেন্তোর দিকে এমন ভাবে চায় যার পষ্ট অর্থ : উনি যদি এখন জাহাজ·নিয়ে ওর সঙ্গে আলোচনা শুরু করেন তাহলেই গেছি। আনাস্তাজি তার ভাব বুঝতে পারে। মহিলাদের জন্মগত বিস্ময়কর উপস্থিতবুদ্ধি নিয়ে হেসে সে বলে, এস মাক্‌সিম, তোমার সঙ্গে দু'চারটে কথা আছে। তোমাদের দুজনকে আমরা রেহাই দিয়ে যাচ্ছি—যত খুশি ওয়ারউইক আর ভাঁজোর নিয়ে গল্প কর।

উঠে দাঁড়িয়ে সে কপট ষড়যন্ত্রের ভঙ্গীতে মাক্‌সিমকে ইশারা করে। মাদামের পেছু পেছু তার নিভৃত কক্ষের দিকে এগোয় মাকসিম। প্রণয়ীযুগল দরজা অবধি যেতে না যেতেই ওজেনের সঙ্গে কথা বন্ধ করেন কঁৎ। খিটখিটে মেজাজে ডেকে বলেন, যেও না আনাস্তাজি! ভালমতই তুমি জান যে·····

—আসছি—এখুনি আসব! তাকে বাধা দিয়ে বলে ওঠে মহিলাটি।—মাকসিমকে দিয়ে আমার একটু দরকার আছে, কাজের কথাটা বলে এখুনি আসছি।

প্রণয়ীযুগল এদের বলা চলে না। ঠিক প্রণয়ী এরা নয়। এক অর্থে দম্পতি। জার্মান ভাষায় একটি শব্দ আছে যার কোন প্রতিশব্দ আমাদের ভাষায় নেই। মোদ্দাকথায় তার অর্থ অসম-বিবাহ। মেয়েটি নিজের ঘরেই থাকে আর তার সন্তান-সন্ততিও বাপের উপাধি, মর্যাদা বা সম্পত্তির উত্তরাধিকার পায় না। স্বামী বর্তমানেও গান্ধর্ব সূত্রে এই ধরণের দম্পতি মাকসিম আর আনাস্তাজি।

সামান্য পরেই ফেরেন মাদাম। নিজেদের গরজে সমস্ত স্বেচ্ছাচারিণী নারীই বাধ্য হয়ে স্বামীর প্রকৃতি অনুধাবন করে। এবং অচিরেই বুঝে নেয় যে বিশ্বাস বিপন্ন না করে কতটা এগোন চলে। আর সংসারের খুটিনাটি বিষয় নিয়ে কখনও এরা ঝগড়া করে না। কঁতের গলার আওয়াজ শুনেই কঁতেস বুঝতে পারেন যে নিভৃত কক্ষে থাকা নিরাপদ নয়। ওজেনই এই অপ্রীতিকর অবস্থার হেতু। রাস্তিঞ্যাকের দিকে চোখের ইশারা করে বিরক্তভাবে মাকসিমের কাছে এই মনোভাব প্রকাশ করেন কঁতেস। মাকসিম তখন রুক্ষভাবে অপর তিনজনকে বলে, আচ্ছা, আপনারা তো ব্যস্ত আছেন দেখছি—আমি আর বিরক্ত করব না। আজকের মত যাচ্ছি! সঙ্গে সঙ্গেই সে রওনা হয়।

—যেও না মাকসিম! কঁৎ অনুরোধ জানায়।

—ডিনারের সময় এস কিন্তু! আবারও কঁৎ আর ওজেনকে ফেলে রেখে

মাকসিমের পেছু পেছু পয়লা বৈঠকখানায় যেতে যেতে বলেন কঁতেস। এখানে তারা এতক্ষণ থাকে যে ছাত্রটি ইতিমধ্যে চলে গেছে বলেই মনে হয়।

মাঝে মাঝে রাস্তিঞাকের কানে এদের উচ্ছ্বসিত হাসির শব্দ আসে। কোন কিছু যখন শোনা যায় না তখন ও কথা বলছে মনে হয়। নাছোড়বান্দা ছাত্রটি কিন্তু নানা প্রসঙ্গের অবতারণা করে, তোষামোদ করে কঁৎকে আলোচনায় প্রবৃত্ত করে। কেননা মনে মনে সে আবারও কঁতেসের সঙ্গে দেখা করার সঙ্কল্প করেছে। আজকেই সে জেনে নিতে চায়, বুড়ো গোরিওর সঙ্গে কঁতেসের সম্পর্ক কি। মহিলাটি তার কাছে সম্পূর্ণ রহস্যময়ী বলে মনে হচ্ছে। পষ্টই বোঝা যায়, মাক্সিমের সঙ্গে ইনি প্রণয়াসক্তা, তবু স্বামীর উপর কর্তৃত্ব করে যাচ্ছেন; আর বুড়ো ব্যবসায়ীর সঙ্গেও যেন কি গোপন সম্বন্ধ সূত্রে আবদ্ধ। এ রহস্য সে ভেদ করতে চায়। আশা রাখে, পারি শহরের সৌখিন নারী সমাজের প্রতীক এই মহিলাটির উপর একদিন একছত্র আধিপত্য করবে।

কঁৎ আবারও ডাকেন, আনাস্তাজি!

—তাহলে এখন এস মাক্সিম, আজ আর আত্মসমর্পণ করা ছাড়া আমাদের উপায় নেই। আজ সন্ধ্যায়...

কঁতেস কথাটা শেষ করতে না করতেই যুবক তার কানে কানে ফিস ফিস করে বলে, আশা করি এই ছোকরার জন্য তোমার দোর বন্ধ থাকবে নাসি। এখুনি তোমার দিকে তাকাবার সময় ওর চোখ দুটো কয়লার মত জ্বলে উঠছে। বেশ বুঝতে পারছি, নিশ্চয়ই তোমার কাছে প্রেম নিবেদন করবে আর তুমিও আমায় ওকে খুন করতে বাধ্য করবে।

—তুমি কি পাগল হলে মাক্সিম? রসিকতা করে বলে কঁতেস।—বুঝতে পারছ না যে বিপজ্জনক হওয়া তো দূরের কথা, এ সব গোবেচারি ছাত্র চমৎকার বিজুলি তারের কাজ করে। বিশ্বাস কর, এমন অবস্থা আমি করব যাতে রেস্তো ঈর্ষায় পাগল হয়ে যায় ওর জন্য।

প্রাণখুলে হেসে বেরিয়ে যায় মাকসিম। কঁতেসও যায় পেছু পেছু। জানালায় দাঁড়িয়ে সে লক্ষ্য করে যে লাফ দিয়ে গাড়িতে চড়ে চাবুক ঘুরিয়ে সে কদমে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল। সদর ফটক বন্ধ হবার পরেই সে ফিরে আসে।

কঁতেস ফিরে এলে রেস্তো বলে ওঠেন, শুনেছ ডিয়ার, এ ভদ্রলোকদের এস্টেট নাকি শাঁরেতের পাড়ে ভেরতোই থেকে দূরে নয়। ওর জ্যেঠা আর আমার পিতামহের পরিচয় ছিল!

—পারস্পরিক পরিচয়ের সূত্র আছে শুনে মুগ্ধ হলাম। বিমনাভাবে বলে কঁতেস্।
—যা ভাবছেন তা ছাড়াও আছে। চাপা গলায় বলে ওজেন।
—তার মানে? পট করে জিজ্ঞাসা করেন কঁতেস।

ছাত্রটি বলে যায়, এখুনি এক ভদ্দরলোককে আপনার বাড়ী থেকে বেরুতে দেখলাম। একই বোর্ডিংয়ে আমার পাশাপাশি ঘরে থাকে বুড়ো গোরিও।

চিম্‌টে দিয়ে আগুন উল্‌টে দিচ্ছিলেন কঁৎ। বুড়ো বিশেষণ সহ এই নামোচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে চিমটেটা অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে ফেলে দিয়ে তিনি এমন ভাবে দাঁড়ান যেন আগুনে হাত পুড়িয়ে ফেলেছেন। বলেন, মঁশিয় গোরিও বললেই ভাল করতেন স্যর।

স্বামীর বিরক্তি দেখে কঁতেস প্রথম বিবর্ণা হয়ে যান। তারপর তার মুখ রাঙা হয়ে ওঠে—বেশ বিব্রত বোধ করছেন বোঝা যায়। খানিকটা অবাস্তব স্বস্তির ভঙ্গীতে গলার স্বর যথাসম্ভব স্বাভাবিক করে বলেন, আমাদের প্রিয় কোন লোককে চেনেন না নিশ্চয়ই……। কথাটা অসমাপ্ত রেখেই সহসা তিনি পিয়ানোর দিকে তাকান। মনে হয় যেন কোন্ আকস্মিক খেয়াল চেপেছে। বলেন, গান ভাল লাগে?

—খুউব! সঙ্কোচে মুখ রাঙা করে জবাব দেয় ওজেন। চট করে একটা চরম ভব্যতা-বিরোধী কাজ করে ফেলেছে বুঝতে পেরে বেশ লজ্জা হয়।

কঁতেস ইতিমধ্যে পিয়ানোটার কাছে গিয়ে সব কটা পরদার উপর আঙুল চালিয়ে চড়া গলায় জিজ্ঞাসা করেন, গাইতে পারেন?

—না, মাদাম!

কঁৎ দ রেস্তো এসময় ঘরের মধ্যে পায়চারি করছেন।

—জানলে কি ভালোই যে হত! না জেনে উদ্দেশ্য সিদ্ধির একটা সহজ উপায় থেকে বঞ্চিত হলেন।

কথা শেষ করেই কঁতেস গাইতে শুরু করেন: কা—রো, কা—রো, কা—আ—আ—রো, নঁ দু—বি—তা—রে!

বুড়ো গোরিওর নামোচ্চারণ করে নিজের অজ্ঞাতে আবার যাদুদণ্ড ঘোরাল ওজেন। কিন্তু মাদাম দ বোসেয়াঁর আত্মীয় কথাটি বলে যে প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছিল, এবারকার ফল হল তার চাইতে সম্পূর্ণ আলাদা। ঐতিহাসিক বিরল বস্তুর কোন সংগ্রাহকের গৃহে যদি অনুগ্রহ করে কাউকে ঢুকতে দেওয়া হয়, আর সে লোক যদি মূর্তি-ভরা কোন শো-কেসের উপর ধাক্কা খেয়ে তিন-

চারটে কোনমতে জোড়া দেওয়া মূর্তির মুণ্ড ফেলে দেয়, তাহলে তার যে অবস্থা হয়, ওজেনের অবস্থাও তেমনি হল। ভাবল, পৃথিবী দ্বিধা হয়ে তাকে গ্রাস করলে সে বেঁচে যায়! মাদাম দ রেস্তোর মুখ গম্ভীর ও কঠোর হয়ে পড়ে। দুর্ভাগা ছাত্রটির চোখ এড়িয়ে উদাসীন দৃষ্টিতে চাইছিল মহিলাটি।

ওজেন তখন বলে, আপনার হয়ত মঁশিয় দ রেস্তোর সঙ্গে কথা আছে, আপনার অনুমতি হলে আসি……

হাতের ইশারায় ওজেনকে বাধা দিয়ে অমনিই কঁতেস বলে ওঠেন, যখনই আসুন না কেন, জানবেন, আপনি এলে মঁশিয় দ রেস্তো আর আমি সুখীই হব।

কঁৎ ও কঁতেসকে সসম্ভ্রমে অভিবাদন জানিয়ে বেরিয়ে পড়ে ওজেন। তার নিষেধ সত্ত্বেও মঁশিয় দ রেস্তো তার পেছু পেছু পাশের ঘর অবধি আসেন এবং মরিশকে বলে দেন, যখনই এই ভদ্দরলোক আসবে, বলে দেবে কঁতেস বা আমি কেউই বাড়ী নেই।

সিঁড়িতে নেমেই ওজেন দেখল, বৃষ্টি পড়ছে। মনে মনে বলে, দুর ছাই, সব ভেস্তে দিলাম! নিজেই জানিনা কি করে, কতটা ক্ষতি করে ফেলেছি। এখন যাবে টুপি আর কোটটা। আমার মত লোকের পক্ষে ঘরের কোণে বসে আইন পড়া আর মফঃস্বলের হাকিম হবার কল্পনা করাই ভাল। সৌখিন সমাজে ঘোরাফেরা করতে গেলে যখন গুচ্ছের গাড়ি, পালিশ-করা বুট, সোনার চেন, সকাল বেলা হরিণীর চামড়ার সাদা দস্তানা এবং সন্ধ্যার দিকে হলদে দস্তানা না হলে চলে না, আমার মত লোকের পক্ষে তা কি করে সম্ভব? জাহান্নামে যাক বুড়ো গোরিও—ছোটলোক ইতর কাহাকার!

সদরের কাছে আসতেই ঘোড়াগাড়ির এক কোচোয়ানের সঙ্গে দেখা। এখুনি এক নব-বিবাহিত দম্পতিকে পৌছে দিয়ে এসেছে কোচোয়ানটি। ফেরার পথে মালিককে ফাঁকি দিয়ে মুফতে যদি কিছু উপরি আয় হয় তো মন্দ কি! তাই ছাতি-বিহীন, সাদা ওয়েষ্ট কোট, কালো কোট, হলদে দস্তানা আর চক্চকে বুট পরা ছাত্রটিকে দেখে সে আমন্ত্রণ জানায়। ওজেন তখন রাগে গজ গজ করছে। নিজের উপর এই ধরণের রাগের মাথায় যুবকেরা আরও বেশী করে অন্ধকারের গর্তে ঝাঁপ দেবার প্রেরণা বোধ করে। মনে ভাবে, তাতেই স্বস্তি পাওয়া যাবে বুঝি। পকেটে মাত্র তেইশ সো থাকলেও কোচোয়ানের ইংগিতে সে সম্মতি জানায় এবং কমলালেবুর মঞ্জরী আর রূপালী সুতো ছড়ান গাড়িতে চড়ে বসে। স্পষ্টই বোঝা যায়, এই গাড়ি করে বর-কনে গেছে।

অমনিই সাদা দস্তানা খুলে কোচোয়ানটি জিজ্ঞাসা করে, কোথায় যাব স্যর?
—যা থাকে কপালে! মনে মনে বলে ওজেন।—ভাড়াই যখন দিলাম তখন তার উস্থুল করে নেওয়া যাক! ওতেল দ বোসেয়াঁতে চল।
—কোন্‌টায়? কোচোয়ান জিজ্ঞাসা করে।

এই বেকায়দা প্রশ্নে ওজনের টনক নড়ে ওঠে। অপরিপক্ক এই সৌখিন বাবু জানেন না যে ছুটি ওতেল দ বোসেয়াঁ আছে। অমনিই মনে হয়, কত বড় বড় লোক তার আত্মীয় অথচ তারা তাকে তৃণজ্ঞান করে না।
—ভিকঁৎ দ বোসেয়াঁ, রুয়······
—দ গ্রেনেল! মাথা নেড়ে পাদপূরণ করে কোচোয়ান। তারপর গাড়ির দরজা খুলে দিয়ে বলে, ওটা কঁতের বাড়ী আর মার্কিজেরটা রুয় স্যাঁ—দমিনিকে।
—তা বটে! শুষ্কভাবে জবাব দেয় ওজেন। সামনের কুশনের উপরে টুপিটা ছুঁড়ে ফেলে ভাবে, আজ হল কি, সবাই আজ আমায় টিটকারি দেবে নাকি? এই যে চাল দেখাচ্ছি তাতে বেশ কিছু খসবে। তাহলেও পুরোপুরি অভিজাত ষ্টাইলেই যেতে হবে পাতানো বোনের বাড়ী। বুড়ো গোরিওর জন্য কমপক্ষে দশ ফ্রাঁ গেল। যাক গে! মাদাম দ বোসেয়াঁকে নিশ্চয় এই অভিযানের কথা বলতে হবে। তিনি হয়ত হাসবেন শুনে; কিন্তু লেজকাটা এই বুড়ো ইঁদুর আর এই সুন্দরীর সম্পর্কটা নিশ্চয়ই তার অজানা নয়। এই বেহায়া মেয়ের কাছে অপমান সহ্য করার চাইতে বোনের প্রীতিভাজন হবার চেষ্টা করা ঢের ভাল। এই নির্লজ্জ মহিলা তো বাবুয়ানার জন্য সুযোগ পেলেই আমায় খোঁচা মারে। সুন্দরী ভিকঁতেসের নামের মাহাত্ম্যই যদি অত হয় তো নিজে ইচ্ছে করলে কি না করতে পারেন আমার জন্য? স্বর্গকে যদি চ্যালেঞ্জ করতে হয় তো লক্ষ্যটা ভগবানের দিকেই থাকা উচিত।

হাজারো চিন্তা ভেসে বেড়ায় ওজেনের মনে। কিন্তু তার মর্মার্থ এইটুকুই। বৃষ্টি পড়া দেখতে দেখতে খানিকটা স্থৈর্য ও আত্মবিশ্বাস ফিরে আসে। মনে ভাবে, কোট, বুট আর টুপি বাঁচাবার জন্য শেষ সম্বল পাঁচ ফ্রাঁর মধ্যে দু ফ্রাঁ খরচ করার বুদ্ধি করে ভালই করেছে। সহসা কোচোয়ানটি চেঁচিয়ে ওঠে, সদরটা খুলুন না দয়া করে! এই হাঁকে চাঙ্গা হয়ে ওঠে ওজেন। লাল ও সোনালী তকমাপরা একটি দারোয়ান কব্‌জার শব্দ করে বিশাল ফটক খুলে দেয়। পরম খুশিভরা মনে ওজেন লক্ষ্য করে যে গাড়িখানা তোরণদ্বার পার

হয়ে উঠোন দিয়ে বাঁক ঘুরে বারান্দার নীচে এসে থামল। লাল বর্ডার লাগান জব্বর মোটা নীল ওভারকোট-পরা কোচোয়ানটি নেমে এসে গাড়ির দরজা খুলে দেয়।

গাড়ি থেকে নামতে নামতে গুন্তঘেরা স্থানটির ওপাশে চাপা হাসি শুনতে পায় ওজেন। গরীব বর-কনের যাওয়া নিয়ে তিন চারজন চাকর-বাকর ঠাট্টা তামাসা করছিল। পারির একখানা সেরা ক্রয়াম ছিল পাশে। চার-চাকার এই হালকা দামী জুড়িগাড়িখানার সঙ্গে নিজের গাড়ির তুলনা করে পলকের মধ্যেই ওজেন এদের রসিকতার তাৎপর্য উপলব্ধি করে। এর তেজী ঘোড়াগুলোর কানের কাছে গোলাপ লাগান।

কড়িয়াল চিবোচ্ছে ঘোড়াগুলি, আর পাউডার মাখা গলাবন্ধ-পরা একটি কোচোয়ান তাদের সামলে রাখছে। মনে হয়, সে ছেড়ে দিলেই এরা হুড় হুড় করে ছুট মারবে। শোসে দাঁত্যাঁয় মাদাম দ রেস্তোর উঠোনে এক-ঘোড়ায় টানা সুন্দর একখানি কাব্রিওলে দেখেছে ওজেন। বছর ছাব্বিশেকের এক যুবক সেখানা চালিয়ে নিয়ে আসে। "ত্রিশ হাজার ফ্রাঁ দিয়েও কেনা যায় না এমন একখানা জুড়িগাড়ি ফোবুর স্যাঁ—জেরম্যাঁয় অপেক্ষা করছে কোন অভিজাতের জন্য ?'

—কে এল এখানে ? অবাক হয়ে ভাবে ওজেন। বেশ কিছুটা বিলম্বেই সে উপলব্ধি করে যে প্রণয়ীহীন সামান্য কয়েকজন নারীই হয়ত পারি শহরে পাওয়া যায়, আর এসব বিজিতা রাণীদের জয় করতে হলে শুধু বংশকৌলীন্য থাকলেই চলে না—আরও কিছু চাই তার সঙ্গে।—সব জায়গায় গোলমাল। আমার বোনেরও হয়ত কোন মাকসিম আছে।

দুরু দুরু বুকে সে সিঁড়ি বেয়ে ওঠে। খানিকটা এগোতেই কাঁচের দরজা খুলে যায়। দেখল, বিচারকের মত গম্ভীর মুখের গুচ্ছের খানসামা সামনে দাঁড়িয়ে। ওজেন যে পার্টিতে এসেছিল সে-টি হয়েছিল ওতেল দ বোসেয়াঁর একতলার বিশাল অভ্যর্থনা কক্ষে। নিমন্ত্রণ আর বল-নাচের সময়ের মধ্যে এমন সুযোগ সে পায়নি যে বোনের সঙ্গে দেখা করতে পারে। মাদাম দ বোসেয়াঁর নিজের ঘর দেখার সুযোগ তার জোটেনি। কাজেই যে অনবদ্য পরিবেশ সৃষ্টি করে বিশিষ্টা মহিলারা ব্যক্তিগত সৌখিনতা, পরিপাটিবোধ, তাদের অন্তরের রুচি ও জীবনধারা মূর্ত করে তোলেন, আজকে স্বচক্ষে সেই বিস্ময়কর পরিমণ্ডল দেখতে চলেছে ওজেন। ইতিপূর্বে মাদাম দ রেস্তোর বৈঠকখানা

দেখে যদি নিজের মনে একটা তুলনার মান সৃষ্টি না হত তো তার পর্যবেক্ষণ এতটা কৌতূহলী হত না।

সাড়ে চারটার সময় ভিকঁতেসের দেখা মিলতে পারে। পাঁচ মিনিট আগে হলেও ভাইয়ের সঙ্গে তিনি দেখা করতেন না। পারির ভব্যতার খুঁটিনাটি সম্পর্কে অনভিজ্ঞ ওজেনকে লাল কার্পেট-পাতা পথ ধরে গিল্টিকরা সোপান-স্তম্ভ আর পুষ্পস্তবক সজ্জিত প্রশস্ত সাদা সিঁড়ি দিয়ে পথ দেখিয়ে মাদাম দ বোসেয়ঁার কক্ষে নিয়ে যাওয়া হয়। মহিলাটির গত জীবনের ইতিহাস তার সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। তার মানে, প্রতিদিন সন্ধ্যায় পারির বৈঠকখানার মজলিসে এক বন্ধু অপর একজনকে পল্লবিত করে যে জীবনকথা শোনায় তার কিছুই সে জানে না।

বছর তিনেক হল মার্কি দাগ্যুজা প্যাতো নামে পর্তুগালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ধনী এবং অতি বিশিষ্ট এক অভিজাত ব্যক্তির সঙ্গে মহিলাটির হৃদ্যতার সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। এ এমন নির্দোষ সখ্যতা যে দুপক্ষের কেউই তৃতীয় পক্ষের উপস্থিতি সহ্য করতে পারে না। ইচ্ছায় হোক কি অনিচ্ছায় হোক, এই গান্ধর্ব্য দাম্পত্য সম্পর্কের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে মার্কি দ বোসেয়ঁা জনসাধারণের চক্ষে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। বন্ধুত্বের প্রথম দিকে বেলা দুটোর সময় যে কেউ ভিকঁতেসের সঙ্গে দেখা করতে এলেই মার্কি দাগ্যুজা প্যাতোকে দেখতে পেত। এই অভ্যাগতদের সঙ্গে দেখা করতে বাধ্য হতেন মাদাম দ বোসেয়ঁা, কারণ এদের জন্য তো আর কপাট বন্ধ করে রাখা যায় না? তবু এমন নীরসভাবে তাদের অভ্যর্থনা করতেন এবং বসে বসে এমন একাগ্রমনে কড়িকাঠ পর্যবেক্ষণ করতেন যে তার চরম বিরক্তি উপলব্ধি করতে কারও তিলমাত্র বিলম্ব হত না। পারিতে যখন জানাজানি হয়ে গেল যে দুটো থেকে চারটের মধ্যে কোন অভ্যাগত গেলে মাদাম দ বোসেয়ঁা বিরক্ত বোধ করেন, অমনিই এ দুটি ঘণ্টা সম্পূর্ণ একাকী থাকার সুযোগ জুটে যায়। মঁশিয় দ বোসেয়ঁ আর মঁশিয় দাজুজা প্যাতো এই দুজনকে এক সঙ্গে নিয়েই বুফঁ কি ওপেরায় যেতেন মাদাম। কিন্তু ভব্য লোক বলে, নিজের স্ত্রী ও পর্তুগীজকে আসনে বসিয়ে দিয়ে মশিয়ঁ দ বোসেয়ঁা চলে আসতেন। মঁশিয় দাজুজা এখন বিয়ে করবেন বলে স্থির করেছেন এবং তার আয়োজনও হচ্ছে। পাত্রীর নাম মাদমোয়াজেল দ রশফিদ্। সৌখীন সমাজের মধ্যে একমাত্র মাদাম দ বোসেয়ঁাই এই প্রস্তাবিত বিবাহের সংবাদ জানতেন না। জনকয়েক বন্ধু-বান্ধবী অস্পষ্ট আভাসে কথাটি তার কানে তুলেছিল। তিনি হেসে উড়িয়ে দিয়েছেন। ভেবেছেন,

বন্ধু-বান্ধবীরা হয়ত ঈর্ষ্যাবশে তার সুখের আকাশে মেঘ সৃষ্টি করতে চায়। তাহলেও পরিণয় সংবাদ প্রচারিত হল বলে!

খোলাখুলিভাবে ভিকঁতেসকে এই বিবাহের কথা জানাবার জন্যই এসেছিল সুদর্শন পর্তুগীজ। কিন্তু মুখ খুলে নিজের বিশ্বাসঘাতকতার কথা ঘুণাক্ষরেও প্রকাশ করতে ভরসা পেল না। তার সঙ্কোচের কারণ সহজেই বোঝা যায়। কোন নারীকে এমন চরমপত্র দেওয়া বড় সুকঠিন কাজ। ঘণ্টা দুয়েক কান্না-কাটির পর মেয়েরা যখন মরে গেলাম বলে স্মেলিং-সল্ট চায়—সেই দৃশ্য দেখে কোন কোন পুরুষ এত ভড়কে যায় যে, দ্বন্দ্বযুদ্ধের ক্ষেত্রে নিজের বুকের সামনে প্রতিপক্ষের উদ্যত তলোয়ার দেখেও তারা অতটা অস্বস্তিবোধ করে না। কাজেই এই মুহূর্তে মঁশিয় দাজুয়া প্যাঁতোর অবস্থা কাঁটার ওপর বসে থাকার মত। এখুনি বেরিয়ে যেতে পারলে বাঁচে! মনে ভাবে, চিঠি লিখে সংবাদটা জানাবে মাদাম দ বোসেয়ঁাকে। মুখ দিয়ে বলার চাইতে চিঠির মারফত এ মারাত্মক আঘাত দেওয়া ভাল। এই অবস্থায় খানসামা এসে যখন মঁশিয় ওজেন দ রাস্তিঞ্যাকের আসার সংবাদ জানায়, আনন্দে নেচে ওঠে মার্কি দাজুয়া প্যাঁতো।

প্রসঙ্গত বলা যায়, প্রেমে-পড়া মেয়েদের উদ্ভাবনশক্তি খুবই প্রখর। কিন্তু নতুন সুখের পথ আবিষ্কার করার চাইতে বরং নিজের সম্পর্কে শঙ্কা সন্দেহের সন্ধানেই সেই শক্তি বেশী প্রযুক্ত হয়। পরিত্যক্ত হবার আগের মুহূর্তেও প্রণয়ীর অর্থপূর্ণ ভঙ্গী বিদ্যুত-চমকে তাদের এতটা সচকিত করে তোলে যে, গন্ধ শুঁকে সঙ্গীর ক্ষীণ আভাস পেয়েও ভার্জিলের যুদ্ধাশ্ব অতটা উচ্চকিত হয়ে ওঠেনি। মাদাম বোসেয়ঁাও সচকিত হয়েছিলেন। সেই অনিচ্ছাকৃত সন্ত্রস্ততা সামান্য হলেও অকপট সরলতার জন্য বিভীষিকাময় ছিল।

ওজেন জানত না যে, স্বামী-স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততির গোটা ইতিহাস না জেনে পারির কোন বাড়ীতে যাওয়া নিরাপদ নয়। তাতে নিজের অজ্ঞাতে ভুল করার শঙ্কা থাকে না। পোলাণ্ডে একটা চলতি কথা আছে: গাড়িতে পাঁচটা ষাঁড় জোত। অজ্ঞাতসারে ভুল করে যদি কাদায় আটকে পড়তে হয় তো সেই পাঁক থেকে টেনে তুলতে অন্তত গোটা পাঁচেক ষাঁড়ের প্রয়োজন বলেই কথাটা হয়ত এই ভাবে বলা হয়েছে। বেফাঁস আলাপ-আলোচনার কোন নাম ফ্রান্সে এখনও দেওয়া হয়নি; কারণ কেলেঙ্কারির খবর এখানে এত বহুল প্রচারিত যে অমন ভুল-ত্রুটি এদেশে অসম্ভব বলেই গণ্য হয়।

মাদাম দ রেস্তোর বৈঠকখানায় এমনি কাদায় আটকে পড়েছিল ওজেন। মহিলাটি তাকে ষাঁড় জুতবার ফুরসতও দিলেন না। মাদাম দ বোসেয়াঁর বৈঠকখানায় এসে সে ভুলের উপর ভুল করে। এ রকম ভুল একমাত্র তার পক্ষেই সম্ভব। তবে মাদাম দ রেস্তো আর মঁশিয় দ ত্রাইর চক্ষে সে বিভীষিকা বলে প্রতিপন্ন হলেও মঁশিয় দাহ্যুজা তাকে দেখে খুশিই হয়।

ধূসর আর গোলাপী রঙের ছোট্ট এক সুসজ্জিত বৈঠকখানায় ওজেন ঢুকতে না ঢুকতেই চটপট দরজার কাছে গিয়ে পর্তুগীজটি বলে, আজ আসি তাহলে।

বৈঠকখানাটি এমন সুসজ্জিত যে পরিপাটি এক্ষেত্রে চরম বিলাসিতার নামান্তর হয়ে দাঁড়িয়েছে।

মাদাম দ বোসেয়াঁ অমনিই মাথা ঘুরিয়ে মার্কির দিকে চেয়ে বলেন, ঠিক সন্ধ্যা অবধি ছুটি কিন্তু! আজ তো আমরা বুফঁ যাচ্ছি, কেমন তাই তো?

—আমার উপায় নেই যাবার। দরজার হাতল ধরে বলে দাহ্যুজা।

মাদাম দ বোসেয়াঁ তখন ওজেনকে লক্ষ্য না করে উঠে দাঁড়িয়ে মার্কিকে হাতের ইশারায় ডাক দেন। ওজেন এ সময় রূপকথার রাজপুরীর পরিবেশ দেখে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেছে—আরব্য রজনীর গল্পও মনে হচ্ছে অর্ধ-সত্য বলে। মহিলাটি তাকে বিন্দুমাত্র লক্ষ্য করছেন না দেখে লজ্জায় সে মুখ ঢাকার স্থান খুঁজে পাচ্ছে না। ডান হাতের লীলায়িত ভঙ্গীতে মার্কিকে ডেকেছেন ভিকঁতেস। অঙ্গুলি সংকেতে দেখিয়ে দিয়েছেন সামনের একটা আসন। এই মূক অভিনয় এমন প্রভুত্বের ব্যঞ্জনাময় যে, আসক্তির ডোরে বাঁধা মার্কি হাতল ছেড়ে দিয়ে ফিরে আসে। অপলকে তাকে লক্ষ্য করে ওজেন। খানিকটা হিংসাও যে না হল তা নয়!

মনে মনে বলে, এই লোকটাই ব্রুয়াম নিয়ে এসেছে তাহলে! কিন্তু তেজীয়ান লাফানে ঘোড়া, তকমা-পরা চাকর আর অঢেল টাকা না থাকলে কি পারির মহিলাদের নজরে পড়া যায় না?

বিলাসিতার জাঁক দেখাবার মত বৈভবলাভের দুরন্ত বাসনা দুর্বারবেগে তার মনের মধ্যে চাড়া দিয়ে ওঠে···লোভ দংশে মারে জ্বরের মত···কণ্ঠ শুষ্ক হয়ে আসে অর্থের পিপাসায়। প্রতি তিনমাসে মাত্র একশ' তিরিশ ফ্রাঁ খরচ করতে পারে সে। বাপ-মা, ভাই-বোনেরা আর মাসি মিলে মাত্র একশ' ফ্রাঁ দিয়ে মাস চালায়। নিজের বর্তমান অবস্থা আর উচ্চাশার লক্ষ্যের তুলনা করে অচিরেই সে বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে।

ইতালিয়াঁতে আসতে পারবে না কেন জানতে পারি? হেসে পর্তুগীজকে জিজ্ঞাসা করেন ভিকঁতেস।
—কাজ আছে। ইংরেজ রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে আজ খানা খেতে হবে।
—ও সব বাজে লোক বিদায় করে দাও।

মানুষ যখন প্রবঞ্চনা করতে শুরু করে তখন বাধ্য হয়ে তাকে মিথ্যার উপর মিথ্যার আশ্রয় নিতে হয়। মঁশিয় দাহ্যুজাও তাই হেসে বলে, হুকুম করছ?
—হাঁ, করছি!
—এই কথাটাই শুনতে চেয়েছিলাম তোমার মুখ থেকে। এমন দরদী চোখে দাহ্যুজা তাকায় যে সে চাহনি কোন নারীকে আশ্বস্ত না করে পারে না। ভিকঁতেসের হাতখানি তুলে চুমু খেয়ে সে বেরিয়ে যায়।

চুলের মধ্যে হাত গলিয়ে অভিবাদনের প্রস্তুতি হিসাবে গোটা কয়েক আড়মোড়া খায় ওজেন। ভাবে, এইবার হয়ত মাদাম দ বোসেয়াঁ তার অস্তিত্ব সম্পর্কে সচেতন হবেন। কিন্তু হায়রে, সহসা তিনি লাফিয়ে ওঠেন এবং বারান্দা দিয়ে ছুটে জানালায় গিয়ে মঁশিয় দাহ্যুজার গাড়ি-চড়া দেখতে থাকেন। কান পেতে তিনি হুকুমটা লক্ষ্য করেন। শুনলেন, হুকুমের পুনরাবৃত্তি করে চাকরটি কোচোয়ানকে বলছে, মঁশিয় দ রশফিদের বাড়ী চল।

এই কথাকটি আর মঁশিয় দাহ্যুজার চপপট গাড়িতে ওঠার ভঙ্গি ভিকঁতেসকে বজ্রাহত করে। হঠাৎ আলোর ঝলকানির মত অভিভূত হয়ে তিনি ফিরে আসেন। সৌখীন সমাজে হোক কি অন্যত্র হোক, মারাত্মক বিপদগুলি সর্বত্রই মারাত্মক। নিজের ঘরে ফিরে এসে ভিকঁতেস একখানা দামী চিঠির কাগজ টেনে নিয়ে বসেন।

'ইংরেজ দূতাবাসের বদলে তুমি রশফিদদের ওখানে নেমতন্ন খেতে চলেছ, এর কারণ অবশ্যই জানবার দাবী করতে পারি। তোমার জবাবের প্রতীক্ষায় রইলাম।' হাত কাঁপছিল বলে নিজের হস্তলিপির কয়েকটি অক্ষর তিনি সংশোধন করেন এবং ক্লেয়ার দ বুর্গঞের বদলে 'সি' সই করে বেল বাজান।

অমনিই চাকর হাজির হয়। তাকে বলেন, শোন্ জ্যাক্, সাড়ে সাতটার সময় মঁশিয় দ রশফিদের বাড়ী গিয়ে মার্কি দাহ্যুজা প্যাঁতোর খোঁজ করবি। তিনি যদি সেখানে থাকেন তো চিঠিখানা দিয়ে চলে আসবি। জবাবের জন্য দেরি করার আবশ্যক নেই। তিনি যদি না থাকেন তো ফিরিয়ে এনে আমার হাতে দিবি।

—বৈঠকখানায় একজন লোক মাদাম লা ভিকঁতেসের জন্য অপেক্ষা করছে।

—ও, তাই তো! দরজা খুলে বলেন ভিকঁতেস।

ওজেন তখন নেহাৎ অস্বস্তি বোধ করতে শুরু করেছে। ঠিক সেই সময়েই ভিকঁতেসকে আসতে দেখল। মহিলাটি তখন বিনয়ীভাবে ওজেনকে বলেন, আমায় মাপ করবেন মঁশিয়, চিঠি লিখতে হল বলে বিলম্ব হয়ে গেছে! এখন আমি পুরোপুরি আপনার হাতে। কথাটা তিনি এমনভাবে বলেন যে, ওজেনের অন্তরের তারে প্রতিধ্বনি হয়।

অথচ কি যে বলছেন সে খেয়াল মহিলাটির ছিল না। কারণ, বলবার সময়েও ভিন্ন চিন্তায় তিনি অন্যমনস্ক ছিলেন।

—হুঁ! মাদামোয়াজেল দ রশফিদকে বিয়ে করতে চায় তাহলে! কিন্তু ও কি ভেবেছে যা খুশি তাই করতে পারে? আজ সন্ধ্যা বেলাই এ সম্বন্ধ ভেঙে দিতে হবে, না হলে আমি···কাল ভোরে আর এ সমস্যা থাকতে পারবে না!

—দিদি! ওজেন বলে ওঠে।

—কি বললে! সবিস্ময়ে বলে ওঠেন ভিকঁতসে। তার চাহনির ঔদ্ধত্য দেখে ওজেনের রক্ত হিম হয়ে আসে। এই 'কি বল্‌লে'র অর্থ সে বুঝল। গত ঘণ্টা তিনেকের মধ্যে অনেক কিছুই সে শিখেছে—হুঁশিয়ারও হয়েছে কতকটা।

তাই সসঙ্কোচে মাদাম বলে সম্বোধন করে আবারও সে কথা বলতে আরম্ভ করে। প্রথমে খানিকটা ইতস্তত করে, তারপর বলে যায়, আমায় ক্ষমা করুন মাদাম। আপনার অনুগ্রহ আমার এত প্রয়োজন যে সামান্য আত্মীয়তায় কোন ক্ষতি হবে না।

মাদাম দ বোসেয়াঁ হেসে ওঠেন। কিন্তু বড় ম্লান সে হাসি। বেশ বুঝতে পারছেন যে আসন্ন ঝড়ের মত দুর্ভাগ্য তার চার পাশে ফুঁসছে।

ওজেন বলে যায়, আমাদের পরিবারের অবস্থা যদি জানতেন তো সানন্দে আপনি ধর্মের মায়ের মত ধর্ম-পুত্রের পথের কাঁটা সরিয়ে দিতে রাজী হতেন।

মাদাম তখন প্রসন্নভাবে হেসে বলেন, বেশ তো, বল না তোমার জন্য আমি কি করতে পারি ভাই?

—তাও আমার পক্ষে বলা সম্ভব নয়! আপনার সঙ্গে অতি সামান্য, প্রায় উপেক্ষণীয় আত্মীয়তার সম্পর্কও পরম সৌভাগ্যের জিনিস। আপনি আমার

মাথা এমনভাবে গুলিয়ে দিয়েছেন যে কি বলতে যাচ্ছিলাম তাও এখন মনে পড়ছে না। এই পারি শহরে আপনাকে ছাড়া আর কাউকেই আমি চিনি না। হায়রে, যদি আপনাকে আমার সুহৃদ হতে বলতে পারতাম···অসহায় সন্তান বলে গ্রহণ করতে যদি অনুরোধ জানাতে পারতাম! আমি আপনার আশ্রয়ে থাকতে চাই মাদাম···আপনার জন্য প্রাণ দিতেও প্রস্তুত!

—আমার জন্য মানুষ খুন করবে?

—প্রয়োজন হয় দুটো করব! জোর দিয়ে বলে ওজেন।

—ছেলে মানুষ! সত্যি, একেবারেই ছেলে মানুষ তুমি! চোখের জল সামলে বলেন ভিকঁতেস।—আর যাই হোক, প্রাণ ঢেলে ভালবাসতে পারবে।

—সে আর বলতে! মাথা নেড়ে সায় দেয় ওজেন।

ছাত্রটির জবাবের ঔদ্ধত্য ভিকঁতেসকে পরম কৌতূহলী করে তোলে। দখনে যুবক এই প্রথম তার কথার প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করতে আরম্ভ করে। মাদাম দ রেস্তোর নীল নিভৃত কক্ষ আর মাদাম দ বোসেয়াঁর গোলাপী বৈঠকখানার অভিজ্ঞতায় পারির অলেখা আইন-কানুন সম্পর্কে বিস্তর শিক্ষালাভ করেছে ওজেন। এতটা জ্ঞান সঞ্চয়ের জন্য কমপক্ষে বছর তিনেকের শিক্ষানবিসী দরকার। এই কানুন অভিজাত শ্রেণীর সামাজিক বিধানশাস্ত্র হলেও ভালমত শিখে হুঁশিয়ারভাবে প্রয়োগ করতে পারলে সাফল্যের রাজপথ উন্মুক্ত হয়ে যায়।

—হাঁ, সেই কথাই তো বলতে চেয়েছিলাম। ওজেন বলে।—আপনার বলনাচের আসরে মাদাম দ রেস্তোর সঙ্গে দেখা হয়। আজ সকালে তার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম।

—নিশ্চয়ই তার বাধা সৃষ্টি করেছিলে, তাই না? হেসে বলেন মাদাম দ বোসেয়াঁ।

—সে আর বলতে! আমি এমন হাবা যে আপনার সাহায্য না পেলে সবাইকে চটিয়ে তুলব। আমার বিশ্বাস, পারি শহরে এমন কোন সুরুচিসম্পন্না সুন্দরী ধনী তরুণী নেই যে কারও না কারও ভাগে বিলি হয়ে যায়নি। অথচ আপনারা মহিলারা যাকে জীবন বলে ব্যাখ্যা করেন তার রহস্য বুঝিয়ে দেবার মত একজন সুহৃদ আমার একান্ত প্রয়োজন। না হলে সর্বত্র আমি মঁশিয় দ ত্রাইর মত লোকের সন্ধান পাব। এই ধাঁধার সমাধানের জন্যই এসেছিলাম আপনার কাছে। জানতে এসেছিলাম, কি ধরণের ভুল আমি করেছি। এক বুড়োর কথা বলতেই······

ছাত্রটির কথা শেষ হতে না হতেই জ্যাক্ জানায় : মাদাম লা দুশেস দ লাঁজে এসেছেন। বিরক্তিভরে তার দিকে চায় ওজেন।

ভিকঁতেস তখন চাপা গলায় বলেন, যদি সফলকাম হতে চাও তো আগে অমন খোলাখুলিভাবে মনোভাব প্রকাশ না করতে শেখ।
—এস ডিয়ার, এস! সোৎসাহে বলে ওঠেন ভিকঁতেস। দুশেসকে অভ্যর্থনা করার জন্য উঠে যান মাদাম। এমন মমতার আতিশয্য দেখিয়ে ভিকঁতেস করমর্দন করেন যা দেখে মনে হয় যেন নিজের ভগিনীকে সম্ভাষণ জানালেন। দুশেসও মর্মস্পর্শী মমতাভরে প্রতি সম্ভাষণ জানালেন।

রাস্তিঞাক ভাবে, খুবই অন্তরঙ্গতা আছে হয়ত দুজনের। আজ থেকে দুটি আশ্রয় পাব। একজনের বন্ধু-বান্ধবের প্রতি অন্যজনও নিশ্চয়ই আনুকূল্য দেখাবেন। আর এ মহিলাটি তো নিঃসন্দেহে আমার সম্পর্কে আগ্রহশীল হবেন।

মঁাদাম দ বোসেয়ঁা বলেন, তোমার দেখা পেয়ে কত যে সুখী হলাম অাঁতোয়ানেৎ!
—মঁশিয় দাজ্যুজা প্যাঁতোকে মঁশিয় দ রশফিদের বাড়ী যেতে দেখে ভাবলাম, এখন এলে তোমায় হয়ত একলা পাওয়া যাবে।

মাদাম দ বোসেয়ঁা ঠোঁটে ঠোঁট চাপলেন না, সঙ্কোচও বোধ করলেন না বিন্দুমাত্র। স্থিরদৃষ্টিরও ব্যতিক্রম হল না। বরং দুশেসের মুখ থেকে এই মারাত্মক সংবাদ শুনে তার কপাল যেন আরও মসৃণ হয়ে উঠল।

তারপর ওজেনের দিকে ফিরে দুশেস বলেন, যদি জানতাম তোমার এখানে লোক রয়েছে তাহলে······
—এ ভদ্দরলোকের নাম মঁশিয় ওজেন দ রাস্তিঞাক—সম্পর্কে আমার ভাই হয়। ভিকঁতেস জানান। তারপর ভিন্ন প্রসঙ্গের অবতারণা করে জিজ্ঞাসা করেন, জেনারেল দ মঁত্রিভোর কোন সংবাদ পেয়েছ? সেরজি কাল আমায় বললে, কেউ নাকি তার কোন খোঁজ জানে না। আজ এসেছিল তোমার ওখানে?

মঁশিয় দ মঁত্রিভোর প্রেমে পাগল হয়েছিলেন দুশেস। লোকে বলে, লোকটা এখন নাকি একে ছেড়ে গেছে। তাই এই প্রশ্নের অন্তর্নিহিত খোঁচায় তার অন্তর বিদ্ধ হল। আরক্ত মুখে তিনি জানান, ইলিজে এসেছিল কাল।
—নিজের কাজে? মাদাম দ বোসেয়ঁা জিজ্ঞাসা করেন।

দুশেস তখন তীব্র ঘৃণাভরে তার দিকে চেয়ে বলেন, ক্লারা, আমার ধারণা, তুমি নিশ্চয়ই জান, মঁশিয় দাহ্যুজা আর মাদমোয়াজেল দ রশফিদের বিয়ের ঘোষণা কালকেই প্রকাশ হবে!

এ আঘাত আরও মারাত্মক। হেসে জবাব দেবার সময় ভিকঁতেসের মুখ বিবর্ণ হয়ে যায়, হাঁ, অমন একটা গুজব নিয়েও নির্বোধেরা বলাবলি করছে বটে! পর্তুগালের অতি বিশিষ্ট অভিজাত বংশের লোক মঁশিয় দাহ্যুজা। তার মত লোক রশফিদদের ঘরে বিয়ে করতে যাবে কেন? রশফিদরা তো হঠাৎ বড়লোক হয়েছে, এই তো সেদিন আভিজাত্যের সম্মান পেল।

—কিন্তু লোকে বলে, বের্ত নাকি বছরে দু লাখ লিভার ভাতা পাবে।

—মঁশিয় দাহ্যুজা এত বড়লোক যে অর্থের লোভে কোন কিছু করবেন না।

—কিন্তু লোকে বলে, মাদমোয়াজেল দ রশফিদ অপরূপ সুন্দরী।

—তাই নাকি?

—যাই হোক, আজ সে তাদের সঙ্গে খাচ্ছে নিশ্চয়ই। ব্যবস্থা-পত্তর সব শেষ হয়ে গেছে। অথচ তুমি এত কম খবর রাখ শুনে ভারি আশ্চর্য হলাম!

মাদাম দ বোসেয়াঁ তখন ওজনের দিকে ফিরে বলেন, তুমি কি ভুল করেছিলে মঁশিয়? এই বেচারি সবে সংসারে ঢুকছে আঁতোয়ানেৎ। কাজেই আমাদের কথাবার্তা ঘুণাক্ষরেও বুঝতে পারবে না। অন্তত ওর জন্য, এস, আলোচনাটা আমরা কালকে অবধি মুলতুবি রাখি। সরকারী ঘোষণা যদি কালকেই হয় তো দয়া করে যে সংবাদ আমায় শোনালে তারও সত্যতা জানা যাবে।

দুশেস এমন স্পর্দ্ধিত দৃষ্টিতে ওজেনের আপাদমস্তক লক্ষ্য করেন যাতে যে কোন লোক সঙ্কুচিত হয়ে নিজেকে পোকার মত হীন জ্ঞান করতে বাধ্য হয়।

ছাত্রটি তখন বলে, খেয়াল না করে মাদাম দ রেস্তোর বুকে আমি ছোরা বসিয়ে দিয়েছি। খেয়াল করিনি—সেইটেই অপরাধ। কথার মারপ্যাঁচ ইতিমধ্যেই রপ্ত করে নিয়েছে ওজেন। এই আপাতমধুর কথা কটির অন্তরালে যে তীক্ষ্ণ বিদ্রূপ লুকানো রয়েছে, তাও সে বুঝল।—সচেতনভাবে যারা আঘাত করে, লোকে তাদের সঙ্গে দেখা শোনা করে যায়—হয়ত খানিকটা সমীহও করে, কিন্তু নিজের অজ্ঞাতে যারা আঘাত করে এবং জানে না কতটা ব্যথা দিয়েছে, লোকে তাদের মূর্খজ্ঞান করে—নিজেকে সংশোধন করার সুযোগও সে আনাড়ীর জোটে না। সবাই তাকে ঘৃণা করে।

মাদাম দ বোসেয়ঁ। এই সময় প্রসন্ন মোলায়েম দৃষ্টিতে ছাত্রটির দিকে তাকান। এমনি দৃষ্টি দিয়েই মহৎ লোকে সম্ভ্রম বজায় রেখে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। দুশেসের সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছাত্রটির আত্মমর্যাদাবোধে নিষ্ঠুর আঘাত হেনেছে। ভিকঁতেসের এই প্রসন্ন চাহনি সেই ক্ষতে স্নিগ্ধ মলম লেপে দিল।

বিনয়ী তবু হিংস্রুটে দৃষ্টিতে দুশেসের দিকে ফিরে:সে তখন বলে, বিশ্বাস করবেন কিনা জানি না, কঁৎ দ রেস্তোর সদিচ্ছা আমি ইতিমধ্যেই অর্জন করেছি। অকপটে আমি স্বীকার করছি মাদাম, এখনও গোবেচারি ছাত্র আমি—যেমন নিঃসঙ্গ তেমনি গরীব······

—একথা বল না মঁশিয় দ রাস্তিঞ্যাক। যার উপর অন্যের লোভ নেই তেমন জিনিস মেয়েরা চায় না।

—বটে! ওজেন বলে।—আমার বয়স সবে বাইশ বছর। এখন আমায় জীবনের প্রাতকূলতার সঙ্গে যুঝতে হবে। তাছাড়া এখানে আমি স্বীকারোক্তি করছি—এর চাইতে মধুর স্বীকারোক্তির স্থান সুদুর্লভ। অন্যত্র যে পাপ করব, এটা তাই স্বীকার করার জায়গা।

ছাত্রটির এই প্রগলভতায় দুশেসের মুখব্যঞ্জনা কঠোর হয়ে ওঠে। ভিকঁতেসের দিকে ফিরে এই ভব্যতাহীনতার নিন্দা করে বলেন, ভদ্দরলোক বুঝি সবে······

ভ্রাতা ও দুশেসের আচরণ দেখে ভিকঁতেস অকপটে হাসতে থাকেন।

—সবে এসেছে ডিয়ার! ভব্যতা শেখবার জন্য একজন শিক্ষ... র খোঁজ করছে।

ওজেন তখন বলে, যা আমাদের মুগ্ধ করে তার রহস্য জানার আগ্রহ খুব স্বাভাবিক বৃত্তি নয় কি মাদাম লা দুশেস? (মনে মনে ভাবে, এইবার নিশ্চয়ই ভব্য মিঠে কথা বলেছে!)

—আমার ধারণা, মাদাম দ রেস্তো নিজেই মঁশিয় দ' ত্রাই-র ছাত্রী! দুশেস বলে ওঠেন।

—ও ব্যাপারের কিছুই আমি জানতাম না মাদাম। ছাত্রটি জানায়।—আর নির্বোধের মত নিজেকে তাদের দুজনের মাঝখানে ফেলেছিলাম। যাই হোক, তার স্বামীর সঙ্গে ভাল সমঝোতা হয়েছে, স্ত্রীও কিছুক্ষণ অন্তত আমায় সহ্য করতে বাধ্য হলেন। এই সময় একটা কথা আমার মাথায় এল। বলে ফেললাম, পেছনের সিঁড়ি দিয়ে যে বুড়ো বেরিয়ে গেল তাকে আমি চিনি। যাবার পথে লোকটা কঁতেসকে চুমু খেয়েছিল।

—কে লোকটা ? দুজন মহিলাই একসাথে বলে ওঠেন।

—একটা বুড়ো লোক। মাসে দুই লুই দিয়ে ফোবুর স্যাঁ মার্সোতে থাকে। আমার মত গরীব ছাত্রও থাকে সেখানে। বুড়ো বেচারিকে সবাই উপহাস করে—আমারা তাকে বুড়ো গোরিও বলে ডাকি।

—তুমি ছেলেমানুষ, কি করে আর জানবে ? মাদাম দ রেস্তো বিয়ের আগে মাদমোয়াজেল গোরিও ছিলেন। ভিকঁতেস বলে ওঠেন।

—সেমুই ব্যবসায়ীর মেয়ে। পাদপূরণ করেন দুশেস।—এক প্যাস্ট্রিওলার মেয়ের সঙ্গে একই দিনে ওকে রাজসভায় হাজির করা হয়। মনে সেই ক্লারা ? রাজা সেদিন রহস্যচ্ছলে হাসতে হাসতে লাতিন ভাষায় ময়দার উপর টিপ্পনী কাটেন। কি যেন কথাটা! আহা……

—ও, লোকটা তাহলে ওর বাপ ? ভীতিবিহ্বল বিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করে ছাত্রটি ?

—নিশ্চয়, লোকটির দুটি মেয়ে। মেয়েরা তাকে ত্যাগ করলেও মেয়ে বলতে পাগল বুড়ো।

—ছোট মেয়েটি জার্মান নামের এক ব্যাঙ্কারকে বিয়ে করেনি ? বারোঁ দ নুসাঁজাঁই তো লোকটার নাম, তাই না ? মাদাম দ লাঁজের দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করেন ভিকঁতেস।—মেয়েটির নাম দেলফিন। তাই না ? ভারী সুন্দরী! ওপেরায় একটা বক্স্‌ও তার রিজার্ভ আছে—বুফঁতেও যায় মাঝে মাঝে। দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য জোরে জোরে হাসে মেয়েটি।—সেইটিই তো ছোট মেয়ে, না ?

দুশেস তখন হেসে বলেন, সত্যি ডিয়ার, তোমার কথায় আমি অবাক হয়ে যাচ্ছি। এ ধরণের লোক নিয়ে তুমি অত মাথা ঘামাচ্ছ কেন ? রেস্তোর মত পাগল না হলে মাদমোয়াজেল আনাস্তাজি আর তার ময়দার থলের দিকে কেউ ফিরেও চায় নাকি ? তবে রেস্তোর খুব লাভ হয়নি। মেয়েটা এখন মঁশিয় দ ত্রাই-র হাতে আর সে-ই ওর সর্বনাশ করে ছাড়বে।

—বাপকে ওরা ত্যাগ করেছে ? পুনরুক্তি করে ওজেন।

—হ্যাঁগো, নিজের বাপকে ত্যাগ করেছে। ভিকঁতেস বলে ওঠেন।—অতি স্নেহময় বাপ। লোক বলে, সৎপাত্র বিয়ে করে মেয়েরা যাতে সুখী হতে পারে তার জন্য প্রত্যেক মেয়েকে সে নাকি পাঁচ ছয় লাখ ফ্রাঁ দিয়েছিল; আর নিজের জন্য রেখেছিল বছরে মাত্র আট কি দশ হাজার লিভার আয়ের সম্পত্তি। ভেবেছিল, বিয়ের পরেও মেয়ে দুটি তার মেয়েই থাকবে—তাদের

নতুন জীবনে সে দুটি নতুন অস্তিত্ব লাভ করবে—দুটি নতুন বাড়ী পূজা করবে তাকে। কিন্তু বিয়ের পর দু' বছর যেতে না যেতেই জামাইরা হীন অস্পৃশ্যজ্ঞানে তাকে তাড়িয়ে দেয়।

ওজেনের চোখে জল দেখা দেয়। পূত-পবিত্র পারিবারিক স্নেহের শান্তি সে সদ্য ভোগ করে এসেছে—যৌবনের আদর্শবাদ এখনও তাকে প্রভাবিত করে। আজই পারির সভ্য জীবনে তার প্রথম হাতে-খড়ি হল। সাচ্চা আবেগ এমন সংক্রামক যে মুহূর্তের জন্য এই তিনজন নীরবে পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে।

—আঃ! সত্যি, বড় মর্মান্তিক! তবু রোজই আমরা এমনি ঘটনা প্রত্যক্ষ করছি। মাদাম দ লাঁজে বলে ওঠেন।—সত্যি বল ডিয়ার, জামাই যে কত আদরের জিনিস তা কখনও ভেবে দেখেছ? জামাই হচ্ছে সেই মানুষ যার জন্য তোমার আমায় পালন করা হয়েছে। সতের বছর ধরে সংসারে যে আনন্দের নিধি ছিল—সহস্র স্নেহের বন্ধন যে ছোট্ট প্রাণটি ঘিরে রেখেছে, লামার্তিনের মত পবিত্র যার হৃদয়, একদিন সে-ই দুঃখের কারণ হয়ে ওঠে। এই জামাই যখন সেই মেয়েকে আমাদের কাছ থেকে নিয়ে যায়, তখন তার প্রতি মেয়েটির ভালবাসার সুযোগ নিয়ে ক্রমে ক্রমে কুড়ুল মেরে সমূলে সে এই দেবশিশুর অন্তর থেকে বাপের সংসারের প্রতি সমস্ত টান ধ্বংস করে দেয়। দুদিন আগে এই মেয়ে একান্তভাবে আমাদেরই ছিল। আমরাও ছিলাম তার সব কিছু। কিন্তু দুদিন পরেই সে শত্রু হয়ে দাঁড়ায়। রোজই এই মর্মান্তিক ঘটনা আমরা প্রত্যক্ষ করছি না কি? বউয়েরা আবার শ্বশুরদের প্রতি এমন রূঢ় আচরণ করে যা বলবার নয়। অথচ এই শ্বশুর পুত্রের জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করেছে। লোকে বলে শুনি, সমাজে আজকাল কোন নাটকীয় ঘটনা ঘটে কি? কিন্তু জামাইর নাটক কি বিভীষিকাময়! আমাদের বিয়ের কথা না হয় নাই বললাম—সে তো জঘন্য প্রহসন মাত্র। বুড়ো সেমুই ব্যবসায়ীর কি হয়েছে তা আমি বেশ বুঝতে পারছি। যতদূর মনে পড়ে তার নাম তো ফরিও।

—না মাদাম, গোরিও।

—হাঁ, এখন মনে পড়েছে! বিপ্লবের সময় এই গোরিও তার ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের সভাপতি ছিল। কুখ্যাত দুর্ভিক্ষের কথাও জানত লোকটা। আর সেই সময় কেনা দামের দশগুণ দরে ময়দা বেচে নিজের সৌভাগ্যের গোড়াপত্তন

করে। যত ময়দা চাই সে যোগান দিতে পারত। আমার মাতামহীর জমিদারির নায়েব প্রচুর বেচেছিল ওর কাছে। জনমঙ্গল কমিটির সঙ্গে যোগ-সাজসে এই গোরিও বেশ কিছু লুটের ভাগ কুড়িয়ে নিয়েছে। তা ওদের মত লোক অমন করেই থাকে। আমার বেশ মনে আছে, নায়েব আমার মাতামহীকে বলেছিল, নিশ্চিন্তে তিনি গ্রঁদ ভিইয়ে-তে থাকতে পারেন; কারণ তার সেরা ময়দা জনসাধারণের কাছে প্রশংসা পেয়েছিল। গলা-কাটাদের কাছে ময়দা বেচে দিত এই গোরিও। তবু লোকে বলত, লোকটার একটি মাত্র আকর্ষণ ছিল: প্রাণাধিক ভালবাসত মেয়েদের। বড় মেয়েকে সে দ রেস্তোর ঘরে ভাজা-ভাজা হতে দিয়েছে, আর ছোটটিকে চাপিয়েছে বারো দ নুস্যঁজাঁর ঘাড়ে। এই ধনী ব্যাঙ্কার আবার রাজতন্ত্রী বলে পরিচয় দেয়। বেশ বুঝতে পার যে, বোনাপার্ত যতদিন সম্রাট ছিলেন, সেকেলে এই বুড়ো ততদিন হামেশা মেয়েদের বাড়ী আসা-যাওয়া করত। কোন জামাই তাতে আপত্তি করেনি। কিন্তু বুরবোঁরা ফের সিংহাসনে বসবার সঙ্গে সঙ্গে অবস্থা বদলে যায়। বুড়ো তখন মঁশিয় দ রেস্তো আর ধনী ব্যাঙ্কারের পথের কাঁটা হয়ে ওঠে। মেয়েদের তখনও হয়ত বাপের প্রতি কিছুটা মমতা ছিল। তাই তারা দুই-কূল রক্ষা করার চেষ্টা করে। ছাগল ও কপি দুটোই বাঁচাতে চায়।...বাপ ও স্বামী দুজনকেই সন্তুষ্ট রাখতে চায়। অপর কোন দর্শনার্থী না থাকলে তারা এই গোরিওর সঙ্গে দেখা করত, এবং এজন্য নানা অছিলা বার করত। তাতে মনে হত যেন ভালবাসার জন্যই করছে। 'এই এই সময় এস বাবা। খুবই ভাল হবে তাতে, আমরা তখন একলা থাকতে পারব।' এই রকম কথা শোনাত বুড়োকে। কিন্তু আমার ধারণা, সাচ্চা মনোভাবের চোখও আছে, বুদ্ধিও আছে। সেকেলে বুড়ো নিশ্চয়ই ব্যথা পেয়েছে মনে। নিশ্চয়ই সে বুঝতে পারত, মেয়েরা তার জন্য লজ্জা বোধ করে; আর স্বামীকে তারা যদি ভালবাসে তো সে মেয়ে জামাইর মধ্যে ঝামেলা সৃষ্টি করছে। তাই তখন সে আত্ম-ত্যাগ করতে বাধ্য হয়। বাপ হয়ে সে করেও ছিল। মেয়েদের বাড়ী আসা-যাওয়া সে বন্ধ করে দেয়। মেয়েরা সুখে আছে দেখে বুঝতে পারে, ভালোই করেছে। বাপ-মেয়ে দুজনে মিলে এই পাপ কাজটুকু করে। সর্বত্র একই জিনিস দেখতে পাবে। ময়লার দাগ ছাড়া মেয়েদের বৈঠকখানায় এই বুড়ো গোরিওর কি মূল্য আছে বল? তার নিজেরই বিচ্ছিরি লাগত—নিজেই বিরক্ত হয়ে উঠত। মেয়েদের সম্পর্কে

এই বাপের যে দশা হয়েছে, পারির অজস্র সুন্দরীরও যে কোন সময় প্রণয়ী সম্পর্কে সেই দশা হতে পারে। প্রাণ ঢেলে যাকে ভালবাসল, একবার সে যদি এই ভালবাসায় ক্লান্তিবোধ করে তো অমনিই ভেগে যাবে। মেয়েটির হাত থেকে রেহাই পাবার জন্য জঘন্যতম কাজ করতেও সে কুণ্ঠা বোধ করবে না। আমাদের সমস্ত মনোবৃত্তি এক ধরণের। আমাদের অন্তরকে দৌলতখানার সঙ্গে তুলনা করা চলে। সমস্ত সম্পদ উজাড় করে ঢেলে দিয়েছ কি ডুবেছ। নিঃস্বকে যেমন আমরা ক্ষমা করিনা, তেমনি যারা উলঙ্গভাবে নিজেদের মনোভাবে প্রকাশ করে তাদেরও ক্ষমা করতে দ্বিধাবোধ করি। এই বাপ সব কিছু দিয়ে দিয়েছে। তার স্নেহ, তার সমস্ত অন্তর উজাড় করে ঢেলে দিয়েছে এই বিশ বছর ধরে। একদিনে বিকিয়ে দিয়েছে সমস্ত সম্পত্তি। লেবুর সমস্ত রস নিঙড়ে ছিবড়েটা মেয়েরা জঞ্জালে ফেলে দিয়েছে।

—সংসারটা বড় জঘন্য! আঙুল দিয়ে শালের প্রান্ত নাড়াচাড়া করতে করতে নত চোখে বলে ওঠেন ভিকঁতেস। কারণ গল্পটি বলবার সময় তাকে লক্ষ্য করে মাদাম দ লাঁজে যে-সব কথা বলেছেন, তাতে বড় লেগেছে মনে।

—জঘন্য? নাতো! ডুশেস বলেন।—নিজের নিয়মেই চলছে সংসার, ব্যস তার বেশী কিছু নয়। সংসার আমায় জড়াতে পারেনি একথা বোঝাবার জন্যই কথাগুলো বললাম এমন ভাবে। তারপর ভিকঁতেসের হাতে চাপ দিয়ে বলেন, আমিও একমত তোমার সঙ্গে। সত্যিই নর্দমার মত জঘন্য! আর সেই জন্যই নিজেদের খানিকটা উপরে রাখার চেষ্টা করা উচিত।

উঠে গিয়ে তিনি মাদাম দ বোসেয়াঁর কপালে চুমু খান। তারপর বলেন, তোমায় এখন বড় মধুর লাগছে ডিয়ার। তোমার গালে এর চাইতে সুন্দর রঙ কখনও আমার চোখে পড়েনি।

ওজেনের দিকে ফিরে ঈষৎ আনত মস্তকে সম্ভাষণ জানিয়ে বিদায় নেন ডুশেস।

—মহৎ লোক বুড়ো গোরিও। রাত্রে রূপোর রেকাব ভাঙার কথা মনে পড়ে বলে ওঠে ওজেন।

মাদাম দ বোসেয়াঁ নিজের চিন্তায় এত মগ্ন ছিলেন যে কথাটা তার কানে গেল না। নীরবে মিনিট কয়েক কেটে যায়। ছাত্র বেচারি এমন বিভ্রান্তির জড়ত্বে অভিভূত হয়ে পড়ল যে বেরিয়ে যেতেও সাহস হচ্ছিল না, আবার থাকতেও ভরসা পাচ্ছিল না।

ভিকঁতেস অবশেষে বলে ওঠেন, অতি জঘন্য, অতি হিংসুটে এই সংসার! দুঃসময় এলেই বয়ে এসে সংবাদটি জানিয়ে যাবে। এ বন্ধুর অভাব হয় না! ছোরা দিয়ে খুঁচিয়ে অন্তর ক্ষত-বিক্ষত করে দেবে, তবু তোমায় মুঠির তারিফ করতে হবে। এর মধ্যেই শেষ-বিদ্রূপ শুরু হয়ে গেছে! আচ্ছা দেখা যাবে! যাই ঘটুক, আমি হাল ছাড়ছিনে।

সগর্বে মাথা তোলেন মহিয়সী মহিলাটি। গর্বোন্নত চোখে বিজুলি ঝলক ফুটে ওঠে।

তারপর ওজেনকে লক্ষ্য পড়ে বলে ওঠেন, ও, এখনও আছ তুমি!

—হাঁ, আছি এখনও! করুণভাবে জানায় ওজেন।

—শোন মঁশিয় দ রাস্তিঞাক, এই দুনিয়া যেমন তার সঙ্গে ঠিক তেমনি ব্যবহার করবে। তুমি তো সাফল্য চাও, বেশ, আমি তোমায় সাহায্য করব। নারীর দুর্নীতির গভীরতম প্রদেশে নাড়া দিতে হবে তোমাকে, নিক্তিতে ওজন করতে হবে পুরুষের জঘন্য ঠুনকো আত্মম্ভরিতা। দুনিয়ার হালচাল আমার ভাল মত জানা আছে; এমন অনেক-কিছু ছিল যার হদিস আমি জানতাম না। এখন সবটাই জেনেছি। যত নিরাসক্তভাবে হিসেব করে চলতে পারবে, ততই তুমি এগিয়ে যাবে। বেপরোয়া আঘাত হানো, লোকে তোমায় ভয় করবে। ডাক-টানা ঘোড়া যেমন এক একটি পাল্লা ছুটে ক্লান্ত হয়ে পড়ে, পুরুষ হোক কি নারী হোক, কাকেও সেই গাড়ীটানা ঘোড়ার চাইতে বেশী মর্যাদা দিও না। তাহলেই তোমার কামনার লক্ষ্যে পৌছোতে পারবে। মনে রেখ, কোন মেয়ে যদি তোমার সম্পর্কে আগ্রহী না হয় তো কোনদিন এখানে প্রতিষ্ঠা পাবে না। মেয়েটি তরুণী, ধনী আর সৌখিন হওয়া চাই। কিন্তু কখনও যদি সাচ্চা টান অনুভব কর তো ধন দৌলতের মত সঙ্গোপনে সে মনোভাব লুকিয়ে রাখবে। কেউ যেন কোনদিন সন্দেহের অবকাশ না পায়। তাহলেই ডুববে। তাহলে আর জল্লাদ হতে পারবে না—হতে হবে তার শিকার। কোন দিন যদি প্রেমে পড়ে যাও তো, হুঁশিয়ার ভাবে সে মনোভাব গোপন রাখবে। যার কাছে মন খুলছ তার সম্পর্কে যদি নিশ্চিন্ত হতে না পার তো কখনও নতি স্বীকার কর না। ভালবাসা যদি বাঁচাতে চাও তো তার আগেই দুনিয়াকে অবিশ্বাস করতে শেখ। আমার কথা শোন মিগেল (নিজের ভুল লক্ষ্য না করে নেহাৎ স্বাভাবিক ভাবেই তাকে এই নাম ধরে ডাকেন), বাপকে ত্যাগ করা আমাদের পক্ষে নিতান্ত গর্হিত কাজ; বাপের মৃত্যু কামনাই তারা করে। কিন্তু তার চাইতেও

জমজমাট দুই বোনের আড়াআড়ি। সদ্বংশের ছেলে রেস্তো—সৌখিন সমাজ তার স্ত্রীকে গ্রহণ করেছে। রাজদরবারেও হাজির করা হয়েছে তাকে। কিন্তু ছোট বোন মাদাম দেলফিন দ নুস্যাঁজা আরও বড় লোক, আরও সুন্দরী—বেশ বিত্তবানের ঘরণী, তবু সে ক্ষোভে মরে যাচ্ছে—হিংসায় জ্বলে মরছে। বোনের সঙ্গে তার দেড়শ ক্রোশ ব্যবধান। নিজের বোন আর এখন বোন নেই। বাপকে যেমন ত্যাগ করেছে, পরস্পরকেও তারা তেমনিভাবে ত্যাগ করেছে। আমার বৈঠকখানায় ঢোকার জন্য মাদাম দ নুস্যাঁজা রুয় দ গ্রনেল আর রুয়া স্যাঁ লাজারের সমস্ত কাদা ঘাঁটতেও রাজী। ভেবেছিল, দ মারসে তার উদ্দেশ্য সাধনে সাহায্য করবে। তাই নিজেকে সে দ মারসের দাসী করে তুলেছে—উত্ত্যক্ত করে তুলেছে দ মারসেকে। দ মারসে তাকে বড় আমল দেয় না। তুমি যদি আমার সঙ্গে তার দেখা করিয়ে দিতে পার তো তুমিই তার ব্যাজামঁ্যা হবে—পূজা করবে তোমাকে। পার তো এর পর তাকে ভালবেস, আর না হয় তাকে কাজে লাগিও। বড় রকম পার্টিতে এখানে যেদিন বহু লোক জমায়েৎ হবে, তখন বড় জোর বার দুয়েক আমি অতিথি হিসাবে তাকে গ্রহণ করতে পারি। কিন্তু সকাল বেলা দেখা হবে না। দেখা হলে আমি তাকে অভিবাদন করব। ব্যস, সেই যথেষ্ট! বুড়ো গোরিওর নাম করায় কঁতেসের দরজা তোমার কাছে বন্ধ। নিজেই সে কপাট বন্ধ করার ব্যবস্থা করেছ। হাঁ হে বন্ধু, বিশবার তার বাড়ীতে যাও তো বিশবারই শুনবে মাদম দ রেস্তো বাড়ী নেই। সেখানে আর তোমায় ঢুকতে দেবে না। তাহলে মাদাম দেলফিন দ নুস্যাঁজার বাড়ীতে তোমার ঢোকার পথ করে দিক না বুড়ো গোরিও। সুন্দরী মাদাম দ নুস্যাঁজা তোমার পতাকার কাজ করবে। সেই পরিচয় করিয়ে দেবে তোমাকে। সে যদি তোমায় আনুকূল্য করে তো আর আর মেয়েরাও দেখবে নজর দিতে শুরু করেছে। তার প্রতিদ্বন্দ্বী, তার বান্ধবী—তার প্রিয়তম বান্ধবীরাও দেখবে তোমাকে তার কাছ থেকে চুরি করে নেবার চেষ্টা করছে। এমন বহু মেয়ে আছে যারা অন্য কোন মেয়ে পছন্দ করেছে বলেই সেই পুরুষকে ভালবাসে। মধ্যবিত্ত মেয়েরা যেমন আমাদের মত টুপি পরে মনে করে যে আমাদের হাল-চাল রপ্ত করেছে, এ ব্যাপারটাও অনেকটা সেই ধরণের। নিশ্চয় তুমি কৃতকার্য হবে। পারি শহরে সামাজিক সাফল্যই সব কিছু—এইটাই ক্ষমতার চাবিকাঠি। মেয়েরা যদি মনে করে যে তুমি বেশ চালাক-চতুর, তাহলে পুরুষেরাও বিশ্বাস করবে, যদি অবিশ্যি তুমি তাদের ভুল ভেঙে না দাও। তারপর যত ইচ্ছা

উচ্চাশা করতে পার—সর্বত্র তুমি অবাধ যাতায়াতের অধিকার পাবে। তখন বুঝতে পারবে যে দুনিয়াটা মূর্খ আর বদমায়েসের মেলা। খেয়াল রেখ, এর যে কোন দলে পড়ে গেলেই গোলমাল। এই গোলক ধাঁধার জট খোলার জন্য আরিয়াদনের মত আমি তোমায় হদিস বলে দিলাম। দেখ, ভুল করে ফেল না যেন! থুতনিটা তুলে চেয়ে বলেন ভিকঁতেস। তারপর ওজেনের দিকে অদ্ভুত কৌতূহলী চোখে চেয়ে বলেন, এ চাবিকাঠি ময়লা না করে আমায় ফেরত দিতে হবে কিন্তু। এখন যাও, আমায় একলা থাকতে দাও। আমাদের মেয়েদের নিজের নিজের ঝামেলাও বড় কম নয়—তার সঙ্গেও বুঝতে হয়।

—মাইন পোঁতার জন্য কোন লোকের দরকার আপনার হবে কি? ভিকঁতেসের কথার মধ্যেই বলে ওঠে ওজেন।

—তার মানে? মহিলাটি জিজ্ঞাসা করেন।

বুকে হাত দিয়ে নিজেকে দেখায় ওজেন। তারপর বোনের হাসির প্রত্যুত্তরে হেসে বেরিয়ে পড়ে।

বেলা পাঁচটা বাজে। বেশ খিদে পেয়েছে ওজেনের। শঙ্কা হল, ডিনারে যেতে বিলম্ব হয়ে যাবে হয়ত। সঙ্গে সঙ্গে পারি শহরে দ্রুত চলাচলের সুবিধার কথা মনে পড়ে। নিছক জৈবিক আনন্দের মোহে অবাধে সে মানসিক দুশ্চিন্তার সঙ্গে লড়াই করে যায়। ঘৃণ্য আচরণ এ বয়সের যুবকদের মর্মমূলে আঘাত করে। ক্রোধে দপ করে জ্বলে ওঠে তারা, ঘুষি বাগিয়ে গোটা সমাজকে দেখে নেব বলে শাসায় আর প্রতিশোধ নেবার সঙ্কল্প করে। তবু তাদের আত্মবিশ্বাস শিথিল হয়ে যায়। একটি মাত্র কথা ছাড়া এই সময় আর কিছুই ভাবতে পারছে না রাস্তিঞাক! নিজেই বন্ধ করেছ কঁতেসের দরজা।

মনে মনে ভাবে, আবারও যাবে তার ওখানে। মাদাম দ বোসেয়াঁর কথাই যদি ঠিক হয়, প্রবেশের অধিকার যদি না পাই তো যে বৈঠকখানায় মাদাম দ রেস্তো ঢুকবে সেখানেই আমার দেখা পাবে। তার আগে আমায় অসিচালনা আর পিস্তল ছোঁড়াটা শিখে নিতে হবে। তার জন্যই তার মাকসিমকে খতম করে দেব।

সঙ্গে সঙ্গে বিবেক জিজ্ঞাসা করে, টাকার কি হবে? কোত্থেকে জোটাবে?

অমনিই মাদাম দ রেস্তোর বাড়ীর ধন দৌলতের বিলাসের দৃশ্য চোখের সামনে ভেসে ওঠে। এমন বিলাসিতার জাঁক সে দেখে এসেছে যে মাদমোয়াজেল গোরিওর মত মেয়ে তার মোহে না পড়ে পারে না। দেখেছে, সোনা

চাঁদির দামি জিনিস দেখাবার আগ্রহ, নতুন ধনীদের বিচারহীন জাঁকজমক আর রাজ-পারিষদের মত নির্বোধ অতিব্যয়িতা। বনেদী আভিজাত্যমণ্ডিত ওতেল দ বোসেয়াঁর কথা মনে পড়ে এই মধুর ছবিও সহসা রাহুগ্রস্ত হয়ে পড়ে। কল্পনায় পারির সমাজ জীবনের সুউচ্চ চূড়ায় উড়ে বেড়াবার সময় হাজারো গোপন চিন্তা তার অন্তর আলোড়িত করে; প্রসারিত হয় জীবনের দিগন্ত—শিথিল হয়ে যায় বিবেকের নিষেধ। দুনিয়ার আসল রূপ সে চিনতে পারে। বুঝতে পারে, আইন আর নৈতিক বিধান ধনীসমাজে কত ক্ষমতাহীন; আর সাফল্যই সমাজের সব কিছুর চূড়ান্ত নিয়ামক।

—ঠিকই বলেছে ভোতর্যাঁ, সাফল্যই সবকিছু! মনে মনে বলে ওজেন।

মেজঁ ভোকেতে পৌঁছে কোচোয়ানকে দশ ফ্রাঁ দেবার জন্য দৌড়ে সে উপরে উঠে যায়। তারপর ঢোকে বিরক্তিকের খাবার ঘরে। আঠারজন অতিথি সেখানে জানোয়ারের মত হাপুস হাপুস করে গিলছে। এই ঘরের করুণ দৃশ্য আর তার দারিদ্র্য-ক্লিষ্ট ভাড়াটেদের আজকে ঘৃণ্য বলে মনে হয়। এমন আচমকা এমন পুরোপুরি এই পরিবর্তন ঘটেছে যে তার মনে নতুন প্রেরণার জোয়ার এসেছে। অসীমে প্রসারিত করেছে তার উচ্চাশার সীমা। একদিকে সুসভ্য সামাজিক জীবনের সন্থ-দেখা মধুর ছবি মনে পড়ছে—ভেসে উঠেছে আর্ট ও বিলাসিতার অপূর্ব সৃষ্টির পটভূমিকায় তরুণ প্রাণোচ্ছল নর-নারীর আবেগভরা কাব্যময় মুখছবি। আর চোখের সামনে রয়েছে বিষণ্ন পটে আঁকা কলুষ কলঙ্কিত মুখ। আবেগ পালিয়ে গেছে এ মুখ থেকে—পড়ে আছে শুধু খাঁচা আর পুতুল নাচাবার তারগুলো। বিপ্রলব্ধা পরিত্যক্তা নারী বলে ক্ষোভের বশে কতগুলি সদুপদেশ বেরিয়ে এসেছে মাদাম দ বোসেয়াঁর মুখ থেকে। আপাতমধুর কিছু সাহায্যের প্রতিশ্রুতিও দিয়েছেন। মনে পড়ল সেই উপদেশের কথা। কিন্তু দারিদ্র্য সব কিছু ঘিরে রেখেছে। জ্ঞান ও ভালবাসার আলাদা পথ ধরে ভাগ্যের মন্দিরে সমান্তরালে দুটি অভিযান চালাবার সঙ্কল্প করে রাস্তিঞ্যাক। আইন-শাস্ত্রবিদ ও বৈষয়িক লোক হতে চায়। এখনও বড্ড ছেলেমানুষি আছে! ক্রমে ক্রমে বাঁকা হয়ে এই দুটি লাইন কাছাকাছি আসে বটে, কিন্তু কোন কালেই এক হয় না।

—আপনাকে যেন বেশ গম্ভীর মনে হচ্ছে মার্কি! তীক্ষ্ণদৃষ্টি হেনে বলে ওঠে ভোতর্যাঁ। এই সন্ধানী দৃষ্টি দিয়েই সে মানুষের নিগূঢ় চিন্তার রহস্য ভেদ করে।

—মার্কি বলে আমায় যারা শ্লেষ করে তাদের রসিকতার জবাব দেবার মত মেজাজ আমার নেই। ভোতর‍্যাঁর কথার জবাবে শুনিয়ে দেয় ওজেন।—এখানে মার্কি হতে গেলে বছরে অন্তত হাজার লিভার আয় থাকা দরকার। সেই সৌভাগ্যের অধিকারী হলে মেঞ্জ্ঁ ভোঁকেতে কেউ থাকে না।

আধ স্নেহমাখা, আধ ব্যঙ্গভরা দৃষ্টিতে রাস্তিঞাকের দিকে তাকায় ভোতর‍্যাঁ। যেন বলতে চাইছে: হায় অবোধ শিশু! এক গ্রাসে তোমার মত লোক আমি গিলে ফেলতে পারি। তারপর বলে, সুন্দরী ভিকঁতেস দ রেস্তোর ওখানে সুবিধে হয়নি বলেই মেজাজ খিচড়ে গেছে বুঝি?

—তার বাবা আমাদের টেবিলে বসে খায় একথা বলায় তার দুয়ার আমার কাছে বন্ধ হয়ে গেছে। রাস্তিঞাক খেঁকিয়ে ওঠে।

ভাড়াটেরা পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে। বুড়ো গোরিও চোখ নীচু করে এবং মুখ ঘুরিয়ে চোখ মোছে।

—আঃ, আমার চোখে নস্যি ছিটিয়ে দিলে যে! পাশের লোকটাকে বলে সে।

—আজ থেকে বুড়ো গোরিওকে যারা বিদ্রূপ করবে, আমি দেখে নেব তাদের। সেমুই-ব্যবসায়ীর পাশের লোকটির দিকে চেয়ে বলে ওজেন।—আমরা সবাই মিলেও ওর সমান নই—মহিলাদের কথা অবিশ্যি বলছিনে! মাদমোয়াজেল তাইফেরের দিকে চেয়ে সে কথা শেষ করে।

এই মন্তব্যে সবাই হতভম্ব হয়ে যায়। এমনভাবে ওজেন কথাটা বলে যে সবাই চুপ করে যায়। শুধু ভোতর‍্যাঁই শ্লেষভরে বলে, বুড়ো গোরিওর বোঝা যদি নিজের কাঁধে নিতে চাও, যদি তার রক্ষক হতে চাও তো আগে অসিচালনা আর গুলি ছুঁড়তে ওস্তাদ হয়ে নাও।

—সে ইচ্ছেও আছে। ওজেন বলে।

—আজ থেকেই যুদ্ধের জন্য তৈরী হচ্ছ তাহলে?

—হয়ত তাই। রাস্তিঞাক সায় দেয়।—কিন্তু সে আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার; আর সে জন্য কারও কাছে আমি জবাবদিহি করতে রাজী নই। কারণ, অন্য লোক রাত্রির অন্ধকারে কি করে বা না করে তা নিয়ে তো আমি মাথা ঘামাই না।

আড়চোখে ওজেনের দিকে তীক্ষ্ণ অর্থপূর্ণ দৃষ্টি হানে ভোতর‍্যাঁ।

—পুতুল-নাচে যদি বিভ্রান্ত হতে না চাও তো পর্দার আড়ালে যাও বৎস!. পর্দার ফুটো দিয়ে উঁকি মেরে কি বুঝবে? বুঝলে? ওজেন রাগে টগবগ করছে দেখে

বলে ভোতর‍্যাঁ।—দু' চারটে কথা আছে তোমার সঙ্গে। যখন তোমার সময় হয় বলতে পারি।

খাবার টেবিলে একটা মনমরা ভাব, সাধারণ একটা বিষণ্ণতা দেখা দেয়। ছাত্রটির কথায় দুঃখের গহ্বরে ডুবে গেল বুড়ো গোরিও। বুঝতে পারল না যে তার সম্পর্কে লোকের ধারণা বদলে গেছে। বুঝল না যে উৎপীড়কদের স্তব্ধ করে দেবার মত এক যুবক তার স্বপক্ষে দাঁড়িয়েছে।

—তুমি কি তাহলে এই কথাই বলতে চাও যে মঁশিয় গোরিও এক কঁতেসের বাপ? চাপাগলায় জিজ্ঞাসা করেন মাদাম ভোকে।

—শুধু তাই নয়, বারনেরও বাপ। রাস্তিঞাক জানায়।

—শুধু ঐ ক্ষমতাই আছে। রাস্তিঞাককে বলে বিয়াশঁ।—ওর মাথাটা আমি পরীক্ষা করেছি একবার। একটি পোকাই আছে তার মধ্যে—সে পোকা পিতৃত্বের। চিরন্তন বাপ হতে পারবে লোকটা।

ওজেনের মন এত ভারাক্রান্ত ছিল যে বিয়াশঁর রসিকতায় হাসতে পারল না। কি করে মাদাম দ বোসেয়াঁর উপদেশের সদ্ব্যবহার করা যায় তার চিন্তায় সে অনন্যমনা। ভাবছে, কি করে, কোত্থেকে কিছু টাকা যোগাড় করতে পারে। নিজের চোখে সে দুনিয়ার অমৃত-ভাণ্ড দেখে এসেছে। এখনও সেই অমৃত-সম্ভার তার কাছে অর্থহীন, তবু সম্ভাবনাপূর্ণ। অর্থচিন্তায় সে অনন্যমনা হয়ে পড়ে। বাকী আর সবাই খাওয়া শেষ করে একের পর এক উঠে যায়। একলাই সে পড়ে থাকে। আর ছিল বুড়ো গোরিও।

—আমার মেয়েকে দেখেছ তাহলে? আবেগ-কম্পিত গলায় জিজ্ঞাসা করে বৃদ্ধ।

ওজেনের দিবাস্বপ্ন ভেঙে যায়। বুড়োর হাতখানা টেনে নিয়ে দরদভরা সুরে বলে, মহৎ লোক আপনি। মেয়েদের কথা পরে বলব এক সময়।

গোরিওর জবাবের প্রতীক্ষা না করেই উঠে পড়ে ওজেন, এবং নিজের ঘরে গিয়ে মায়ের কাছে এই চিঠিখানি লেখে:

প্রিয় মা,

জননীর বদান্যতার নতুন কোন সূত্র আমার জন্য বার করতে পারবেন কিনা চেষ্টা করে দেখবেন। আমি এমন অবস্থায় আছি যে এখুনি নিজের ভাগ্য গড়ে তুলতে পারি। কিন্তু বারশ' ফ্রাঁ আমার একান্ত প্রয়োজন। যে কোন উপায়ে হোক এ অর্থ আমার চাই। বাবার কাছে একথা প্রকাশ করবেন না। তিনি

হয়ত আপত্তি করে বসবেন। কিন্তু এই অর্থ যদি না পাই তবে এমন ভয়ানক হতাশ হয়ে পড়ব যে আত্মহত্যাও করে বসতে পারি। আমার অবস্থা চিঠিতে বোঝাতে বেশ কয়েকখানি বই লিখে ফেলতে হয়। জুয়া আমি খেলি না মা, কোন ঋণও আমার নাই। কিন্তু আপনার দেওয়া জীবন যদি বাঁচাতে চান তবে এ অর্থ আপনাকে যে ভাবে হোক সংগ্রহ করতেই হবে। ভাল কথা, ভিকঁতেস দ বোসেয়াঁর সঙ্গে দেখা করেছি। তিনি আমায় আশ্রয় দিয়েছেন। সৌখিন সমাজে মেলা-মেশা করতে হয় আমাকে। অথচ হাতে এক কপর্দকও নেই যে পরিচ্ছন্ন এক জোড়া দস্তানা কিনি। শুকনো রুটি আর জল খেয়ে দিন কাটাতে শিখতে পারি, প্রয়োজন হলে উপোস করতেও রাজী, কিন্তু ভব্য সমাজে মেলা-মেশার উপযোগী পোশাক-আশাক না হলে আমার কিছুতেই চলবে না। হয় আমাকে মনস্থির করে নিজের পথ করে নিতে হবে, আর না হলে চিরকাল পাঁকে আটকে থাকতে হবে। আপনার সমস্ত আশা আকাঙ্ক্ষা যে আমার উপর নির্ভরশীল তা আমার জানা। এও জানি, মনে মনে আপনি কামনা করছেন যেন অচিরেই সেই আশা পূর্ণ হয়। আমার কথা শুনুন মা, কিছু গহনা বিক্রী করে দিন। আবার আমি তা গড়িয়ে দেব। আমাদের পরিবারের অবস্থা আমার জানা। বুঝি, এ ত্যাগের অর্থ কি? তবু বিশ্বাস করুন, সামান্য কারণে এ দাবী আমি করছি না। আমি যদি জানোয়ার হতাম তো তার সম্ভাবনা ছিল। আপনাকে উপলব্ধি করতে হবে যে একান্ত প্রয়োজনে এই আবেদন আমায় জানাতে হচ্ছে। আমার অভিযান শুরু করার জন্য এই যে অর্থের প্রয়োজন তার উপর আমাদের সমস্ত ভবিষ্যৎ নির্ভর করে। কারণ, পারির জীবনে সংগ্রাম চিরন্তন। এই অর্থ দেবার জন্য যদি মাসির লেসও বিক্রী করতে হয়, তাহলে তাকে বলবেন, অচিরেই আমি আরও ভাল একটা পাঠাব।

চিঠির বাকী বয়ানটুকুরও একই সুর।

সঞ্চিত অর্থ পাঠিয়ে দেবার জন্য বোনেদের কাছেও সে চিঠি লেখে। পরিবারের লোকজন আনন্দে এ ত্যাগ করবে জেনেও এ সম্পর্কে আলোচনা বন্ধ করার উদ্দেশ্যে বোনেদের অন্তরের দুর্বলতায় আঘাত করে ওজেন—তাদের আত্ম-মর্যাদাবোধের তারে নাড়া দেয়। এ তার তরুণ মনে বড় কড়া সুরে বাঁধা থাকে আর সামান্য স্পর্শেই ঝঙ্কৃত হয়ে ওঠে। এ সত্ত্বেও চিঠি লেখা শেষ করে আচমকা তার গা শিউরে ওঠে…বুকের মধ্যে ধড়াস ধড়াস করে। কাঁপতে থাকে ওজেন। অপূর্ব নবজাত উচ্চাশার তাড়নায় এই কাজ সে করল বটে,

তবু সংসার থেকে দূরে নির্জনে যে হৃদয় লালিত, তার নিষ্কলুষ মহত্ব তার অজ্ঞাত নয়। ওজেন জানে, তার জন্য কতটা ছল-চাতুরি করতে হবে বোনেদের। আবার এও জানে যে কতটা আহ্লাদ হবে তাদের, আর গোপনে বাগানের মধ্যে বসে দুই বোনে আদরের ভাইয়ের সম্পর্কে কতই না আলোচনা করবে। উজ্জ্বল আলোর মত তার বিবেক উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। সেই উদ্ভাসে বোনেদের সে গোপন সঞ্চয় গুণতে দেখে। এই রহস্য উদ্‌ঘাটনের জন্য সমবয়সী তরুণীদের মত তাদের হিংসুটে বুদ্ধি প্রয়োগ করছে বলেও যেন দেখতে পায়। বাপ-মার অজ্ঞাতে স্বার্থহীন মহৎ উদ্দেশ্যের জন্য এই অর্থ পাঠিয়ে সর্বপ্রথম তারা প্রবঞ্চনায় হাতে খড়ি দিচ্ছে। হীরার মত পবিত্র ভগিনীদের হৃদয়—মমতার খনি! মনে মনে বলে ওজেন। চিঠি ক'খানার জন্য তার লজ্জা হয়।

কত ঐকান্তিক আবেগভরে তারা ভাইয়ের জন্য প্রার্থনা করবে! ভগবানের প্রতি তাদের ভক্তি পবিত্র! তার জন্য এই স্বার্থত্যাগ করতে তাদের আনন্দের সীমা পরিসীমা থাকবে না। সবটা অর্থ পাঠাতে না পারলে মায়ের প্রাণ কত ব্যথাই যে পাবে! এই মহৎ মমতা, এই কষ্টকর স্বার্থত্যাগ—সবই তো দেলফিন দ ন্যুসঁজাঁর কাছে পৌছোবার মই তৈরী করার জন্য! পরিবারের পবিত্র যজ্ঞ-বেদী মূলে ধূপের শেষ গুঁড়োটুকু ছুঁড়ে মারার মত ওজেনের চোখ দিয়ে কয়েক ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ে। হতাশাভরা উত্তেজনায় ঘরের মধ্যে অনবরত পায়চারি করতে থাকে রাস্তিঞাক।

আধ-খোলা দরজার ফাঁক দিয়ে তার এই অবস্থা দেখে ঘরে ঢুকে খোঁজ নেয় বুড়ো গোরিও।

—হল কি মঁশিয় ?

—আরে, পড়শী যে! আপনি যেমন বাপ, আমিও এখন ঠিক তেমনিধারা পুত্র আর ভাই! কঁতেস আনাস্তাজি সম্পর্কে শঙ্কার সঙ্গত কারণ আছে। তিনি এখন মঁশিয় মাকসিম দ ত্রাই নামে একটা লোকের কব্‌জির মধ্যে। এই লোকটাই ওর সর্বনাশের কারণ হবে।

থতমত খেয়ে দুর্বোধ্য ভাষায় বিড়বিড় করে ওজেনকে কি যেন বলে বেরিয়ে যায় গোরিও।

পরদিন চিঠি কখানা নিয়ে ডাকঘরে যায় ওজেন। শেষ মুহূর্ত অবধিও সে ইতস্তত করে; শেষ-মেষ বাক্সের মধ্যে ফেলে দেয়। বলে, সফলকাম আমার হতেই হবে। জুয়াড়ী কিংবা বিরাট যোদ্ধারা ব্যবহার করে এই ভাষা। এই

মারাত্মক শব্দ কটি খুব সামান্য জনকয়েককে সিদ্ধি দিয়েছে, কিন্তু ধ্বংসের কারণ হয়েছে বহুর।

দিন কয়েক পরে মাদাম দ রেস্তোর সঙ্গে দেখা করতে যায় ওজেন। বাড়ীতে ছিলেন না তিনি। তিন দিন সে এমন সময় এসেছে যখন কঁৎ মাকসিম দ ত্রাই-র থাকার কথা নয়। ভিকঁতেস ঠিক কথাই বলেছিলেন।

ছাত্রটি এখন পড়াশুনা ছেড়ে দিযেছে। শুধু হাজিরা ঠিক রাখার জন্য কলেজে যায়, এবং হাজিরা হযে গেলেই ভেগে পড়ে। অধিকাংশ ছাত্রের মত সেও স্থির করে যে পরীক্ষা এগিয়ে না আসা পর্যন্ত পড়াশোনা স্থগিত রাখা যেতে পারে। দ্বিতীয় ও তৃতীয বর্ষের পাঠ্য জমা হোক, তারপর শেষ মুহূর্তে এক চোটে গোটা আইনশাস্ত্র শিখে নেবে। ফলে পনের মাস সে পারির সমুদ্রে পাল তুলে ঘুরে বেড়াবার, সৌভাগ্যের সন্ধানে এখানে-ওখানে টোপ ফেলার আর পৃষ্ঠপোষিকার কাজ করতে পারে এমন এক নারীর সন্ধানে ঘুরে বেড়াবার ফুরসুৎ পায়।

এই সপ্তাহেই দুবার সে মাদাম দঁ বোসেয়ঁার সঙ্গে দেখা করেছে। প্রতি-বারই ঢুকেছে মার্কি দাজ্যুজা প্যাতোর গাড়ি বেরিযে যাবার পর। এই বিশিষ্টা মহিলা, ফোবুর স্যাঁ জেরমঁার অভিজাত পাড়ার এই চরম রহস্যময়ী নারী দিন কয়েকের মত মাদমোয়াজেল দ রশফিদের সঙ্গে মার্কি দাজ্যুজা প্যাতোর বিবাহ স্থগিত রাখতে সমর্থ হন। মনে হয তারই বুঝি জয় হবে। কিন্তু সুখ থেকে বঞ্চিত হবার শঙ্কাভরা চরম উচ্ছ্বাসে উজ্জ্বল এই শেষের দিনকটি সর্বনাশ আরও এগিয়ে নিযে আসে। রশফিদদের সঙ্গে মার্কি দাজ্যুজা একমত হন যে, এই ঝগড়া মিটিযে ফেলা তার পরিকল্পনার অনুকূল হবে। তারা আশা করে, মাদাম দ বোসেযঁা ক্রমে ক্রমে বিযের পরিকল্পনা সম্পর্কে অভ্যস্ত হয়ে যাবেন এবং বিয়ে করা যে পুরুষের জীবনের স্বাভাবিক সিদ্ধান্ত একথা উপলব্ধি করে শেষ অবধি মঁশিয় দাজ্যুজার সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ বন্ধ করে দেবেন। কাজেই পবিত্র প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও মঁশিয় দাজ্যুজা অভিনয় করে যায়, আর ভিকঁতেস স্বেচ্ছায় নিজের চোখে ঠুলি পরাতে দেন।

—বীরাঙ্গনার মত জানালা থেকে ঝাঁপ দিয়ে না পড়ে, নিজেকে সে নীচের তলায় ঠেলে ফেলতে দিচ্ছে। মাদাম দ বোসেয়ঁার অন্তরঙ্গ বান্ধবী দুশেস দ লাঁজে বলতেন।

সুখ-শান্তির শেষ আভাস বেশ কয়েকদিন সমুজ্জ্বল থাকে। ফলে পারিতে

থেকে তরুণ আত্মীয়ের উদ্দেশ্যসাধনের সহায়ক হতে পারেন ভিকঁতেস। ওজেনের প্রতি কিঞ্চিৎ স্নেহের দুর্বলতা ছিল মহিলাটির। মেয়েরা যখন কোন মায়া-মমতার সন্ধান পায় না, কারও চাহনির মধ্যে যখন সান্ত্বনা দেবার কোন আন্তরিক আগ্রহের আভাস পায় না, স্বার্থপ্রণোদিত হয়ে ছাড়া পুরুষেরাও যখন তোষামোদ করতে এগোয় না, সেই করুণ অবস্থায় ভিকঁতেসের সঙ্গে আন্তরিকতাভরা দরদী আচরণ করেছে ওজেন।

দ মুসাঁর্জাঁর প্রাসাদে ঢুকবার আগে রাস্তিঞাক যেমন নিজের চাল-চলন মার্জিত করে নিতে চেয়েছে, তেমনি গোরিওর গত জীবনের ইতিহাস জেনে নেবার আগ্রহও তার কম ছিল না। বিশ্বাসযোগ্য যে সব সংবাদ সে সংগ্রহ করেছে মোটামুটিভাবে তার মর্ম এই :

বিপ্লবের পূর্বে এক সেমুই ব্যবসায়ীর অধীনে কাজ করত জঁ্যা-জোঁয়াখ্যা গোরিও। যেমন নিপুণ তেমনি মিতব্যয়ী ছিল লোকটা। ১৭৮৯ সালের প্রথম বিদ্রোহে মালিক নিহত হলে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানটি সে কিনে নেয়। কর্ণ একস্-চেঞ্জের (শস্যের বাজার) কাছাকাছি রুয় দলাঁ জুসিয়েনে সে অফিস খোলে এবং দুরদৃষ্টিবলে অমন বিপজ্জনক সময়ে প্রভাবশালী বিশিষ্ট লোকের সমর্থন লাভের আশায় নিজের ব্যবসায় সঙ্ঘের সভাপতিত্ব গ্রহণ করে। এই দূরদর্শিতার জন্যই সে নিজের সৌভাগের বুনিয়াদ গড়ে তুলতে সমর্থ হয়, এবং সাচ্চা কি কৃত্রিম আকালের সময় ফেঁপে ওঠে। এই দুর্ভিক্ষের সময় খাদ্যশস্য অগ্নিমূল্যে বিক্রী হত পারিতে। রুটির জন্য রুটিওলার দরজায় লড়াই করে বহু লোকের প্রাণান্ত হয়েছে। বাকী আর সবাই হৈ হল্লা করে ইতালীয় পেষ্ট্রির জন্য মুদির দোকানে চলে যেত। এই বছরে প্রচুর মূলধন সঞ্চয় করে নাগরিক গোরিও। এত অর্থ সে জমায় যে, ব্যবসায়ীর হাতে যথেষ্ট পুঁজি থাকলে যতটা সুবিধাভোগ করা যায়, পরবর্তীকালে তার সমস্ত সুবিধা ভোগ করেছে গোরিও। সাধারণ যোগ্যতা-সম্পন্ন মানুষের ভাগ্য যেমন হয়, তার চাইতে বেশী ভাগ্যবান সে হতে পারেনি। এই মাঝারি যোগ্যতাই তাকে বাঁচিয়েছে। তাছাড়া তার সাফল্যের কথা যখন জানাজানি হয়, ধনী হওয়া তখন ত.া বিপজ্জনক নয়। কারও হিংসা সে উদ্রেক করেনি। শস্যের ব্যবসায়ে তার সমস্ত মন-বুদ্ধি নিয়োজিত থাকত বলে মনে হয়েছে। গম, ময়দা কি ভূষির প্রকৃতি বুঝতে, তার তারতম্য বা উৎপত্তিস্থান চিনতে, শস্য মজুত করতে কি বাজার দর আঁচ করতে, কিংবা ফলন সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করতে, সস্তা দরে মাল কিনে সিসিলি কি উক্রাইনে

গোলাজাত করে রাখতে কোন ব্যবসায়ী গোরিওর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে পারত না। তার ব্যবসা পরিচালনার পদ্ধতি দেখলে, কিংবা শস্য আমদানি বিধির রপ্তানি সংক্রান্ত আইন কানুন সম্পর্কে তার ব্যাখ্যা শুনলে কি ঐসব অন্তর্নিহিত নীতি বা তার দুর্বলতা সম্পর্কে তাঁর বিশ্লেষণ শুনলে, যে কারও মনে হত যে লোকটা মন্ত্রী হবার উপযুক্ত। ধৈর্যশীল, কর্মঠ, উদ্‌যোগী, অটল আর চটপটে এই মানুষটির দৃষ্টি ছিল ঈগলের মত তীক্ষ্ণ। সব কিছুই সে আগাম বুঝতে পারত— সব কিছুই জানত আর গোপনও করত সব কিছু। কূটনীতিকের মতই যে কোন অবস্থা সে বিশ্লেষণ করতে পারত। আর সেই সঙ্গে ছিল আগুয়ান সৈনিকের মত পা টেনে ধীর মন্থরে নিরলস এগিয়ে চলার ক্ষমতা। এই বিশিষ্ট স্থান থেকে যদি তাকে সরিয়ে নেওয়া যায়, যে নগণ্য অজ্ঞাতপরিচয় হিসাব-নিকাশের বাড়ীর চৌকাঠে হেলান দিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা সে অবসর সময় কাটিয়েছে সেই দরজা থেকে যদি তাকে অন্য কোথাও নিয়ে যাওয়া তো অমনিই সে সাবেক অমার্জিত হাঁদা শ্রমিক হয়ে পড়বে। কোন যুক্তি বোধগম্য হবে না, কোন আনন্দ সাড়া জাগাবে না মনে। থিয়েটারে গেলে ঘুমিয়ে পড়বে। পারির এই দলিবাঁ তখন শুধু নির্বুদ্ধিতার জন্যই বিশিষ্টতা অর্জন করবে। তার মত প্রকৃতির সমস্ত মানুষের স্বভাব একই ধরণের। প্রায় প্রত্যেকের অন্তরেই এক একটা মহৎ প্রেরণা থাকে। শস্যের ব্যবসা যেমন তার সমস্ত বুদ্ধি আচ্ছন্ন করে রেখেছিল, তেমনি দুটি উচ্ছ্বসিত আবেগ আচ্ছন্ন করে রেখেছিল তার অন্তর। লা ব্রির সম্পন্ন এক চাষীর একমাত্র কন্যাকে বিয়ে করেছিল গোরিও। স্ত্রী প্রথমে তার অন্তহীন ভালবাসা, তার ভক্তিপূর্ণ শ্রদ্ধার পাত্রী ছিল। এই মহিলার মধ্যে কোমল অথচ দৃঢ় এক ব্যক্তিত্বের, মধুর আর অনুভূতিমণ্ডিত এক চরিত্রের সন্ধান পেয়েছিল গোরিও। এই প্রকৃতি তার চরিত্রের বিপরীত ধর্মী। মানুষের অন্তরে যদি কোন সহজাত বৃত্তি থাকে তো অসহায়কে আজীবন নিরবচ্ছিন্ন আশ্রয়দানের গর্বই সেই বৃত্তি। আনন্দের মৌলিক উপচারের প্রতি নিষ্কলুষ চরিত্রের মানুষের আবেগতপ্ত কৃতজ্ঞতাবোধের সঙ্গে এই গর্ব আর ভালবাসা যোগ দিলে মানব প্রকৃতির বহু অসঙ্গতির রহস্য বোঝা যায়। একটানা সাত বছর মেঘ-মুক্ত সুখভোগের পর দুঃসময়ে স্ত্রীকে হারাল গোরিও। মহিলা এই সময় পারিবারিক স্নেহ-বন্ধনের বাইরের ব্যাপারেও তাকে প্রভাবিত করতে শুরু করেছিল। কালে এই মহিলাটি হয়ত গোরিওর মত জড় প্রকৃতির মানুষকেও প্রকৃত মানুষ করে তুলতে পারত। আবার সে-ই হয়ত স্বামীকে

ব্যবসায়িকে জগতের বাইরের দুনিয়ার শঙ্কা-সন্দেহ আর সেখানকার জীবন সম্পর্কে সচেতন করে তুলতে পারত। কিন্তু অবস্থা যা দাঁড়াল তাতে পিতৃস্নেহ শেষ অবধি গোরিওর বাতিকের সামিল হয়ে ওঠে। মৃত্যুর দরুণ যে স্নেহ-সম্ভার ব্যর্থ হয়ে গেল, সেই স্নেহই দুটি মেয়ের উঁপর পড়ে। আর এই পাত্রান্তর প্রথম দিকে তার আন্তরিক আবেগের পিয়াসা পুরোপুরি মিটিয়েছে। কন্যা সম্প্রদানের আশায় বহু ব্যবাসায়ী আর কৃষক বহু লোভনীয় বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে এসেছে তার কাছে। তবু সে স্থির-প্রতিজ্ঞায় বিপত্নীক রয়ে যায়। শ্বশুরের সঙ্গে খানিকটা হৃদ্যতা ছিল গোরিওর। এই ব্যাপারে তিনি সগর্বে বলতেন, স্ত্রী মারা গেলেও তার প্রতি অবিশ্বাসী না হবার শপথ করেছে গোরিও। শস্যের বাজারের ব্যবসায়ীরা এই মহৎ নির্বুদ্ধিতার অর্থ উপলব্ধি করতে পারত না। এ নিয়ে তারা ঠাট্টা তামাসা করত এবং ব্যঙ্গচ্ছলে তার এক নতুন নামও দেয়। মদের লেনদেনে সদ্য বেশ কিছু রোজগার করে এদের এক ব্যবসায়ী প্রথম যেদিন ব্যঙ্গচ্ছলে তাকে এই নাম ধরে ডাকে, সেদিন গোরিওর এক ঘুষোয় তাকে রুয় ওবঁল্যাঁর জঞ্জালের মধ্যে মুখ থুবড়ে পড়ে যেতে হয়। কন্যাদুটির প্রতি গোরিওর গভীর টান, তাদের প্রতি তার স্পর্শকাতর মনের সদা শঙ্কাভরা ভালবাসার কথা এমন সুবিদিত হয়ে পড়ে যে, ব্যবসায় ক্ষেত্রে তার এক প্রতিযোগী নিজের সুবিধার জন্য একদিন তাকে বাজার থেকে সরাবার উদ্দেশ্যে জানায় যে দেলফিন গাড়ির ধাক্কা খেয়ে পড়ে গেছে। সেমুই ব্যবসায়ী অমনিই শঙ্কিত বিবর্ণ মুখে বাজার ছেড়ে চলে যায়। এই মিথ্যা সংবাদের আঘাত আর তার মানসিক প্রতিক্রিয়ার জন্য দিন কয়েক তাকে অসুস্থতার দরুণ শয্যাশায়ী থাকতে হয়। গোরিওর প্রাণঘাতী কব্জির দাপট অবিশ্যি এই ব্যবসায়ীকে বুঝতে হয়নি, তবু তার ব্যবসায়ের এক সংকট মুহূর্তে দেউলিয়া হতে বাধ্য করে তাকে শস্যের বাজারছাড়া করে গোরিও।

স্বভাবতই মেয়ে দুটি নষ্ট হয়ে যায়। তাদের শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে কাণ্ডজ্ঞানের কোন স্থান ছিল না। গোরিওর বার্ষিক আয় তখন ষাট হাজার ফ্রাঁরও বেশী। অথচ নিজের জন্য সে বারো ফ্রাঁও ব্যয় করত না। মেয়েদের খেয়াল চরিতার্থ করাই ছিল তার একমাত্র আনন্দ। সুশিক্ষার দ্যোতক হালচাল শেখাবার জন্য সেরা সেরা মাষ্টার নিয়োগ করা হত। বিবাহিতা প্রবীণা এক মহিলা অভিভাবিকাও ছিল এদের। সামাজিক অনুষ্ঠানে ইনি সঙ্গে যেতেন। সৌভাগ্যবশত মহিলাটি যেমন বুদ্ধিমতী তেমনি সুরুচিসম্পন্না ছিলেন। মেয়েরা

ঘোড়ায় চড়ে বেড়াত—গাড়িও ছিল নিজেদের। এক কথায়, ধনবান বৃদ্ধ জমিদারের মত জীবনযাপন করত এরা। একবার কোন জিনিসের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করলে সে জিনিস যত মূল্যবানই হোক বাপ ছুটে গিয়ে অমনিই তা এনে দিত, এবং এজন্য সে শুধুমাত্র একটি চুমু ছাড়া আর কিছুই প্রত্যাশা করত না। মেয়েদের সে দেব-দূতের পর্যায়ে উন্নীত করে। তার মানে, তার অনেক উপরে উঠে যায় মেয়েরা। বেচারি! তাবা যে ব্যথা দিত তার জন্যও তাদের ভালবাসত গোরিও।

বিয়ের বয়স হলে নিজের নিজের পছন্দমত বর বেছে নেবার অবাধ অধিকার দেওয়া হয় মেয়েদের। প্রত্যেকেই বাপের সম্পত্তির অর্দ্ধেক উপঢৌকন পাবে বলে স্থির হয়। সৌন্দর্যের মোহে কঁৎ দ রেস্তো ঘোরাঘুরি করত আনাস্তাজির পেছনে। আর তার নিজেরও অভিজাত জীবনের প্রতি লোভ ছিল। তাই বাপের ঘর ছেড়ে সে সমাজের উঁচুতলার ঘরণী হয়। দেলফিন অর্থ ভালবাসত। তাই সে বিয়ে করে জার্মান বংশের নুসঁজাঁ নামে এক ধনী ব্যাঙ্কারকে। লোকটা পরে পবিত্র রোম সাম্রাজ্যের 'বারোঁ' উপাধি পেয়েছিল। এদিকে গোরিও সেমুই ব্যবসায়ীই রয়ে গেল।

গোরিও এখনও ব্যবসা করছে—এ জিনিস জামাইদের কাছে নেহাৎ অপমানজনক বলে মনে হয়। অথচ এই ব্যবসার বাইরে তার কোন জীবন ছিল না। বছর পাঁচেক তাদের অনুরোধ উপেক্ষা করেছে গোরিও। তারপর ব্যবসা বিক্রী করা টাকা আর আগেকার লাভের উপর নির্ভর করে ব্যবসা ছেড়ে দিতে রাজী হয়েছে। গোরিও যখন প্রথম মেঁজ ভোকেতে আসে, সেই সময় তার পুঁজি থেকে বছরে আট দশ হাজার ফ্রাঁ আয় হত বলে অনুমান করেছিলেন মাদাম ভোকে। জামাইরা যখন তাকে বাড়ীতে রাখতে অস্বীকার করে, এমনকি গোপনে ছাড়া তার মেয়েদের দেখা-সাক্ষাৎ বন্ধ করে, সেই-সময়েই চরম হতাশায় বোর্ডিংয়ে আত্মগোপন করে গোরিও।

মঁশিয় মুর নামে একটা লোক গোরিওর ব্যবসা কিনেছিল। তার কাছ থেকে বুড়ো গোরিও সম্পর্কে এইটুকু সংবাদ সংগ্রহ করা গিয়াছে। দুশেস দ লাঁজের মুখে শোনা অনুমান তাই সত্য প্রতিপন্ন হল। পারির এই অজ্ঞাত অথচ মর্মান্তিক ট্রাজেডির গৌরচন্দ্রিকা এইখানেই শেষ।

ডিসেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহের শেষের দিকে দু'খানি চিঠি পেল রান্তিগ্রাক। একখানি মায়ের আর অপরখানি বড় বোনের। পরিচিত হস্তলিপি দেখে তার প্রাণ আনন্দে নেচে ওঠে। তবু মনে শঙ্কার শিহরণ জাগে। এই দু'খানি ছোট্ট কাগজের টুকরোর মধ্যে তার আশা-আকাঙ্ক্ষার মৃত্যুদণ্ড কিংবা সাফল্যের রায় লিপিবদ্ধ রয়েছে। বাপ-মার দারিদ্র্যের কথা ভেবে তার মনে কিছু অনিশ্চয়তা সৃষ্টি হয়েছিল। তবু তাদের অপার স্নেহের এত অভিজ্ঞতা তার আছে যে, শেষ রক্ত-বিন্দু দান করতেও যে তারা কুণ্ঠাবোধ করে না এ-বিষয়ে কোন সন্দেহ ছিল না। মার চিঠিখানির বয়ান এই :

প্রাণের খোকা,

আমার কাছে যা চেয়েছিলি—পাঠালাম। অর্থের সদ্ব্যবহার করবি। আবার যদি তোর জীবন রক্ষার জন্যও অর্থের প্রয়োজন হয়, তাহলেও তোর বাবাকে না জানিয়ে এত বেশী টাকা পাঠান যাবে না। তাহলে এদিকে গোলমাল সৃষ্টি হবে। তখন জমি-জমা বন্ধক না রাখলে টাকা পাওয়া যাবে না। যে পরিকল্পনার কথা একেবারেই জানি না, তার ভালমন্দ বিচার করা অসম্ভব। কিন্তু কেমনধারা সে পরিকল্পনা যে আমাকে জানাতেও কুণ্ঠাবোধ করলি? বোঝাবার জন্য গুচ্ছের লেখার আবশ্যক হয় না। মায়ের পক্ষে একটি কথাই যথেষ্ট। তাহলে আমাকে অনিশ্চয়তার দুশ্চিন্তা ভোগ করতে হত না। তোর চিঠি আমার মনে যে মর্মান্তিক প্রভাব সৃষ্টি করেছে, তার কথা না জানিয়ে পারলাম না। হাঁরে খোকা, কিসের জন্য বাধ্য হয়ে তুই আমার প্রাণে এমন ব্যথা দিলি? তোর যে-সব কথা পড়ে মনে নিদারুণ ব্যথা পেলাম সেই কথা লিখতে গিয়ে তুই নিজেও নিশ্চয়ই দারুণ ব্যথা ভোগ করেছিস। কি অভিযান শুরু করবি? নিজে যা নস্, লোকের চক্ষে তাই প্রতিপন্ন হবার জন্য নিজের জীবন, নিজের সুখ-শান্তি বন্ধক রাখতে যাচ্ছিস কি? পড়াশোনার পক্ষে মূল্যবান সময়ের অপচয় না করে কিংবা অর্থ ব্যয় না করে সে দুনিয়ার সঙ্গে পরিচিত হওয়া যায় না, তাই দেখার জন্য মেতে উঠেছিস কি! লক্ষ্মী ওজেন, মায়ের কথা শোন, অসৎ পথে কোন কাজ করা যায় না। তোর মত অবস্থার যুবকের জীবনে ধৈর্য আর সহিষ্ণুতাই একমাত্র গুণপনা হওয়া উচিত। তোকে ভর্ৎসনা করছি না—আমাদের এই দানের সঙ্গে তিক্ততা মিশিয়ে দেবার আগ্রহও আমার নেই। তোর উপর পুরোপুরি বিশ্বাস আছে বলেই মা হিসেবে বলছি। সন্তানের জন্য মায়ের মন বড়

দুশ্চিন্তা ভোগ করে। নিজের দায় দায়িত্বের কথা তোর অজানা নয়। আবার এও জানি যে তোর হৃদয় নিষ্কলুষ আর উদ্দেশ্যও সৎ। কাজেই নির্ভয়ে আমি বলতে পারছি : এগিয়ে যাও, বাছা! মা বলেই বুকটা কেঁপে ওঠে। কিন্তু তোর প্রতিটি কাজে আমাদের আশীর্বাদ আর আমাদের শুভেচ্ছা সহায়ক হবে। সাবধানে চলবি খোকা! কখনও বিচার বিবেচনা না করে চলবি না। পাঁচটি লোকের ভবিষ্যৎ তোর উপর নির্ভর করে। সত্যি, আমাদের ভাগ্য তোর সঙ্গে জড়িত—তোর সাফল্য আমাদের সাফল্যের সামিল। প্রার্থনা করি, ভগবান যেন সর্ববিষয়ে তোর সহায়ক হন। তোর মার্সিযাক মাসি এ-ব্যাপারে অবিশ্বাস্য বদান্যতা দেখিয়েছেন। সবটাই তিনি চট করে বুঝে ফেলেন। এমনকি দস্তানা সম্পর্কে আমায় যা লিখেছিস্ তাও অনুমান করেন। বললেন, বড় ছেলেটা সম্পর্কে খানিকটা দুর্বলতা আছে আমার। মাসিকে ভক্তি করিস ওজেন! তুই কৃতকার্য না হওয়া অবধি আমি বলব না—কি তিনি করেছেন তোর জন্য। না হলে তার টাকা তোর আঙুল পুড়িয়ে দেবে। ছেলেমানুষ তোরা, এখনও তোদের বোঝার ক্ষমতা হয়নি যে স্মৃতি-জড়িত জিনিস বিকিয়ে দেওয়া কি বেদনাদায়ক। কিন্তু তোর জন্য কি আমরা ত্যাগ করতে না পারি? তাঁর হয়ে তোর কপালে একটা চুমু পাঠাতে বলেছেন। তিদি আশীর্বাদ করেছেন যে এই চুমুই যেন তোকে সৌভাগ্য দান করে। এই সহৃদয় মহিলা নিজেই তোব কাছে চিঠি লিখতেন, কিন্তু জানিস তো, তার আঙুলে বাত। তোর বাবা ভাল আছেন। আমরা যা আশা করেছিলাম তার চাইতে ১৮১৯ সালের ফসল ভাল হযেছে। বিদায়, খোকা। তোর বোনেদের সম্পর্কে আমি আর কিছু লিখলাম না। লোর্‌ নিজেই চিঠি লিখল। পরিবারের ছোটখাটো ঘটনার সংবাদ তার চিঠিতেই জানতে পারবি। ভগবানের আশীর্বাদে সফলকাম হও। হাঁ নিশ্চয়, সফল তোকে হতেই হবে ওজেন। আবার তুই আমার বুকে এক দুঃসহ ব্যথার বোঝা চাপিয়েছিস। দারিদ্র্যের দুঃখ আমার জানা আছে; তাই সন্তানদের তা বুঝতে দিতে চাই না। আচ্ছা, এইবার তাহলে শেষ করি! সংবাদ জানাতে ভুল করিস না। মায়ের চুমু নিস!

চিঠি পড়া শেষ করতে না করতেই ওজেনের চোখ জলে ভরে যায়। মনে পড়ে, কন্যার ঋণশোধের জন্য বুড়ো গোরিও-ও রূপোর রেকাব ভেঙে বেচে দিয়েছিল।

—তোমার মা নিজের গহনা বেচেছে। আপন মনে বলে সে।—স্মৃতিস্মারক বেচে দেবার সময় তোমার মাসিও হয়ত চোখের জল ফেলেছে। কি অধিকার আছে তোমার আনাস্তাজিকে নিন্দা করার? নিজের ভবিষ্যতের জন্য যা করলে, আনাস্তাজিও ঠিক তাই করেছে প্রণয়ীর জন্য। কে ভাল? তুমি না সে?

মনে মনে দুঃসহ অন্তর্দাহ বোধ করে ছাত্রটি। দুনিয়ার সব কিছু ছেড়ে ছুড়ে চলে যেতে ইচ্ছে হয়। ইচ্ছে হয় টাকাটা ফেরৎ দেবার। অন্তরে এক মহৎ গোপন বেদনা অনুভব করে ওজেন। অপরের সমালোচনা করার সময় এ অনুভূতির মর্যাদা দেওয়া হয় না। অথচ এই মহৎ বেদনাবোধের জন্যই মানুষের বিচারে দণ্ডনীয় অপরাধীও স্বর্গের দেবদূতদের ক্ষমা পায়। তারপর সে বোনের চিঠিখানা খোলে। এ চিঠির অকপট সরলতা আর মাধুর্য তার অন্তরে সান্ত্বনার স্নিগ্ধ প্রলেপ লেপে দেয়।

'তোমার চিঠি ঠিক সময়েই এসেছে দাদা! কারণ আগাৎ আর আমি টাকাটা ব্যয় করার পদ্ধতি সম্পর্কে বহু চিন্তা করেও শেষ পর্যন্ত কোন পথ বার করতে পারিনি। মালিকের ঘড়িটা ফেলে দিয়ে স্পেনের রাজার চাকর যা করেছিল, তুমিও ঠিক তাই করেছ। তুমি একমন করেছ আমাদের। সত্যি, এর মধ্যে এতটুকু মিথ্যে নেই ওজেন। প্রথমে কি কেনা যায় তাই নিয়ে আমরা ঝগড়া করছিলাম। তাছাড়া দুজনের যা যা চাই তার সব কিছু করার উপায়ও আমরা বার করতে পারিনি। আগাৎ আনন্দে ফুঁপিয়ে ওঠে। সত্যি, সারাদিন আমরা পাগলের মত হুড়াহুড়ি করেছি। মাসিমার ভাষায় এমন অদ্ভুত পাগল হয়ে গিয়েছিলাম যে, মা ধমক দিয়ে জিজ্ঞাসা করেন, তোদের হল কি? আমার ধারণা, খানিকটা ভৎ'সনা করলে আমরা আরও খুশি হতাম। যাকে ভালবাসে তার জন্য কষ্ট ভোগ করে মেয়েরা অপার আনন্দ পায়। কিন্তু আনন্দের মধ্যেও আমি বিরক্তি ও দুঃখবোধ করছিলাম। আমি এত অপব্যয়ী যে কোনদিন ভাল গৃহিণী হতে পারব না। নিজের জন্য দুটো কটিবন্ধ আর বডিস্ তৈরী করার জন্য সুন্দর একখানা ছুরি কিনেছি। কি হবে ও ছাই দিয়ে? ফলে মিতব্যয়ী মহান আগাতের চাইতে আমার কাছে কম টাকা ছিল। কিপটের মত টাকা জমায় আগাৎ। দুশ' ফ্রাঁ ছিল তার কাছে! আর আমার কাছে ছিল মাত্র দেড়শ। ভাল শাস্তিও হয়েছে আমার! ইচ্ছে হচ্ছে, কটিবন্ধ দুটো কূয়োর মধ্যে ফেলে দিই। ও

জুতো পরার সময় বরাবর নিজের উপর ঘৃণা হবে, কারণ ওই জুতোর জন্তই তো তোমাকে বঞ্চিত হতে হল! বড় ভাল মেয়ে আগাৎ। সে বলে, এস, আমরা দুজনে মিলে সাড়ে তিনশ' ফ্রাঁ পাঠাই। কিন্তু কি কি ঘটেছিল এখন আর তোমায় না বলে থাকতে পারছি না।

'জান, কি করে আমরা তোমার আদেশ পালন করেছি? নিজের নিজের সঞ্চয় নিয়ে একসাথে আমরা বেড়াতে বেরোই। বড় রাস্তায় পড়েই চোঁ-চাঁ দৌড়ে রুফেক যাই এবং সেখানে মেসাজেরি রোয়াইয়ালের মঁশিয় গ্রাঁবের হাতে টাকাটা দিয়ে দিই। তারপর বাবুই পাখীর মত চটপট ফিরে এলাম। আগাৎ জিজ্ঞাসা করে, আনন্দে কি মানুষের পাখা গজায়? দুজনে মিলে হাজারো কথা বলেছি। তার আর পুনরুল্লেখ করব না। সব কথাই তোমার সম্পর্কে মঁশিয় লি পারিজিয়ঁ! শোন দাদা, প্রাণভরে ভালবাসি তোমাকে। সংক্ষেপে এইটুকুই আসল কথা। কথাটা গোপন রাখা সম্পর্কে মাসিমার ভাষায় বলতে পারি, আমাদের মত বাঁদরের পক্ষে সব কিছুই সম্ভব, এমনকি জিভ সামলান পর্যন্ত!

মাসিমাকে সঙ্গে নিয়ে মা একটা গোপন কাজে আঁগুলেম গিয়েছিলেন। তাদের যাবার মহৎ উদ্দেশ্য সম্পর্কে উভয়েই নীরব ছিলেন। অবিশ্যি দীর্ঘ আলাপ আলোচনা না করে এ অভিযানে তারা বেরোন নি। আমাদের সে আলোচনা শুনতে দেওয়া হয়নি—বাবাকেও না।

'রাস্তিঞাকদের রাজ্যে বিরাট-বিরাট সব পরিকল্পনা চালু হচ্ছে। মহামান্য রাণীর জন্য সপত্র ফুল-তোলা মসলিন পোশাক তৈরী করছে ইন্‌ফান্তারা। (১) একান্ত গোপনে সূঁচের কাজ এগিয়ে চলেছে—আড়ের দিকে আর দুটি লাইনের কাজ মাত্র বাকী। স্থির হয়েছে, ভেরতোইর দিকে প্রাচীর তোলা হবে না; বরং তার বদলে বেড়া দেওয়া হবে। আমরা তাহলে ফল আর জাফরির কাজ করা গাছ হারাব, কিন্তু পথচারী পাবে সুন্দর এক নতুন দৃশ্য। সিংহাসনের উত্তরাধিকারীর যদি রুমালের প্রয়োজন থাকে তো তাকে জানান যাচ্ছে, বিধবা দ মার্সিয়াক তার হারকুলেনিয়াম আর পম্পাই নামে ট্রাঙ্ক আর রত্নভাণ্ডার দুটি খোঁজাখুঁজি করে এক টুকরো ক্যাম্ব্রিকের কাপড় আবিষ্কার করেছেন। তিনি জানতেন না যে এই কাপড় তাঁর ছিল।

---

(১) ইনফান্তা: স্পেন ও পর্তুগালের রাজার উত্তরাধিকারিণী ভিন্ন অপরাপর কন্যার উপাধি।

যুবরাজ আদেশ করলে রাজকুমারী আগাৎ আর লোর তাদের স্ঁচ-সুতো আর হাত নিয়ে আজ্ঞাপালনে প্রস্তুত। কিন্তু হায়, সে হাত বড্ড বেশী লাল টুকটুকে! এদিকে রাজকুমার দন্‌ আঁরি আর দন গাব্রিয়েল আঙুরের জ্যাম নিয়ে মেতে আছে, বোনেদের জ্বালাচ্ছে, মোটেই পড়াশোনা করছে না, পাখীর ডিম চুরি করছে, সব সময় দুরন্তপনা করছে আর রাজ্যের আইন ভঙ্গ করে ছড়ি বানাবার জন্য অনবরত ওঝার গাছ কাটছে। ব্যাকরণের পবিত্র বিধান লঙ্ঘন করে এরা যদি এইভাবে গাছে গাছে চড়ে বেড়াবার সামরিক বিধান অনুসরণ করে তো মঁশিয় লি ক্যুরে নামে পরিচিত পোপের দূত তাদের একঘরে করে রাখবেন বলে শাসাচ্ছেন।

'আর বিশেষ কিছু লিখব না দাদা। কোন পত্র তোমার সাফল্যের প্রতি এত সদিচ্ছা, এমন প্রাণঢালা অকৃত্রিম ভালবাসার বার্তা বহন করতে পারেনি। বাড়ী এলে নিশ্চয় আমাদের অনেক অনেক গল্প শোনাবে! সব খুলে বলতে হবে আমাকে, কেননা আমিই জ্যেষ্ঠা। মাসিমার কথায় সন্দেহ হচ্ছে, সামাজিক ব্যাপারে তোমার হয়ত কিছুটা সাফল্য হয়েছে।

'এক মহিলার কথা ওঠে, তারপর সবাই নীরব…'

'সত্যি, এখানে সেই কথাই উঠেছে। ভাল কথা, তুমি যদি চাও ওজেন তো রুমালের বদলে আমরা গোটা কয়েক শার্টও তৈরী করে দিতে পারি। সত্বর এ প্রশ্নের জবাব দেবে। ভাল শার্টের যদি দরকার থাকে তো এখুনি আমরা কাজে লাগতে পারি। আমরা জানি না এমন কোন ফ্যাশান যদি পারিতে উঠে থাকে তো তার নমুনা পাঠিও—বিশেষ করে কফের।

'বিদায়, বিদায়। তোমার কপালের বাঁদিকের জন্য স্নেহ-চুম্বন পাঠালাম। রগটা একান্তভাবে আমাদের সম্পত্তি। চিঠির পেছনের দিকটা আগাতের জন্য রাখলাম। সে কথা দিয়েছে যে আমার চিঠি পড়বে না; কিন্তু বিশ্বাস করতে পারছি না বলে সে চিঠি লেখার সময় আমি পাশেই থাকব। ইতি, তোমার স্নেহের ভগিনী

লোর্ দ রাস্তিঞাক

ওজেন তখন মনে বলে, নিশ্চয়, যে মূল্যে দিতে হোক, এখন আমায় সফলকাম হতেই হবে। রত্নভাণ্ডার উজাড় করে দিলেও এ ভালবাসার প্রতিদান দেওয়া যায় না। দুনিয়ার সমস্ত সুখ এনে যদি ওদের উপহার দিতে পারতাম! পন্দেরশ' পঞ্চাশ ফ্রাঁ! একটু থেমে সে বলে যায়।—প্রতিটি পয়সা

আমি কাজে লাগাব। ঠিকই বলেছে লোয়, মেয়েটার কথাই বিশ্বাস করব। সত্যিই ভাল শার্ট আমার নেই। অপরের মঙ্গলের ব্যাপারে মেয়েরা সব সময় হুঁশিয়ার থাকে। নিজের সম্পর্কে অকপট আর আমার ব্যাপারে দূরদর্শিনী এই নারী স্বর্গের দেবীর মত আমার পার্থিব ত্রুটি ক্ষমা করছে। অথচ জানে না কি সে অপরাধ।

দুনিয়াটাই এখন ওজেনের। দরজি ডেকে ইতিমধ্যেই তাকে আভাস দিয়ে বশে আনা হয়েছে। মঁশিয় দ ত্রাই-র সেই কটাক্ষ থেকে ওজেন বুঝতে পেরেছে যে যুবকের জীবনে দরজির প্রভাব কত বেশী! দুই চরম পন্থার মধ্যে মাঝামাঝি কোন ব্যবস্থা নেই; দরজি হয় পরম শক্রতা করবে আর না হয় পরম মিত্র হবে। কিন্তু এই দরজিটি তার পবিত্র কর্তব্য বোঝে বলেই ওজেনের মনে হয়। নিজেকে সে যুবকের জীবনের বর্তমান ও ভবিষ্যতের যোগসূত্র বলে গণ্য করে। রাস্তিঞাকও কৃতজ্ঞতাভরে একটি মাত্র রসাল কথায় তার মন ভিজিয়ে দেয়। ভবিষ্যৎ জীবনে সে নিজেও এ ব্যাপারে পারদর্শিতা অর্জন করে। বলে, আপনার দুটো পাজামার খবর জানি যা পরলে বছরে বিশ হাজার ফ্রাঁ আয়ের বিয়ের সম্পর্কও সম্ভব হতে পারে।

পনেরশ' ফ্রাঁ আর সেই সঙ্গে যত খুশি পোশাক! এই সময় গরীব দখনে ছেলের মনে কোন বিষয়ে কোন সংশয় ছিল না। পকেটে প্রচুর টাকা থাকলে যুবকদের চাল-চলনে যে অনির্বচনীয় বেপরোয়া ভাব ফুটে বেরোয়, ঠিক তেমনি-ভাবেই প্রাতরাশ খেতে নেমে আসে ওজেন। ছাত্রদের পকেটে যেই টাকা পড়ল অমনিই তারা মনে করে যেন নিজের মধ্যে নৈতিক সমর্থনের এক নতুন স্তম্ভ গড়ে উঠল। তখন তারা আগের চাইতে সদম্ভে চলাফেরা করে। মনে ভাবে, দাঁড়াবার মত এমন একটা জায়গা পেয়েছে যেখান থেকে নিজের চাবি দিয়ে দুনিয়ার কপাট খুলে ফেলতে পারবে। তখন তারা সরাসরি মুখের দিকে তাকায়, চলাফেরার ভঙ্গী বেশ জোরালো আর দৃঢ় হয়ে ওঠে। কাল যে লাজুক, নম্র এবং যে কোন লোকের রূঢ় আচরণ সহ্য করতে প্রস্তুত ছিল, আজ সে প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধেও দাঁড়াতে পারে। বিস্ময়কর পরিবর্তন ঘটে তার মনে; কিছুই তার উচ্চাশার অতীত নয়—কিছুই নেই তার ধরা ছোঁওয়ার বাইরে। বেপরোয়াভাবে সে এটাসেটার কথা চিন্তা করে। আপনা থেকে প্রফুল্ল, সদয় আর উদার হয়ে পড়ে। এক কথায়, পালক গজান পাখীর ছানা এতদিনে বুঝতে পারে যে সে ডানায় ভর করে উড়তে পারে।

বিপদের সামনে কুকুর যেমন হাড় মুখে করে সত্রাসে ছুটে পালায়, খানিকটা দূরে গিয়ে যেমন মাংস চিবোয়, মজ্জা চুষে খায় তারপর আবার পালায়, কপর্দকহীন ছাত্রের অবস্থাও তেমনি। ক্ষণিক আনন্দের সুযোগ পেলে তাকেও সত্রাসে উপভোগ করতে হয় সেই আনন্দ। কিন্তু পকেটে স্বর্ণমুদ্রার মধুর শব্দ করার মুরদ থাকলে যুবকেরা রসিয়ে উপভোগ করে আনন্দ। ফোঁটা ফোঁটা মুখে দিয়ে মৌজ করে রস আস্বাদন করে। মাটির উপর তখন আর পা থাকে না—শূন্যে ভেসে বেড়ায়। অর্থহীন হয়ে পড়ে দারিদ্র্য শব্দ। তখন সে গোটা পারির মালিক।

এই সব দিনে সারা দুনিয়া আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে, সব কিছুর মধ্যে আলোর ঝিকিমিকি আর বহ্নিশিখার দীপ্তি দেখা যায়। কোন পুরুষ বা কোন নারী এই অবিমিশ্র আনন্দময় দিনগুলি কাজে লাগাতে পারে? ঋণদায়গ্রস্থ অনিশ্চয়তাভরা দিনগুলি সমস্ত আনন্দের অনুভূতি দশগুণ খরতর করে। রুয় সঁ্যা-জাক আর রুয় দে সঁ্যা পেরের মধ্যে সিন নদীর বাঁ পারের জীবন যারা জানে না, জীবনের কোন অভিজ্ঞতাই নেই তাদের।

—হায়রে! পারির মেয়েরা যদি এ খবর জানত তাহলে প্রণয়ীর খোঁজে ছুটে আসত এখানে! প্রতিটি এক ফার্দিং মূল্যের হ্যাসপাতির স্টু খেতে খেতে মনে মনে বলে ওজেন।

ঠিক সেই সময়ে ফটকের বেল বেজে ওঠে। এবং মেসাজেরি রোয়াইয়ালের এক পিয়ন হাজির হয় খাবার ঘরের দোর গোড়ায়। মঁসিয় ওজেন দ রাস্তিঞাকের খোঁজ করে সে এবং তার হাতে দুটি থলে আর সই করবার জন্য একখানা রসিদ দেয়। তাই দেখে অতল রহস্যভরা সন্ধানী চোখে ওজেনের দিকে চায় ভোতর্যাঁ। এ চাহনি তাকে কশাঘাতের মত পীড়িত করে।

লোকটা বলে, এইবার তাহলে অসিচালনা আর গুলি ছোঁড়া শেখার খরচ চালাতে পারবে।

—তোমার জাহাজ তাহলে বন্দরে ফিরে এল! থলে দুটির দিকে চেয়ে বলেন মাদাম ভোকে।

লুব্ধদৃষ্টি ধরা পড়বে এই শঙ্কায় মাদমোয়াজেল মিশোনো টাকার থলের দিকে চোখ ফেরালেন না।

—নিশ্চয়ি তোমার মা স্নেহশীল! মাদাম কুত্যুর বললেন।

—হাঁ, নিশ্চয়ি স্নেহশীল। প্রতিধ্বনি করে পোয়ারে।

—হাঁ, মা'র শেষ রক্তবিন্দু চুষে নেওয়া হয়েছে বটে! ভোতর‍্যাঁ বলে ওঠে।—এইবার নিশ্চিন্তে বুনো জই্র আবাদ করতে পার—সৌখিন সমাজে ঘোরাফেরা করে উত্তরাধিকরিণীদের জন্য টোপ ফেলতে পার, চাই কি চুলে পীচমঞ্জরীপরা কঁতেসের সঙ্গে নাচতেও পার। তার আগে আমার উপদেশ শোন যুবক, গুলি ছোঁড়াটা অভ্যাস করে নাও। হাতের ইশারায় কল্পিত প্রতিদ্বন্দ্বীকে লক্ষ্য করে বন্দুকের তাক করে ভোতর‍্যাঁ।

পিয়নকে বকসিস দেবার ইচ্ছা ছিল রাস্তিঞ্যাকের। পকেটে হাত দিয়ে দেখল পকেট শূন্য। ভোতর‍্যাঁ তখন নিজের পকেটে হাত দিয়ে পিয়নটির দিকে একটা ফ্রাঁ ছুঁড়ে মারে।

—তোমার পকেটের অবস্থা তো ভালোই দেখছি! ছাত্রটির দিকে চেয়ে বলে ভোতর‍্যাঁ।

তাকে ধন্যবাদ দিতে বাধ্য হল রাস্তিঞ্যাক। কিন্তু মাদাম দ বোসেয়াঁর বাড়ী যেদিন গিয়েছিল, সেইদিন ডিনারের সময় লোকটার সঙ্গে যে কথা কাটাকাটি হয়, তারপর থেকে ভোতর‍্যাঁকে আর সে সহ্য করতে পারছে না। দিন সাতেক তাদের কথা বন্ধ ছিল। মুখ দেখাদেখি হয়েছে, কিন্তু কেউ কথা বলেনি। উভয়েই পরস্পরকে ভালভাবে লক্ষ্য করেছে। নিজেকে এর কারণ জিজ্ঞাসা করেছে ছাত্রটি, কিন্তু কোন জবাব পায়নি।

আইডিয়া যত শক্তিশালী হয়, তার অভিব্যক্তিও তদনুপাতে জোরালো হয়। এবং যে গণিতিক নিয়মে মর্টারের গোলা পরিচালিত হয়, মস্তিষ্কের চালনায় এই আইডিয়াও ঠিক সেই নিয়মে সরাসরি ছুটে গিয়ে লক্ষ্য ভেদ করে। তবে তার প্রতিক্রিয়ার মধ্যে বিভিন্নতা থাকে। নরম প্রকৃতির মানুষের মধ্যে এরা সর্বনাশা প্রভাব বিস্তার করে। আবার সুরক্ষিত দুর্গের মত দৃঢ়চেতা কিছু মানুষ আছে যাদের পিতলে-গড়া মাথার খুলিতে প্রতিহত হয়ে অন্যের ইচ্ছাশক্তি আপনা থেকে ভোঁতা হয়ে প্রাচীরে প্রতিহত বুলেটের মত পড়ে যায়। এছাড়া নমনীয় কোমল মস্তিষ্কের কিছু মানুষ আছে যারা কাদামাটির আশ্রয়ে নিহত শিকারের মত বিনা প্রতিরোধে অন্যের ইচ্ছার কাছে সহজেই নতিস্বীকার করে। রাস্তিঞ্যাকের মাথায় বারুদভরতি ছিল। সামান্য আঘাতেই তা ফেটে পড়ার সম্ভাবনা। সে এত অস্থিরমতি যে অন্যের মতলব তার মস্তিষ্ক ভেদ করতে পারত না। অপরের মনোভাবের অন্তর্নিহিত কারণ যদি জানা না থাকে তো তার প্রতিক্রিয়া বিস্ময়কর ও

চমকপ্রদ বলে মনে হয়। কিন্তু ওজেনের উপর এই মনোভাবের প্রভাব পড়বার উপায় ছিল না। চোখের দৃষ্টিশক্তির মত তার অন্তর্দৃষ্টিও স্বচ্ছ, দূরপ্রসারী আর বনবিড়ালের মত তীক্ষ্ণ। দৈহিক শক্তির মত তার যাবতীয় অনুভব শক্তিরও রহস্যময় বিসারণের ক্ষমতা ছিল—স্বেচ্ছায় যেমন এগিয়ে যেতে পারত আবার হটেও আসতে পারত তেমনিভাবে। এই সঙ্কোচন আর বিসারণের ক্ষমতার জন্যই অনন্যসাধারণ ধীমানরা আমাদের বিস্ময় উদ্রেক করে। সুকৌশলী অসিচালকের মত অনায়াসেই তাদের সন্ধানী চোখ যে কোন বর্মের দুর্বলস্থান খুঁজে বার করতে পারে।

তাছাড়া, গত এক মাসে ওজেনের সদ্‌গুণ আর দুর্বলতা অতি দ্রুত বেড়ে গেছে। সংসারের সংসর্গ আর নিজের সদ্যজাত আকাঙ্খা পূরণের প্রয়াসকে আশ্রয় করেই বেড়েছে দুর্বলতা। তার সদ্‌গুণের মধ্যে ছিল দখনেদের মত বিপদের মুখে সরাসরি ঝাঁপিয়ে পরার প্রচণ্ড দুঃসাহস। লোয়ার নদীর ওপারের কোন লোক এজন্য বেশীক্ষণ অনিশ্চয়তার মধ্যে থাকে না। উত্তুরে লোক এই গুণপনাকে চারিত্রিক দুর্বলতা বলে থাকে। দৃষ্টান্ত দেখিয়ে তারা বলে, এই দুঃসাহসিকতা যদি মুরীর সৌভাগের কারণ হয় তো এইটেই তার মৃত্যুর কারণও বটে। এই থেকে আমরা সিদ্ধান্ত করতে পারি, দক্ষিণের কোন লোক যদি নিজের চরিত্রে দখনে দুঃসাসিকতার সঙ্গে উত্তুরে শঠতা সমাবেশ করতে পারে তো মানুষ হিসাবে সে পূর্ণ হয়ে ওঠে এবং বেরনাদতের মত সুইডেনের সিংহাসন জয় করে করায়ত্ত রাখতে পারে।

কাজেই ভোতর‍্যাঁ শত্রু কি মিত্র সঠিক না জেনে বেশীদিন সে তার গোলাবর্ষণ সহ্য করতে পারল না। তার মনে হত, এই রহস্যময় লোকটি প্রতি মুহূর্তে তার মনের গতি লক্ষ্য করছে এবং অনায়াসে তার অন্তরের অন্তঃস্থলের কথা বুঝতে পারছে। অথচ নিজে সে এমন হুঁশিয়ারভাবে মনের আগল বন্ধ করে রেখেছে যে, নারী-সিংহী-মূর্তির মতই তাকে অতল রহস্যময় বলে মনে হয়—যেন নিজে সব দেখছে, সবই জানে তবু চুপ করে আছে। ভরতি পকেটসঞ্জাত আত্মপ্রত্যয় নিয়ে সে বিদ্রোহের জন্য প্রস্তুত হয়।

কফিতে শেষ চুমুক দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছিল ভোতর‍্যাঁ। তাকে ডেকে বলে, দয়া করে আর একটু অপেক্ষা করুন না।

মাথায় টুপি পরে আর তরোয়ালভরা ছড়িখানা তুলে নিয়ে বর্ষীয়ান লোকটি জিজ্ঞাসা করে, কিসের জন্য? এই ছড়িখানা ভোতর‍্যাঁ সব সময়

এমনভাবে ঘোরাত যেন চারটে চোরের যুগপৎ আক্রমণ ঠেকাচ্ছে।—আপনার ধারটা শোধ করতে চাই। চটপট একটা থলে খুলে মাদাম ভোকের জন্ত একশ চল্লিশ ফ্রাঁ গুণে বলে রাস্তিঞাক। তারপর জানালার দিকে চেয়ে বলে, ছোটখাটো লেনদেনের মধ্য দিয়ে পাকা বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। এক্তে স্যাঁ সিলভেস্তর্ দিবস পর্যন্ত আমাদের দেনা-পাওনা চুকে গেল। এই পাঁচ ফ্রাঁ মুদ্রাটা ভাঙিয়ে দিতে পারেন?

—ছোটখাটো লেনদেনের মধ্য দিয়েই পাকা বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। ভোতর্‌্যাঁর দিকে চেয়ে প্রতিধ্বনি করে পোয়ারে।

—এই যে ফ্রাঁ-টা! কালো পরচুলাপরা রহস্যময় মানুষটির দিকে মুদ্রাটি বাড়িয়ে ধরে রাস্তিঞাক।

—লোকে এতে মনে করবে যে আমার কাছে যৎকিঞ্চিৎ ঋণী থাকতে তুমি ভয় পাও। ঠোঁটে শ্লেষভরা কপট হাসি নিয়ে বলে ওঠে ভোতর্‌্যাঁ। কিন্তু তার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি যুবকের অন্তর তল্লাস করে। ভোতর্‌্যাঁর এই ব্যঙ্গভরা কপট হাসি বহুবার ওজেনকে ক্ষিপ্ত করে তুলেছে।

—বলুক না, সত্যিই ভয় পাই তো! থলে দুটি তুলে নিয়ে নিজের ঘরে যাবার জন্ত উঠে দাঁড়িয়ে শুনিয়ে দেয় ছাত্রটি।

ভোতর্‌্যাঁ তখন দরজা পেরিয়ে বৈঠকখানায় যায় আর ছাত্রটি অপর দরজা দিয়ে সিঁড়ির দিকে এগোয়। এই সময় হঠাৎ বৈঠকখানার কপাট খুলে গটমট করে ছাত্রটির কাছে এগিয়ে এসে ভোতর্‌্যাঁ বলে, জান মঁশিয় লি মার্কি দ রাস্তিঞাকোরামা, যে কথা আমায় বললে সেটা খুব সৌজন্যপূর্ণ নয়। রূঢ় দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে থাকে ওজেন। তারপর খাবার ঘর আর রান্নাঘরের মাঝের পথে যখন তারা বাগানে যাবার লোহার শিকের উপর কাঁচ লাগানো দরজার কাছে দাঁড়িয়েছিল, সেই সময় রান্নাঘর থেকে বেরোয় সিলভি।

ছাত্রটি বলে, মিষ্টার ভোতর্‌্যাঁ, আমি মার্কি নই আর আমার নামও রাস্তিঞাকোরামা নয়।

—ওরা মারামারি করবে নাকি? নির্লিপ্তভাবে বলেন মাদমোয়াজেল মিশোনো।

—লড়াই করবে! পোয়ারে প্রতিধ্বনি করে।

—না না, সে রকম কিছু হবে না! সাদরে টাকার তোড়াটির উপর টোকা মেরে বলেন মাদাম ভোকে।

—কিন্তু ওরা যে গাছের তলায় যাচ্ছে। উঁচু হয়ে বাগানের দিকে চেয়ে মাদামোয়াজেল ভিকৃতরিন কাতরস্বরে বলে ওঠে।—যুবক বেচারি ঠিক কথাই তো বলেছে।

—ওপরে চল ডিয়ার, ও সব ব্যাপারে আমাদের দরকার নেই। মাদাম কুত্যুর বলেন।

কিন্তু মাদাম কুত্যুর আর ভিকতরিন উঠে পড়তেই মুটকি সিলভি দোর গোড়ায় এসে তাদের পথ আটকে দেয়। বলে, ওরা করতে চায় কি? মঁশিয় ভোতরঁ্যা বলল, এস, দুজনেই খোলাখুলি ভাবে কথা বলি। তারপর মঁশিয় রাস্তিঞ্যাকের হাত ধরে সে টেনে নিয়ে গেল। এখন দুজনেই আর্টিচোক গাছের মধ্যে ঘোরাঘুরি করছে।

সিলভির কথা শেষ হতে না হতেই ভোতরঁ্যা ভেতরে আসে। হেসে বলে, ভয় পাবেন না ভোকে মা, লাইম গাছের তলায় আমার পিস্তলটা একবার পরীক্ষা করে দেখব।

ভিকতরিন তখন সন্ত্রস্তভাবে হাত জোড়া করে বলে ওঠে, সে কি স্যর, মঁশিয় ওজনকে খুন করতে চাইছেন কিসের জন্য?

দুপা পিছিয়ে গিয়ে একদৃষ্টে ভিকতরিনের দিকে চেয়ে থাকে ভোতরঁ্যা। তারপর বিক্রুপের সুরে বলে ওঠে, হুঁ, এযে আবার নতুন জিনিস টের পাচ্ছি! লজ্জায় রাঙা হয়ে ওঠে মেয়েটি।—তোমার মতে বাইরের ঐ যুবকটি খুবই ভাল? আমার মাথায় একটা নতুন ধারণা ঢুকিয়ে দি‍ে যে! আচ্ছা, তোমাদের দুজনকেই সুখী করব সুন্দরী।

মাদাম কুত্যুর তখন মেয়েটির হাত ধরে তাড়াতাড়ি তাকে সরিয়ে নিয়ে যান। যেতে যেতে কানে কানে বলেন, সত্যি ভিকতরিন, তোর ভাব দেখে আজ সকালে আমিও অবাক হয়ে যাচ্ছি।

—আমার বাগানে কেউ গুলি ছুঁড়ুক এ আমি চাই না। মাদাম ভোকে বলে ওঠেন।—তুমি কি পাড়া-পড়শীকে ভড়কে দিয়ে এই সময় পুলিশ ডেকে আনতে চাও নাকি?

—হয়েছে—হয়েছে, অত আর বিচলিত হবেন না মা! ভোতরঁ্যা বলে।—আপনি নিশ্চিন্ত হোন্, আমরা তাহলে গুলি ছোঁড়ার গ্যালরিতেই যাব।

রাস্তিঞ্যাকের কাছে ফিরে এসে অতি পরিচিতের মত তার কনুই ধরে ভোতরঁ্যা। বলে, আমি যদি দেখাতে পারি যে ত্রিশ পা দূর থেকেও পাঁচ

পাঁচবার আমি ইস্কাতনের টেক্কার পেটে বুলেট লাগাতে পারি তাহলেও তোমার উৎসাহ দমবে না বোধ হয়! মাথা গরম যুবকের মত তুমি আমায় অপমান করেছ, তার ফলে বোকার মত প্রাণটা হারাবে।

—আপনি পেছিয়ে যাচ্ছেন তো! ওজেন বলে।

—আমার ক্রোধ বাড়িও না বলছি। আজ সকালে মেজাজটা খুব ঠাণ্ডা নেই। তার চাইতে বরং ওখানে যাই চল। সবজে রঙের আসনগুলো দেখিয়ে বলে ভোতর্যাঁ।—চল, কেউ আমাদের কথা শুনতে পাবে না। তোমার সঙ্গে আমার গোটাকয়েক কথা আছে। ভাল ছেলে তুমি! আমি চাই না যে তোমার কোন অমঙ্গল হোক। আমার সত্যি নাম যেমন চীটডেথ (সে কি!) ভোতর্যাঁ, তেমনি সত্যি করেই বলছি, তোমায় আমার ভাল লাগে। কেন যে লাগে সে-কথা এখুনি জানতে পাবে। তবে এইটুকু জেনো, তোমায় আমি নিজের হাতে তৈরী করা মানুষের মতই ভাল ভাবে জানি, আর সে-কথা এখুনি প্রমাণ করব। থলে দুটো এখানে রেখে দাও। গোল টেবিলটা দেখিয়ে সে বলে।

থলে দুটো টেবিলের উপর রেখে পরম কৌতুহলভরে বসে পড়ে ওজেন। লোকটা প্রথমে তাকে খুন করতে উদ্যত হয়, তারপর অকস্মাৎ রক্ষক সেজে বসে। হালচালের এই পরিবর্তনে ওজেনের মধ্যে চরম কৌতূহল সৃষ্টি হয়।

ভোতর্যাঁ তখন বলে, আমার পরিচয়, আমার বিগত জীবনের ইতিহাস আর বর্তমান অবস্থা জানতে স্বভাবতই তোমার আগ্রহ হচ্ছে। বড় কৌতূহলী তুমি ছোকরা! বেশ, চুপ করে বস! তার চাইতে বিস্ময়কর কথা শোনাব তোমাকে। অনেক দুর্ভাগ্য আমায় সইতে হয়েছে। প্রথমে আমার কথা শুনে নাও, তারপর যা খুশি জিজ্ঞাসা কর। তিনটি কথায় আমার গত জীবনের পরিচয় দিচ্ছি! আমি কে? ভোতর্যাঁ! কি করছি? যা খুশি। ব্যস, এইটুকুই! আমার প্রকৃতি জানতে চাও? যাদের সঙ্গে মনের মিল হয়, যারা আমার সঙ্গে ভাল ব্যবহার করে তাদের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করি। আমার সঙ্গে যে যে রকম খুশি ব্যবহার করতে পারে, ইচ্ছে হয় পায়ের নলিতে লাথিও মারতে পারে; তবু আমি বলব না, সাবধান! কিন্তু ভগবানের নামে হলপ করে বলতে পারি, আমায় যারা উত্যক্ত করে তাদের কাছে আমি শয়তান! তারপর থুথু ফেলে বলে, তোমার জানা থাকা ভাল, থুথু ফেলা আর মানুষ খুন-করা আমার কাছে সমান গুরুত্বপূর্ণ। তবে খুন আমি ভদ্র

ভাবেই করি, আর একান্ত প্রয়োজন না হলে করি না। এদিক থেকে আমায় শিল্পীও বলতে পার। আমায় দেখতে এমন হলে কি হয়, বেনভেনুতো চেলিনির স্মৃতিকথা আমি পড়েছি—ইতালীয় ভাষাতেই পড়েছি। তার মত ক্রীড়াবিদ কচিৎ মেলে। তিনিই আমায় শিখিয়েছেন ভগবানের মত নির্বিচারে মানুষের প্রাণ নিতে আর সৌন্দর্যের সন্ধান পেলে তাকে ভালবাসতে। সমস্ত মানুষের বিরুদ্ধে একলা দাঁড়িয়ে জয়ী হওয়ার মধ্যে শত হলেও আনন্দ আছে। তাই না? তোমাদের এই বর্তমান সামাজিক বিশৃঙ্খলার কাঠামো সম্পর্কে অনেক চিন্তা করেছি। কিন্তু তোমায় বল্‌ছি ভায়া, ডুয়েল লড়া ছেলেমানুষি—নেহাৎ বোকামি। জ্যান্ত দুজন লোকের মধ্যে একজনকে যখন মঞ্চ থেকে সরে দাঁড়াতেই হবে, তখন অনিশ্চয়তার উপর নির্ভর করা পাগলামি। ডুয়েল-লড়া সোজা কথায় অর্থহীন। ভেবে দ্যাখ না। পঁয়ত্রিশ পা দূর থেকে ইস্‌কাতনের টেক্কার পেটে একটার পর একটা করে আমি পাঁচ পাঁচটা গুলি লাগাতে পারি। এতটা বাহাদুরি থাকলে নিশ্চয়ি প্রতিদ্বন্দ্বীকে খুন করা যায়। আচ্ছা, বিশ পা দূর থেকে একজনকে আমি গুলি করেছিলাম—লাগল না। সে লোকটা জীবনে পিস্তল চালিয়ে দেখেনি। তারপর ওয়েস্ট কোট খুলে শুয়োরের পিঠের মত লোমশ বুক বার করে রহস্যময় লোকটি বলে, এইদিকে তাকাও! রাঙাটে উসকো খুসকো লোমগুলি ওজেনের মনে বিরক্তিভরা বিভীষিকা সৃষ্টি করে। তখন রাস্তিঞাকের হাত টেনে নিয়ে নিজের বুকের উপর এক গভীর ক্ষতচিহ্নে তার আঙুলটা চেপে ধরে বলে, আনাড়ী লোকটা আমার বুকের লোম ঝলসে দিয়েছে। কিন্তু তখন আমি ছেলেমানুষ—তোমার বয়সী হব—বছর একুশেক। তখনও কিছু কিছু আস্থা ছিল। বিশ্বাস করতাম নারীর ভালবাসায়, কি অমন গুচ্ছের বাজে জিনিসে। তোমারও শীগগিরই পরিচয় হবে এ সবের সঙ্গে। তুমিও লড়াই করতে আমার সঙ্গে। করতে না? আমাকে হয়ত খুন করেও বসতে পারতে। ধর আমি মরে গেলাম, কিন্তু তখন তুমি কোথায় থাকবে? তোমায় তখন সরে পড়তেই হবে। হয়ত সুইজারল্যাণ্ডে বাপের টাকা ধ্বংস করবে! আর সে বেচারীর হয়ত নিজের সংসার চালাবার অর্থ জোটে না। আমি তোমার চোখ খুলে দিচ্ছি—বুঝিয়ে দিচ্ছি আসল অবস্থাটা। তোমার চাইতে আমার বিচারশক্তি বেশী বলেই বলছি। এখানকার হালচাল আমার জানা। দেখেছি, দুটি মাত্র পথ আছে: নির্বোধ আনুগত্য অথবা বিদ্রোহ। কোন কিছুই আমি মানি না, বুঝলে?

যে পথে যাচ্ছ সেদিকে চলতে গেলে কত অর্থের প্রয়োজন জান? নগদ দশ লাখ! তা যদি না থাকে তো মাথা ঠাণ্ডা করে স্যাঁক্লুতে বসে ভগবানের খোঁজ করা যেতে পারে। কিন্তু সে দশ লাখ আমি তোমায় দেব।

সহসা থমকে গিয়ে সে ওজেনের দিকে তাকায়।—এইতো! চোখ দেখে মনে হচ্ছে যেন পাপা ভোতর্যাঁর উপর এইবার খানিকটা সদয় হয়েছ! কোন মেয়েকে যদি কেউ বলে,' আজ সন্ধ্যায় আসছি' আর আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে বেশবিন্যাস করার সময় বেড়ালের দুধ-চাটার মত মেয়েটি যদি তার ঠোঁট চেটে খায়, তাহলে সেই মেয়েটির মুখের যে অবস্থা হয়, কথাটা শুনে তোমাকেও যে তেমনি দেখাচ্ছে হে! ভাল কথা! এইবারে তাহলে আসল কথা পাড়া যেতে পারে। আমাদের ব্যালান্স-সিটটা তাহলে বিশ্লেষণ করে দেখা যাক। দেখা যাচ্ছে, বাপ, মা, বড় মাসি, সতের-আঠার বছরের দুটি বোন, পনর আর দশ বছরের দুটি ভাই রয়েছে আমাদের। কেমন, এই তো গোটা পরিবারের হিসাব? মাসি বোনদুটিকে পালন করছেন। পুরুত এসে লাতিন পড়িয়ে যাচ্ছে ভাই দুটিকে। সাদা রুটির চাইতে পরিজনদের চেস্টনাটই বেশী খেতে হয়। বাবাকে হুঁশিয়ার থাকতে হয় যাতে পাজামাটা ছিঁড়ে না যায়। মা'র যদি থাকে তো বড় জোর একটি গ্রীষ্মের পোশাক আর একটি মাত্র শীতের পোশাক আছে। আমাদের বোনেরা যতটা পারে নিজেদের জামা-কাপড় নিজেরাই তৈরী করে নিচ্ছে। সবই আমার জানা হে! দক্ষিণে আমি ছিলাম যে! এই তো বাড়ীর অবস্থা! তারা যদি বছরে বারশ ফ্রাঁ পাঠায় তো সম্পত্তির আয় বড় জোর তিন হাজার। তাছাড়া একটা পাচক আর একটা চাকরও আছে আমাদের! কারণ বাবা তো বারঁ—ঠাঁট আমাদের বজায় রাখতেই হবে!

—তাছাড়া, আমরা আবার উচ্চাভিলাষী। বোসেয়াঁদের সঙ্গে আত্মীয়তা আছে যে! তবু চলতে হয় হেঁটে হেঁটে। বড়লোক হতে চাই—কিন্তু পকেটে কপর্দকও নেই। খাকি ভোকে মার মেসে, কিন্তু সাধ হয় কোবুর স্যাঁ জেরম্যাঁর অভিজাত পাড়ায় লোভনীয় ডিনার খেতে। সামান্য খড়ের গদিতে শুয়ে আমরা সৌধের সপ্ন দেখি! এ সব জিনিস পাবার আগ্রহের জন্য তোমায় দোষ দিচ্ছি না। কিন্তু উচ্চাশা সকলর জন্য নয় হে ছোকরা! মেয়েদের জিজ্ঞাসা কর, কি ধরনের লোক তারা পছন্দ করে? অমনিই জবাব আসবে, উচ্চাভিলাষী লোক। উচ্চাভিলাষীদের মেরুদণ্ড অপরের চাইতে পোক্ত,

তাদের রক্তে লোহার অংশ বেশী আর তাদের অন্তরও অপরের চাইতে উষ্ণ। জীবনের যে সময় নিজেকে সব চাইতে শক্তিমান বলে মনে হয়, সেই উচ্ছল সুখের দিনে নিজেদের এত ভাল করে মেয়েরা চেনে যে অমিত শক্তিমানকেই তারা পছন্দ করে। এজন্য ধ্বংস হয়ে যেতে হয় সে-ও ভাল।

—সরাসরি তোমর সমস্যায় আসব বলেই তোমার উচ্চাশার হিসাব করলাম। ভোতর্‌্যাঁ বলে যায়। এইবার আসল প্রশ্নের কথা বলব। নেকড়ের মত বুভুক্ষু আমরা, দাঁতও বেশ ধারালো, কিন্তু কি করে খাবার পাত্রের যোগাড় করা যায়? প্রথমে আইন-কানুন গলাধঃকরণ করতে হবে। খুব আরামের জিনিস নয়। আর কিছুই শেখা যায় না তা থেকে। তাঁহলেও না শিখে উপায় নেই। আচ্ছা, এ পর্য্যন্ত ভাল। তারপর জেলা কোর্টের প্রেসিডেন্ট হবার আশায় তুমি আইনজীবী হলে, কারণ, ধনীরা যাতে নিশ্চিন্তে ঘুমোতে পারে তার সুবিধা করে দেবার জন্য মানুষ হিসাবে আমাদের চাইতে ঢের ঢের ভাল হতভাগ্য বেচারিদের 'টি-এফ' ছাপ মেরে জাহাজী কয়েদে পাঠাতে হবে যে! খুব আরামের জিনিস নয় নিশ্চয়! তাছাড়া এ পদ পেতে সময়ও অনেক লাগে। প্রথমত ভাল ভাল জিনিসের দিকে চেয়ে চেয়ে বছর দুয়েক পারির ঝকমারি সইতে হবে। শুধু দেখতেই পার, হাত দিয়ে ছোঁয়ার অধিকার নেই। শুধু চাওয়া আর চাওয়া, কিন্তু কোন কালে পাওয়া যাবে না। আমরা যদি রক্তহীন অলস প্রাণী হতাম তো কোন ভাবনা ছিল না। শিরায় শিরায় যে সিংহের মত উষ্ণ রক্তস্রোত ব..! দিনের মধ্যে বিশ পঁচিশটা বোকামি করার আগ্রহ রয়েছে যে! কাজেই এ পীড়ন তোমাকে সইতেই হবে। ভগবানের নরকে যত রকম পীড়ন আছে বলে শুনেছি, তার চাইতেও বিভীষিকাময় এই পীড়নের দাহ। আচ্ছা, না হয় ধরে নিলাম তুমি ভাল ছেলে—দুধের গেলাসে চুমুক দিয়ে নিজের ঝামেলার জন্য শুধু হা-হুতাশই করতে পার। তাহলে যে যন্ত্রণা কুকুরকে পর্যন্ত পাগল করে দেয়, বেশ কিছু দিন তাই সহ্য করার পর তোমার মত বীরপুরুষকে হয়ত কোন এক শহরের গহ্বরে কোন রাস্কেলের অধীনে ডেপুটি হয়ে জীবন শুরু করতে হবে। আর কসাই যেমন কুকুরকে মাংসের টুকরো ছুঁড়ে দেয়ে, গবর্ণমেণ্টও তেমনিভাবে দয়া করে বছরে তোমাকে বারশ' ফ্রাঁ ছুঁড়ে দেবে। তোমার কাজ হবে চোরের পেছনে কুকুরের মত ঘেউ ঘেউ করা, ধনীদের জন্য ওকালতি করা আর দৃঢ়চেতা মানুষকে শিরশ্ছেদের জন্য গিলোতিনে পাঠান। অশেষ ধন্যবাদ! কোন প্রতিপত্তি

যদি না থাকে তো মফঃস্বলের আদালতেই পচে মরবে। তিরিশ বছর বয়সে বছরে বারশ' ফ্রাঁ মাইনের বিচারক হবে! যদি অবিশ্যি তার আগেই কাজে ইস্তফা না দাও। তারপর চল্লিশ বছর বয়সে হয়ত বছরে হাজার বারশ' ফ্রাঁ আয়ের কোন কলওয়ালার মেয়েকে বিয়ে করে বসবে। কেমন হে, কেমন জোর কপাল দ্যাখ তো! আবার প্রভাব প্রতিপত্তি যদি থাকে তো তিরিশ বছর বয়সেই বাৎসরিক তিন হাজার ফ্রাঁ মাইনের সরকারী কৌসুলী হতে পারবে আর সুরূপা মেয়রের মেয়েও জুটবে। এর পর সেইখানে দু'চারটে রাজনৈতিক বোকামি করতে যদি রাজী হও তো বছর চল্লিশেক বয়সে এটর্নি জেনারেল হয়ে যেতে পার—চাই কি আইন সভার সভ্য হতে পার। খেয়াল রেখ ভায়া, এতে আমাদের বিবেকের অনেক কিছু বিসর্জন দিতে হবে, অনেক কিছু ঘষে-মেজে বাদ দিতে হবে বিচারবুদ্ধি থেকে আর এখানে পৌছোতে সময় লাগবে কমসে কম বছর বিশেক। বিরক্তিকর দুর্ভাবনা আর চাপা দুঃখ-দুর্ভোগে কাটাতে হবে এতটা সময়। তাছাড়া, আমাদের বোনেরাও ততদিনে বুড়ী হয়ে যাবে কিন্তু বিয়ে হবে না। আর একটা কথাও তোমাকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে গোটা ফ্রান্সে মাত্র বিশজন এটর্নি জেনারেল আছে আর সেই পদপ্রার্থীর সংখ্যা কম পক্ষে বিশ হাজার। এদের মধ্যে এমন সব রাস্‌কেলও আছে যারা বংশের মানমর্য্যাদা বিকিয়ে দিয়েও একধাপ উপরে ওঠার চেষ্টা করবে।

—আচ্ছা, এ সব জিনিস যদি তোমার বিরক্তি উৎপাদন করে তো এস, আর একদিক বিচার করি। বার্ঁ দ রাস্তিঞাক কি এডভোকেট হতে চান? বেশ, ভাল কথা! তাহলে বছর দশেক তাকে দাস হয়ে থাকতে হবে, মাসে মাসে হাজার ফ্রাঁ খরচ করতে হবে। আবার লাইব্রেরি আর চেম্বারও থাকা চাই। তাছাড়া সৌখিন সমাজে যাতায়াত করতে হবে, মামলার জন্য সলিসিটরের কাছে নতজানু হতে হবে আর—হাইকোর্টের মেজেও জিভ দিয়ে সাফ না করলে উপায় নেই। এতেও যদি কোন সুরাহা হয় তো আপত্তি নেই। কিন্তু পারির এমন পাঁচজন এডভোকেটের নাম কর তো যারা পঞ্চাশ বছর বয়সেও বছরে পঞ্চাশ হাজার ফ্রাঁর বেশী আয় করে? বয়ে গেল! এভাবে আত্মহত্যা করার চাইতে জলদস্যু হওয়াও ভাল। তাছাড়া নগদ টাকা পাচ্ছ কোথায়? হেসে উড়িয়ে দেবার প্রশ্ন নয়। স্ত্রীর যৌতুকের টাকাকটিই আমাদের মত লোকের একমাত্র সম্বল। বিয়ে করার সাধ হয়? তাতে নিজের গলায়

সেখে পাথর ঝোলাবে। তাছাড়া টাকার লোভে যদি বিয়ে কর তো আমরা যে আত্ম-মর্যাদা আর সুরুচির বড়াই করি সেটা রইল কোথায়? তাহলেই দেখ, মানুষের একালের আস্থার বিরুদ্ধেও তোমাকে বিদ্রোহ করতে হচ্ছে। সাপের মত স্ত্রীর পায়ের তলায় মোড়ামুড়ি করা, শ্বাশুড়ীর পা-চাটা আর জঘন্য ঘৃণিত কাজ করা ছাড়া গত্যন্তর নেই! থুঃ! কিন্তু তাতেও যদি সুখী হওয়া যেত! এই শর্তে কোন মেয়েকে যদি বিয়ে কর তো তোমার অবস্থা নর্দমার পাথরের চাইতেও জঘন্য হবে। স্ত্রীর সঙ্গে ঝগড়া করার চাইতে পুরুষের সঙ্গে লড়াই করাও ঢের ঢের ভাল।

—জীবনের চৌমাথায় এসে দাঁড়িয়েছ ভায়া—বেছে নাও! আর তাও বা কেন, তুমি তো ইতিমধ্যেই বেছে নিয়েছ। তোমার বোন দ বোসেয়াঁর বাড়ী গিয়ে ইতিমধ্যেই তো শুঁকে এসেছ বিলাসিতার গন্ধ। তাছাড়া বুড়ো গোরিও-র মেয়ে মাদাম দ রেস্তোর বাড়ীও গেছ। পারির মহিলাদের নমুনা তো তোমার দেখা হয়ে গেছে তাহলে! সেদিন কপালে একটি মাত্র কথা লিখে বাড়ী ফিরেছ। ও লেখা আমি পড়তে জানি। শব্দটি হচ্ছে 'সাফল্য' —যে কোন মূল্যে সাফল্য চাই। আমি মনে মনে বললাম, সাবাস্! এই লোকটার সঙ্গে আমার খাপ খাবে। টাকার দরকার ছিল তোমার। কোত্থেকে যোগাড় হতে পারে? বোনেদের নিঙড়ালে! সব ভাইয়েরাই অবশ্য বোনেদের অল্পবিস্তর নিঙড়ে থাকে। ভগবান জানেন কি ভাবে নিঙড়ে পনেরশ ফ্রাঁ যোগাড় করলে! পাঁচ-ফ্রাঁ মুদ্রার চেয়ে যে-দেশে চেস্টনাট বেশী পাওয়া যায়, কি করে যে হানাদার সৈনিকের মত সেখান থেকে অত টাকা বার করলে! আচ্ছা সে যা হোক, কি করবে তুমি? কাজ করবে? আপাতত তুমি যাকে কাজ বলে মনে করছ, তার ফলে পোয়ারের মত বুদ্ধিবৃত্তির লোক যারা বুড়ো বয়সে তাদের ভোকে মার বোর্ডিংয়ের মত বোর্ডিংয়ে মাথা গুঁজতে হয়। কমপক্ষে পঞ্চাশ হাজার যুবকের এখন তোমার মত অবস্থা— সাফল্যের সহজ পথ বার করার জন্য মাথা খুঁড়ে মরছে। হাঁ হে, তোমার মত ছেলে ওর চাইতে কম নেই। যে প্রচণ্ড শ্রম আর তীব্র সংগ্রাম তোমায় করতে হবে, তার কথা নিজেই ভেবে দেখতে পা । তোমাদের জন্য পঞ্চাশ হাজার পদ নেই দেখে মাকড়সার মত পরস্পরকে তোমরা গিলে খাবে। কি করে এখানে পথ বার করতে হয় জান? হয় প্রতিভার বলে, আর না-হয় শঠের মত দুর্নীতির আশ্রয় নিয়ে। এই জনসমুদ্রের মধ্য দিয়ে হয় কামানের গোলার

মত তোমায় পথ করে নিতে হবে, আর না-হয় মহামারির মত ওদের মধ্যে সঙ্গোপনে অনুপ্রবেশ করতে হবে। সাধুতায় কিছু হবার নয়। প্রতিভার দীপ্তির কাছে মানুষ হার মানে। প্রথমে তারা ঘৃণা করে প্রতিভাকে। লুটের ভাগ না দিয়ে প্রতিভাবান মানুষ সব কিছু নিজে নিয়ে নেয় বলে তাকে আঘাতও করে। কিন্তু প্রতিভা যদি দৃঢ়তা নিয়ে কাজ করে যায় তো শেষ অবধি মানুষ তাকে পথ ছেড়ে দেয়। সোজা কথায়, কাদার তলে ঠেসে রাখার চেষ্টা যদি ব্যর্থ হয়, তখনই মানুষ নতজানু হয় প্রতিভার কাছে। দুর্নীতি এ-দুনিয়ায় বড় শক্তিমান। কিন্তু প্রকৃত গুণীর অভাব আছে। কাজেই দুর্নীতিই অগণিত মাঝারি বুদ্ধির লোকের একমাত্র হাতিয়ার। সর্বত্রই এই হাতিয়ারের খোঁচা টের পাবে। দেখবে, সর্বসাকুল্যে বছরে ছ' হাজার ফ্রাঁ আয়ের স্বামীদের স্ত্রীরা বেশবাসে দশ হাজার ফ্রাঁরও বেশী খরচ করে। দেখবে, বছরে বারশ ফ্রাঁ আয়ের সরকারী চাকুরেও জমিদারি কিনছে। ফ্রান্সের কোন লর্ডের ছেলের গাড়িতে করে পাক খেয়ে খেয়ে লঁ শাঁ বেড়াতে যাবার সুযোগ পেলে দেহদান করতেও মেয়েরা কুণ্ঠাবোধ করে না। সেদিন তো নিজেই দেখলে, ঐ হাঁদা বুড়ো গোরিও বেচারি কেমন করে মেয়ের ধার শোধ করে এল। অথচ জামাইর বছরের আয় পঞ্চাশ হাজার ফ্রাঁ। আমি জোর করে বলতে পারি, নরকের চাইতে জঘন্য গোপন লেনদেন টের না পেয়ে এই পারির রাস্তায় দু'পাও হাঁটতে পারবে না। বাজী রেখে আমি বলতে পারি, ধনী, সুন্দরী আর তরুণী কোন মহিলার দিকে নজর দিয়েছ কি বোলতার চাকে খোঁচা মেরেছ। এ যদি সত্য না হয় তো আমার নাম মিথ্যা! 'সব বেটি আইন ফাঁকি দেয়—প্রতিটি জিনিস নিয়ে সবাই মারমুখো হয়ে ঝগড়া করে স্বামীর সঙ্গে। প্রণয়ী, শখের জিনিস, সন্তান-সন্ততি, ঘরকান্না কি অহমিকার জন্য এরা যে-সব কাজ করে, তার গল্প শুরু করলে আর শেষ হবে না। কিন্তু কদাচিৎ এদের সৎ কাজ করতে দেখবে। কাজেই সজ্জন সকলের শত্রু।

—কিন্তু এ শহরে সৎলোক কাকে বলবে? যারা মুখ বন্ধ করে থাকে আর লুঠের ভাগ নিতে অস্বীকার করে তারাই পারি শহরের সৎলোক। শ্রমের ন্যায্য মূল্য না পেয়ে যে হতভাগারা সর্বত্র খেটে মরছে, তাদের কথা আমি বলছিনে। ওদের আমি ভগবানের রাজ্যে সর্বশক্তিমান অকর্মণ্যের দল বলে ডাকি। এদের নির্বুদ্ধিতার মধ্যেও সততা পূর্ণ বিকশিত—তেমনি দারিদ্র্যও আছে।

শেষ বিচারের দিনে ভগবান যদি চালাকি করে অনুপস্থিত থাকেন তো এদের মুখের ভাবখানা আমি চোখের সামনে দেখতে পারছি।

—তাহলেই বুঝছ, চটপট যদি ভাগ্যবান হতে চাও তো বড়লোক হওয়া চাই, আর না হয় বড়লোকী চাল দেখাতে হবে। সব সময় চরম ঝুঁকি নিয়ে জুয়া খেলতে হবে এখানে। তা যদি না পার তো কেউ পুছবে না— কিছু করতে পারবে না জীবনে। দুদিনেই খতম হয়ে যাবে। আবার হাজারো বৃত্তির জনকয়েক লোক হয়ত চটপট উপরে উঠে গেল। তাদের অনুসরণ করে রাতারাতি যদি তরতর করে উপরে উঠে যাও তো জনসাধারণ চোর নাম দেবে। এইবার নিজেই সিদ্ধান্ত করে ফেল। এইটেই এখানকার জীবনের আসল রূপ। রান্নাঘরের চাইতে বড় বেশী ভাল নয়। ঠিক তেমনি গন্ধভরা। আর ভালভাবে যদি বাঁচতে চাও তো হাত নোংরা করতেই হবে। আসল কথা হচ্ছে, ময়লা সাফ করার কায়দাটা জানা থাকা চাই। নোংরা হাত ধুয়ে ফেলার কৃতিত্বের মধ্যেই আমাদের যুগের সমস্ত নীতিজ্ঞান নিহিত।

—সঙ্গত কারণ আছে বলেই দুনিয়ার এই ধরণের সমালোচনা করছি। এ-দুনিয়াকে আমি ভালভাবেই চিনি। ভাবছ, দুনিয়ার নিন্দা করছি? মোটেই না। বরাবরই তো এমনি হাল দুনিয়ার। পরিবর্তন করা নীতি-বাগীশদের কাজ নয়। মানুষ তো আর দেবদূত নয়! কখনও সে চরম কপট, আবার কখনও বা খানিকটা কম। নীতিবোধ মানুষের আছে কি নেই, তাই নিয়ে মূর্খেরা মাথা ঘামায়। ধনীদের আমি জনতার চাইতে বেশী খারাপ মনে করি না। এই সমাজ জীবনের উঁচুতলা, নীচুতলা কি মাঝখানকার মানুষ সবাই প্রায় একই ধরণের। গরু-ভেড়ার পালের মত এই লক্ষ লক্ষ মানুষের মধ্যে দশ-বারজন খরবুদ্ধির মানুষ সব কিছুর উপরে উঠতে পারে—এমনকি আইনেরও উর্ধে। আমি সেই দশজনের একজন। যদি সাধারণ ভেড়ার-পালের উর্ধে উঠতে চাও তো মাথা খাড়া করে সোজা সামনে এগিয়ে যাও। কিন্তু খেয়াল রেখ,, ঈর্ষা, কলঙ্ক আর মাঝারি মানুষের হীনতার বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে তোমাকে। এক কথায়, গোটা দুনিয়ার বিরুদ্ধে লড়তে হবে। ওব্রি নামে এক সময়-সচিবের বিরুদ্ধতা করেছিলেন নাপলেয়ঁ। কারণ লোকটা তাকে উপনিবেশে পাঠাতে পারেনি। বাজিয়ে নাও নিজেকে। পরখ করে দেখ, আগের রাত্রে যতটা দৃঢ় সংকল্প ছিল পরদিন সকালে ঘুম ভেঙে তার

চাইতে বেশী দৃঢ়তা নিয়ে বিছানা ছেড়ে উঠতে পারছ কিনা। তাই যদি পার তো তোমায় আমি এমন সুযোগ দেব যা সবাই লুফে নেবে। যা বললাম খেয়াল রেখ।

—একটা খেয়াল আমার মাথায় এসেছে, বুঝলে! ভাবছি, যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণাঞ্চল গিয়ে, ধরো লাখ একরের মত এক জমিদারি কিনে, সেখানে গোষ্ঠীপতির মত বসবাস করব। ইচ্ছে আছে প্লাণ্টার হব, ক্রীতদাস রাখব আর নিজের গরু-ভেড়া, নিজের তামাক, নিজের কাঠ বিক্রী করে বেশ কয়েক কোটি টাকা আয় করে রাজার হালে থাকব—যা খুশি করব। এমনভাবে বাঁচব যে, পাথর আর প্লাস্টার দিয়ে তৈরী আমাদের এই খুপরির মানুষ তা কল্পনাও করতে পারবে না। আমি একজন মস্ত কবি, বুঝলে হে! আমার কবিতা লেখা হয় না। কল্পনায় আর কাজে সে কবিতা রূপ পায়। এখন আমার হাতে হাজার পঞ্চাশেক ফ্রাঁ আছে। তাতে বড়জোর জনচল্লিশেক নিগ্রো কেনা যেতে পারে। কিন্তু অত কমে হবে না তো! কম্‌সে কম দুশো নিগ্রো চাই—দুশো নিগ্রো আমার কুলপতি হবার সাধ পূর্ণ করবে। জান বোধহয়, নিগ্রো ছেলে চাইলেই পাওয়া যায়। যা খুশি করতে পার তাদের দিয়ে। কোন সরকারী উকীল তাদের সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন করবে না। এই কালো পুঁজি নিয়ে দশ বছরে আমি তিরিশ চল্লিশ লাখের মালিক হব। যদি সফল হই তো কেউ জিজ্ঞাসাও করবে না—তুমি কে হে? আমি তখন চল্লিশ লাখপতি মার্কিণ নাগরিক! পঞ্চাশ বছর বয়স হলেও বুড়িয়ে যাব না—নিজের খেয়ালমত সুখভোগ করতে পারব।

—সোজা কথা, তোমায় যদি দশ লাখের এক উত্তরাধিকারিণী জুটিয়ে দিতে পারি তো আমায় দু'লাখ দেবে কি? খুব বেশী বাট্টা চাইনি—শতকরা কুড়ি টাকা মাত্র। স্ত্রীর ভালবাসা তুমি আদায় করতে পারবে। বিয়ে হয়ে গেলেই খানিকটা অস্বস্তি, খানিকটা বিমর্ষতার ভাব দেখাবে। কয়েক সপ্তাহ চালাবে এইভাবে। তারপর একদিন রাত্রে কিছুটা ন্যাকামির পর গোটা দুয়েক চুমু খেয়ে স্ত্রীর কাছে স্বীকার করবে যে তোমার দু'লাখ ফ্রাঁ ধার আছে। তারপর বলবে, প্রাণেশ্বরি! আরে, অভিজাত সমাজের যুবকেরা প্রতিদিন এই প্রহসন করে থাকে। যাকে মনে লাগে তার জন্য টাকা খরচ করতে মেয়েরা কুণ্ঠাবোধ করে না। এতে তোমার লোকসান হবে ভাবছ? মোটেই না। আবার হয়ত ব্যবসায়ের এক লেনদেনে এই দু'লাখ তুমি মেরে দেবে।

নিজের পুঁজি আর বুদ্ধি নিয়ে তুমি যত খুশি টাকা জমাতে পারবে। চাই কি, মাস ছয়েকের মধ্যে নিজেকে, মধুর স্বভাব স্ত্রীকে আর পাপা ভোতর্‌্যাকে পর্যন্ত সুখী করতে পারবে। তবে তোমার নিজের পরিবারের কিছু হবে না। শীতের দিনে চেলা কাঠের অভাব তাদের আঙুল পুড়িয়েই মেটাতে হবে। আমার এই প্রস্তাব বা যা চাইলাম তাতে আঁতকে উঠ না যেন! পারির সৌখিন সমাজের ষাটটে বিয়ের মধ্যে সাত-চল্লিশটাই এই ধরণের। নোটারিদের চেম্বার বাধ্য করেছে মঁশিয়……

—কি আমায় করতে হবে? সাগ্রহে বাধা দিয়ে বলে ওঠে রাস্তিঞাক। বঁড়শীর টোপে একটু একটু টান পড়তে আরম্ভ করলে শিকারীর মনে যেমন চাপা উল্লাস দেখা দেয়, আপনা থেকে তেমনি একটা উৎসাহের ভঙ্গী করে ভোতর্‌্যা বলে, কিছুই না। যা বলছি মন দিয়ে শোন। দুর্ভাগিনী দুঃখিনী বালিকার হৃদয় শুকনো স্পঞ্জের মত পিপাসু। ভালবাসার রস পড়লে অমনিই শুষে নেবে। ফোঁটা ফোঁটা দরদ তার মধ্যে পড়বে আর সে-স্পঞ্জ প্রসারিত হবে। নিঃসঙ্গতা, হতাশা আর দারিদ্র্যে দিশেহারা কোন মেয়েকে যদি অপ্রত্যাশিতভাবে প্রেম নিবেদন কর তো কোনদিন হতাশ হবে না। এ যেন আগে থেকে নম্বর জেনে লটারি খেলার মত—গোপনে সংবাদ জেনে শেয়ারের বাজারে ফটকা খেলার মত! তাহলে পোক্ত ভিতের উপর তুমি অবিনশ্বর বিবাহের ইমারত গড়ে তুলবে। মেয়েটি যখন লাখ লাখ টাকার মালিক হবে, তখন সব টাকা তোমার পায়ের উপর ছুঁড়ে ফেলে বলবে, তুমিই সব নিয়ে নাও আদলফ! কিংবা হয়ত বলল, নিঃ নাও আলফ্রেদ। কিংবা ওজেনও বলতে পারে। এতটুকু আত্মত্যাগ করার মত বুদ্ধি যার আছে তার নাম ধরেই বলবে। এই আত্মত্যাগের অর্থ পুরনো কোট বেচে দিয়ে মেয়েটির সঙ্গে কাদ্রাঁ ব্লোতে টোস্টের সঙ্গে মাসরুম খেতে যাওয়া, তারপর সন্ধ্যাবেলা আঁবিগু কমিকে যাওয়া, কিম্বা নিজের আংটি বন্ধক দিয়ে স্ত্রীর জন্য একখানা শাল কেনা। তাছাড়া, প্রেমপত্র লেখার রীতি সম্পর্কে নিশ্চয়ই কিছু বলতে হবে না। মেয়েরা যে সব অর্থহীন উচ্ছ্বাসভরা ভাঁড়ামি পছন্দ করে, যেমন ধর, দূর থেকে চিঠি লেখার সময় কাগজের উপর চোখের জলের মত করে জল ছিটিয়ে দেবার রীতির কথাও বলা নিষ্প্রয়োজন, কি বল? হৃদয়ের ভাষা ভালভাবেই জান নিশ্চয়!

—নতুন জগতের মত হাজারো অসভ্য উপজাতি বাঁচবার জন্য লড়াই করছে

পারি শহরে। বুঝলে? ইলিয়নিস আর হুরনদের মত বহু অসভ্য আছে। শিকার করে যা সংগ্রহ করা যায় তার উপর বেঁচে আছে সমাজের প্রতিটি শ্রেণী। ধর, লাখ টাকার শিকারী তুমি। এই শিকার পাবার জন্য জাল পাতছ, নানা ভাবে ফাঁদ পেতে বসেছ। বহু রীতি আছে শিকারের। কেউ উত্তরাধিকারিণী শিকার করে, কেউ বা অসৎ ব্যাবসায়িক লেনদেনের মারফৎ শিকার ধরে। কেউ কেউ আবার আত্মা শিকার করে। বাকী আর সবাই মক্কেলদের হাত পা বেঁধে বেচে দেয়। কোন শিকারী যদি পরিচ্ছন্নভাবে শিকার ভরতি থলে নিয়ে ফিরে আসতে পারে তো তাকে স্বাগত জানান হয়, আপ্যায়িত করা হয়। সৌখিন সমাজেও তার কদর বাড়ে। বড় অতিথিবৎসল শহর আমাদের। দুনিয়ার কোথাও এমন উদার শহর পাবে না। ইয়োরোপের সমস্ত রাজধানীর গর্বিত অভিজাত সমাজ যদি কোন নীচ ক্রোড়পতিকে পাত্তা না দেয় তো পারি দুই হাত বাড়িয়ে তাকে অভিনন্দন জানাবে, তার পার্টিতে ছুটে যাবে, তার ডিনার খাবে—তার কলংকিত গ্লাসে গ্লাস ঠেকিয়ে সানন্দে মদ্য পান করবে।

—কিন্তু কোথায় পাব এমন মেয়ে? ওজেন বলে।

—তোমার চোখের সামনেই আছে, এমনকি ইতিমধ্যেই তোমার হয়ে আছে!

—মাদমোয়াজেল ভিকতরিন?

—ঠিক ধরেছ।

—ফের ও কথা বলবেন না!

—তোমার ওই বারন্ দ রাস্তিঞ্যাক সে এরই মধ্যে তোমায় ভালবেসে ফেলেছে হে!

—এক কপর্দকও তো ওর নেই! সবিস্ময়ে বলে ওজেন।

—বটে! তাহলে বলছি শোন। আর দু-একটা কথা বললেই সব পরিষ্কার হয়ে যাবে। ওর বাবা তাইফের একটা আস্ত বদমায়েস। বিপ্লবের সময় এক বন্ধুকে খুন করেছিল বলেও খ্যাতি আছে। লোকটা নাকি স্বাধীনচেতা। একটা ব্যাঙ্কের মালিক আর ফ্রেদেরিক্ তাইফের এণ্ড কেম্পানির বড় অংশীদার। একটিমাত্র পুত্র তার। ভাবছে, ভিকতরিনকে বঞ্চিত করে সবটা তাকে দিয়ে যাবে। এ অবিচার আমার সহ্য হয় না। আমার স্বভাবটা দন কুইক্‌জোতের মত। সবলের বিরুদ্ধে দুর্বলকে আমি রক্ষা করতে চাই। ভগবান যদি এই পুত্রকে সরিয়ে নিয়ে যান তো তাইফের নিশ্চয়ই কন্যাকে

স্বীকার করবে। সম্পত্তি দিয়ে যাবার মত উত্তরাধিকারী তার চাই-ই চাই। এটা মানব-চরিত্রের সাধারণ দুর্বলতা। আমি জানি, আর কোন সন্তান তার হবার আশা নেই। ভিকতরিনের স্বভাব যেমন বিনয়ী তেমনি মধুর। দুদিনেই সে বাপকে আঙুলের ডগায় পাক খাওয়াতে পারবে। স্নেহের দুর্বলতায় লোকটা তখন হুওয়া-কলের চরকির মত ঘুরবে। তোমার ভালবাসার কদরও পাবে—ভুলবে না তোমাকে। কাজেই তুমি তাকে বিয়ে করতে পারবে। আমার কথা যদি বল, আমি না হয় ভগবানের কাজটা করে দেব। ভগবানের ইচ্ছাকে আমি ঠিক পথে চালিয়ে নিতে পারব। আমার এক বন্ধু আছে। এক সময় তার অনেক কাজ করে দিয়েছি। লোকটা লোয়ার নদী এলাকার পল্টনের কর্নেল। সবে গার্দ রোয়াইয়ালে (রাজকীয় রক্ষীদল) বদলী হয়েছে। এখন সে উগ্র রাজতন্ত্রী। যে সব লোক নিজেদের মতামত আঁকড়ে থাকে, তাদের মত নির্বোধ সে নয়। আরও কোন উপদেশ দেবার দরকার যদি থাকে তো বলছি শোন, কথার চাইতে বেশী শক্তভাবে মতামত আঁকড়ে থেক না। কেউ যদি মতামত চায় তো বেচে দিও। যে-লোক গর্ব করে বলে যে কখনও তার মত বদলায় না, নিজেকে সে সরল রেখার উপর দিয়ে চলতে বাধ্য করে। মূর্খ এরা—নিজেদের অভ্রান্ত মনে করে। নীতি বলে কোন জিনিস এ দুনিয়ায় নেই, আছে শুধু ঘটনা। কোন আইন নেই, আছে মাত্র পরিবেশ। সাধারণ মানুষের চাইতে বুদ্ধিমান লোক এই ঘটনা আর পরিবেশকে মেনে নিয়ে নিজের কাজে লাগায়। শাশ্বত নীতি বা আইন বলে যদি কিছু থাকত তো আমরা যেমন করে শার্ট বদলাই তেমনিভাবে বিভিন্ন জাতি তাদের নীতি বা বিধিবিধান বদলাত না। জাতির চাইতে ব্যক্তির ন্যায়-অন্যায়বোধ বেশী হবার কোন প্রয়োজন নেই। অনমনীয় লাফাইয়েৎ ফ্রান্সের সব চাইতে বেশী অপকার করেছে। তবু তার উপর লোকের মোহ আছে, তাকে শ্রদ্ধাও করা হয়, কারণ সর্ববিষয়ে সে আদর্শবাদী ছিল। তাকে বড়জোর সংরক্ষণশালার যন্ত্রের মধ্যে রেখে প্রদর্শনী হিসাবে ব্যবহার করা চলে। অ. যে তালেরাঁকে মানুষ নিন্দা করে, মানবসমাজের মুখে অবজ্ঞাভরে অবহেলে যে থুথু ফেলত, সেই উৎপীড়ক, সেই রাজার মত তালেরাঁই ভিয়েনার কংগ্রেসে ফ্রান্সকে বাঁচিয়েছিল—তাকে খণ্ডবিখণ্ড হয়ে যেতে দেয়নি। মানুষ তার মুখে কাদা ছুঁড়ে মারে, কিন্তু জয়মাল্য পাবার অধিকারী সে। এ ঋণ স্বীকার করতেই হবে। ওহে, এ

ছুনিয়ায় কি চলেছে তা আমার অজানা নয়। বহু লোকের গোপন রহস্তের চাবিকাঠি আমার জানা। এর চাইতে বেশী কিছু বলতে চাই না। কোন নীতি সম্পর্কে যদি তিনজন লোকও সম্পূর্ণ একমত হয় তো আমি অপরিবর্তনীয় মনোভাব আঁকড়ে থাকব। কিন্তু তার জন্য দীর্ঘ দিন অপেক্ষা করতে হবে। আইনের তাৎপর্য সম্পর্কে কোন আদালতে তুমি তিনজন বিচারকের অভিন্ন মত দেখবে না।

—যাক, এখন আমার সেই লোকটির কথায় আসা যাক। আমি যদি বলি তো খ্রীষ্টকে আবার ক্রুশে চড়াতেও সে রাজী হবে। যে জানোয়ারটা বোনকে পাঁচ ফ্রাঁ দিয়েও জিজ্ঞাসা করে না, পাপা ভোতর‍্যাঁর এক কথায় সে তার সঙ্গে ঝগড়া বাধাবে। তারপর···। এই সময় উঠে দাঁড়াল ভোতর‍্যাঁ এবং অসি চালনায় দক্ষ লোকের মত আত্মরক্ষার ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে জোরে শ্বাস ছাড়ে। ফের বলে, তারপর? তারপর কবর···।

—সে কি ভয়ঙ্কর কথা! ওজেন বলে ওঠে।—না না, আপনি পরিহাস করছেন মঁশিয় ভোতর‍্যাঁ! নিশ্চয় পরিহাস করছেন, তাই না?

—রোসো, রোসো, অত উতলা হয়ো না! মেজাজটা ঠাণ্ডা রাখ! লোকটা বলে ওঠে।

—খোকামি কর না। তবে যদি ভাল লাগে তো পা' ঠুকে রাগে টঙ্ হতেও পার। ইচ্ছে হয় আমায় স্কাউণ্ড্রেল, গুণ্ডা, দস্যু, গবেট—যা খুশি বল; কিন্তু দোহাই তোমায়, গুপ্তচর বা নীচ বল না। বলে যাও ভায়া, তোপ দাগতে শুরু কর! তোমায় আমি ক্ষমা করব, কারণ তোমাদের মত বয়সে এ জিনিস স্বাভাবিক। এককালে আমিও ঐ রকম ছিলাম। শুধু ভেবে দেখ, একদিন এর চাইতেও নোংরামি তুমি করবে। হয়ত কোন সুন্দরী রমণীর কাছে গিয়ে প্রেমের অভিনয় করবে আর তার টাকা নেবে। এ চিন্তা নিশ্চয়ই তোমার মাথায় এসে গেছে। কারণ প্রেম করে যদি আয় না হয় তো চালাবে কেমন করে? শোন ছাত্রবন্ধু, ধর্ম অবিভাজ্য—হয় আছে, না হয় একেবারেই নেই। পাপের জন্য আমাদের প্রায়শ্চিত্ত করতে বলা হয়। চমৎকার ব্যবস্থা! কিছুটা চাঁদা দিয়েই ত্রাণ পাওয়া গেল। সমাজের এক ধাপ উপরে উঠবার জন্য হয়ত কোন মেয়েকে ফুসলালে, নিছক খেয়াল বা স্বার্থের জন্য কোন পরিবারের মধ্যে হয়ত বিরোধের বীজ বুনলে, যত রকম হীন কাজ করা যায়—সবই হয়ত করলে। ইচ্ছে হয়, বাইরে ভাল আবরণ রাখলে আর না হয় খোলাখুলিই

করলে'; কিন্তু তোমার কি বিশ্বাস এগুলো আস্থা, আশা বা বদান্যতার কাজ? ছিঁচকে চোর যদি রাত্রে কোন ছেলের অর্ধেক সম্পত্তি চুরি করে তো সে দু'মাস জেল খেটে রেহাই পায়, আর তার চাইতেও বিপন্নতার মধ্যে যে বেচারি একশ' ফ্রাঁর নোট চুরি করে সে নির্বাসনে যায়। এই প্রভেদ হবে কেন? অথচ এ-ই তোমাদের বিধান। ওর মধ্যে এমন একটি ধারাও নেই যাকে অসম্ভবের পর্যায়ে ফেলা যায় না। হলদে দস্তানাপরা তোমাদের ওই মধুরভাষী লোকগুলো বহু খুন করেছে। কিন্তু তাদের খুনে রক্ত পড়ে না। যাদের বধ করা হচ্ছে তারাই আবার রক্ত জল-করা ঘাম ফেলে ওদের জন্য খাটে। আগে যে পাজিটার কথা বলেছি, তার অপরাধ—সিঁদ কাঠি দিয়ে সে অন্যের দরজা খুলেছে। দুটোই জঘন্য কাজ। একদিন তুমি যা করবে, আর যে প্রস্তাব আমি করেছি, তার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই—শুধুমাত্র রক্তপাত ছাড়া। দুনিয়ায় ভালমন্দ বিচারের কোন শাশ্বত মানদণ্ড আছে বলে বিশ্বাস কর! মানুষকে ঘৃণা কর তাহলে—আইনের জাল থেকে বেরুবার ফুটোর সন্ধান কর। বাহ্যত আয়ের সূত্রহীন বিরাট বিরাট সম্পত্তিবানদের গোপন অপরাধের রহস্য লোকে ভুলে গেছে। ভুলে গেছে এইজন্য যে, সে-অপরাধ নিখুঁতভাবে করা হয়েছে।

—আর বলবেন না, থামুন এইবার। আর আপনার কথা শুনতে চাই না। আপনি আমার নিজের উপরেই সন্দেহ সৃষ্টি করেছেন। এই মুহূর্তে যা অনুভব করছি, তার বেশী কিছু জানি বলে মনে হয় না।

—বেশ তো, যা ইচ্ছে তোমার! ভেবেছিলাম তুমি আরও শক্ত ধাতে গড়া। ভোতর্যাঁ বলে।—আর বলব না তাহলে। তবু একটা কথা বলে শেষ করছি। কঠোর দৃষ্টিতে ছাত্রটির দিকে চেয়ে থাকে ভোতর্যাঁ। তারপর বলে, আমার গোপন কথা তুমি জানলে।

—যে যুবক আপনার কথায় রাজী হল না, এটুকু বুদ্ধি তার আছে যে এসব কথা তাকে ভুলে যেতে হবে।

—বেশ বলেছ। শুনে খুশি হলাম। আর কেউ হলে এতটা হুঁশিয়ার হত না, বুঝলে? তোমার জন্য যা করতে চাইলাম, খেয়াল রেখ। ভাববার জন্য তোমায় দু' সপ্তাহ সময় দিলাম। ইচ্ছে হয় রাজী হতে পার, না হয় প্রত্যাখ্যানও করতে পার।

ছড়িখানা বগলে নিয়ে ভোতর্যাঁকে খানিকটা উদাসভাব চলে যেতে দেখে

গ্রান্তিগ্রাক মনে মনে ভাবে, কি লৌহকঠোর ইচ্ছাশক্তি লোকটার। তবু মাদাম দ বোসেয়াঁ মার্জিত ভাষায় যা বলেছেন, এ লোকটাও তো সেই একই কথা শোনাল। ইস্পাতের নখ দিয়ে আমার হৃদয় ক্ষতবিক্ষত করে দিয়ে গেল! কেন যেতে চাইছি মাদাম দ নুস্যাঁজাঁর কাছে? আমি নিজেই এখনও যে সব অভিপ্রায় টের পাইনি, ফস্ করে সবই তো বলে দিয়ে গেল। এ যাবৎ বই কি মানুষের কাছ থেকে যত নীতিকথা শুনেছি, দস্যুটা তার চাইতে অনেক বেশি শুনিয়ে গেল। ধর্মের মধ্যে যদি কোন মেশাল না চলে তো ভগিনীদের আমি কি ঠকিয়েছি তাহলে? টেবিলের উপর থলেটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ভাবে ওজেন। আবারও সে বসে পড়ে। মাথাটা কেমন গুলিয়ে যায়। বারবার ভাবে, আমায় কি তাহলে ধর্ম্মনিষ্ঠ হয়ে বীরের মত শহীদ হতে হবে? দুত্তোর ছাই! সবাই ধর্মে বিশ্বাস করে কিন্তু আচরণ করে কজনে? সব জাতিই স্বাধীনতার পূজারী, তবু দুনিয়ার কোথায় স্বাধীন জাতির অস্তিত্ব আছে? আমার যৌবন এখনও মেঘমুক্ত নীল আকাশের মত নির্মল। বড় কি ধনী হতে গিয়ে কি তাহলে মিথ্যা বলতে, নতিস্বীকার করতে, হীন হতে, আবার লাফিয়ে উঠতে, তোষামোদ আর প্রবঞ্চনা করতে মন তৈরী করতে হবে? তার মানে, আমায় কি তাহলে মিথ্যাবাদী হীন তোষামুদেদের সাকরেদ হতে হবে? সাঙাৎ হবার আগে কি তাদের চাকর না হয়ে উপায় নেই? তাই যদি হয় তো ওর মধ্যে নেই। সদ্ভাবে সসম্মানে আমি কাজ করে যেতে চাই। দিনরাত কাজ করব। নিজের শ্রম ছাড়া কারও কাছে সৌভাগ্যের জন্য ঋণী থাকব না। এতে অতি আস্তে আস্তে এগোতো হবে। তা-ই ভাল। রাত্রিবেলা কোন কুচিন্তা না করে ঘুমোতে পারব তো! পেছনে চেয়ে যদি দেখা যায় যে নিজের জীবন কুসুমের মত অমলিন, তার চাইতে আর আনন্দের কি থাকতে পারে? জীবন আর আমি তরুণ প্রণয়ী-যুগলের মত। দশ বছর বিবাহিত জীবনের পর স্বামী-স্ত্রীর যে অবস্থা হয়, তার কথাই শুনিয়েছে ভোতর‍্যাঁ। ওঃ, মাথাটা ঘুরছে! আর কোন কথা ভাবব না। অন্তরের নির্দেশ নির্ভয়ে নির্ভর করে চলা যায়।

মোটা সিলভির কণ্ঠস্বরে ওজেনের চিন্তামগ্নতা কেটে যায়। সে খবর দেয় যে দরজি এসেছে। টাকার থলে হাতে করেই তার সঙ্গে দেখা করতে যায় ওজেন। এভাবে যেতে তার কোন সংকোচ হল না। সান্ধ্য বেশবাস পরখ করে

দেখে সে সকাল বেলার নতুন পোশাকটা পরে। পোশাকটি তাকে সম্পূর্ণ বদলে দেয়।

—মঁশিয় দ ত্রাই-র চাইতে এখন আমি কোন অংশে কম যাই না। মনে মনে ভাবে ওজেন। —তার মানে, পুরোপুরি ভদ্দরলোকের মত দেখাচ্ছে।

বুড়ো গোরিও এই সময় ছাত্রটির দোরগোড়ায় আসে। বলে, মঁশিয় আমায় জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে মাদাম দ নুসাঞ্জাঁ কোথায় কোথায় থায় তা জানি কিনা।

—করেছিলাম।

—সোমবার সে মারেসাল কারিগলিয়ানের বলনাচের আসরে যাচ্ছে। আপনি যদি সেখানে যেতে পারেন তো আমার মেয়েটি কেমন আমোদ-প্রমোদ করল, কি পরেছিল—সব কিছু বলবেন কি?

—কি করে এ খোঁজ বার করলেন গোরিও? অতিথিকে আগুনের পাশে একখানা চেয়ার এগিয়ে দিয়ে জিজ্ঞাসা করে ওজেন।

—তার দাসী বলল। তেরেজ আর কঁস্তাঁসের কাছ থেকে ওদের সব খবর পাই। সানন্দে বলে বৃদ্ধ। তরুণ প্রেমিক যেমন প্রণয়িণীর অজ্ঞাতে অন্যের কাছ থেকে ছল করে তার খোঁজ-খবর জানতে পারলে খুশি হয়, এই বৃদ্ধের অবস্থাও তেমনি। অকপটে নিজের হিংসার বেদনা ব্যক্ত করে বলে, ওদের দুজনেরই দেখা পাবেন।

—ঠিক বলতে পারছি না। ওজেন বলে।—মাদাম দ বোসেয়াঁর সঙ্গে দেখা করে জিজ্ঞাসা করব যে তিনি মারেশালের স্ত্রীর সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিতে পারেন কি না।

এই নতুন পোশাক পরে ভিকঁতেসের সামনে হাজির হবার কল্পনায় মনে মনে একটা গোপন উল্লাসের শিহরণ অনুভব করে ওজেন। নীতিবাগীশেরা যাকে মনের অতল গহ্বর বলে থাকেন, স্বার্থপ্রণোদিত অলীক চিন্তা আর স্বতোৎসারিত আগ্রহ বই তা আর কিছুই নয়! সম্ভোগের আশায় অনুপ্রাণিত বলে এর কোন নির্দিষ্ট ধারা থাকে না, অনবরত পথ বদলে এলোপাথাড়ি ভাবে চলে। তাই এর বিরুদ্ধে এত অনুযোগ নিজের সাজ-সজ্জার মোহে পড়ে পবিত্র শপথের কথা ভুলে যায় রাস্তিঞাক। তাছাড়া, যুবকেরা যখন অন্যায় করতে চলে, তখন বিবেকের আয়নায় নিজেদের মুখ দেখতে সাহস পায় না। কিন্তু প্রবীণেরা আত্মদর্শন করেছে। জীবনের এই দুই পর্যায়ের মধ্যে এইটাই মূল পার্থক্য!

গত কয়েক দিনে ওজেন আর তার প্রতিবেশী গোরিওর মধ্যে বেশ অন্তরঙ্গতা গড়ে উঠেছে। যে মনস্তাত্ত্বিক কারণে ভোতর্‍্যার প্রতি ওজেনের মনোভাব বিরূপ হয়, ঠিক সেই একই কারণে বেড়ে ওঠে এই গোপন অন্তরঙ্গতা। সাহসী দার্শনিকদের মধ্যে যারা পার্থিব জগতের উপর আমাদের ভাবাবেগের প্রতিক্রিয়া বিশ্লেষণ করতে চান, তারা লক্ষ্য না করে পারবেন না যে, মনের এই বাহন আমাদের আর জন্তু-জানোয়ারের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করতে গিয়ে বস্তুর উপর একাধিক প্রভাব বিস্তার করে। কুকুর যেমন চট করে ধরতে পারে যে আগন্তুক তাকে পছন্দ করে কি না, মুখ দেখে যারা মনের ভাব বলতে পারেন তারাও অমন চট করে মানুষের চরিত্র অনুমান করতে পারেন না। যে-সব অবাস্তব দার্শনিক আজও ভাষার মূল শব্দ থেকে খোসা ছাড়াবার চেষ্টা করে থাকেন, আমাদের বর্তমান পরিভাষার 'অনু', 'জাতিত্ব' প্রভৃতি সুপরিচিত চালু শব্দ তাদের বিষম গোলমালে ফেলে দেয়। আমরা 'অনুভব' করি যে আমাদের ভালবাসা হচ্ছে। অনুভূতি সব কিছু প্রভাবিত করে। মহাব্যোমেও তার অবাধ গতি। চিঠি জীবন্ত প্রাণের সামিল। এই লিপির মারফৎ যে সুর মুখরিত হয়ে ওঠে তা এত অকৃত্রিম যে অনুভূতিপ্রবণ মানুষ চিঠিকে প্রণয়ের অন্যতম পরম সম্পদ বলে গণ্য করে। বুড়ো গোরিওর টানও অনুভূতিসর্বস্ব। মনের সঙ্গে তার সম্পর্ক নেই। তাই সে কুকুরের মত গভীর অনুভবশক্তির অধিকারী। অনুভূতি বলেই সে বুঝতে পেরেছে যে ছাত্রটির অন্তরে তার প্রতি সমবেদনা, সহৃদয় শ্রদ্ধা আর তারুণ্যের দরদ উথলে উঠেছে।

অন্তরঙ্গতা সবে শুরু হয়েছে মাত্র। এখনও এমন অবস্থা দেখা দেয়নি যাতে উভয়ে উভয়কে বিশ্বাস করে মনের গোপন কথা জানাতে পারে। মাদাম দ বুসাঁজাঁর সঙ্গে দেখা করার আগ্রহের কথা অবশ্য বলেছে ওজেন। তবে এ জন্য সে গোরিওর উপরেই নির্ভর করছে বলে কথাটা বলেনি। ভেবেছে, হুট করে কথাটা পাড়লে হয়ত কাজে লেগেও যেতে পারে। একদিন বিকেলে দেখা করে আসার পর গোরিওর মেয়েদুটি সম্পর্কে ওজেন যে সব মন্তব্য করেছে সেই প্রসঙ্গেই দু'চার কথা বলেছে বৃদ্ধ। তার বেশী কিছু নয়।

তার পরের দিন বলে, এ আপনি কি করে মনে করলেন মঁশিয় যে আমার নাম বলায় মাদাম দ রেস্তো আপনার উপর চটে গেছে? মেয়েদুটি আমায় খুব ভালবাসে। বাপ হিসাবে আমি সুখেই আছি। তবে জামাই

দুটি ভাল ব্যবহার করে না। আমি চাই না যে জামাইদের সঙ্গে আমার মতভেদের জন্য মেয়েরা কষ্ট পাক। তাই গোপনে তাদের সঙ্গে দেখা করি। যে সব বাপ হামেশা মেয়েদের সঙ্গে দেখা করতে পারে তাদের চাইতে এই গোপন সাক্ষাতে আমি অনেক বেশী আনন্দ পাই। আমার পক্ষে যখন খুশি দেখা করা সম্ভবও নয়; তাই আবহাওয়া ভাল থাকলে শাঁ-জেলিজে যাই। তার আগে চাকরানীদের কাছ থেকে খোঁজ নিয়ে যাই যে মেয়েরা সেদিন বেরুচ্ছে কি না। তারা চলে না যাওয়া অবধি অপেক্ষা করি। তাদের গাড়ি আসতে দেখলেই আমার বুক ধুক্ ধুক্ করে ওঠে। মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাদের সাজ-পোশাকের দিকে চেয়ে থাকি। যাবার পথে আমার দিকে চেয়ে তারা মুচকি হেসে চলে যায়, দুনিয়ার সব কিছুই তখন আমার কাছে আনন্দে ঝলমল করে ওঠে। তার পরেও আমি অপেক্ষা করি; কারণ ওই পথেই তারা ফিরবে। আবারও দেখা হয়। হাওয়া লেগে তাদের আরও সুন্দর দেখায়—গালে গোলাপী আভা ফুটে বেরোয়। শুনি, পাশের কেউ হয়ত বলে উঠল, ভারি সুন্দর মহিলা তো! আনন্দে আমার অন্তর উথলে ওঠে। ওরা তো আমারই আত্মজা, আমারই রক্ত-মাংসের সৃষ্টি! যে-ঘোড়াগুলো ওদের টেনে নিয়ে যায় তাদের পর্যন্ত ভাল লাগে—হিংসে হয় কোলের কুকুরটা দেখে। ওদের সুখেই আমি সুখী। প্রত্যেকেরই ভালবাসার ধরণ আলাদা। আমার ধরণে কারও কোনও ক্ষতির সম্ভাবনা নেই। তবু কেন লোকে আমার কথা ভেবে দুশ্চিন্তা করবে? নিজের মনে আমি সুখেই আছি। মেয়েরা যখন সন্ধ্যাবেলা বল-নাচের আসরে যায় তখন তাদের দেখতে পাব না এমন কোন নিষেধ আইনে আছে কি? দেরীতে গিয়ে যদি শুনি যে মাদাম চলে গেছে তাহলে কি হতাশ যে হই! একবার দুদিন নাজির সঙ্গে দেখা করতে পারিনি, তারপর একদিন রাত তিনটে অবধি তার জন্য অপেক্ষা করেছিলাম। কি আনন্দ যে পেলাম তা আর কি বলব! মেয়েদের সম্পর্কে কোন ভাল কথা যদি বলতে না পারেন তো আমার সঙ্গে কথা বলার দরকার নেই। আমায় তারা কত রকম উপহার যে দিতে চায়। কিন্তু আমিই বারণ করি। বলি, টাকা খরচ করিস না। কি করব আমি উপহার দিয়ে? কিছুই চাই না আমার। ভেবে দেখুন, আমার আসল অবস্থা কি? জঘন্য কঙ্কালও বলতে পারেন। প্রাণটা তো রয়েছে মেয়েদের সঙ্গে সঙ্গে। মাদাম দ নুসাঁজাঁর সঙ্গে দেখা হলে তার সম্পর্কে যা মনে হয় বলবেন। ওজেন বাইরে বেরোবার

জন্ত তৈরী হচ্ছে দেখে একটু ভেবে বলে বৃদ্ধ। মাদাম দ বোসেয়াঁর বৈঠকখানায় হাজির হবার সাহস সঞ্চয়ের পূর্বে তুইলরির উদ্যানে ঘুরে বেড়াবে বলে মনে মনে স্থির করে ওজেন।

এই বেড়ান ছাত্রটির সদভিপ্রায়ের পক্ষে মারাত্মক হল। এমন প্রিয়দর্শন, এমন সুচারু বেশবাসপরা তরুণ স্বভাবতই বেশ কয়েকটি মহিলার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। যখন বুঝতে পারল যে সে বেশ কয়েকটি মুগ্ধপ্রায় দৃষ্টির লক্ষ্য হয়ে পড়েছে, অমনিই তার মন থেকে বোনেদের আর মাসিকে ঠকাবার গ্লানি আর ন্যায়-অন্যায়বোধের দংশন উধাও হয়ে গেল। মাথার উপর দিয়ে সে এমন মায়া-দানব উড়ে যেতে দেখেছে যাকে দেবদূত বলে ভ্রম হতে পারে। দেখেছে সেই শয়তানকে যে রামধনুরঙা পাখা থেকে পদ্মরাগমণি ছড়ায়, সোনার তীর ছুঁড়ে মারে প্রাসাদ লক্ষ্য করে। বেশবিন্যাসে রমণীকে সে রমণীয় করে তোলে। মূলত অতি সাধারণ কর্তব্যের যে রাজপথ সৃষ্টি করা হয়েছে সোনায় মুড়ে তাকে করে অর্থহীন মহিমা-মণ্ডিত। যে অহামিকার টিনের ঝনঝনানি আমাদের কাছে ক্ষমতার প্রতীক বলে গণ্য হয়, তার মনভোলান আহ্বান শুনেছে ওজেন। হাড় জিলজিলে বৃদ্ধা কোন এক ছেঁড়া ন্যাকড়ার ফেরিওয়ালীও যদি ফেরি করতে এসে কোন তরুণীকে বলে যায় যে, ভাবী জীবনে তার জন্য ভালবাসা আর অর্থের অনন্তভাণ্ডার সঞ্চিত রয়েছে, তবে সেই বৃদ্ধার কদাকার মুখাবয়বও মাঝে মাঝে তরুণীর মনে না পড়ে পারে না। ভোতর্যাঁর উক্তি কঠোর হলেও ঠিক তেমনি ধারা তরুণীর মতই ওজেনের অন্তরে গোপনে বাসা বেঁধে আছে।

প্রায় পাঁচটা অবধি ঘোরাঘুরি করে মাদাম দ বোসেয়াঁর বাড়ী গেল ওজেন। এখানে সে এমন মারাত্মক আঘাত পায় যা যুবকদের চরম ব্যথা দেয়। এতদিন ভিকঁতেস তার প্রতি মার্জিত সৌজন্য আর স্নিগ্ধ সহৃদয় ব্যবহার করে এসেছেন। এ তার অভিজাত শিক্ষার ফল। আন্তরিক হলেই তা নিখুঁত হয়। কিন্তু আজ তাকে আসতে দেখেই মাদাম দ বোসেয়াঁ তীক্ষ্ণ ভঙ্গীতে সরাসরি বলেন, তোমার সঙ্গে আলাপ করা হয়ত সম্ভব হবে না মঁশিয় দ রাস্তিঞাক। অন্তত আজকে তো নয়-ই। আজ আমি ব্যস্ত আছি।

বাইরের এক আগন্তুক আর রাস্তিঞাক এই সময় চটপট এক হয়ে যায়। এই কথা, এই ভঙ্গী, এই চাহনি আর তার কণ্ঠস্বরের ঝংকার মহিলাটির সম-গোত্রীয়দের গোটা চরিত্র ও রীতিনীতির আভাস দেয়। ভেলভেটের দস্তানার

তলায় সে লৌহকঠোর হাতের সন্ধান পায়। মার্জিত সহবতের আড়ালে দেখে স্বার্থপরতা আর অহমিকার আসল রূপ। বার্ণিসের তলায় কাঠের খোঁজ পায়। রাজ-সিংহাসনের মাথায় পুচ্ছের নীচে 'আমরাই রাজা' বলে যে নির্দেশ রয়েছে তার সমর্থ এতদিনে বুঝতে পারে ওজেন। অতি সাধারণ অভিজাতের শিরেও একই কথা লেখা।

সর্বান্তঃকরণে মহিলাটিকে বিশ্বাস করেছে ওজেন। বড্ড বেশী বিশ্বাস করে বসেছে। তাই তার উদ্ধত আচরণ বিশ্বাস করতে পারছে না। সমস্ত দুর্ভাগার মতই সরল বিশ্বাসে এক উদার চুক্তি স্বাক্ষর করেছে ফেলেছে ওজেন। উপকারী আর উপহারগ্রহিতা উভয়েরই এই চুক্তিশর্তে আবদ্ধ থাকার কথা, এবং তার প্রথম শর্ত অনুযায়ী দুটি সহৃদয় প্রাণের মধ্যে পূর্ণ সমতা থাকা উচিত। যে বদান্যতা দুটি অন্তর একত্রে গ্রথিত করে স্বর্গীয় ভাবাবেশে একাত্ম করে দেয়, সাচ্চা ভালবাসার মত তার কদর সামান্যই উপলব্ধি হয়। আর এমন জিনিসের সাক্ষাতও কদাচিৎ মেলে। দুটি জিনিসই মহৎ প্রকৃতির অকৃপণ দান।

কিন্তু দুশেস দ কারিগলিয়ানোর বল-নাচে যাবার স্থিরসংকল্প করেছে রাস্তিঞাক। তাই এই অপমানও সে হজম করল। বাঁধ বাধ গলায় বলেল, জরুরী কাজ না থাকলে আপনাকে বিরক্ত করতে আসতাম না মাদাম। দয়া করে আমায় পরে দেখা করার সুযোগ দিন। আমি অপেক্ষা করব'খন।

—বেশ ভাল কথা, আজ তাহলে আমার সঙ্গে খেও এসে। নিজের কথার রূঢ়তায় কতকটা সংকোচ বোধ করে বলেন মহিলাটি। আসলে মহিলাটি যেমন পদমর্যাদায় মহৎ, তেমনি তার মনটাও দরদী।

মহিলাটির কণ্ঠস্বরের এই পরিবর্তনে প্রভাবিত হলেও বেরিয়ে যেতে যেতে সে মনে মনে ভাবে, পদলেহন করতে হবে তোমাকে—যা কিছু আসুক সহ্য করতে হবে। এমন সহৃদয় মহিলাই যদি মুহূর্তের মধ্যে বন্ধুত্বের সমস্ত প্রতিশ্রুতি অবহেলা করে তোমায় পুরনো জুতোর মত দূরে ফেলে দিতে পরেন তাহলে আর সবাই কেমন হবে? সব লোকেই কি তাহলে আপন সর্বস্ব? সত্য বটে তার বাড়ী দোকান ঘর নয় এবং তার সাহায্য প্রার্থনা করে আমি অন্যায় করছি। তাহলে ভোতাঁর কথাই কি ঠিক? তোপ দেগে ভেঙেচুরেই কি পথ করে নিতে হবে?

তবু ভিকঁতেস তাকে খাবার নিমন্ত্রণ করেছেন। এই আসন্ন আনন্দের কথা মনে পড়তেই তার চিন্তার তিক্ততা লাঘব হয়।

ছোটখাটো দুর্ঘটনার বিস্ময়কর যোগাযোগ ঘটছে ওজেনের জীবনে; আর সেই সব দুর্ঘটনা চক্রান্ত করে তাকে এমন এক রঙ্গমঞ্চে ঠেলে দিয়েছে যেখানে মেজঁ ভোকের রহস্যময় মানুষটির বিভীষিকাময় বিচারে নিজের প্রাণ বাঁচাতে হলে রণাঙ্গনের মত তাকে খুন করতে হবে, বিশ্বাসঘাতকতার বিপদ থেকে ত্রাণ পাবার জন্য হতে হবে বিশ্বাসহন্তা। সেই রঙ্গমঞ্চের তোরণ দ্বারে বিবেক আর অন্তর গচ্ছিত রেখে মুখোসের আড়ালে আত্মগোপন করে মানুষকে চালনা করতে হবে ঘুঁটির মত। রাজমুকুট পরবার যোগ্যতা অর্জন করতে হলে প্রাচীন স্পার্টার মত সবার অলক্ষ্যে ছোঁ মেরে পুরস্কার নিয়ে পালাতে হবে।

ফের ঘুরে এসে ভিকঁতেসকে তার বরাবরের মত উদার ও সহৃদয় বলে মনে হয়। দুজনে একসাথে খাবার ঘরে প্রবেশ করে। ভিকঁৎ সে ঘরে একটা টেবিলের পাশে স্ত্রীর জন্য অপেক্ষা করছিলেন। টেবিলের উপর ভূরি ভোজনের আয়োজন। এ কথা সুবিদিত যে রাজতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার যুগে উপাদেয় খাদ্যের আয়োজন অভিজাত মহলে চরমে ওঠে। দুনিয়ার বহু মনমরা বিষণ্ণ লোকের মত ভাল খাবার আগ্রহ ছাড়া মঁশিয় দ বোসেয়ঁার জীবনে নগণ্য সম্ভোগের আনন্দ অবশিষ্ট ছিল। বস্তুত তাকে অষ্টাদশ লুই আর দুক্ দেসকারের মতাবলম্বী পেটুক বলা চলে। প্রাচুর্যের জাঁকজমক পুরুষানুক্রমে যে সব পরিবারে ঐতিহ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে, তেমনি এক পরিবারে আজ সর্বপ্রথম খেতে বসেছে ওজেন। পরিবেশের জৌলুস তার চোখ ধাঁধিয়ে দেয়। এমনটি আর কোথাও সে দেখেনি আগে। ফ্যাসানের পরিবর্তন হওয়ায় আজকাল আর নৈশভোজনের রেওয়াজ নেই। আগে নৈশভোজনেই বলনাচের আসর শেষ হত। কিন্তু সম্রাটের আমলে এই রীতি পালটান আবশ্যক হয়ে পড়েছিল। কারণ বেরিয়ে যাবার আগে উপস্থিত অফি-সারদের লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে তো! এবং যে কোন মুহূর্তেই তার সম্ভাবনা ছিল। তাই এ পর্যন্ত শুধুই বলনাচের আমন্ত্রণ পেয়েছে ওজেন। যে সংযম ভবিষ্যৎ জীবনে তাকে এত বিশিষ্টতা দান করে, এই সময় থেকেই তার স্ফুরণ হয়। কাজেই চাষার মত সে বিস্ময়ে হাঁ করে রইল না। তবু নতুন ফ্যাসানের রূপোর প্লেটের সৌন্দর্য, ভূরি ভোজনের উপাদেয় আয়োজন আর নীরবে পরিবেশনের পদ্ধতি সর্বপ্রথম দেখে তার মত কৌতূহলী যুবকের পক্ষে সেদিন সকাল বেলার কষ্টকণ্টকিত জীবনের পরিবর্তে এই মার্জিত

সংস্কৃতিবান জীবনধারা পছন্দ করা মোটেই অস্বাভাবিক নয়। পলকের জন্য তার চোখের সামনে বোর্ডিং হাউসের ছবি ভেসে ওঠে। এমন বিরক্তি লাগে যে জানুয়ারি মাসেই বোর্ডিং ছেড়ে দেবার সংকল্প করে। তাতে একটা কাম্য পরিবেশও পাওয়া যাবে আর ভোতর‍্যাকেও ঝেড়ে ফেলা যাবে। পষ্টই সে নিজের কাঁধে লোকটির দৃঢ় থাবা অনুভব করে।

পারির অগণিত প্রকাশ্য কি নীরব দুর্নীতির কথা চিন্তা করলে কাণ্ডজ্ঞান সম্পন্ন যে কোন লোক অবাক বিস্ময়ে ভাবতে পারে যে বুদ্ধিভ্রংশ না হলে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে এ শহরের তরুণদের এক জায়গায় জড়ো করার ব্যবস্থা গবর্ণমেন্ট করত না। অবাক হয়ে সে ভাববে, কি করে এখানকার সুন্দরীরা শ্রদ্ধা পেতে পারে, আর কেনই বা মহাজনদের টাকা আপনা থেকে পাখা গজিয়ে কাঠের বাক্স থেকে উড়ে চলে যায় না? কিন্তু কেউ যদি একথা মনে করে যে তরুণেরা খুব সামান্য অপরাধ বা অন্যায় কাজই করে থাকে, তাহলে নিজের সঙ্গে সংগ্রাম আর পরিণামে প্রায় সর্বক্ষেত্রেই বিজয়ী ধৈর্যশীল বঞ্চিতদের প্রতি কতকটা শ্রদ্ধা সে পোষণ করবে! পারির সংগে সংগ্রামরত এই যুবকের যথাযথ রূপায়ণ যদি করা যায় তো ছাত্র বেচারি আমাদের আধুনিক সভ্যতার এক চরম নাটকীয় দৃষ্টান্ত বলে প্রতিপন্ন হবে।

মাদাম দ বোসেয়াঁ ওজেনের দিকে চেয়ে থাকেন। তাকে কথা বলতে আহ্বান করছেন যেন। কিন্তু সে প্রচেষ্টা ব্যর্থ হল। ভিকঁতের সামনে কোন কথা বলবার আগ্রহ তার ছিল না।

—আজ আমায় ইতালিয়াঁতে (থিয়েটারের নাম) নিয়ে যাচ্ছ কি? স্বামীকে জিজ্ঞাসা করেন ভিকঁতেস।

—তুমি তো জান যে তোমার অনুরোধ রক্ষা করতে পারলে আমি পরম খুশি হই। মার্জিত কপট সৌজন্যভরে বলেন ভিকঁৎ। অনভিজ্ঞ ছাত্রটি কথাটা সরল অর্থেই গ্রহণ করল। —কিন্তু ভারিয়েতে-তে আজ আমার একজনের সঙ্গে দেখা করার কথা আছে!

—প্রণয়িনীর সঙ্গে! মনে মনে বলেন মহিলাটি।

—তাহলে দাত্যুজা কি তোমার জন্য আজ সন্ধ্যায় আসছে না? জিজ্ঞাসা করেন ভিকঁৎ।

—না। সংক্ষেপে জানান মাদাম।

—বেশ, একান্তই যদি দোসর চাও তো মঁশিয় দ রাস্তিঞাককে নিয়ে যাও।

মুচকি হেসে রাস্তিঞাকের দিকে তাকান ভিকঁতেস।
—এ তোমার আপসের কথা। মাদাম বলেন।
—ফরাসীরা বিপদ ভালবাসে। মঁশিয় দ শাতোব্রিয়াঁর ভাষায়, বিপদের মধ্যে তারা গৌরবের সন্ধান পায়। সসম্ভ্রমে অভিবাদন করে বলে রাস্তিঞাক।

মিনিট কয়েক পরেই মাদাম দ বোসেয়াঁর নিজের ব্রুয়ামে চড়ে তারই পাশে বসে পারির রাজপথ অতিক্রম করে অভিজাত থিয়েটারে যায় ওজেন। মঞ্চের মুখোমুখি এক বক্সে ঢুকতে গিয়ে মনে হয় যেন সে যাদুর প্রভাবে পড়েছে। দেখল, একে একে সবকটি অপেরা গ্লাস অপরূপ রূপসজ্জায় ভূষিত ভিকঁতেস আর তার নিজের দিকে ঘুরছে। চমকের পর চমক এসে তাকে মুগ্ধ করে ফেলে। যাদুর উপর যাদু দিশেহারা করে দেয়।
—জান নিশ্চয়ই, আমার সঙ্গে এখন তোমায় কথা বলতে হবে। মাদাম দ বোসেয়াঁ বলেন। —আরে, ঐ দ্যাখ তিনটে বক্সের পর মাদামদ নুসাঁজাঁ বসে আছে। ওর বোন আর মঁশিয় দ ত্রাই আছে ওধারে।

কথা বলবার সময় মাদাম দ বোসেয়াঁ মাদামোয়াজেল দ রশফিদের খোঁজ করেন। তার পাশে মঁশিয় দাত্যজা নেই দেখে তার মুখখানা উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে।

মাদাম দ নুসাঁজাঁর দিকে চেয়ে ওজেন বলে, সত্যিই মোহিনী!
—চোখের পাতা সাদা।
—কিন্তু চেহারার গড়ন কি সুন্দর ছিপছিপে দেখেছেন!
—হাত দুটো বড্ড লম্বা!
—কিন্তু চোখ দুটি অপরূপ!
—মুখখানা কেমন লম্বাটে দেখেছ?
—লম্বা ছাঁদের মধ্যেও বৈশিষ্ট্য আছে।
—তাহলে তাকে ভাগ্যবতী বলতে হবে! অপেরা গ্লাস নিয়ে কেমন আনাড়ীর মত করছে দেখছ? প্রতিটি হালচালের মধ্যে গোরিও বংশের ছাপ। ভিকঁতেস বলেন। ওজেন খানিকটা বিস্মিত হয়। কারণ নিজের অপেরা গ্লাস দিয়ে মাদাম দ বোসেয়াঁ গোটা দর্শকমণ্ডলীকে লক্ষ্য করছিলেন, মাদাম নুসাঁজাঁর দিকে তেমন নজর তিনি দেননি; তবু তার কোন ভঙ্গী মাদামের দৃষ্টি এড়ায়নি। পারির সমস্ত রূপসীদের মেলা জমেছে এখানে। কাজেই মাদাম দ বোসেয়াঁর তরুণ সুদর্শন সৌখিন পোশাকপরা ভ্রাতার দৃষ্টি একান্তভাবে

তার দিকেই পড়েছে বুকে দেলফিন দ নুসাঁজাঁ আত্মপ্রসাদ লাভ না করে পারল না। ওজেনের চোখদুটো প্রকৃতই তার দিকে ছিল।

—অমন করে যদি চেয়ে থাক তো কলঙ্ক রটে যাবে মঁশিয় দ রাস্তিঞাক। অমন করে যদি কারও মাথায় ঝাঁপিয়ে পড় তো কোনদিন সফল হতে পারবে না।

ওজেন তখন বলে, দিদি, প্রচুর উপকার করেছেন আমার। সে অনুগ্রহ যদি পূর্ণ করতে চান তো আর একটা অনুগ্রহও চাইব। তাতে আপনার সামান্য কষ্ট হবে হয়ত, কিন্তু আমার উপকারে লাগবে। আমার প্রাণ বিকিয়ে গেছে!

—এর মধ্যেই?

—হাঁ।

—ওই মহিলার কাছে?

—আর কোথাও আমার আশাআকাঙ্খা পাত্তা পাবে কি? সন্ধানী চোখে ভগিনীর দিকে চেয়ে বলে ওজেন! একটুখানি থেমে আবার সে বলে যায়, মাদাম লা দুশেস দ কারিগলিয়ানো দুশেস দ বীরির বান্ধবী। নিশ্চয়ি তার সঙ্গে দেখা হবে আপনার। দয়া করে তার সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিন। আর সোমবার তার বলনাচের আসরে আমায় সঙ্গে নিয়ে যাবেন কি? মাদাম দ নুসাঁজাঁর সঙ্গে সেখানে দেখা হবে নিশ্চয়ি, আর আমিও পয়লা লড়াই সুরু করতে পারব।

—বেশ তো! ইতিমধ্যেই যদি ওকে চোখে লেগে থাকে তো তোমার প্রেমের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। ঐ ছাখ, দ মার্সি রয়েছে রাজকুমারী গ্যালাতিওনের বক্সে। মাদাম দ নুসাঁজাঁ কোনঠাসা হয়ে আছে, আর মনমরাও বটে। মেয়েদের সঙ্গে আলাপ জমাবার এর চাইতে ভাল সুযোগ হয় না, বিশেষত তারা যদি ব্যাঙ্ক মালিকের স্ত্রী হয়। শোসে দাঁত্যার সব মহিলাই প্রতিশোধ নিতে ভালবাসে।

—আপনি হলে এ অবস্থায় কি করতেন?

—আমি? নীরবে কষ্ট সহ্য করতাম!

এই সময় মার্কি দাহ্যজা এসে মাদাম দ বোসেয়াঁর বক্সে হাজির হয়।

—তোমার সঙ্গে মিলবার জন্য কত চালাকিই যে করতে হল! দাহ্যজা বলে।

—কথাটা বলে নিলাম যাতে এতটা শ্রম পণ্ড না হয়!

ভিকঁতেসের মুখের দীপ্তি ওজেনকে আন্তরিক ভালবাসার অভিব্যক্তি চিনে নিতে শিখিয়ে দেয়। সেদিন থেকে আর কোনদিন একে সে পারির ছেনালি কপটতা বলে ভুল করেনি। শ্রদ্ধাভরে নীরবে সে ভগিনীর দিকে চেয়ে থাকে এবং দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে মঁশিয় দাত্মজাকে আসন ছেড়ে দেয়।

—নারীর গভীর ভালবাসা কি অপরূপ—কত মহৎ। মনে মনে ভাবে ওজেন। —আর এই লোকটা একটা পুতুলের মোহে এই ভালবাসা ছেড়ে যাচ্ছে! হায়রে, কোন প্রাণে মানুষ ওকে ছেড়ে যেতে পারে!

বালকের মত রাগ হয় তার। ক্রোধে অন্তর টগবগ করে ওঠে। ইচ্ছে হয়, মাদাম দ বোসেয়াঁর পায়ে লুটিয়ে পড়ে। ঈগল যেমন ছোঁ মেরে মাটি থেকে দুগ্ধপোষ্য সাদা শূকর ছানা নিয়ে নিজের বাসায় উড়ে চলে যায়, ওজেনেরও তেমনি ইচ্ছে হয়। দানবের মত শক্তিমান হলে সে-ও মহিলাকে হরণ করে নিজের হৃদয় দুর্গে চির-বন্দিনী করে রাখত। এই সৌন্দর্যের মেলার মধ্যে নিজের নিঃসঙ্গতার জন্য, কোন প্রণয়িনী না থাকার জন্য নিজেকে কেমন যেন ছোট ছোট মনে হয়। মনে মনে বলে, প্রণয়িনী থাকা আর রাজবংশের সমতুল এই সমাজে আসন লাভ করা ক্ষমতার নিদর্শন। অপমানিত যেমন করে প্রতিদ্বন্দ্বীর দিকে তাকায়, তেমনিভাবে মাদাম দ নুসাঁজাঁর দিকে চেয়ে থাকে রাস্তিঞাক।

ভিকঁতেস তার দিকে ফিরে তাকান এবং এই বিচক্ষণতার জন্য তার দৃষ্টি নীরবে হাজারো ধন্যবাদ জানায়। এই সময় প্রথম অঙ্ক শেষ হয়ে যায়।

—মাদাম দ নুসাঁজাঁর সঙ্গে তোমার কেমন পরিচয় আছে? মঁশিয় দ রাস্তিঞাকের সঙ্গে তার আলাপ করিয়ে দিতে পার? মঁশিয় দাত্মজাকে জিজ্ঞাসা করেন মাদাম দ বোসেয়াঁ।

—মঁশিয় দ রাস্তিঞাকের সঙ্গে আলাপ করতে পারলে খুশিই হবে। মার্কি বলে।

প্রিয়দর্শন পর্তুগীজ তখন উঠে দাঁড়িয়ে ছাত্রটির হাত ধরে এবং পলকের মধ্যে মাদাম দ নুসাঁজাঁর সামনে উপস্থিত হয়।

মার্কি বলে, মাদাম, মাদাম দ বোসেয়াঁর ভাই শভালিয়ে ওজেন দ রাস্তিঞাকের সঙ্গে আপনার পরিচয় করিয়ে দিতে চাই। আপনি ওর উপর এমন প্রভাব বিস্তার করেছেন যে দেবীর কাছাকাছি নিয়ে এসে ওর সাধ পূর্ণ করা আমি কর্তব্য বলে মনে করলাম।

খানিকটা খোসমেজাজী বিদ্রূপের ছলে কথাকটা ঙ্গ-ভরা একটা রসিকতার জন্য এর অশ্রদ্ধেয় খোঁচা উপেক্ষা করা গেল। এই বাবপত্র। যে তোষামোদের ভাব নিহিত রয়েছে, যথাবিহিত সৌজন্য সহকারে যদি তা ‿ সই করা হয় তো এই সব কথা মহিলাদের কাছে কখনও অপ্রীতিকর হতে পারে না। মাদাম দ মুসাঁজাঁ মুচকি হাসেন এবং স্বামীর শূন্য আসনে ওজেনকে বসতে বলেন। তার স্বামী এখুনি উঠে গেছে আসন থেকে।

—আপনাকে আমার এখানে থাকতে বলতে সাহস হচ্ছে না মঁশিয়। মাদাম দ মুসাঁজাঁ বলেন। কারণ, মাদাম দ বোসেয়ঁার সঙ্গী হবার মত ভাগ্যবান লোক কখনও বেশীক্ষণ তাকে ছেড়ে থাকতে চায় না।

ওজেন তখন চাপাগলায় বলে, আমার ধারণা আপনার এখানে থাকলেই দিদি: বেশী খুশি হবেন। মঁশিয় ল মার্কি না আসা অবধি আমরা আপনার কথাই আলোচনা করেছি, প্রশংসা করছিলাম আপনার অপরূপ চেহারার। কতকটা জোরেই কথাটা শেষ করে ওজেন।

মঁশিয় দাহ্যুজা এই সময় চলে যায়।—সত্যিই থাকছেন তাহলে? বারন্ বলেন। বেশ, তাহলে দুজনেই পরস্পরকে জানাবার সুযোগ পাব। মাদাম দ রেস্তো এর মধ্যেই আপনার সঙ্গে আলাপ করার জন্য আমায় উদ্‌ব্যস্ত করে তুলেছে।

—ভারি কপট তো তাহলে! কারণ, তিনি হুকুম দিয়েছেন যাতে আমি তার বাড়ীতে ঢুকতে না পারি।

—তা কি করে সম্ভব?

—অকপটে আপনাকে কারণ বলছি মাদাম। এই গোপনীয় কথা বলার সময় আমার সব ত্রুটি মার্জনা করতে হবে কিন্তু! আমি আপনার বাবার প্রতিবেশী। জানতাম না যে মাদাম দ রেস্তো তার মেয়ে। সরলভাবে তার কথা আমি তুলেছিলাম, তাতে আপনার বোন আর তার স্বামী দুজনেই অসন্তুষ্ট হন। আপনি কল্পনাও করতে পারবেন না যে বাপের প্রতি সন্তানের এই অবাধ্যতা দুশেস দ লাঁজে আর আমার দিদির মনে যে কি বিচ্ছিরি ধারণা সৃষ্টি করেছে! তারা একে কুরুচির পরিচয় বলে গণ্য করেন। আমি যখন সবটা বর্ণনা করলাম, হাসতে হাসতে তাদের চোখে জল দেখা দেয়। তারপর মাদাম দ বোসেয়ঁা আপনাদের দুই বোনের রেষারেষির আভাস দিয়ে আপনার খুব প্রশংসা করলেন। বললেন, আপনি নাকি আমার প্রতিবেশী মঁশিয় গোরিওকে খুব ভালবাসেন। আর না ভালবেসে পারবেনই বা কেন? মঁশিয়

ভিকঁতেসের মুখের এত গভীর ভালবাসেন যে তার উপর মাঝে মাঝে আমার
চিনে নিতে শিখি আজ সকালবেলা ঘণ্টাদুয়েক আপনাদের কথা আলোচনা হয়েছে
ছেনালি ক ঙ্গে। তারপর সন্ধ্যাবেলা দিদির ওখানে যাচ্ছিলাম ; আপনার বাবার
চেকে কথা আমার মনে এমন প্রভাব বিস্তার করেছে যে সে সময় দিদিকে বলে বসলাম : আপনি যতটা স্নেহশীল নিশ্চয়ি অতটা সুন্দরী নন। আপনার প্রতি আমার সশ্রদ্ধ প্রীতির কথা ভালভাবেই জানা আছে দিদির। আর আমার আকাঙ্খা তিনি পূরণ করতে চান বলেই আজকে আমায় সঙ্গে করে নিয়ে এসেছেন। স্বাভাবিক সহৃদয়তার জন্যই তিনি বললেন যে এখানে আপনার দেখা পাওয়া যাবে।

—তাহলে ইতিমধ্যেই তো আমার কৃতজ্ঞতা পাওনা হয়ে গেছে, তাই না মঁশিয় ? ব্যাঙ্ক মালিকের পত্নী বলেন।—অচিরেই আমরা পুরনো বন্ধু হয়ে পড়ব।

—আপনার বন্ধুত্বলাভ নিশ্চয়ি পরম আনন্দের কথা। তবু বন্ধু হতে আমি চাই না মাদাম। রাস্তিঞাক বলে।

প্রথম সামাজিক আলাপের সময় শিক্ষানবিশদের এই সব বাঁধা ধরা ন্যাকামি করতেই হবে। তবু এই প্রতিবাদ মহিলাদের কাণে মধুবর্ষণ করে ; কিন্তু সুস্থ মস্তিষ্কে পড়তে গেলে বিচ্ছিরি লাগে। যুবকদের ভাবভঙ্গী, কণ্ঠস্বর আর চাহনি এ সময় বিস্ময়কর বাঙ্ময় হয়ে ওঠে। মাদাম দ নুসাঁজাঁরও মনে হয়, রাস্তিঞাক প্রকৃতই মনোহর। তবে যুবকদের এ সময়কার অকপট উচ্ছসিত প্রশংসার যোগ্য জবাব কোন মেয়েই দিতে পারে না। তাই মাদাম দ নুসাঁজাঁও ভিন্নপ্রসঙ্গ তুলে জবাব দিলেন।

—তা বটে, বাবার সঙ্গে এ রকম ব্যবহার করে দিদির কোন লাভ হয় না! আমাদের প্রতি বরাবর স্নেহশীল তিনি। মঁশিয় দ নুসাঁজাঁ যখন সরাসরি নিষেধ করে দেয় যে সকালবেলা ছাড়া তার সঙ্গে দেখা করা চলবে না তখনই শুধু নিরস্ত হলাম। অনেকদিন ধরে এজন্য মনঃকষ্টে আছি। কত চোখের জলই যে ফেললাম। স্বামীর নির্দয় ব্যবহারের উপর এই নির্দেশ আমার দাম্পত্য জীবন বিষিয়ে তুলেছে। দুনিয়ার চক্ষে আমি পারি শহরের সব চাইতে লোভনীয় মহিলা, কিন্তু আসলে সব চাইতে করুণার পাত্রী। আপনি হয়ত ভাববেন, এ সব কথা আপনাকে বলা আমার উচিত নয়। কিন্তু বাবার সঙ্গে আপনার জানাশোনা আছে, কাজেই আমার কাছে আপনি অচেনা লোক নন।

—আমার বিশ্বাস, আমার চাইতে আপনার একান্ত অনুগত স্নেহ-ভরা একটা আগ্রহী লোকের সঙ্গে নিশ্চয়ি আপনার দেখা হয়নি। ওজেন বলে।—বাবপত্র। মেয়েরা? সুখ নয় কি? প্রাণমাতানো কণ্ঠে সে বলে যায়।—ভালবাসাই পাওয়া, শ্রদ্ধা পাওয়া, মন খুলে নিজের আশা-আকাঙ্খা সাধ-আহ্লাদ সুখ দুঃখের কথা বলার মত একান্ত বিশ্বাসী অন্তরঙ্গ বন্ধু লাভ করে মেয়েরা যদি সুখী হয়, স্বাভবিক দুর্বলতা আর মহত্বমণ্ডিত হৃদয় নিশ্চিন্তে খুলে ধরা আর বিশ্বাসভঙ্গের কোন শঙ্কা না থাকা যদি মেয়েরা সুখ বলে গণ্য করে তো বিশ্বাস করুন, আমার মধ্যে সেই নিশ্চিত নির্ভরযোগ্য অকৃত্রিম অনুরাগী হৃদয়ের সন্ধান আপনি পাবেন। যৌবনের আদর্শ এখনও আমার মধ্যে অম্লান। আপনার ইঙ্গিতে মৃত্যুবরণ করতেও আমি দ্বিধা করব না। সংসারের কোন অভিজ্ঞতাই আমার নেই, আর সে অভিজ্ঞতালাভের আগ্রহও বোধ করি না। কারণ আমার চোখে আপনিই সারা জগৎ। এসব কথা বলার সময় আমার সরলতা দেখে নিশ্চয়ি আপনি হাসবেন। সরাসরি পাড়াগাঁ থেকে এসেছি আমি, এখনও সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। চিনেছি শুধু ভালবাসাভরা অন্তর। ভেবেছিলাম, প্রেম বাদ দিয়েই জীবন কাটাব। ঘটনাচক্রে দিদির সঙ্গে দেখা হয়। খুব কাছাকাছি থেকে তিনি আমায় তার অন্তরের পরিচয় জানবার সুযোগ দেন। তার মধ্য দিয়েই আমি ভালবাসার অনন্ত ভাণ্ডারের সামান্য আভাস পেয়েছি। এখন শেরুব্যাঁর মত আমি নারীপ্রেমিক এবং যতদিন পর্যন্ত মাত্র একজনের সেবায় নিয়োজিত হতে না পারি, সকলের প্রতি আমার এই ভালবাসা ততদিন অম্লান থাকবে। আজ সন্ধ্যায় আপনাকে দেখে মনে হল যেন সমুদ্রের জোয়ার আপনার দিকে আমায় ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে। কত কথাই যে আগে ভেবেছি আপনার সম্পর্কে! কিন্তু স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি যে আপনি এমন অপরূপ সুন্দরী। আপনার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকতে নিষেধ করেছেন মাদাম দ বোসেয়াঁ। তিনি বোঝেন না যে আপনার সুন্দর রাঙা ঠোঁট, আপনার দুধের মত রঙ আর স্নিগ্ধ দৃষ্টির আকর্ষণ কত তীব্র! এখন আপনি হয়ত ভাবছেন, এত কথা বলা আমার উচিত নয়। তবু আমায় মন খুলে কথা বলার সুযোগ দিন!

নিজের সম্পর্কে এমন মধুর কথা শোনার চাইতে আর কিছুতেই মেয়েরা বেশী আনন্দ পায় না। অটল নিষ্ঠাবতীরা এই সব কথার কোন জবাব না দিলেও কাণ পেতে শুনে যায়। একবার যখন শুরু করেছে তখন অন্তরঙ্গতাভরা

ভিকঁতেসের মুখে চিনে নিতে শিখি...র কাহিনী শেষ না করে নিরস্ত হল না রাস্তিঞ্যাক। মাদাম ছেনালি ... হাসি দিয়ে তাকে উৎসাহিত করেন; আর মাঝে মাঝে আড়চোখে চেয়ে ...নি রাজকুমারী গ্যালতিওনের বক্সে বসা দ মার্সির দিকে।

স্বামী যতক্ষণ তাকে বাড়ী নিয়ে যাবার জন্য না এল সেই অবধি মাদাম দ নুসঁজাঁর সঙ্গ ছেড়ে গেল না রাস্তিঞ্যাক।

—ডুশেস দ কারিগলিয়ানোর বল নাচের আগেই আবারও আপনার সঙ্গে দেখা করব মাদাম! ওজেন বলে।

—মাদাম যখন আমন্ত্রণ করেছেন, নিশ্চয়ি যাবেন! নিশ্চিত থাকতে পারেন, গেলে সাদর অভ্যর্থনাই পাবেন। বারঁ বলে। এই হোঁৎকা আলজাসিয়ঁ্যার গোল মুখে একটা ক্রুর শঠতার ব্যঞ্জনা ছিল।

মাদাম দ বোসেয়ঁা তখন মঁশিয় দাজ্যুজাকে নিয়ে বেরিয়ে পড়বার জন্য উঠে দাঁড়িয়েছেন। তাকে বিদায় সম্ভাষণ জানাবার জন্য যেতে যেতে মনে মনে ভাবে ওজেন, না, আরম্ভটা আশাপ্রদ। যখন বললাম, 'আমায় ভালবাসতে পারেন কি?' তখন রাগ করল না তো! বল্গা পরিয়েছি, এখন চড়ে বসে আয়ত্তে আনতে যা বাকী!

কিন্তু ছাত্র বেচারি জানত না যে বারণ তখন অন্য চিন্তায় মগ্ন। দ মার্সির কাছ থেকে একখানা পত্র আসার শঙ্কা করছিল সে। এ সব সাজ্ঘাতিক পত্রে হৃদয় ক্ষতবিক্ষত হয়ে যায়। নিজের ভ্রান্তিবিলাসে মশগুল হয়ে ভিকঁতেসের সঙ্গে স্তম্ভঘেরা স্থান অবধি যায় ওজেন। লোকে এখানে গাড়ির জন্য অপেক্ষা করে।

—তোমার ভাই যে একেবারেই বদলে গেল! রাস্তিঞ্যাক চলে যাবার পর ভিকঁতেসকে বলে পর্তুগিজটি।—ব্যাঙ্ক ও না ভেঙে ছাড়বে না। ছেলেটি বান মাছের মত চলতে জানে। আমার ধারণা, অনেকদূর এগোতে পারবে।

—মহিলাটি যখন সঙ্গলাভের চেষ্টা করছিল, ঠিক সেই সময় তাকে খুঁজে বার করা শুধু তোমার পক্ষেই সম্ভব। কিন্তু যে লোকটা ওকে ছেড়ে যাচ্ছে তাকে এখনও ভালবাসে কিনা কি করে জানব বল? ভিকঁতেস বলেন।

তিয়েতর ইতালিয়ঁা থেকে হেঁটেই রুয় নভ-সঁ্যা-জনভিয়েভে ফেরে ওজেন। পথে পথে বহু রঙীন কল্পনা মাথার মধ্যে পাক খায়। ভিকঁতেসের বক্সে ঢোকার সময় এবং মাদাম দ নুসঁজাঁর সঙ্গে আলাপের সময় মাদাম দ রেস্তোও যে অনুগ্রহ করে তাকে বিশেষভাবে লক্ষ্য করেছেন তাও তার চোখ এড়ায়নি।

এই থেকেই সে সিদ্ধান্ত করে, ভবিষ্যতে কঁতেসের দরজাও খড়-ভরা একটা
এখন তার জন চারেক গণ্যমান্য মিত্র জুটেছে। কারণ পারির সবাবপত্র।
মহলে গিয়েও মার্শালের স্ত্রীকে সে তুষ্ট করতে পারবে বলে ধরে সেই
এইবার সে বুঝতে পারে যে বিভিন্ন স্বার্থের ঘাত-সংঘাতের জটিলতাভ
এই দুনিয়ায় যদি সে যন্ত্রের উপরে উঠতে চায় তো নিজেকে যন্ত্রের অংশ করে নিতে হবে আর উপায়ের ছক না কেটে দ্বিধাহীনচিত্তে কাজে লাগাতে হবে এই যন্ত্রকে। এই যন্ত্র করায়ত্ত করা আর তাকে দিয়ে তার ভার বহন করাবার মত সবলতা নিজের আছে বলেই মনে হয়।

—মাদাম দ নুস্যাঁজা যদি আমার সম্পর্কে আগ্রহ দেখান তো স্বামীকে কি করে করায়ত্ত রাখতে হয় তা শিখিয়ে দেব। স্বামীটি আবার টাকার বাজারের কারবারী। তার সাহায্যে একটা লেন-দেনেই আমার বরাত খুলে যেতে পাবে'।

পষ্টভাবে নিজের কাছেও সে কথাটা বলতে পারেনি। সমগ্রভাবে যে কোন পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে সিদ্ধান্ত করা কি তার সম্ভাবনাগুলি বিচার করে দেখার মত বিচক্ষণতা তখনও তার ছিল না। আবছা মেঘের মত এসব কল্পনা তার মনের দিগন্তে ভেসে বেড়ায়। সে কল্পনার মধ্যে ভোতর‍্যাঁর মন্তব্যের বীভৎসতা না থাকলেও বিবেকের কষ্টিপাথরে বিচার করে তাকে পবিত্রও বলা যায় না।

ক্রমাগত অন্যায়ের সঙ্গে এইভাবে আপস করেই এ যুগের মানুষ শিথিল নীতিবোধের অবস্থায় উপনীত হয়। আগেকার যুগে এমন বহু অনমনীয় দৃঢ়চেতা মানুষের দেখা মিলত অনড়ভাবে যারা প্রলোভনের বিরুদ্ধাচরণ করেছে। সততা ও সাধুতার সরল পথ থেকে সামান্যতম বিচ্যুতিকে এরা পাপ বলে গণ্য করত। এই দৃঢ়চেতা ব্যক্তিত্বই মলিয়েরের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকীর্তি 'আলসেস্ত' আর আমাদের যুগে ওয়াল্টার স্কটের উপন্যাসে জেনি ডীনস আর তার বাপের চরিত্র রূপায়ণের অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে। কিন্তু উচ্চাভিলাষী বৈষয়িক লোক বাইরের আবরণ বজায় রেখে ন্যায়-অন্যায়বোধ বিসর্জন দিয়ে অসৎপথে যেভাবে হাওয়া অনুযায়ী পাল তুলে নিজের লক্ষ্যে পৌছোতে চেষ্টা করে, কোন উপন্যাসে যদি তার যথাযথ বর্ণনা থাকে তো সে উপন্যাসও কম চিত্তাকর্ষক কি কমনা টকীয় হবে না।

মাদাম দ নুস্যাঁজার প্রতি অনুরাগতপ্ত শ্রদ্ধা নিয়েই বাসায় ফেরে রাস্তিঞাক। মনে পড়ে, বাবুই পাখীর মত সুবঙ্কিম রেখান্বিত কি অপূর্ব

ভিকঁতেসের মুখের
চিনে নিতে শিখি...র ছিপছিপে চেহারা! চোখের মধুমাখা স্নিগ্ধতা মাতাল করে
ছেনালি র... ওজেনের মনে হয়েছে, সিল্কের মত মসৃণ আর চকচকে তার
চেয়ে ...া চামড়ার নীচে রক্তপ্রবাহও যেন দেখতে পাচ্ছিল। কি মধুর আবেশ তার কণ্ঠে। কি অপূর্ব কেশদাম! সব কথাই মনে পড়ে একে একে। জোরে জোরে হেঁটে আসার শ্রমে ধমনীর তপ্ত রক্তপ্রবাহ হয়ত বা তার কল্পলোকের মহিলাটিকে আরও মনমোহিনী করে তুলেছে। সরাসরি গোরিওর দরজায় গিয়ে সে জোরে জোরে কড়া নাড়ে। বলে, মাদাম নেলফিনের সঙ্গে দেখা হয়েছে আজ।

—কোথায়?

—ইতালিয়াঁতে।

—বেশ খুশি দেখলে তো? ভেতরে এস না! বিছানা ছেড়ে উঠে দরজা খুলে দেয় বৃদ্ধ। তারপর আবারও গিয়ে শুয়ে পড়ে।

ইতিপূর্বে গোরিওর ঘরে ঢোকেনি ওজেন। থিয়েটারে মেয়েদের সৌখিন সাজ-সজ্জা দেখে এসে বাপের বসবাসের এই জঘন্য খুপরির মধ্যে ঢুকে সে বিস্ময়ে চমকে উঠল। জানলায় কোন পর্দা নেই। দেওয়ালের স্যাঁতস্তেঁতে ভাবের জন্য দেয়ালমোড়া কাগজের কয়েক জায়গা আলগা হয়ে দুমড়ে উঠেছে। ধোঁয়ার কালো পলাস্তর বেরিয়ে পড়েছে সেখানে। জঘন্য জীর্ণ বিছানায় শুয়ে আছে বৃদ্ধ। শুধু পাতলা একখানা কম্বল আর মাদাম ভোকের পুরনো পোশাকের অপেক্ষাকৃত কম জীর্ণ টুকরো দিয়ে তৈরী তুলোভরা লেপ আছে একখানা। মেজে যেমন স্যাঁৎস্তেঁতে তেমনি নোংরা। জানালার বিপরীত দিকে গোলাপগন্ধী কাঠের দেরাজ রয়েছে একটা। সেটি আবার সেকেলে। দেরাজটির সামনের দিকের কিছুটা অংশ বাইরে বেরিয়ে এসেছে আর পিতলের হাতলটা পাতা কি ফুলতোলা পাকানো আঙুরলতার মত। পুরনো একখানা ফার্নিচারের মাথায় কাঠের তাক রয়েছে একটা। তার উপর একটা কলসী, জলের গামলা আর কামাবার যাবতীয় সরঞ্জাম। জুতোগুলো আছে এক কোণে। বিছানার পাশের টেবিলটির কোনও দেরাজ ছিল না। শ্বেত পাথরও বসানো ছিল তার উপরে। আগুনের কোন চিহ্নই ছিল না কয়লার ঝাঁঝরিতে। আর তারই পাশে ছিল ওয়ালনাট কাঠের একখানা টেবিল। রূপোর রেকাব দুমড়াবার জন্য এই টেবিলের পায়ায় লাগানো বার ব্যবহার করেছিল গোরিও। ঝরঝরে জীর্ণ একটা লেখবার

ডেস্কের উপর বৃদ্ধের টুপিটা রয়েছে। আর আছে খড়-ভরা একটা আরামকেদারা এবং খান দুই চেয়ার। ব্যস, এইটুকুই ঘরের আসবাবপত্র। বিছানার উপরের চাঁদোয়াটা ছাদের সঙ্গে ন্যাকড়া দিয়ে ঝুলানো। সেই চাঁদোয়া থেকে সস্তা লাল চেকওলা ছেঁড়া একখণ্ড কাপড় ঝুলছে। মাদাম ভোকের এই বোর্ডিংয়ে বুড়ো গোরিও যে দুর্দশার মধ্যে আছে, নগন্যতম কোন চাকরও তার খুপরিতে এমন দুরবস্থায় থাকে না। ঘরখানার দিকে চাইলেই গা ঘিনঘিন করে ওঠে—দম আটকে আসে যেন। কারাগারের বিভীষিকাময় বিষণ্ণ খুপরির সঙ্গেই এর তুলনা করা চলে। সৌভাগ্যবশত ছাত্রটির মুখ দেখতে পেল না গোরিও। কারণ মোমখানা ওজেন বিছানার পাশের টেবিলের উপর রেখে দিয়েছিল। কাত ফিরে থুতনি অবধি চাদর টেনে দিয়ে পড়ে থাকে বৃদ্ধ।

একটু পরে বলে, এইবার বল তো কাকে বেশী ভাল লাগল? মাদাম দ রেস্তোকে না মাদাম দ নুস্যাঁজাঁকে?

—মাদাম দেলফিনকেই বেশী ভাল লেগেছে, কেননা সেই বেশী ভালবাসে আপনাকে।

দরদী গলায় কথা কটা বলে ওজেন। তাই শুনে গায়ের চাদরের তলা থেকে একখানা হাত বার করে ওজেনের হাত চেপে ধরে বৃদ্ধ। কৃতজ্ঞতাভরে বলে, ধন্যবাদ! ধন্যবাদ! কি বললে আমার সম্পর্কে?

খানিকটা রঙ চড়িয়েই বারনের কথার পুনারাবৃত্তি করে ওজেন। নীরবে কান পেতে শোনে বৃদ্ধ। মনে হয়, ধর্মগ্রন্থপাঠ শুনছে যেন।

তারপর বলে, দুলালী আমার! ঠিকই বলেছ, সত্যিই আমায় বড় ভাল বাসে। কিন্তু আনাস্তাজি সম্পর্কে যা বলেছে তা বিশ্বাস কর না। বুঝতে পারছ না, দু'বোনে একটু আড়াআড়ি আছে। এটা ওদের ভালবাসার আর একটা প্রমাণ। মাদাম দ রেস্তোও আমায় খুবই ভালবাসে। কোন সন্দেহ নেই তাতে। বাপের পাশে সন্তান থাকা ভগবান কাছে থাকার সামিল। অন্তরের অন্তঃস্তলে সাড়া জাগিয়ে সে মনোভাব বিচার করতে পারে। দুটিই সমান ভালবাসে। হায়রে, জামাইদুটি যদি ভাল হত তো আমার মত সুখী কে ছিল? মনে হয়, এ সংসারে কোন সুখই পূর্ণ নয়। যদি ওদের সঙ্গে বসবাস করতে পারতাম তো শুধু কণ্ঠস্বর শুনে, কি ওরা কাছেই আছে টের পেলে, কিংবা ওদের বাইরে যাওয়া-আসা দেখতে পেলেই আমার মন

আনন্দে নেচে উঠত। আমার কাছে যখন ছিল তখনও তাই হত। আচ্ছা, ওরা বেশ সাজ-গোজ করে এসেছিল তো?

—হাঁ। কিন্তু মঁশিয় গোরিও, আপনার মেয়েদের যখন এমন চমৎকার বাড়ী রয়েছে তখন এমন গর্তের মধ্যে বাস করা আপনার উচিত নয়।

—সে কি হে! কতকটা ছাড়া ছাড়া ভাবে বলে বৃদ্ধ।—এর চাইতে ভালবাসা দিয়ে কি দরকার আমার? ব্যাপারটা তোমায় ঠিক বোঝাতে পারব না। কথার জাল বুনতে তেমন পারি না। সবই এইখানে! বুকে চাপড় দিয়ে বলে বৃদ্ধ।—ঐ দুটি মেয়ের মধ্যেই আমি বেঁচে আছি। ওরা যদি মনের আনন্দে থাকে, যদি দেখি সুখে শান্তিতে আছে ওরা—ভালবাবে সাজ-গোছ করছে, গালিচার উপর দিয়ে হাঁটছে, তাহলে কোথায় আমি ঘুমোলাম আর কি ছাই-পাশ পরলাম তাতে কি এসে যায় বল? ওরা যদি গরমে থাকে তো আমি ঠাণ্ডাবোধ করি না। ওদের যদি হাসতে দেখি তো কখনও আমার মনমরাভাব হয় না। ওদের ঝামেলাই আমার একমাত্র ঝামেলা। বাপ হলে এর মর্ম বুঝবে। সন্তানের আধ-আধ বুলি শুনে তখন নিজের মনে মনে বলবে, আমার জীবন থেকেই তো জীবন পেয়েছে ওরা! সে সময় বুঝবে যে তোমার ধমনীর প্রতিটি রক্তবিন্দু দিয়ে তুমি ওদের সঙ্গে বাঁধা। সেই রক্তেরই সৃষ্টি ওরা—সেই বীজের অপূর্ব ফুল। তখনই বুঝতে পারবে সন্তানের মর্ম। মনে হবে, ওদের চামড়া যেন তোমার নিজের দেহ ঢেকে রেখেছে—ওদের প্রতি পদক্ষেপে তুমি নিজেই হাঁটছ যেন। সমস্ত কথার জবাবে আমি যেন ওদেরই কণ্ঠস্বর শুনতে পাই। ওদের বিষণ্ন দৃষ্টি দেখলে আমার রক্ত হিম হয়ে আসে। একদিন বুঝতে পারবে যে নিজের সুখের চাইতে সন্তানের সুখেই বাপেরা বেশী সুখী হয়। কথাটা তোমায় ঠিক বুঝিয়ে বলতে পারব না। এ তোমার দেহের একটা অনুভূতি আর সেই অনুভূতি দেহময় আনন্দ ছড়িয়ে দেয়। সোজা কথায়, তিনটে জীবন আমার। আরও অদ্ভুত কিছু শুনবে? বলছি শোন, বাপ হয়ে আমি ভগবানকে চিনলাম। সব কিছুর মধ্যেই তার পূর্ণ প্রকাশ; কেননা তার মধ্য থেকেই উদ্ভব এই সৃষ্টির। আমার সঙ্গেও আমার মেয়েদের একই সম্পর্ক। শুধু পার্থক্য এই, ভগবান এই দুনিয়াকে যত ভালবাসেন তার চাইতে আমি বেশী ভালবাসি মেয়েদের। ভগবান তত ভালবাসেন না। তার কারণ, এ দুনিয়া ভগবানের মত অত সুন্দর নয়। কিন্তু আমার মেয়েরা অনেক বেশী সুন্দর আমার চাইতে। ওদের সঙ্গে আমার অন্তরের যোগাযোগ

এত ঘনিষ্ঠ যে আজই আমার মনে হয়েছিল, আজ সন্ধ্যাবেলাই তুমি ওদের দেখা পাবে। ভগবানের নামে শপথ করে বলতে পারি, ভালবাসা পেলে মেয়েরা যতটা সুখী হয়, আমার দেলফিনকে তেমন সুখী যে করতে পারবে, সে লোকের কেনা চাকর হয়ে থাকতেও আমি রাজী। আমি তার জুতোয় কালি দিয়ে দেব—ছুটাছুটি করে ফাইফরমাস খেটে দেব। ওর পরিচারিকা যা বললে তাই থেকেই বুঝতে পারলাম যে মঁশিয় দ মার্সি লোকটা জঘন্য ইতর। মাঝে মাঝে ভেবেছি, ওর ঘাড় মটকে দেব। বল কি হে! অমন অপরূপ সুন্দরী, নাইটিংগেলের মত অমন সুরেলা কণ্ঠস্বর যার, নারী সমাজের সেই রত্নকেও সে ভালবাসে না! ঐ আলজাসিয়ঁ্যা গাছের গুঁড়িটাকে যখন বিয়ে করে, তখন কি চোখের মাথা খেয়েছিল? দুজনেই সুদর্শন যুবক পেতে পারত, আর ভালবাসতেও পারত তাদের। এখন বললে কি হবে? মাথায় যে খেয়াল ঢুকল তা-ই করে বসল।

বুড়ো গোরিও সত্যিই মহৎ। উচ্ছসিত পিতৃস্নেহে সমুজ্জ্বল তার এই রূপ দেখার সুযোগ ওজনের কোনদিনই হয়নি। ভবাবেগের সঞ্জীবনী শক্তি প্রকৃতই দেখার মত জিনিস। মানুষ যতই কাদা দিয়ে তৈরী হোক না কেন, যেই তার মধ্যে প্রগাঢ় সাচ্চা মমতার সঞ্চার হয়, অমনিই সেই মমতা থেকে একটা অপার্থিব রস ক্ষরিত হয়ে তার মুখাবয়ব, অঙ্গ-ভঙ্গী আর কণ্ঠস্বর বদলে দেয়। ভাবাবেগের প্রেরণায় চরম নির্বোধ মানুষও তখন সুউচ্চ কল্পনামুখর হয়ে ওঠে। অবশ্য ভাষায় তা প্রকাশ নাও পেতে পারে। মনে হয়, তখন সে যেন এক আলোকোজ্জ্বল জগতে বিচরণ করছে। এইসব কথা বলার সময় বিশিষ্ট অভিনেতাদের মত এই সরল বৃদ্ধের কণ্ঠস্বর ও অভিব্যক্তি এমন মর্মস্পর্শী হয়ে উঠেছিল যে তা সহানুভূতি উদ্রেক না করে পারে না। আমাদের প্রগাঢ় মমতাবোধ কি মনের কাব্যরূপ নয়?

ওজেন তখন বলে, আপনি হয়ত শুনে দুঃখিত হবেন না যে দ মার্সির সঙ্গে শিগ্‌গিরই তার ছাড়াছাড়ি হয়ে যাচ্ছে। ভদ্দরলোক এখন ওকে ছেড়ে রাজকুমারী গালাতিয়োনের পেছু নিচ্ছে। আমার কথা যদি শুনতে চান তো বলতে পারি, আজ সন্ধ্যাবেলাই আমি মাদাম দেলফিনের প্রেমে পড়েছি।

—বাজে কথা!

—বাজে কথা নয়—সত্যিই তাই! আর তার চোখেও অনুরাগের আভাস

টের পেয়েছি। পুরো ঘণ্টাখানেক আমরা প্রেম নিয়ে আলোচনা করেছি। তাছাড়া আগামী পরশু শনিবার আবারও যাচ্ছি তার সঙ্গে দেখা করতে।

—কি আর বলব বলো, সে যদি তোমার অনুরক্ত হয় তো কত ভালই যে তোমায় বাসব! দরদী তুমি, তুমি কোনদিন তার মনে কষ্ট দেবে না। আর তাকে যদি ছেড়ে যাও তো আমিই তোমার গলা কেটে ফেলব। জান বোধ হয়, দু'বার কোন মেয়ে ভালবাসে না। দুত্তোর ছাই, কি আবোল-তাবোল বকে যাচ্ছি মঁশিয় ওজেন! এ জায়গাটা বড় ঠাণ্ডা, যাও, এখানে তোমার থাকা উচিত নয়! সত্যিই তাহলে তাকে কথা বলতে শুনেছ? আমায় কি বলে পাঠাল?

মনে মনে বললে, কিছুই না; কিন্তু মুখে বলল, মেয়েরা আপনাকে স্নেহ-চুম্বন পাঠিয়েছে!

—বিদায় পড়শী! প্রার্থনা করি, অঘোরে ঘুমোও—মধুর স্বপ্ন দেখ! তোমার এই সংবাদের পরে আমার আর স্বপ্ন দেখার আবশ্যক নেই। ভগবান তোমার সব ইচ্ছা পূর্ণ করুন। স্বর্গের দেবদূতের মত আজ সন্ধ্যায় তুমি আমার কাছে এসেছ, আর সঙ্গে নিয়ে এসেছ আমার মেয়ের মধুর গন্ধ।

—বেচারি! বিছানায় যেতে যেতে বলে ওজেন।—পাষাণ হৃদয় স্পর্শ করাই যথেষ্ট! তুর্কীর খলিফা সম্পর্কে মেয়েরা যতটা চিন্তা করে, তার চাইতে এতটুকু বেশী ভাবে না বাপের সম্পর্কে!

এইটুকু আলোচনাতেই গোরিও উপলব্ধি করল যে এই তরুণ প্রতিবেশী তার সুহৃদ এবং বিশ্বাসের পাত্র। একটিমাত্র সূত্র ওদের পরস্পরকে আবদ্ধ করেছে। আর ঐ একটিমাত্র সূত্রেই বৃদ্ধ অপরের প্রতি আকৃষ্ট হতে পারে। অনুভূতি কখনও ভুল করে না। দেলফিনের প্রতি সত্যই খানিকটা বেশী আকর্ষণ ছিল গোরিওর। তার মনে হল, ওজেন যদি দেলফিনের প্রিয়পাত্র হতে পারে তো নিজেও তার কাছ থেকে আরও বেশী যত্ন আদর পাবে। দিনের মধ্যে হাজারবার মাদাম দ নুসিঁজাঁর কল্যাণ কামনা করে বৃদ্ধ। তবু এও সে জানে যে প্রেমের মধুর স্বাদ কোনদিন পায়নি দেলফিন। তার নিজের ভাষায়, ওজেনের মত চমৎকার ছেলে জীবনে সে দেখেনি এবং তার দৃঢ় বিশ্বাস যে ওজেনের মধ্যে সমস্ত বঞ্চিত সুখের আনন্দ সে পাবে। এইভাবেই বৃদ্ধ আর তার প্রতিবেশীর মধ্যে অন্তরঙ্গতা গড়ে ওঠে, আর ক্রমেই বেড়ে যায় অন্তরঙ্গতা। এই অন্তরঙ্গতা ছাড়া এ কাহিনীর শেষ জানা কোনক্রমেই সম্ভব হত না।

পরদিন প্রাতরাশের সময় ওজেন ঘরে ঢুকতেই সস্নেহ দৃষ্টিতে তার দিকে চায় বৃদ্ধ। বসেও ছাত্রটির পাশাপাশি। প্রতিবেশীর সঙ্গে তাকে গুটিকয়েক কথা বলতে শুনে অন্যান্য ভাড়াটেরা অবাক হয়ে চেয়ে থাকে। প্লাষ্টারের ছাঁচের মতই তার মুখ ব্যঞ্জনাহীন। তাই তার মুখের পরিবর্তন কারও দৃষ্টি এড়াল না। তীক্ষ্ণ সন্ধানী চোখে ছাত্রটির দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকে ভোতর্‍্যাঁ। তার অন্তরের গূঢ় রহস্য ভেদ করতে চায় যেন। ঘুমোবার আগে সামনের বিরাট সম্ভাবনাময় জীবনের কথা পর্যালোচনা করেছে ওজেন। এখন ভোতর্‍্যাঁর পরিকল্পনার কথা মনে পড়তেই অনিবার্যভাবে মাদমোয়া জেল তাইফেরের যৌতুকের কথা স্মরণ হয়। সৎ যুবকেরা যে চোখে ধনী উত্তরাধিকারিণীদের দিকে তাকায়, ওজেনও তেমনি দৃষ্টিতে ভিকতরিনের দিকে না চেয়ে পারল না। দৈবক্রমে সেও এ সময় আড়চোখে তাকাল ওজেনের দিকে। চোখাচোখি হয়ে গেল। ক্ষণিকের এই দৃষ্টি বিনিময়ের মধ্য দিয়েই রাস্তিঞাক নিঃসংশয়ে বুঝতে পারে, অব্যক্ত অজানা যে আবেগ সমস্ত তরুণীর হৃদয় আলোড়িত করে, তার নিজের সম্পর্কেও সেই অনির্দিষ্ট অনুভূতি রয়েছে মেয়েটির। এই পরিচয়হীন অনুভূতির বলেই তরুণীরা নিকটতম মানুষের মধ্যে তাদের চরম লক্ষ্যের সন্ধান পায়। ওজেনের কানে কানে কে যেন বলে যায়ঃ আট লাখ ফ্রাঁ! কিন্তু চটপট সে আগের দিনের সন্ধ্যার স্মৃতি তলব করে এবং নিজেকে এই বলে সান্ত্বনা দেয় যে মাদাম দ নুস্যাঁজার প্রতি তার ফরমায়েসী ভালবাসা এইসব অনিচ্ছাকৃত দুশ্চিন্তা থেকে ত্রাণ পাবার একমাত্র নিরাপদ আশ্রয়।

বলে, ইতালিয়াঁতে কাল সন্ধ্যায় রোজিনির 'সেভিলের পরামাণিক' অভিনয় হয়েছে। এমন চমৎকার সঙ্গীত আমি জীবনে শুনিনি। ইতালিয়াঁতে যাদের বকস্ আছে তারা স্বর্গ-সুখের অধিকারী।

হাঁ করে তার কথা শোনে গোরিও। কুকুর যেমন প্রভুর প্রথম ইঙ্গিতে লাফিয়ে পড়বার জন্য উৎকর্ণ হয়ে থাকে, তেমনি উন্মুখ হয়েই ছাত্রটির প্রতিটি কথা লক্ষ্য করে বৃদ্ধ।

—তোমরা পুরুষেরা আরামেই আছ—যখন যা খুশি করতে পার। মাদাম ভোকে বলেন।

—কি করে ফিরলে? ভোতর্‍্যাঁ জানতে চায়

—হেঁটে। ওজেন জানায়।

—তুমি তাহলে আমার মত নও! প্রলুব্ধকারী বলে।—কোন কাজ আমি আধাআধি করি না। যদি থিয়েটারে যাই তো নিজের গাড়িতে যাব, বক্‌সে বসব আবার ফিরেও আসব আরামে। হয় সব করব, না হয় কিছুই না। এই-ই আমার নীতি।

—খুবই ভাল নীতি নিশ্চয়! সায় দিয়ে বলেন মাদাম ভোকে।

ওজেন তখন চাপাগলায় গোরিওকে বলে, মাদাম দ নুসাঁজাঁর সঙ্গে নিশ্চয়ি আজ দেখা হবে আপনার। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, দুহাত বাড়িয়ে আজ আপনাকে অভ্যর্থনা করবেন, আর আমার সম্পর্কেও ছোটখাটো অনেক কথা জিজ্ঞাসা করবেন নিশ্চয়ি। শুনেছি, আমার দিদি মাদাম দ বোসেয়াঁর বাড়ীতে আমন্ত্রণ পাবার জন্য তিনি যা কিছু করতে রাজী। তাকে বলতে ভুল করবেন না, এত ভাল তাকে বাসি যে, সেই সাধ পূর্ণ করার কথাও আমি না ভেবেছি এমন নয়।

সঙ্গে সঙ্গে একল্ দ দ্রোয়াতে চলে যায় রাস্তিঞাক। এই জঘন্য বাড়ীতে বেশীক্ষণ থাকার ইচ্ছা আদৌ ছিল না। তারপর প্রায় সারাদিনই সে লক্ষ্যহীনের মত পথে পথে ঘুরে বেড়ায়। মাথায় কোন উতলা আশা ঘুরপাক খেলে সেই বিকারের ঘোরে এমন দশা সব যুবকেরই হয়। ভোতর‍্যাঁর যুক্তি তার চিন্তার খোরাক যোগায়। জারদাঁ দু লুকসাঁবুরে বন্ধু বিয়াশঁর সঙ্গে হঠাৎ দেখা হবার সময় সমাজ ব্যবস্থার বিশ্লেষণে সে অনন্যমনা হয়ে পড়েছিল।

—অমন মুখগোমরা করে আছিস্ কেন? তার হাত ধরে পালের দিকে হাঁটতে হাঁটতে জিজ্ঞাসা করে মেডিক্যাল ছাত্রটি।

—প্রলোভন আমায় সুস্থ থাকতে দিচ্ছে না।

—কি ধরণের প্রলোভন? প্রলোভন এড়ান চলে!

—কি করে?

—তার বশীভূত হয়ে।

—ঠাট্টা তুই করতে পারিস্, কিন্তু জানিস্ না কি নিয়ে ঠাট্টা করছিস্। রুশো পড়েছিস্?

—পড়েছি।

—মনে পড়ে সেই প্যারাটার কথা যেখানে পাঠকদের তিনি প্রশ্ন করেছেন, পারি থেকে না নড়ে শুধু ইচ্ছাশক্তি বলে চীনের এক বৃদ্ধ মান্দারিনকে খুন করে যদি প্রচুর টাকা পাওয়া যায় তো কি করবে তারা?

—পড়ে।

—তাহলে ?

—ধ্যেৎ, আমি নিজেইতো তেত্রিশটা মন্দারিনের সমান।

—ফাজলামি রাখ। শোন্, যদি এ কথা প্রমাণ করে দেওয়া যায় যে এ জিনিস সম্ভব, শুধু সম্মতি দিলেই চলবে, কি করবি তাহলে ?

—তোর ঐ মান্দারিন কি স্থবির হয়ে গেছে? তবে বুড়ো হোক কি জোয়ান হোক, পক্ষাঘাতের রোগী হোক কি স্বাস্থ্যবান হোক, আমি হলে, সত্যি বলছি, রাজী হতে পারতাম না।

—তুই ভাল ছেলে বিয়াশঁ! কিন্তু ধর, কোন মেয়েকে যদি তুই এমন ভালবাসিস যে তার জন্য বিবেক বিসর্জন দিতে আটকায় না, আর তার যদি সাজ-গোজ, গাড়ি কি যে কোন খেয়ালের জন্য প্রচুর টাকার প্রয়োজন হয় তাহলে ;

—প্রথমেই তো মাথা গুলিয়ে দিলি, তারপর আবার মাথা খাটাতে বলছিস্!

—বিয়াশঁ, ভাই, আমার মাথা ঠিক নেই। পারিস্ তো ঠিক করে দে। দুটি বোন আছে আমার। সৌন্দর্য আর সরলতার প্রতিমূর্তি তারা। আমি চাই, তারা সুখে থাক। পাঁচ বছরের মধ্যে কোত্থেকে যোগাড় করব তাদের যৌতুকের দু'লাখ ফ্রাঁ? এই সমস্যাই আমাকে বিব্রত করে তুলেছে। জীবনে এমন অবস্থা আসে যখন বৃহৎ লাভের আশায় জুয়া খেলতে হয়। পেনি কুড়িয়ে জীবন কাটান তখন নিরর্থক, বুঝলি ?

—কিন্তু এই যে সমস্যার কথা তুই বলছিস্, সকলেই সংসারে প্রবেশ করে এই সমস্যার সম্মুখীন হয়। আর তুই তরোয়ালের এক কোপে সেই গেরো কেটে ফেলতে চাস্? ও পথে যদি চলতে চাস্ তো তোকে আলেকসন্দর হতে হবে, না হয় কারাগারে যেতে হবে। আমার নিজের কথা বলতে পারি, নির্বিবাদে নগণ্য গ্রাম্যজীবন যাপন করতে পারলেই আমি সন্তুষ্ট। ক্রমে ক্রমে বাপের স্থান অধিকার করতে পারলেই সুখী হব। ক্ষুদ্র পরিবেশ কি বৃহত্তর পরিধি যাই হোক না কেন, সর্বত্রই মানুষের মায়া-মমতা পূর্ণ তৃপ্তি লাভ করতে পারে। এমন সে নাপলেয়ঁ তারও দিনে একবার খাবার সুযোগ জুটেছে; আর কাপুস্যাঁতে থাকার সময় মেডিক্যাল ছাত্রদের যত প্রণয়িনী জোটে, তার চাইতে বেশী প্রণয়িনী তাঁরও ছিল না। হেঁয়ালি রাখ বন্ধু, সুখটা আমাদের জুতোর শুকতলা থেকে এই মাথার মধ্যেই থাকে। বছরে তার জন্য দশ লুই

ব্যয় কর আর একশ' দুই ব্যয় কর, সুখ সম্পর্কে আমাদের অনুভূতি মূলত একই ধরণের। এবং সবটাই নিজের মনের উপর নির্ভর করে। আমার মতে, চীনাকে বাঁচতে দেওয়া উচিত।

—ধন্যবাদ বিয়াশঁ, আমার অনেক উপকার করলি। চিরদিন আমাদের এ সৌহার্দ্য বজায় থাকবে।

মেডিক্যাল ছাত্রটি তখন বলে, আর একটা কথা শোন। জারদ্যাঁ দে প্ল্যাঁতে থেকে কুভিয়রের বক্তৃতা শুনে ফিরে আসার সময় দেখে এলাম, ঐ মিশোনো মেয়ে লোকটা আর পোয়ারে বেঞ্চিতে বসে একটা অপরিচিত লোকের সঙ্গে কথা বলছে। গত বছরের গোলমালের সময় লোকটাকে আমি আইন পরিষদ ভবনের আনাচে-কানাচে ঘোরা-ফেরা করতে দেখেছিলাম। হঠাৎ আমার মনে হল যেন লোকটা অবসরপ্রাপ্ত সৎ ব্যবসায়ীর ছদ্মবেশী পুলিশের গুপ্তচর। ঐ জোড়ার দিকে নজর রাখতে হবে। কেন, পরে বলব। এখন আসি তাহলে! চারটের নাম ডাকের সময় হাজির থাকতেই হবে।

বোর্ডিংয়ে ফিরে এসে ওজেন দেখে যে গোরিও তারই জন্য অপেক্ষা করছে।

—ওহে, এই তার একখানা চিঠি! বৃদ্ধ বলে।—হাতের লেখাটা ভাল নয়।

সীল খুলে ওজেন পড়ে যায়:

বাবার কাছে শুনলাম মঁশিয় যে আপনি ইতালিয় গান ভালবাসেন। আমার বক্সে আসার আমন্ত্রণ যদি গ্রহণ করেন তো খুশি হব। শনিবার আমরা ফেদর আর পেলাগ্রিনি দেখতে যাচ্ছি। আশা করি, আমার অনুরোধ উপেক্ষা করবেন না। সেদিন এমনি এসে আমাদের এখানে খাবার জন্য মঁশিয় দ নুসাঁজা ও আমার সঙ্গে একযোগে আপনকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছেন। এই আমন্ত্রণ যদি আপনি গ্রহণ করেন তো তিনি খুশিই হবেন; কারণ তাহলে আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে যাবার দায় থেকে তিনি অব্যাহতি পাবেন। স্বামীর এই কর্তব্য তার বিরক্তিকর লাগে। জবাব দেবার আবশ্যক নেই, আসা চাই—'

আন্তরিকভাবে আপনার,

দ. দে. নু

ওজেনের পড়া হয়ে গেলে বৃদ্ধ বলে, আমায় দেখতে দাও তো! যাচ্ছ তো, কেমন? মুখের সামনে চিঠির কাগজখানা ধরে জিজ্ঞাসা করে।

—ওঃ, কি সুন্দর গন্ধ আসছে! বেশ বোঝা যায়, এতে তার আঙুলের ছোঁওয়া লেগেছে।

ওজেন তখন ভাবছে, এভাবে কোন মেয়ে তো সেধে পুরুষের কাঁধে চাপে না! আমায় দিয়ে সে দ মার্সিকে ফিরিয়ে আনতে চায়। শুধু ক্রোধের উত্তেজনা বশেই মানুষ এমন কাজ করতে পারে।

—কি হে, ভাবছ কি? গোরিও জিজ্ঞাসা করে।

সে যুগের কিছু কিছু মেয়ের উন্মাদ অহমিকার খোঁজ জানত না ওজেন। সে জানত না যে ফোবুর স্যাঁ জেরম্যাঁর পরিবারে অবাধ প্রবেশাধিকার পাবার জন্য ব্যাঙ্ক মালিকের ঘরণীরা যে কোন কাজ করতে রাজী ছিল। ফোবুর স্যাঁ জেরম্যাঁর এই চক্রের মধ্যে যারা প্রবেশাধিকার পেত, সৌখিন মেয়ে মহলে তারা পরী বলে গণ্য হত। 'দাম দ্যু পাতি শাতো' বলা হত এদের। আর মাদাম দ বোসেয়াঁ, তার বান্ধবী দুশেস দ লাঁজে আর দুশেস দ মোক্রাঞাস এই পরীমণ্ডলের উজ্জ্বলতম জ্যোতিষ্ক। উজ্জ্বলতম তারকা শোভিত এই সুউচ্চ পরীমণ্ডলে উন্নীত হবার জন্য শোসে দাঁত্যার মহিলারা কি অক্লান্ত সাধনাই যে করে সে সম্পর্কে বিন্দুমাত্র ধারণা ছিল না রাস্তিঞাকের। কিন্তু নিজের সন্দিগ্ধ প্রকৃতি তার সহায়ক হয়। এই প্রকৃতি তার বিচারশক্তিকে স্থৈর্য দিয়েছে—আর দিয়েছিল যে কোন পরিস্থিতির কাছে নতিস্বীকার না করে তার উপর নিজের শর্ত আরোপ করার ক্ষমতা। এ ক্ষমতা মোটেই আনন্দদায়ক নয়।

—হাঁ, নিশ্চয় যাব! গোরিওর জবাবে বলে ওজেন।

কাজেই কৌতূহল তাকে মাদাম দ নুসাঁজাঁর কাছে নিয়ে যায়। কিন্তু মহিলাটি যদি তার প্রতি অবজ্ঞার ভাব দেখাতেন তাহলেও তাকে নিয়ে আসতে পারতেন। ছেলেটি তখন আসত নিজের ভাবাবেগের তাড়নায়। এ সত্ত্বেও বেশ খানিকটা অধীরতা নিয়ে পরের দিন মহিলাটির ওখানে যাবার নির্দিষ্ট সময়ের জন্য প্রতীক্ষা করে ওজেন। প্রথম ষড়যন্ত্র হয়ত প্রথম প্রেমের মতই যুবকদের কাছে সমান লোভনীয়। সাফল্যের নিশ্চয়তাই পরম সুখের মূল। অথচ কোন লোক একথা স্বীকার করতে চায় না। আর এইটেই বহু নারীর যাবতীয় আকর্ষণের হেতু। সহজে জয়লাভের সম্ভাবনা কিংবা তার প্রতিবন্ধক উভয়ই চটপট জয়লাভের আগ্রহ স্পষ্ট করে। এই দুটি প্রেরণাই মানুষের প্রতিটি অনুরাগ বৃদ্ধি করে, কিংবা তাকে বাঁচিয়ে রাখে। প্রেমের রাজ্যে এই দুটি আকর্ষণই রাজা। এই বিভাগ হয়ত স্বভাবের গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের অন্যতম পরিণতি। লোকে যাই বলুক না কেন, সমাজ জীবনে

এই স্বভাব বা মেজাজ প্রধানশক্তি হিসাবে কাজ করে। বিষণ্ণ লোকের পক্ষে ছেনালী প্রতিঘাতের উত্তেজক প্রয়োজন হতে পারে; কিন্তু প্রতিরোধ খুব বেশী দিন চললে অবব্যস্থিত চিত্তের মানুষ কিংবা দৃঢ় বিশ্বাসীরও হটে যাবার সম্ভাবনা। অন্যভাবে বলা চলে, রাগী মেজাজের মানুষ আর বিষণ্ণ মিয়ানো মানুষ উভয়ের জন্যই বিজয়োল্লাস সমান আবশ্যক; আর রসিকজনের জন্য তেমনি প্রয়োজন বেদনার আঘাতের।

যাবার উদযোগ করতে গিয়ে প্রসাধনের প্রতিটি জিনিসে আনন্দ উপভোগ করে ওজেন। এটা যুবকদের স্বভাব। কারণ এ রকম বাবুয়ানা তাদের অহঙ্কারে সুড়সুড়ি দেয়। অথচ হাস্যাস্পদ হবার ভয়ে এর একটি কথাও প্রকাশ করতে সাহস পায় না। চুল আঁচড়াবার সময় ভাবে—কেমন করে সুন্দরীরা গোপনে তাকাবে এই কালো কোঁকড়ানো চুলের দিকে। বলনাচের আসরে যাবার আগে তরুণীরা যেমন নিখুঁত বেশ-বিন্যাসের চেষ্টা করে, তেমনি হাস্যকরভাবেই বেশবাস করল ওজেন। কোটের ভাঁজ ঠিক করে দিতে দিতে নিজের ছিপছিপে চেহারার দিকে চেয়ে আত্মপ্রসাদভরে ভাবে, এর চাইতে খারাপ চেহারার লোকও দুনিয়ায় আছে নিশ্চয়!

তারপর সে একতলায় নেমে আসে। সমস্ত ভাড়াটেই ডিনারের জন্য তখন টেবিলের চারপাশে জড়ো হয়েছে। তার সৌখিন বেশ-বাস দেখে সকলেই খোশমেজাজে বদ-রসিকতা করে সোচ্চারে তাকে সংবর্ধনা জানায়। অজ পাড়াগাঁয়ের চাষা যেমন ফিটফাট পোশাকপরা ভদ্দরলোক দেখে অবাক হয়ে যায়, এ বোর্ডিংয়ের ভাড়াটেদের অবস্থাও মূলত তেমনি। নতুন একটা কোট পরার মুরদ কারও নেই, তবু টিপ্পনী না কেটে ছাড়বে না।

ঘোড়াকে উৎসাহিত করার ভঙ্গীতে তালুতে জিভ ঠেকিয়ে গোটা কয়েক টক্ টক শব্দ করে বিয়াশঁ।

—তোমায় যে ডিউক কি বেল্টপরা আর্লের মত ছিমছাম দেখাচ্ছে হে! মাদাম ভোকে বলে ওঠেন!

—ভদ্দরলোক প্রেম করতে চলেছে নাকি? জিজ্ঞাসা করে মাদমোয়াজেল মিশনো।

—কক্—কড়া—কড়—ক! মোরগের অনুকরণে ডেকে ওঠে শিল্পী।

—তোমার বিবাহিতা প্রণয়িনীকে আমার অভিনন্দন জানিও। এ মন্তব্য আসে যাদুঘরের কর্মচারীর কাছ থেকে।

—বিবাহিতা প্রণয়িনী আছে নাকি তোমার? পোয়ারে জিজ্ঞাসা করে।

—হাঁগো, বিবাহিতা প্রণয়িনী! নিশ্ছিদ্র আলাদা ঘরে থাকে, বেশ হাসিখুশি। গায়ের রঙ পাকা—দাম পঁচিশ থেকে চল্লিশ। হালফিলের কেতাদুরস্ত। প্রসাধনে যেমন পরিপাটি তেমনি দেখতেও সুন্দর। আদ্ধেক লিনেন, আদ্ধেক সুতা আর আদ্ধেক পশমী। দাঁতের বেদনা কি আরও অনেক অসুখ সারিয়ে দেয়—রাজকীয় চিকিৎসক সংসদের অনুমোদিত! শিশুদের পক্ষেও ভাল! বিশেষ করে মাথাধরা, হৃদরোগের অনুভূতি আর কণ্ঠনালী কি চোখ কিংবা কাণের অসুখের অব্যর্থ মহৌষধ! মেলার হাতুড়ে চিকিৎসকের মত গলা ফাটিয়ে রসিকতা করে ভোতরঁ্যা।—এই অলৌকিক জিনিসের কথা কত আর বলব ভদ্রমহোদয়গণ! মাত্র দুই সো! না, এ নিছক বিকিয়ে দেবার সামিল। মোগল বাদশা আর বাদেনের গ্রাণ্ড ডিউক সহ ইয়োরোপের সমস্ত রাজাকে সরবরাহ করার পর মাত্র সামান্য মাল আছে। আসুন! আসুন! সরাসরি সামনে এগিয়ে আসুন! দামটা ডেসকের উপর দিয়ে দিন! এই, ব্যাণ্ড বাজাও! ক্রম্—লা—লা—ট্রিন! লা—লা—বুম! বুম! ও ক্লারিওনেট মশাই, আপনার বাজনা বেসুরে হচ্ছে! খেড়ে গলায় সে বলে যায়।

—দাঁড়ান, আপনার আঙুলের গাঁটে গোটাকয়েক ঠোকর মেরে দিচ্ছি!

—বাব্বা কত রসিকতাই যে জানে! মাদাম কুত্যুরকে বলেন মাদাম ভোকে।

—ও বাড়ীতে থাকলে কখনও বিরক্তি বোধ করতে হবে না!

ভোতরঁ্যার কমিক বক্তৃতায় ভাড়াটেদের মধ্যে হাসি ও রঙ্গরসের ফোয়ারা ছোটে। সেই সুযোগে মাদামোয়াজেল তাইফেরের গোপন চাহনি লক্ষ্য করে ওজেন। নীচু হয়ে মাদাম কুত্যুরের কাণে কি বলবার সময় অলক্ষ্যে তাকায় মেয়েটি।

—গাড়ি এসে গেছে! সিলভি জানায়।

—খেতে চলেছিস কোথায়? বিয়াশঁ জিজ্ঞাসা করে।

—বারন্ দ নুসঁজাঁর ওখানে।

—মঁশিয় গোরিওর মেয়ের বাড়ীতে! ছাত্রটি পাদপূরণ করে।

এই কথার পর সকলের দৃষ্টিই সেমুই ব্যবসায়ীর উপর পড়ে। খানিকটা ঈর্ষাভরে ওজেনের মুখের দিকে চেয়েছিল বৃদ্ধ।

রুয় স্যঁ লাজারে পৌঁছে রাস্তিঞাক দেখল যে সরু সরু থাম আর অপরিসর বারান্দাওলা ছোট্ট একখানি বাড়ীই তার গন্তব্যস্থল। পারির অধিবাসীদের

দৃষ্টিতে এসব বাড়ী 'মনোরম' আখ্যা পায়। পুরোপুরি ব্যাঙ্ক মালিকের বাড়ী। লোককে দামী দামী দেখাবার জিনিসে ভরতি। প্রতিটি দেয়াল চুনকাম করা। সিড়িগুলোয় চিত্রিত শ্বেতপাথর বসানো। রেস্তোঁরার মত সাজান আর ইতালীয় চিত্রাঙ্কনরীতির ছবি টাঙানো ছোট্ট এক বৈঠকখানায় সে মাদাম দ মুসাজাঁর দেখা পেল। বারনকে খানিকটা মনমরা দেখাচ্ছিল। বিষণ্ণতা চাপা দেবার প্রয়াস ওজেনকে আরও কৌতূহলী করে তোলে; কারণ সে প্রয়াসের মধ্যে কোন ছল-চাতুরী ছিল না। তার উপস্থিতিতে মহিলাটি খুশি হবেন বলেই সে ভেবে রেখেছিল; কিন্তু এসে দেখল বিষণ্ণতা। এই হতাশা ওজেনের মর্যাদাবোধে আঘাত করে।

—আপনার গোপন কথা জানতে চাইবার কোন অধিকারই আমার নেই মাদাম, তবু আমি যদি কোন অসুবিধা সৃষ্টি করে থাকি তো খোলাখুলি বলে ফেলুন। আপনার কথার উপর আমার আস্থা আছে। একটু বাদে মহিলাটির চিন্তিত ভাব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে ওজেন।

—না না, আপনি থাকুন! মহিলাটি বলেন।—আপনি চলে গেলে আমায় একলা থাকতে হবে। মুসাঁজাঁ আজ শহরে খানাপিনা করবে। একলা থাকতে ইচ্ছে করছে না। খানিকটা আনমনা হবার দরকার আছে।

—কিন্তু হয়েছে কি বলবেন?

—অন্তত আপনাকে সে কথা কিছুতেই বলা যায় না। মহিলাটি বলে ওঠেন।

—জানতে পারলে খুশি হতাম। নিশ্চয়ই এ রহস্যের মধ্যে আমি জড়িত আছি।

—সম্ভবত! তার পর একটু থেমে বলে যান, না না এ ধরণের পারিবারিক কলহের কথা গোপন রাখাই উচিত। গত পরশু এ সম্পর্কে আপনাকে খানিকটা আভাস দেই নি কি? আমি মোটেই সুখী নই। সোনার শিকলের ভার সব চাইতে দুর্বহ।

কোন মহিলা যদি কোন যুবককে জানায় যে সে অসুখী, আর সে যুবক যদি বুদ্ধিমান আর সুবেশ হয় এবং তার পকেটে যদি পনের শ ফ্রাঁ বিনা কাজে পড়ে থাকে, তাহলে অনিবার্যভাবে সে কতকটা দাম্ভিক হয়ে পড়ে, আর ওজেনের মতই চিন্তা করে থাকে।

—চাইবার কি আছে আপনার? ওজেন বলে।—একাধারে তরুণী, সুন্দরী, ধনী আর পূজিতা আপনি!

বিষণ্ণভাবে মাথা ঝেঁকে মহিলাটি বলেন, আমার কথা থাক। আজ

আমরা দুজনেই শুধু একসঙ্গে খাব, তারপর দুজনে একসাথে গান শুনতে যাব। আমার চেহারা ঠিক আছে কি? উঠে দাঁড়িয়ে সাদা কাশ্মীরী শালের উপর অপূর্ব পারসিক নক্‌সা তোলা পোশাকের জৌলুস দেখিয়ে বলেন মহিলাটি।

—আপনি যদি পুরোপুরি আমার হতেন! ওজেন বলে।—অপূর্ব দেখাচ্ছে!

—তাহলে বিচ্ছিরি এক সম্পত্তির মালিক হতে হত। ম্লান হাসি হেসে বলেন মহিলাটি।

—এখানকার কোন জিনিসেই দুর্ভাগ্যের ছাপ নেই। তবু বাইরের এই আবরণ সত্ত্বেও হতাশায় দিন কাটছে আমার। দুশ্চিন্তায় আমার ঘুম পর্যন্ত আসে না—শিগগিরই কুৎসিৎ হয়ে যাব।

—দূর, তা হতেই পারে না। ছাত্রটি বলে।—আমার কিন্তু বড্ড কৌতূহল হচ্ছে। ঐকান্তিক ভালবাসা দিয়ে দূর করা যায় না এমন কি ঝামেলা থাকতে পারে?

—তার কথা যদি বলি তো আপনি পালিয়ে যাবেন। মহিলাটি বলেন।—আপনি তো আমায় ভালবাসেন চলতি রীতির বশে—পুরুষের পক্ষে ওটা এক ধরনের মার্জিত আচরণের মত। কিন্তু প্রকৃতই যদি ভালবাসতেন তো বিভীষিকাময় হতাশায় হাবুডুবু খেতেন। যাই হোক, মনের শান্তি আমায় বজায় রাখতে হবে। দোহাই আপনার, অন্য কথা বলুন! চলুন, আমার ঘর দোর দেখে আসবেন।

—না থাক, এখানেই বসা যাক! মাদাম দ নুসাঁজাঁর কাছাকাছি আগুনের সামনে একটা সোফার উপর বসে পড়ে ওজেন। সাহসে ভর করে তার হাত খানাও ধরে।

মহিলাটি আপত্তি করলেন না। বরং দৃঢ়ভাবে যুবকের আঙুল চেপে ধরলেন। তাতে তার মানসিক উত্তেজনাই ধরা পড়ল।

—শুনুন, কোন ঝামেলা যদি থাকে তো আমায় বলতেই হবে। আমি প্রমাণ করতে চাই যে শুধু আপনার জন্যই আপনাকে ভালবাসি। হয় আমাকে সমস্ত দুঃখের কথা খুলে বলবেন আর আমি তা দূর করার চেষ্টা করব—তাতে যদি আধ-ডজন খানেক লোকও খুন করতে হয় তাতেও দ্বিধা করব না; আর তা যদি না বলেন তো এখুনি চলে যাব এবং আর কোনদিন আসব না।

হতাশাভরে কপালে করাঘাত করে মহিলাটি তখন বলে ওঠেন, বেশ, এখুনি আপনাকে পরীক্ষা করছি। তারপর নিজের মনে মনে বলে, হাঁ, তা ছাড়া

আর কোন পথও তো নেই ! বেল বাজান মহিলাটি। বেয়ারা ঢুকতেই জিজ্ঞাসা করেন, তোমার কর্তার গাড়ী তৈরী ?

—হাঁ, মাদাম !

—তাহলে আমিই ওখানা নিয়ে যাব। ঘোড়াসহ তাকে আমার গাড়ি দিও। আর সাতটার আগে ডিনার দেবার দরকার নেই। তারপর ওজেনের দিকে ফিরে বলেন, আসুন আমার সঙ্গে !

মাদাম দ নুসাঁজাঁর পাশে ব্যাঙ্ক মালিকের গাড়িতে বসে ওজেনের মনে হয় যেন স্বপ্ন দেখছে।

—পালে রোয়াইয়াল চল ! কোচয়ানকে হুকুম দেন মাদাম।—তিয়েতর ফ্রাঁসের কাছাকাছি।

যাবার পথেও মাদামকে উত্তেজিত আর দুশ্চিন্তাগ্রস্থ মনে হয়। ওজেন তাকে হাজারো প্রশ্ন করে। কিন্তু তার কোন জবাবই পেল না। এই একগুঁয়ে নীরবতায়, এই নীরব প্রতিরোধের মুখে কি করা উচিত কিছুই বুঝে উঠতে পারল না ওজেন। মনে ভাবল, আর মিনিট কয়েক পরেই হাত থেকে ফসকে যাবে !

গাড়ি থামতেই বারন্ এমন দৃষ্টিতে ওজেনের দিকে তাকালেন যে তার ঠোঁট আটকে গেল। তার মানসিক উত্তেজনা তখন ফেটে পড়বার মুখে। অনেক কথাই মুখে আসছিল কিন্তু বেরুল না।

—সত্যিই ভালবাসেন তো ? মহিলাটি বলেন।

—বাসি। অন্তরের অস্বস্তি চাপা দিয়ে বলে ওজেন।

—যা করতে বলব তাতে খারাপ কিছু ভাববেন না তো ?

—না।

—আমার আদেশ পালন করতে রাজী আছেন ?

—অন্ধভাবে।

—জুয়ার আড্ডায় গিয়েছেন কখনও ? কাঁপা গলায় জিজ্ঞাসা করেন মহিলাটি।

—না।

—বাঁচালেন ! আবার শ্বাস নিতে পারছি। নিশ্চয়ই আপনার পয়া আছে। এই আমার টাকার থলে নিন। নিন ! মহিলাটি বলেন।—মোট একশ' ফ্রাঁ আছে ; এই-ই আমার যথাসর্বস্ব। জুয়ার আড্ডায় চলে যান। কোথায় আছে আমি ঠিক জানি না। শুধু এইটুকুই জানি যে পালে রোয়াইয়ালের

কাছাকাছি আছে একটা। রুলেৎ খেলায় সবটা বাজী ধরবেন। হয় সবটা হেরে আসবেন, আর না হয় ছ' হাজার ফ্রাঁ নিয়ে আসবেন। ফিরে এলে আমার দুশ্চিন্তার কথা বলব।

—যা করতে যাচ্ছি তার বিন্দু-বিসর্গও যদি বুঝি তো কি বলেছি। তাহলেও আপনার আদেশ পালন করব। ওজেন বলে ; তারপর মনে মনে ভাবে, এত দুর এগিয়েছে যে আর পেছু হটতে পারবে না—যা কিছু চাইব, এখন আর অস্বীকার করবার উপায় নেই।

সুন্দর থলেটি নিয়ে চটপট সে নয় নম্বরে চলে যায়। ঐটাই কাছাকাছির জুয়ার আড্ডা। পুরনো কাপড়ের এক দোকানী দেখিয়ে দিয়েছে আড্ডাটি। সরাসরি উপরে উঠে যায় ওজেন। টুপটি খুলে রুলেৎ টেবিলের খোঁজ জিজ্ঞাসা করে। একটি বেয়ারা তাকে পথ দেখিয়ে একখানা লম্বা টেবিলের কাছে নিয়ে যায়। পাকা জুয়াড়ীরা খানিকটা অবাক হয়ে পড়ে। দর্শকদের স্থির দৃষ্টি সত্ত্বেও বিন্দুমাত্র সঙ্কোচবোধ না করে ওজেন জানতে চায় যে কোথায় বাজী ধরবে।

সম্ভ্রান্ত ভদ্দরলোকের মত দেখতে চুল পাকা এক প্রবীণ বলে, যে কোন একটি ছত্রিশ নম্বরে যদি আপনি এক লুই ধরেন আর ঐ নম্বর আসে তাহলে ছত্রিশ লুই পাবেন।

ওজেন তখন তার বয়সের নম্বরে অর্থাৎ একুশে তার সমস্ত টাকা বাজী রাখে। ব্যাপারটা বুঝে উঠবার আগে এক বিস্মিত চীৎকারে তার চমক ভাঙে। সে জিতেছে ; কিন্তু কি করে যে জিতল কিছুই বুঝতে পারল না।—টাকাটা নিয়ে নিন ! প্রবীণ লোকটি বলে।—ও ভাবে দুবার জেতা যায় না।

ওজেন তখন জিতের ছত্রিশ শ' ফ্রাঁ নিয়ে নেয় এবং খেলার কিছুই না বুঝে গোটা টাকা আবারও লালের উপর বাজী রাখে। পাশের লোকজন ঈর্ষাভরা কৌতূহলে তার খেলা লক্ষ্য করে যায়। আবারও চাকা ঘোরে—ফের জেতে ওজেন। ব্যাঙ্কার আবারও তাকে তিন হাজার ছ'শ ফ্রাঁ ছুঁড়ে দেয়।

—এইবার সাত হাজার দুশো ফ্রাঁ হল। প্রবীণ লোকটি কানে কানে বলে, আমার কথা শোন—এখন চলে যাও। আটবার লাল উঠেছে, যদি দয়া ধর্ম থাকে তো নাপলেয়ঁর যুগের এই দুর্ভাগা বৃদ্ধ পুরোহিতের সৎপরামর্শের ঋণ স্বীকার করে তার দুঃখ দুর করে যাও।

রাস্তিঞাক অবাক হয়ে দেখল সে চুল পাকা লোকটি দশটা লুই মুদ্রা তুলে নিয়ে পকেটে ভরল। যাই হোক, সাত হাজার ক্রাঁ নিয়েই খেলার কিছু না বুঝে এবং নিজের সৌভাগ্যে হতবাক হয়ে সে বেরিয়ে পড়ে।

—এটা তো হল, এইবার কোথায় নিয়ে যাবেন? গাড়ির দরজা বন্ধ হবার সঙ্গে সঙ্গে মাদাম দ নুসাঁজাঁকে সাত হাজার ক্রাঁ দেখিয়ে বলে ওজেন।

উতলা হয়ে দেলফিন দুই হাতে তাকে জড়িয়ে ধরে এবং চুমোয় চুমোয় অস্থির করে তোলে। তবু এ চুম্বন আবেগতপ্ত নয়!

—আমায় বাঁচিয়েছ! বলে ওঠে দেলফিন। আনন্দে চোখের জল গড়িয়ে পড়ে গাল বেয়ে।—সবই এখন তোমায় খুলে বলব বন্ধু! তুমি আমার বন্ধু হবে, কেমন তো? ভাবছ আমি ধনী—খুউব ধনী। কোন অভাবই আমার নেই, অন্তত উপরে তাই মনে হয়। তাহলে বলছি শোন, মঁশিয় দ নুসাঁজাঁ আমায় কপর্দকও ছুঁতে দেয় না। সংসারের খরচ, আমার গাড়ি কি থিয়েটারের বকসের খরচ সবই সে নিজে দেয়! আমায় একটা হাতখরচের ভাতা দেয় মাত্র। তাতে আমার পোশাক-আশাকের খরচ চলে না। নির্মমভাবে ষড়যন্ত্র করে আমায় সে দারিদ্র্যের মধ্যে রেখেছে। কিন্তু যে মূল্য দিলে তার কাছ থেকে টাকা পাওয়া যায়, তাতে যদি রাজী হই তো আমায় জঘন্যতম নারী হতে হয়।. আমার নিজের সাত লাখ ক্রাঁ ছিল। কিন্তু কি করে তার শেষ কপর্দক পর্যন্ত হারালাম জানতে চাও? অহমিকার জন্য…রাগ করে। বিবাহিত জীবনের শুরুতে আমরা বড় কাঁচা, বড় সরল থাকি। স্বামীর কাছে যখন টাকা চাওয়া উচিত ছিল, তখন মুখ ফুটে বলতে পারি নি। একটি কথাও বেরুতো না মুখ দিয়ে। আমার নিজের সঞ্চিত টাকা কি আমার গরীব বাপের দেওয়া টাকা সবই খোয়ালাম একে একে। তারপর ধার করতে লাগলাম। বিয়ে আমার পক্ষে বিভীষিকাময় প্রহসন মাত্র। তার কথা তোমায় বলতে পারব না। এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে এখন যে ভাবে আলাদা ঘরে থাকছি তার চাইতে অন্য কোন ভাবে যদি নুসাঁজাঁর সঙ্গে আমায় থাকতে হত তো জানালা দিয়ে লাফিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করা ছাড়া উপায় ছিল না। কর্জের কথা তাকে জানালে গঞ্জনা সইবার ভয় ছিল। গহনা কি ছোট খাটো নানা জিনিসের জন্য এমন ধার সব তরুণীরই থাকে। আর বাবা এমনভাবে আমাদের সখ পূরণ করেছেন যে সব কিছু পাবার ইচ্ছা এখন স্বভাব হয়ে দাঁড়িয়েছে! যাই হোক, শেষ অবধি সাহস

করে বলে ফেললাম। আমার নিজেরও তো টাকা ছিল এককালে! ধারের কথা শুনে মুস্যাঁজাঁ তো রেগে আগুন। বললে, আমিই তার সর্বনাশ করব— এমনি আরও কত জঘন্য কথাই যে শোনাল! ভাবলাম, ধরণী দ্বিধা হয়ে যদি আমায় একশ' ফুট নীচে তলিয়ে নিয়ে যায় তাহলেও বাঁচি! আমার যৌতুকের টাকাটা সে নিয়েছিল বলে কর্জটা শোধ করে দেয়। কিন্তু বলে, নির্দিষ্ট একটা হাতখরচ দিয়ে আমায় চালাতে হবে। সাংসারিক শান্তির কথা ভেবে রাজী হলাম। কিন্তু তারপর থেকে তোমার জানা জনকয়েক স্ত্রীলোকের আত্মমর্যাদাবোধের উপযুক্ত পথেই চলতে লাগলাম। আমায় প্রবঞ্চনা করলেও তাকে অনুদার বলতে পারব না। তবু শেষ অবধি আমায় কেলেঙ্কারির মধ্যে ফেলেছে। প্রয়োজনের সময় পুরুষ যদি কোন মেয়ের জন্য অনেক টাকা ব্যয় করে থাকে তো কোনদিন তাকে ছেড়ে যাওয়া উচিত নয়। চিরদিন সেই মেয়েকে ভালবাসা উচিত। তোমার মত আত্মমর্যাদা সম্পন্ন মহান আদর্শনিষ্ঠ নিষ্কলুষ একুশ বছরের যুবক হয়ত জিজ্ঞাসা করবে, কি করে পুরুষের কাছ থেকে টাকা নিতে পারে মেয়েরা? হায় ভগবান! সুখের জন্য যার কাছে ঋণী তার সঙ্গে সবকিছু ভাগাভাগি করে নেওয়াই স্বাভাবিক নয় কি? একজন যখন স্বর্বস্ব দান করেছে, তখন সেই সমগ্রের সামান্য অংশের জন্য দুশ্চিন্তা করা উচিত কি? অনুরাগ যখন সরে যায় তখনই টাকার কদর বাড়ে। কিন্তু একি জীবন-বন্ধন নয়? মেয়েরা যখন ভালবাসা পাচ্ছে বলে মনে করে, কে তখন বিচ্ছেদের কথা ভাবে? আমাদের কাছে তোমরা চিরন্তন ভালবাসার শপথ কর। কি করে তাহলে দুজনের স্বার্থ আলাদা হয়?

—আজ মুস্যাঁজাঁ যখন আমায় ছ' হাজার ফ্রাঁ দিতে সরাসরি অস্বীকার করল, কি কষ্টই যে পেলাম তা বুঝবে না। অথচ প্রতিমাসে এ টাকা সে তার অপেরার নর্তকী প্রণয়িনীকে দেয়। আত্মহত্যা করব বলে ভেবেছিলাম। মাথায় সব পাগলা খেয়াল আসতে লাগল। এমন সময়ও গেছে যখন চাকর বাকরদের বরাতও আমার চাইতে ভাল বলে মনে হয়েছে—নিজের দাসীকে হিংসা করেছি। কি করে বাবার কাছ থেকে সাহায্য পাবার আশা করব? সে আশা অর্থহীন। আনাস্তাজি আর আমি এই দুজনে মিলে তাকে নিঙড়ে শেষ করেছি। নিজে বিক্রী বসলেও যদি ছ' হাজার ফ্রাঁ পাওয়া যেত তো বাবা তাতেও রাজী হতেন। তাকে শুধু হতাশার মধ্যে ফেলতে পারতাম,

কিন্তু কোন লাভ হত না। তুমি আমায় অপমান আর মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়েছ। মনঃকষ্টে আমি আত্মহারা হয়ে পড়েছিলাম। তোমায় আমি জঘন্য অন্যায়ভাবে কাজে লাগিয়েছি, তাই তোমার কাছে এই জবাবদিহি করার প্রয়োজন ছিল। যখন তুমি চলে গেলে, আর যখন তোমায় দেখতে পাচ্ছিলাম না, তখন পালিয়ে যাবার ইচ্ছে হচ্ছিল। কিন্তু কোথায় যে যাব জানতাম না। পারির আর্দ্ধেক মেয়ের জীবন আমার মত—বাইরে বিলাসিতার জৌলুস কিন্তু ভেতরে নির্মম দুশ্চিন্তা। আমার চাইতে অসুখী হতভাগিনীদের কথাও জানি। এমন মেয়েও আছে যারা তাদের দোকানীদের মিথ্যা হিসাব দাখিল করতে বলে; বাকী আর সবাই স্বামীদের ফতুর করে। কোন কোন স্বামী মনে করে যে একশ লুই দামের কাশ্মীরী শালের দাম পাঁচশ লুই; আবার কেউ কেউ পাঁচ'শ লুইরটা একশ লুই ভাবে। এমন হতভাগিনীও আছে যারা সন্তানদের উপোসী রেখে নিজের পোশাকের দাম যোগাড় করে, না হলে অন্যভাবে টাকা যোগাড় করতে পারে না। এই সব নীচ চালাকি আমি করি না। আমার শেষ কষ্ট এই: স্বামীর উপর আধিপত্য করার জন্য কিছু কিছু মেয়ে স্বামীর কাছে নিজেদের বিকিয়ে দেয়। যে করে হোক, এদিক থেকে আমি মুক্ত। সে পথে চলতে যদি রাজী হতাম তো নুসাঁজী আমায় সোনা দিয়ে ঢেকে দিত এতদিনে। কিন্তু যাকে শ্রদ্ধা করি সেই পুরুষের বুকের উপর মাথা রেখে কাঁদাও এর চাইতে ভাল। বাঁচা গেল। আজ রাত থেকে আর টাকায়-কেনা নারীর মত আমার দিকে চাইবার কোন অধিকার থাকবে না মঁশিয় দ মার্সির।

ওজেনের কাছে চোখের জল লুকোবার জন্য হাত দিয়ে সে মুখ ঢাকে। কিন্তু তার হাত সরিয়ে দিয়ে চেয়ে থাকে ওজেন। দেলফিনকে এই সময় মহিয়সী বলে মনে হয়।

—প্রেমের সঙ্গে টাকার মেশাল, ব্যাপারটা কুৎসিত নয়? এখন আর তুমি আমায় ভালবাসতে পারছ না, তাই না? দেলফিন জিজ্ঞাসা করে।

মর্যাদাবোধের এই ব্যাখ্যা ওজেনকে অভিভূত করে ফেলে। এই মর্যাদাবোধই নারীকে মহিয়সী করে তোলে। বিশেষত এর মধ্যে যখন বর্তমান সমাজ ব্যবস্থার অনিবার্য পরিণতি হিসাবে বাধ্যতামূলক মর্যাদাচ্যুতির অদ্ভুত সংমিশ্রণ ছিল। মৃদুভাবে সে মহিলাকে সান্ত্বনা দেয়—অবাক বিস্ময়ে চেয়ে থাকে বেদনায় দিশেহারা ছলা-কলাহীন অকপট পাশে বসা সুন্দরীর দিকে।

—কথাটা আমার বিরুদ্ধে অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করবে তো? করবে কি? কথা দাও! দেলফিন বলে।

—না মাদাম, তা কি করে পারি? জবাব দেয় ওজেন।

তার হাতখান তুলে নিয়ে কৃতজ্ঞতা ও মধুর সন্তোষ প্রকাশের ভঙ্গীতে নিজের বুকের উপর চেপে ধরে দেলফিন।

—ধন্যবাদ, আবারও আমি মুক্তি পেলাম—সুখী হলাম। এতক্ষণ যেন লোহার পাঞ্জার মধ্যে নিস্পেষিত হচ্ছিলাম বলে মনে হচ্ছিল। কপদক ব্যয় না করে এখন থেকে আমি সরল জীবন যাপন করতে চাই। তাতে তুমি আমায় এমনিভাবে পছন্দ করবে কি? করবে না বন্ধু? ছ'খানা ব্যাঙ্ক-নোট তুলে নিয়ে বলে, এইটা রেখে দাও নিজের কাছে। বিবেকের বিচারে আমি তোমার কাছে তিন হাজার ফ্রাঁ ধারী। কারণ আধাআধি ভাগ করে নেওয়াই উচিত ছিল। কুমারীরা যেমন করে ইজ্জত রক্ষার জন্য সংগ্রাম করে, তেমনিভাবেই প্রতিবাদ জানায় ওজেন। কিন্তু বারন যখন বলেন, যদি ভাগীদার না হও তো তোমায় শত্রু মনে করব,' তখন আর সে না নিয়ে পারল না।

—জমা রাখলে বিপদের সময় কাজে লাগবে। ওজেন বলে।

—ওকথা শুনলেই আমার ভয় করে! বিবর্ণ হয়ে বলে ওঠেন বারন্।—জীবনে আমার উপর যদি কোন বিষয়ে নির্ভর কর তো আমার কাছে প্রতিজ্ঞা কর যে আর কোনদিন জুয়ার আড্ডায় ঢুকবে না। ভগবান সাক্ষী, তোমায় যদি আমি নষ্ট করি তো সেই দুঃখেই মারা যাব।

এই সময় তারা রুয় স্যাঁ লাজারে পৌছোয়। এই বাড়ীর জাঁকজমক আর তার গিন্নীর দুর্দশার বৈসাদৃশ্য দেখে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যায় ওজেন। অমনিই ভোতর্যাঁর ঝাঁঝালো কথা কানে প্রতিধ্বনিত হয়।

নিজের ঘরের আগুনের পাশে একখানা নীচু চেয়ার দেখিয়ে বারন্ বলেন, বস এখানে। আমায় একখানা ভারি কঠিন চিঠি লিখতে হবে। তোমার পরামর্শ চাই।

—কিছুই লিখ না। ওজেন বলে।—ব্যাঙ্ক নোটগুলো খামের মধ্যে ভরে ঠিকানা লিখে পরিচারিকাকে দিয়ে পাঠিয়ে দাও।

—কি যে তোমায় বলব ডার্লিং! মহিলাটি বলেন।—এখন আমি ভাল সহবতের মর্যাদা বুঝতে পারছি। খাঁটি দ বোসেয়াঁর পক্ষেই এই বুদ্ধি সম্ভব! হেসে জানায় দেলফিন।

—সত্যিই অপরূপ দেলফিন! মনে মনে ভাবে ওজেন। প্রতি মুহূর্তে যেন সে প্রগাঢ় প্রেমে জড়িয়ে পড়ছিল।

ঘরের চারপাশে তাকায় ওজেন। এই চরম বিলাসিতার মধ্যেও খানিকটা সুরুচির অভাব ধরা পড়ে।

—পছন্দ হচ্ছে? পরিচারিকার জন্য বেল বাজিয়ে জিজ্ঞাসা করে দেলফিন।

—তেরেস, তুমি নিজে এখানা মঁশিয় দ মার্সির ওখানে নিয়ে যাও। চিঠিখানা তার হাতেই দেবে। সে যদি বাড়ী না থাকে তো ফিরিয়ে এনে আমাকে দেবে।

চিঠিখানা নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার সময় ওজেনের দিকে কুটিল কটাক্ষ হানে তেরেস।

ডিনারের ডাক পড়ে। মাদাম দ নুস্যাঁজাঁর দিকে প্রসারিত বাহু বাড়িয়ে দেয় ওজেন। দুজনেই একসঙ্গে এক অপূর্ব খাবার ঘরে ঢোকে। দিদির বাড়ীতে ভূরি ভোজনের যে আয়োজন তার তাক লাগিয়ে দিয়েছিল, এখানকার অবস্থাও তেমনি।

—অপেরার দিন রোজ এখানে খেতে আসবে। দেলফিন বলে। তারপর আমায় সঙ্গে করে ইতালিয়াঁয় নিয়ে যাবে।

—যদি টেকে তো অচিরেই এই মধুর জীবনে অভ্যস্ত হয়ে যাব। তবে গরীব ছাত্র আমি, সে দিকেও নজর রাখতে হবে তো!

—কিছু ভেব না, তোমার উন্নতি আটকায় কে? হেসে বলে দেলফিন।—দেখলে তো, শেষ অবধি সব ঠিক হয়ে যায়। আমিই কি ভেবেছি যে এত সুখী হব?

সম্ভব দিয়ে অসম্ভব প্রমাণ করা মেয়েদের চিরাচরিত অভ্যাস। নিজেদের সহজাত বুদ্ধি দিয়ে তারা বাস্তব ঘটনা উলট পালট করতে চায়। মাদাম দ নুস্যাঁজাঁ আর রাস্তিঞাক একসঙ্গে যখন বুফোঁতে মহিলাটির বকসে বসল, দেলফিনের মুখে তখন এমন পরিতৃপ্ত সন্তোষের ব্যঞ্জনা ছিল যে সকলের মুখ থেকেই অবাধে অবমাননাকর মন্তব্য বেরিয়ে আসে। এই জাতের কুৎসিত ইঙ্গিতের বিরুদ্ধে মেয়েরা অসহায়। এবং নিজেদের দোষে প্রায়শই তারা এই অযাচিত কল্পিত কলঙ্ক সত্য বলে গৃহীত হতে দেয়। পারিকে যারা চেনে, এ কথার এক বর্ণও তারা বিশ্বাস করবে না। আর সেখানে যা ঘটে তার সম্পর্কেও বলবে না কিছু।

ব্যারনের হাতখানা টেনে নেয় ওজেন। আলগা স্পর্শসুখ আর আঙুল

টেপাটেপির মধ্য দিয়ে তারা উভয়েই সঙ্গীতের মন মতানো আনন্দ উপভোগ করে। উভয়েই আনন্দ-উদ্বেল হয়ে পড়ে আজ সন্ধ্যায়। একসঙ্গে থিয়েটার থেকে বেরিয়ে মাদাম দ মুসাঁজাঁ তাকে নিজের গাড়িতে পঁ-স্তফ অবধি পৌঁছে দিয়ে আসার জন্ম পীড়াপীড়ি করে। এ সত্বেও চুমু খেতে দিল না ওজেনকে। অথচ পালে রোয়াইয়ালে নিজেই সে উচ্ছসিত চুমোয়-চুমোয় অস্থির করে দিয়েছিল। এই বিসদৃশ আচরণের জন্ম ওজেন তাকে ভৎ র্সনা করে।

—তার কারণ কৃতজ্ঞতা ; তখন আমি আশা করতে পারিনি যে তুমি আমার কথা রাখবে। মহিলাটি বলেন।—কিন্তু এখন থেকে শপথ করতে হবে!

—কিন্তু তুমি নিজে কোন প্রতিজ্ঞা করতে চাও না, এই তো ? নেহাৎ অকৃতজ্ঞ তুমি! রুক্ষভাবে বলে ওজেন। প্রণয়ীরা যাতে খুশি হয় চোখের পলকে তেমনি ছেনালী ভঙ্গীতে হাতখানা বাড়িয়ে দেয় মাদাম। গোমরা মুখে ওজেনের হাত ধরার ভাব দেখে পরম কৌতুক বোধ করে দেলফিন। বলে, সোমবার আবার বলনাচের আসরে দেখা হবে।

স্নিগ্ধ ফুটফুটে জ্যোৎস্নায় হেঁটে বাড়ী ফেরার সময় গভীর চিন্তায় তন্ময় হয়ে পড়ে ওজেন। আজকের ঘটনায় যেমন খুশি হয়েছে, তেমনি অনুশোচনাও হয়েছে। খুশি হয়েছে এই মনে করে যে পারির সেরা এক সৌখিন সুন্দরীর সঙ্গে আজকের অভিনয়ে তার আশা পূর্ণ হবে হয়তবা। অনুশোচনার কারণ—অর্থলাভের পরিকল্পনার ব্যর্থতা। দুদিন আগে থেকে যে চিন্তা অস্পষ্ট-ভাবে তার মনে আনাগোনা করেছে, এই সময়ে তা নির্দিষ্ট রূপ ' য়। হতাশা থেকেই বোঝা যায় যে আমাদের আকাঙ্খা কত প্রবল। যতই পারির জীবনের আনন্দ উপভোগের সুযোগ জুটছে ওজেনের, ততই অপরিচয় আর দারিদ্র্যের জন্য দুঃখ হচ্ছে। পকেটে হাত দিয়ে সে হাজার ক্রাঁর নোটখানা মুঠ করে ধরল। টাকাটা নিজের জন্ম জম রাখা সব দিক থেকেই সমীচীন মনে হয়।

অবশেষে রুয় নুভ-স্যাঁ-জনভিয়েভে পৌঁছোয় ওজেন। সিঁড়ির মাথায় একখানা মোম জ্বলছিল। বুড়ো গোরিও নিজের ঘরের কপাট খুলে মোম জ্বালিয়ে রেখেছে যাতে ছাত্রটি তার মেয়ের গল্প না বলে চলে না যায়। পুরো কাহিনীই জানাল ওজেন।

—কি বললে! দুঃখে হিংসায় চেঁচিয়ে ওঠে বৃদ্ধ।—ওরা ভাবছে আমি নিঃস্ব হয়ে গেছি, তাই না ? এখনও বছরে আমার তেরশ' লিভার আয় আছে হে! হায় ভগবান, মেয়েটা আমার কাছে এল না কেন ? কিছু শেয়ার বেচে

দিতাম। কিছু আসল বেচে দিয়েও বাকীটা দিয়ে আজীবন ভাতার একটা ব্যবস্থা করা যেত। তুমিও তো আমার কাছে এসে তার অসুবিধার কথা বলতে পারতে পড়শী। কোন প্রাণে তার সর্বস্ব ঐ একশটি ফ্রাঁ তুমি একটা চাকা ঘোরার উপর নির্ভর করে বাজী রাখলে? এ কি কারও প্রাণে সয়? তাহলে এই তো জামাইদের স্বভাব! একবার যদি বাগে পেতাম তো ঘাড় মটকে দিতাম! হায় ভগবান, সে কাঁদছিল বললে না?

—আমার ওয়েস্টকোটে মুখ রেখে। ওজেন বলে।

—তাই নাকি? ওটা তাহলে আমায় দিয়ে দাও। গোরিও বলে।—যে দেলফিন ছোট বেলা এক ফোঁটা চোখের জল ফেলেনি, আমার সেই দুলালীর চোখের জল লেগেছে ঐ কোটে? ওটা আর পর না, আমায় দিয়ে দাও—আমি তোমায় নতুন একটা কিনে দেব। বিয়ের চুক্তি অনুযায়ী নিজের সম্পত্তি ভোগ করার অধিকার তার আছে। দাঁড়াও, কালই আমি উকীল দারভিলকে পাকড়াও করে ওর টাকা ওর নিজের নামে লগ্নি করার ব্যবস্থা করছি। আইন আমার জানা আছে। এককালে আমিও কম তাঁদর ছিলাম না। দেখিয়ে দিচ্ছি মজাখানা।

—এটা নিন বাবা, আমদের জিতের টাকা থেকে এই হাজার ফ্রাঁ আমায় সে দিতে চেয়েছিল। ওয়েস্টকোটের পকেটে ওটা তার জন্যই রেখে দিন।

চোখ টান করে তাকায় গোরিও। হাত বাড়িয়ে জিনিসটা ধরবার সময় ওজেন টের পেল যেন এক ফোঁটা চোখের জল গড়ল তার হাতে।

—তোমার উন্নতি হবে জীবনে। বৃদ্ধ বলে।—ভগবান ন্যায়বিচার করেন, বুঝলে? সজ্জন আমি দেখলেই চিনতে পারি। আমি বলছি, তোমার মত লোক খুব সামান্যই আছে। তুমিও তাহলে আমার সন্তান হতে চাও! যাও ঘুমোও গে'। ঘুমের ব্যাঘাত তোমার হবে না, কারণ এখনও বাপ হওনি তো। বললে না সে কাঁদছিল! আমার দেলফিন যখন কেঁদেছে, আমি সেই সময় বোকার মত বসে বসে খাবার গিলেছি। অথচ তাদের যাতে চোখের জল না পড়ে তার জন্য এই আমিই সর্বস্ব বেচে দিতে দ্বিধা করতাম না।

ভগবানে যারা বিশ্বাস করে তারাই হয়ত গোপনে উপকার করে। ভগবানে বিশ্বাস ছিল ওজেনের।

পরদিন যথা-নির্দিষ্ট সময়ে মাদাম দ বোসেয়াঁর সঙ্গে দেখা করতে যায় ওজেন। তিনি তাকে কারিগলিয়ানোর বল-নাচের আসরে নিয়ে যান।

মার্শাল ঘরণী তাকে সাদরে সংবর্ধনা করেন। এবং তার বৈঠকখানাতেই আবারও দেখা হয় মাদাম দ মুসাঁজাঁর সঙ্গে। সকলের প্রশংসা লাভের আশায় আর ওজেনের চোখে আরও চমক লাগাবার জন্য সেরা সৌখিন বেশ-বাসে সেজে এসেছে দেলফিন। উতলা হয়ে সে প্রতীক্ষা করছিল ওজেনের কটাক্ষের জন্য। ভেবেছিল, কেউ তার এ অধীরতা বুঝবে না। মেয়েদের অন্তরের কথা বুঝতে পারলে এই সব মুহূর্ত বড় মধুর লাগে। প্রেমের স্বীকৃতি আদায় করার উদ্দেশ্যে অস্বস্তি সৃষ্টির জন্য কোন্ পুরুষ উদাসীনতার ভান দেখায়না? মনঃকষ্ট দেবার জন্য কে লুকোয়না আনন্দ? আর কে-ই বা পরে হাসি দিয়ে উড়িয়ে দেবার ছলে নিজের অভিনয় উপভোগ করে না?

এই সন্ধ্যাবেলাই সহসা নিজের অবস্থা উপলব্ধি করে ছাত্রটি। বুঝতে পারে যে মাদাম দ বোসেয়াঁর ভাই বলে দুনিয়ায় তার একটা মর্যাদা আছে। মাদাম মুসাঁজাঁকে লাভ করার স্বীকৃত-কৃতিত্ব তাকে বিশেষ প্রসিদ্ধি এনে দেয়। সমস্ত যুবকের ঈর্ষা-ভরা চাহনি দেখে এই প্রথম যে সৌখিন বাবুয়ানার আনন্দ উপলব্ধি করে। অভ্যাগতদের ভীড়ের মধ্য দিয়ে সে একটির পর একটি অভ্যর্থনা কক্ষ পার হয়ে যাচ্ছে আর কানে শুনছে যে সবাই তার সৌভাগ্যের কথা বলাবলি করছে। মেয়েরা সবাই তার সাফল্য সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করে। আগের দিন সন্ধ্যায় জিদ করে তাকে চুমু খেতে দেয়নি দেলফিন। কিন্তু আজকের সন্ধ্যায় পাছে হারাতে হয় এই শঙ্কায় তাকে বাধা দিল না।

এই দিনই গোটা কয়েক আমন্ত্রণ পেল রাস্তিঞাক। দিদি তাকে বিভিন্ন মহিলার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। এদের সবাই সৌখিনতার দাবীদার আর তাদের বাড়ীও মনোরম বলে পরিচিত। ওজেন বুঝতে পারে যে ভালভাবেই সে পারির চটকদার সৌখিন সমাজে যাত্রা শুরু করেছে। কাজেই আজকের এই সন্ধ্যার মধ্যে সমাজে প্রথম পরিচয়ের চমকপ্রদ সাফল্যের সমস্ত মোহই ছিল। যে বল নাচের আসরে তরুণীরা প্রথম সাফল্য অর্জন করে, তার স্মৃতি যেমন উত্তরকালে মেয়েদের জীবনে অক্ষয় হয়ে থাকে, আজকের এই সন্ধ্যার কথাও তেমনি আজীবন মনে থাক্‌বে রাস্তিঞাকের।

পরদিন সকালবেলা এই সাফল্যের গল্প বুড়ো গোরিও আর ভাড়াটেদের শোনাল ওজেন। ভোতর‍্যাঁর মুখে ক্রূর হাসি দেখা দেয়। পৈশাচিক যুক্তি প্রয়োগ করে সে অবস্থা বিশ্লেষণ করে। বলে, তুমি কি সত্যিই বিশ্বাস কর যে কোন সৌখিন বাবু রুয় ন্যভ-স্যাঁ-জনভিয়েভের মেজঁ ভোকেতে থাকতে পারে!

বোর্ডিংটি নিশ্চয়ি সব দিক থেকে সম্ভ্রান্ত, কিন্তু তাহলেও সৌখিন নয়'তো! এখানকার সব জিনিসই সাচ্চা, নিখাদ।...দরদভরা আতিথেয়তার প্রাচুর্যে ধন্য এই বোর্ডিং, রাস্তিঞ্যাকের সাময়িক বাসস্থান হবার জন্য গর্ববোধও করতে পারে, তবু এলাকাটা তো রুয় নুভ-স্যাঁ-জনভিয়েভ! সৌখিন বিলাসিতার সঙ্গে কোন সম্পর্ক এর নেই।

তারপর শ্লেষভরা সহানুভূতির সুরে বলে যায়, পারিতে যদি চমক লাগতে চাও ভায়া, তাহলে অন্তত গোটা তিনেক ঘোড়া, সকাল'বেলার জন্য একখানা টিলবারি গাড়ি আর সন্ধ্যার জন্য একখানা ক্রুয়াম আর যাতায়াতের মোট খরচের জন্য হাজার নয়েক ফ্রাঁ থাকা চাই। দরজির জন্য অন্তত তিন হাজার ফ্রাঁ, প্রসাধনের জন্য ছ'শ', জুতোওলার জন্য শ'খানেক, ক্রাউন আর টুপির জন্য শ'খানেক যদি ব্যয় করতে না পার তো পাত্তা পাবে না। তারপর ধোপানীও আর এক হাজার ফ্রাঁ মেরে নেবে। কি আর করা যায় বল, পোশাক-আশাক সম্পর্কে সৌখিন যুবকদের সব সময় হুঁশিয়ার হয়ে চলতে হবেই। কজন লোক আর শার্টের তলার খোঁজ করে বল? প্রেম আর গীর্জার বেদীমূলে চোস্ত পোশাকি না হলে চলবে না। এই তো গেল চৌদ্দ হাজার ফ্রাঁর হিসাব। তারপর তাসের আড্ডায়, বাজীতে আর উপহারে যা ব্যয় করতে হবে, তার কথা বললাম না। মোট কথা, হাত খরচের জন্য বছরে দুলাখ ফ্রাঁ বরাদ্দ করতে পার। ও জীবনের অভিজ্ঞতা আমার আছে। খরচের বহরটা ভালভাবেই জানি। যা বললাম, এসব জিনিস অপরিহার্য। এর সঙ্গে নীচ কাজ করার জন্য তিনশ লুই আর রাত কাটাবার জন্য পাখীর মত একটা দাঁড়ের খরচ হাজার ফ্রাঁ যোগ করে নাও। বুঝলে তো ভায়া, যে করে হোক বছরে পঁচিশ হাজার ফ্রাঁ পকেটে আনতে হবেই। না হলে নর্দমার পাঁকে পড়ে যাবে। সবাই উপহাস করবে। আর কর্মজীবন, সাফল্য আর প্রণয়িনীও খতম। হাঁ, তোমার বেয়ারা-খানসামার কথা তো ভুলেই গেছি। ক্রিস্তফকে দিয়ে তোমার প্রেমপত্র পাঠাবে কি? এখন যে কাগজে লিখছ, সেই কাগজে লিখবে কি? তাহলে সব ভেস্তে যাবে। প্রবীণের কথা বিশ্বাস কর বন্ধু, অভিজ্ঞতা আমার বড় কম নেই। ধেড়ে গলা গাঢ় করে বলে ভোতর্যাঁ।—হয় চিলে ঘরে আশ্রয় নিয়ে সদ্ভাবে নিজের কাজে মন দিতে হবে, আর না হয় ভিন্নপথ বেছে নিতে হবে।

আড়চোখে মাদামায়াজেল তাইফেরকে দেখে ওজেনের দিকে পিটপিট

করে তাকায় ভোতর্‌্যা। ছাত্রটির মন কলুষিত করার জন্য যে বীজ সে বুনেছিল, এই চাহনির ইঙ্গিত সেই লোভনীয় যুক্তির সবটা স্মরণ করিয়ে দেয়।

দিন কেটে যায়। বেশ ফুর্তি করেই দিনকটি কাটাল রাস্তিঞ্যাক। প্রায় প্রতি সন্ধ্যায় মাদাম দ নুস‍াঁজাঁর সঙ্গে একসাথে খেয়েছে এবং যেখানেই সে গেছে তার সঙ্গে রয়েছে। বোর্ডিংয়ে ফিরত রাত তিনটে কি চারটের সময়। আবার দুপুর বেলা উঠে সৌখিন বেশবাস পরে—রোদ থাকলে দেলফিনকে নিয়ে সে বোয়ায় বেড়াতে যেত। বিলাসিতার প্রলোভনের মোহে পড়ে অতৃপ্ত পিপাসা নিয়ে বেপরোয়াভাবে মূল্যবান সময় অপচয় করত। খেজুরের ফুল যেমন করে পুং কেশরের পরাগ গ্রহণ করবার জন্য বিকশিত হয়ে থাকে, তেমনি উন্মুখ আগ্রহে এই সৌখিন জীবনের রস গ্রহণের জন্য সে মন খুলে রেখেছে। মোটা বাজী রেখে জুয়া খেলতে শুরু করেছে ওজেন। বহু টাকা হেরেছে আবার জিতেছেও অনেক। শেষ অবধি শহুরে যুবকের অপচয়ী জীবন সে স্বাভাবিক বলেই গ্রহণ করে। প্রথম জিতের টাকা থেকে মা ও বোনেদের পনেরশ' ফ্রাঁ ফেরৎ পাঠায়—সঙ্গে প্রচুর উপহারও পাঠিয়ে দেয়। মেজঁ ভোকে ছেড়ে দেবার সঙ্কল্প ঘোষণা করলেও জানুয়ারি মাসের শেষেও তাকে সেখানেই দেখা যায়। তখনও ছেড়ে যাবার কোন পরিকল্পনা ছিল না।

প্রায় সব যুবকই এক দুর্জ্ঞেয় আইনের অধীন। অন্তত উপর থেকে তাই মনে হয়। কিন্তু এর আসল কারণ তাদের যৌবন আর ফুর্তির প্রতি তাদের প্রাণ-ঢালা ঐকান্তিক একরোখা আগ্রহ। ধনী হোক কি গরীব হোক, জীবনের অপরিহার্য জিনিসের টাকা যুবকদের জোটে না, কিন্তু খেয়াল চরিতার্থ করার টাকা যে করে হোক জুটিয়ে নিতে পারে। ধারে পেলে যে কোন অপব্যয় করতেই তারা কুণ্ঠাহীন; কিন্তু নগদ টাকা ফেলতে হলেই কৃপণতা দেখা দেয়: যা চায় তার সবটা যদি না পায় তো যা পেতে পারে তা-ও উড়িয়ে দিয়ে প্রতিশোধ নিতে চায় যেন। দৃষ্টান্ত হিসাবে সোজা কথায় বলা যায়, কোটের চাইতে টুপির দিকে ছাত্রদের যত্ন বেশী। দরজী মোটা লাভ করে, তাই সে পাওনা টাকার জন্য অপেক্ষা করতেও রাজী, কিন্তু টুপিওয়ালার লাভ এত কম যে সে ধারে কারবার করতে চায় না। প্রকৃত পক্ষে ব্যবসায়ীদের মধ্যে একমাত্র এই লোকটার সঙ্গেই ছাত্রেরা আপস করতে বাধ্য হয়। আবার মহিলাদের অপেরা-গ্লাশে থিয়েটারের ব্যালকনিতে দাঁড়ানো ছাত্রের সৌখিন

ওয়েস্ট-কোটটা ধরা পড়ে; কিন্তু তার মোজা হয়ত নাও থাকতে পারে। এই মোজাওলা আবার উই পোকার মত তাদের পকেট ফুটো করে দেয়।

রাস্তিঞাক এই সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম নয়। মাদাম ভোকের ভাড়া দেবার বেলা তার পকেট সব সময় শূন্য থাকত। আর সৌখিনতার প্রয়োজনে সে পকেট সব সময় পূর্ণ। তার অর্থ, হার-জিতের সঙ্গে সঙ্গে তার পকেটের অবস্থারও গুরুতর তারতম্য হত। তবু অতি সাধারণ দেনা মেটাবার মত টাকা কোন সময় তার কাছে থাকত না। আত্মমর্যাদাহানিকর এই জঘন্য দুর্গন্ধভরা বাসস্থান ছেড়ে যদি অন্য কোথাও সে যেতে চায় তো তার আগে মাদাম ভোকেকে এক মাসের ভাড়া দিতে হবে, আবার সৌখিন যুবকের উপযোগী যে ঘরে গিয়ে উঠবে তার জন্যও আসবাবপত্র না কিনলে মুখরক্ষা হবে না। এত ব্যয় বহন করা তার অসাধ্য। জুয়ার জন্য টাকা হাতে রাখবার উদ্দেশ্যে জহুরির দোকানে গিয়ে অতিরিক্ত চড়া দামে ঘড়ি আর সোনার চেন কিনে নিয়ে আসত ওজেন। আবার ভাগ্য খারাপ হলে যুবকদের বিষণ্ণ বিচক্ষণ বন্ধু পোদ্দারের কাছে বেচে দিত। কিন্তু খাওয়া-থাকার টাকা দেওয়া কিংবা সত্যিকারের সৌখিন জীবন যাপনের জন্য জিনিস-পত্তর কেনা-কাটার প্রশ্নে তার সাহস ও বুদ্ধি সব লোপ পেত। জীবনের অপরিহার্য জিনিস, কিংবা অতীত প্রয়োজনের জন্য যে ধার করা হয়েছে তা শোধ করার কোন প্রেরণা সে বোধ করত না। যারা দিন আনে দিন খায় তাদের মতই এইসব দেনা শোধ করার জন্য সে শেষ মুহূর্ত অবধি অপেক্ষা করত। অথচ হিসেবী লোক এগুলোকে পবিত্র দায় বলে গণ্য করে। ওজেনের অবস্থা মিরাবোর মত। বিরাট অঙ্ক না হওয়া পর্যন্ত কোনদিন তিনি রুটিওলার দেনা শোধ করতেন না।

জুয়ায় হেরে গিয়ে যখন তাকে ধার করতে হয়, তেমনি এক সময় রাস্তিঞাকের সহসা খেয়াল হল যে নির্দিষ্ট আয় ছাড়া এই জীবন চালিয়ে যাওয়া হয়ত সম্ভব হবে না। অর্থকষ্টের কাঁটা ভরা অস্বস্তিকর জীবনে পিষ্ট হলেও এই অপচয়ী জীবনের আনন্দ বিসর্জন দিতে প্রাণ চাইল না। ঠিক করল, যে কোন উপায়ে হোক এ জীবন চালিয়ে যেতে হবে। অর্থোপার্জনের চেষ্টা সফল হবে ধরে নিয়ে শূন্যে যে সৌধ সে গড়েছিল, ক্রমে সেই কল্পনা মরীচিকা বলে প্রতিপন্ন হতে থাকে। দেখা দেয় আসল প্রতিবন্ধক। ন্যুসাঁজা পরিবারের রহস্য জেনে পষ্টই সে বুঝতে পেরেছে যে প্রেমকে সাফল্যের

সোপান হিসাবে ব্যবহার করতে হলে তাকে সমস্ত মান-অপমানবোধ ত্যাগ করতে হবে—ছেড়ে দিতে হবে যৌবনের সমস্ত উদার চিন্তাধারা। অথচ এই উদার চিন্তাই সমস্ত পাপ মোচন করে। এ জীবনের বাইরের আবরণ চটকদার হলেও ভেতরটা অনুশোচনার তীক্ষ্ণ দংশন-ক্লিষ্ট। এই জীবনের ক্ষণস্থায়ী আনন্দের কঠোর মূল্য দিতে হয় দুঃসহ কষ্ট সয়ে। অথচ এই জীবনই তার আজকের জীবন। লা ক্রুযেরের ল দিস্ত্রের মত এ জীবন স্বেচ্ছায় সে আলিঙ্গন করেছে, নর্দমার পাঁকের মধ্যে বিছানা বিছিয়ে গড়াগড়ি দিয়েছে তার উপর কিন্তু তবু ল দিস্ত্রের মতই এখনও তার পোশাক-আশাকে ময়লা লেগেছে মাত্র।

—মান্দারিনকে আমরা বধ করেছি তাহলে? করেছি? একদিন টেবিল থেকে উঠবার সময় জিজ্ঞাসা করে বিয়াশঁ।

—না হয়নি এখন; তবে মহাশ্বাস উঠেছে বটে। জবাবে জানায় ওজেঁন।

মেডিক্যাল ছাত্রটি একে পরিহাস বলেই ধরে নেয় কিন্তু জবাবের আসল উদ্দেশ্য পরিহাস নয়। বহুদিন পরে বোর্ডিংয়ে ডিনার খাচ্ছে ওজেঁন। খাবার সময় তাকে চিন্তিত দেখায়। খাওয়া শেষ হয়ে গেলে যখন ফল পরিবেশন করা হল, টেবিল ছেড়ে উঠে না গিয়ে সে মাদমোয়াজেল তাঁই ফেরের কাছাকাছি বসে থাকে আর মাঝে মাঝে আড়চোখে তার দিকে তাকায়। জনকয়েক ভাড়াটে তখন বসে বসে বাদাম খাচ্ছে। আর সবাই পায়চারি করতে করতে টেবিলের অসমাপ্ত আলোচনার জের টেনে কথাবার্তা বলছে। খাবার পরের আলোচনায় থাকা না থাকা নির্ভর করে আলোচনা সম্পর্কে আগ্রহ বা আগ্রহের অভাবের উপর। আর নির্ভর করে ভরা পেটে অল্পবিস্তর যে ঢিলেমির ভাব দেখা দেয় তার উপর। যাবার ইচ্ছে হলে এক একজন করেই উঠে যেত। শীতকালে শেষের লোকটি আটটার আগে খাবার ঘর ছেড়ে যেত না। তারপর বসত চারজন মহিলার আসর। পুরুষেরা উপস্থিত থাকাকালে শুধু মেয়ে বলে বাধ্য হয়ে যে নীরবতা তাদের পালন করতে হত, এই সময়ে তারা তার শোধ তুলত।

ওজেনের বিমনাভাব ভোতর‍্যাঁকে কৌতূহলী করে তোলে। প্রথমে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়বার ভাব দেখালেও শেষ অবধি সে খাবার ঘরে থেকে যায়। ওজেন দেখতে না পায় এমন একটা জায়গায় সে দাঁড়িয়ে থাকে। ওজেন ভাবে, চলে গেছে; কিন্তু শেষের ভাড়াটেটি চলে যাবার সময় তার সঙ্গে না গিয়ে বৈঠকখানা থেকে গোপনে সে লক্ষ্য করতে থাকে। ছাত্রটির মন সে বুঝে নিয়েছে। সন্দেহ হচ্ছে, সঙ্কট আসন্ন।

সত্যিই এক বিভ্রান্তিকর অবস্থায় পড়েছে রাস্তিঞাক। এ ধরণের অভিজ্ঞতা বহু যুবকেরই হয়। মাদাম দ বুসাঁজাঁর জন্য আন্তরিক ভালবাসার সমস্ত ব্যথাই সইতে হয়েছে তাকে, এবং ছলনার জন্য পারির মেয়েরা যত সব ছলা-কলার আশ্রয় নেয়, ওজেনের মঙ্গলের জন্য তার কোনটার আশ্রয় নিতেই কসুর করেনি দেলফিন। তবু মাদাম দ নুসাঁজাঁ সত্যিই তাকে ভালবাসে, না তাকে নিয়ে খেলছে, এ রহস্য এখনও বুঝে উঠতে পারছে না ওজেন। মাদাম দ বোসেয়াঁর ভাইর সঙ্গে একসাথে প্রকাশ্যে ঘোরাফেরা করে নিজেকে সে জড়িয়ে ফেলেছে সত্য, আবার ওজেনকেও বেঁধেছে তার সঙ্গে, তবু প্রণয়ী হিসাবে দেলফিনের উপর যে অধিকার সে ভোগ করে বলে আর সবাই মনে করে, সেই বিশেষ অধিকার দিতে এখনও ইতস্তত করছে মাদাম দ নুসাঁজাঁ। প্রথম দিকে ছাত্রটি যদি নিজেকে প্রভু বলে মনে করে থাকে তো কূটনৈতিক আচরণ দিয়ে দেলফিন এতদিনে তার নিজের হাতেই কর্তৃত্ব নিয়েছে। ফলে, পারির যুবকদের মধ্যে যে দুটি কি তিনটি সত্তা থাকে তার ভাল-মন্দ সমস্ত প্রবৃত্তিই জাগ্রত হয়েছে ওজেনের মধ্যে। একি দেলফিনের সুপরিকল্পিত নীতি? তা নয়। মনের দিক থেকে মেয়েরা সব সময় সাচ্চা। এমনকি যখন তাদের আচরণ সন্দেহজনক মনে হয় তখনও। কারণ তখন এরা কোন না কোন স্বাভাবিক বৃত্তির কাছে নতি স্বীকার করছে। এমন চটপট এই যুবককে সে নিজের উপর আধিপত্য বিস্তার করতে দিয়েছে, এমন টান দেখিয়েছে তার উপর যে হয়ত সেই কারণেই নিজের আহত আত্মমর্যাদাবোধ পুনঃ প্রতিষ্ঠার প্রবৃত্তি থেকে পরে এই সুবিধা সম্পর্কে মনোভাব পরিবর্তনের ভাণ দেখাবার সিদ্ধান্ত করেছে…হয়ত বা সে সুবিধাভোগের সুযোগ বিলম্বিত করে আনন্দ পেয়েছে।

অনুরাগের স্রোতে ভেসে যাবার মুখেও ইতস্তত করা, যে পুরুষের সঙ্গে নিজের ভবিষ্যৎ জড়িয়ে ফেলছে তার অন্তর পরীক্ষা করা পারির মেয়েদের পক্ষে খুবই স্বাভাবিক। মাদাম দ নুসাঁজাঁর সমস্ত আশা একবার ধূলিসাৎ হয়ে গেছে—স্বার্থপর তরুণ এক অহঙ্কারীর প্রতি তার অকৃত্রিম অনুরাগ পেয়েছে শুধু অবজ্ঞা। কাজেই তার পক্ষে সন্দিহান হবার সঙ্গত কারণ আছে। সম্ভবত তার প্রতি ওজেনের আচরণের মধ্যে সে খানিকটা শ্রদ্ধার অভাব লক্ষ্য করেছে। তাদের পারস্পরিক অবস্থার বৈসাদৃশ্য হয়ত প্রভাবিত করেছে ওজেনকে—চটপট সাফল্যে মাথাও হয়ত ঘুরে গেছে খানিকটা। দেলফিন হয়ত ওজেনকে

তার তারুণ্যের কথা বুঝিয়ে দিতে চেয়েছে। যে লোক তাকে ছেড়ে গেছে তার চোখে ছোট হয়ে হয়ত নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করতে চেয়েছে ওজেনের কাছে। একথা সে ওজেনকে বিশ্বাস করতে দিতে চায় না যে সহজেই তার মত মেয়েকে জয় করা যায়। কারণ তার তো অজানা নেই যে এককালে সে মার্সির ছিল। তারপর হৃদয়হীন নরাধম এক তরুণ লম্পটের হাতে চরম লাঞ্ছনা ভোগ করে সাচ্চা প্রেমের কুসুমাস্তীর্ণ রাজ্যে ঘুরে বেড়াতে এত ভাল লেগেছে যে নিশ্চয়ই তার মনে এই স্বপ্নরাজ্যের মধুর আবেশ দীর্ঘতর করার বাসনা জেগেছে। শুনতে চেয়েছে এখানকার জলধারার মর্মরধ্বনি—সাধ হয়েছে নিজের কপোলে এ জগতের মৃদু মন্দ বাতাসের স্নেহচুম্বন অনুভব করার। প্রতারকের পাপের শাস্তি ভুগতে হচ্ছে সাচ্চা প্রেমিককে। যতদিন পুরুষেরা না বুঝবে যে বিশ্বাসভঙ্গের প্রথম শাণিত ঝাপটায় তরুণী হৃদয়ের কত ফুল দলিত-মথিত হয়ে যায়, দুর্ভাগ্য হলেও ততদিন মেয়েদের আচরণের অসামঞ্জস্য বন্ধ হতে পারে না।

কারণ যাই হোক, রাস্তিঞ্যাককে নিয়ে সত্যই খেলছিল দেলফিন। এ খেলায় সে আনন্দও পেত। ওজেন তাকে ভালবাসে একথা জানে বলেই ভরসা পাচ্ছে এবং এও সে নিশ্চিত জানে যে, তার নারীহৃদয় সদয় হলেই ওজেনকে সমস্ত দুশ্চিন্তা থেকে মুক্ত করতে পারে। নিছক আত্মমর্যাদাবোধের জন্যই পরাভবের মধ্যে ওজেন তার প্রথম প্রেমের যবনিকা টানতে চায়নি। সাঁ উবেরের স্মরণে প্রথম ভোজের দিন শিকারীরা যেমন তিতির পাখী না মেরে কিছুতেই নিবৃত্ত হয় না, ঠিক তেমনিভাবেই হাল না ছেড়ে আক্রমণ চালিয়ে যায় ওজেন। তার শঙ্কা, তার আহত অহমিকাবোধ কি হতাশা যতই ভিত্তিহীন হোক, এই সব কিছুই ক্রমে ক্রমে তাকে এই রমণীর আরও কাছে টেনে আনছে। গোটা শহর মাদাম দ নুসাঁজাঁকে জয় করার জন্য তার কৃতিত্বের তারিফ করছে। অথচ প্রথমদিনে সাক্ষাতের সময় যেটুকু লাভ করেছে, এতদিনে তার এক পা বেশীও এগোতে পারেনি। বিজয়ী হওয়া এখনও অনেক দূরের কথা। এখনও তার শিখতে বাকী আছে যে মেয়েদের ভালবাসার সুনিশ্চিত অধিকারী হবার সুখের চাইতে তাদের ছেনালী কখনও কখনও বেশী আনন্দ-মধুর। কাজেই ক্ষোভে সে হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে ফেলত।

প্রেমের সঙ্গে দেলফিনের লড়াইয়ের এই অবস্থায় ওজেন যদি প্রেমের বসন্তের

আগাম ফল উপভোগ করে থাকে তো সে ফল যেমন দামী তেমনি কাঁচা— একটু টকো হলেও রসাল। কপর্দকহীন ভবিষ্যৎহীন অবস্থায় পড়ে মাঝে মাঝে বিবেকের বিরুদ্ধেও সে মাদমোয়াজেল তাইফেরকে বিয়ে করে ভোতর‍্যার দেখান অর্থলাভের পথের কথা চিন্তা করেছে। কিন্তু তার দারিদ্র্য এখন এত প্রকট হয়ে উঠেছে যে প্রায় অনিচ্ছাসত্ত্বেও রহস্যময় এই মারাত্মক লোকটির শঠ চক্রান্তের কাছে সে নতিস্বীকার করে বসে। প্রায়শ এই ফিনিস্কের স্থিরদৃষ্টি তাকে মন্ত্রমুগ্ধ করে ফেলত যেন।

পোয়ারে আর মাদমোয়াজেল মিশনো উপরতলায় তাদের ঘরে চলে গেলে রাস্তিঞাকের মনে হয় যেন মাদাম ভোকে আর মাদাম কুত্যুরের কথা বাদ দিলে মাদমোয়াজেল তাইফেরকে সে একান্তেই পেয়েছে। স্তোভের কাছে বসে নিজের জন্য পশমী হাতা বুনতে বুনতে ঝিমোচ্ছিলেন মাদাম কুত্যুর। এই সময় এমন অনুরাগমাখা দৃষ্টিতে ওজেন তার দিকে চায় যে সঙ্কোচে চোখ নীচু করে তরুণী।

—দুশ্চিন্তায় পড়েছেন বুঝি মঁশিয় ওজেন! একটু বাদে বলে মেয়েটি।

—কোন না কোন দুশ্চিন্তা তো সব মানুষেরই আছে, নেই কি? জবাবে বলে রাস্তিঞাক।—পুরুষেরা যদি ভালবাসা সম্পর্কে নিশ্চিত হতে পারত, সাচ্চা ভালবাসা যদি পেত, কিংবা সব সময় তারা যতটা আত্মত্যাগ করতে প্রস্তুত তার প্রতিদানে যদি অকপট অনুরাগ পেত, তাহলে হয়ত তাদের দুশ্চিন্তা করার কিছুই থাকত না।

জবাবে ভিক্তরিন শুধু তার দিকে ফিরে তাকায়; কিন্তু সে চাহনির অর্থ সুস্পষ্ট।

—আপনার নিজের কথাই ধরা যাক। আজ আপনি হয়ত নিজের অন্তর সম্পর্কে নিশ্চিত; কিন্তু এমন কথা দিতে পারেন কি যে কোনদিন হৃদয়ের পরিবর্তন হবে না?

অসহায় মেয়েটির ঠোঁটে হাসির ঝিলিক নেচে ওঠে। তার অন্তর থেকে এক ঝলক আলো ঠিকরে পড়েছে যেন। আলোর এই ঝলকানি তার মুখখানা এমন উদ্ভাসিত করে তোলে যে সামান্য কথার খোঁচায় এতটা ভাবোচ্ছ্বাস দেখে চমকে ওঠে ওজেন।

—আচ্ছা ধরুন, কাল যদি আপনি বিপুল সুখ-সম্পদের অধিকারিণী হন, আকাশ থেকে সহসা যদি বিপুল বৈভব খসে পড়ে, তাহলে আজকে

দারিদ্র্যের মধ্যে যে গরীব যুবকের প্রতি অনুরক্ত হয়ে পড়লেন কালকেও তাকে ভালবাসতে পারবেন কি ?

মধুরভাবে মাথা নেড়ে সায় দেয় মেয়েটি।

—সে যুবক যদি দারুণ অসুখী হয় ?

আবারও মাথা নেড়ে সায় দেয় ভিক্তরিন !

—কি আজেবাজে সব বকছ ? মাদাম ভোকে বলে ওঠেন।

—কোন চিন্তা করবেন না, দুজনেই দুজনকে চিনি আমরা। রাস্তিঞাক বলে।

—মঁশিয় ল শেভালিয় ওজেন দ রাস্তিঞাক তাহলে মাদমোয়াজেল ভিকতরিন তাইফেরকে বাগদান করছে ? সহসা গাঢ় এক গম্ভীর স্বর বলে ওঠে, এবং সঙ্গে সঙ্গে খাবার ঘরের দরজায় হাজির হয় ভোতর্যাঁ।

—ওঃ ! তোমার যে কাণ্ড ! চমকে দিলে যে ! মাদাম ভোকে ও মাদাম কুত্যুর এক সঙ্গে বলে ওঠেন।

—এর চাইতেও খারাপ পছন্দ আমি করতে পারতাম। হেসে বলে ওজেন। ভোতর্যাঁর কণ্ঠস্বরে সে এত ব্যথা পায় যে তেমন তীক্ষ্ণ, নির্মম আঘাত জীবনে পায়নি।

—অসভ্য ইয়ার্কি করবেন না মশাই। মাদাম কুত্যুর বলেন।—চল আমরা উপরে যাই ডিয়ার।

মাদাম ভোকেও ভাড়াটে দুটির সঙ্গী হন। সন্ধ্যাটা ওদের সঙ্গে কাটানো গেলে আগুন আর মোমের খরচটা বাঁচে তো ! ওজেন তখন একলা ভোতর্যাঁর মুখোমুখি হয়।

ভোতর্যাঁ তখন অবিচল স্থৈর্যে বলে, জানতাম, একদিন তুমি এ পথে ফিরবে। কিন্তু শোনো, খানিকটা সঙ্কোচ হচ্ছে আমার। এখুনি মনস্থির করে ফেল না। স্বাভাবিক প্রফুল্লতা তোমার নেই—ধার আছে নিশ্চয়ই। ভাবাবেগে কিংবা বেপরোয়া হয়ে তুমি আমার মতে দীক্ষিত হও, এ ইচ্ছা আমার নয়। আমি চাই, ধীর সুবুদ্ধির দরুণ ফিরে এস। আমার বিশ্বাস, হাজার খানেক ক্রাউন তোমার চাই। যদি দরকার মনে কর এই নাও।

নররূপী সেই দানব তখন একখানা পকেট বই টেনে বার করে তার মধ্য থেকে তিনখানা ব্যাঙ্কনোট বার করে ছাত্রটির চোখের সামনে ধরে। বিষম বিভ্রাটে পড়ে ওজেন। সত্যই ধার আছে তার ; মার্কি দাজুদা আর কঁৎ দ ত্রাই দুজনেই তার কাছে একশ লুই করে পাবে। কিন্তু নিজের

কাছে টাকা ছিল না; তাই যাবার কথা থাকলেও মাদাম দ রেস্তোর বাড়ীতে সন্ধ্যাবেলা যেতে সাহস করেনি। এই সব ঘরোয়া পার্টিতে অতিথিরা শুধু চা আর ছোট ছোট কেক্ খায়। তাহলেও হুইস্ট খেলায় ছ' হাজার ফ্রাঁ হেরে যাবার সম্ভাবনাও আছে।

নিজের কাঁপুনি গোপন করার ওজেন তখন বলে, যা আপনি আমায় বলেছেন মঁশিয়, তার পরে তো আমি আপনার কাছে ঋণের দায়ে আটকা পড়তে পারি না!

—তা বটে! তোমার মত যুবক অন্য কিছু বললে আমি হতাশ হতাম। প্রলোভনকারী বলে।

—মহান আদর্শবাদী চমৎকার ছেলে তুমি—সিংহের মত গর্বিত কিন্তু বালিকার মত কোমল। বদমায়েস লোক অনায়াসেই তোমায় জালে ফেলতে পারবে। তোমার মত তরুণদের পছন্দ করি আমি। আর গোটাকয়েক ধর্মভীরু সংশয়ের পর্যায় পার হলেই দুনিয়ার আসল রূপ চিনতে পাবে। নিজের লক্ষ্য যারা জানে, গোটা কয়েক দৃশ্যে অঙ্কে ধর্মের অভিনয় করতে হয়, তারপর প্রেক্ষাগৃহের মূর্খদের করতালির মধ্যে যা খুশি করে যেতে পারে। দিন কয়েক পরেই তুমি আমাদের দলে আসবে। হায়রে! তুমি যদি আমায় গুরুমশাই হতে দিতে তো তোমায় আমি উচ্চাশার শিখরে উঠবার পথ দেখিয়ে দিতে পারতাম! ইচ্ছা হওয়ামাত্র সে ইচ্ছা পূরণ করতে পারতে। সম্মান, সম্পদ কি নারী, যা চাইতে তা-ই পেতে। তোমার জন্য সমস্ত সভ্যজগতে দুধ-মধুরস্রোত বইত। তুমি আমাদের বয়ে-যাওয়া ছেলে, আমাদের বেঁজামাঁ হতে। সানন্দে তোমার জন্য আমরা বর্তমান পথ ছেড়ে দিতাম। তোমার পথের সমস্ত বাধা ধূলোয় মিশিয়ে দেওয়া হত। এখনও সন্দেহ আছে কি? আমায় তো তাহলে স্কাউণ্ড্রেল মনে কর। তাই কি? আচ্ছা, মঁশিয় দ ত্যুরেন্ও তো তোমার মত ন্যায়পরায়ণ মানুষ—অন্তত যতটা ন্যায়নিষ্ঠা তোমার আছে বলে মনে কর, তাঁরও ততটুকু আছে। গুণ্ডা বদমায়েসের সঙ্গে খানিকটা কার-কারবার তিনিও না করেন এমন নয়, তবু তাতে তার মর্যাদাহানি হয় বলে তো মনে করেন না! আমার কাছে ঋণের দায়ে আটকা পড়তে চাও না বললে না? আমায় তোমার পথের বাধা হতে দিও না। হাসি গোপন না করেই বলে ভোতর‍্যাঁ।—এই কাগজের টুকরো কটা নিয়ে নাও আর এই খানার উপর লিখে দাও: বার মাসে শোধ করার কড়ারে

তিন হাজার পাঁচশ ফ্রাঁ নিলাম। ছাপ-মারা একখানা কাগজ বার করে ভোতর‍্যাঁ।—তারিখটাও দিও। সুদের হার যা আছে তাতে আর দ্বিধার কোন কারণ থাকবে না। খুশি হয় আমায় ইহুদি বলেও ডাকতে পার। আর কৃতজ্ঞতা জানাবারও কোন আবশ্যক নেই। তোমার এখনকার ঘৃণায় আমি কিছু মনে করব না, কারণ আমি জানি, পরে ভিন্নমত পোষণ করবে। আমার প্রকৃতির মধ্যে তুমি অতলের সন্ধান পাবে। মূর্খেরা যাকে পাপ বলে, সন্ধান পাবে সেই বিপুল সংহত শক্তির। তাহলেও কোনদিন নীচ বা অকৃতজ্ঞ হতে দেখবে না। সোজা কথায়, আমি ক্রীড়নকও নই আবার বিশপও নই। বিশাল প্রাসাদের মত আমি, বুঝলে ভায়া।

—এ কেমন ধারা লোক আপনি? ওজেন বলে ওঠে।—আমাকে পীড়া দেবার জন্যই কি আপনার জন্ম হয়েছিল?

—নিশ্চয়ই নয়! আমি হচ্ছি সেই সহৃদয় লোক যে নিজের হাত নোংরা করে তোমায় হাত নোংরা করতে দিতে চায় না। জীবনের বাকী দিন কটার জন্য যে তোমায় পাঁক থেকে তুলে নিয়ে আসতে চায়, সেই মানুষ আমি। কেন তোমার জন্য আমার এত টান তাই ভেবে অবাক হচ্ছ বুঝি? বেশ, একদিন কানে কানে একটা কথা বলে দেব। প্রথম যেদিন তোমায় সমাজ যন্ত্রের ক্রিয়া-কলাপের আভাস দিয়েছিলাম, সেদিন খানিকটা চমকে দিয়েছিলাম বটে। দড়ির উপর তোমায় দাঁড় করিয়েছিলাম বলতে পার; কিন্তু রণক্ষেত্রে এসে অপেশাদার সৈনিকের ভয়-ভীতি যেমন করে কেটে যায়, তোমার পয়লা ভীতিও তেমনি করে কাটবে। নিজেদের হাতে যাদের রাজা বানিয়েছে তাদের সেবায় যে সব সৈনিক প্রাণ দেবার সঙ্কল্প করে, এ সমাজের লোকজনকেও তেমনি সৈনিক বলে গণ্য করতে অভ্যস্ত হয়ে যাবে। দিনকাল অবশ্য বদলে গেছে। একবার তুমি এক পাজীকে বলেছিলে, এই নাও তোমার একশ ক্রাউন, আমার জন্য অমুক মঁশিয়কে খুন কর। তারপর সেই লোকটাকে সামান্য একটা পোকার কামড়ের মারফত চির বিশ্রাম দিয়ে নিশ্চেন্তে তুমি রাতের খাবার খেয়েছিল। কিন্তু এখন আমি যে সাহায্যের প্রস্তাব করছি, তাতে মাথা নেড়ে সম্মতি দিলেই তুমি বিস্তর সম্পদের অধিকারী হতে পার। অথচ তাতে তোমার নিজের কিছু করতে হচ্ছে না, তবু তুমি টাল-বাহনা করছ। মেরুদণ্ডহীনতাই এ বয়সের ধর্ম।

ওজেন তখন কাগজ-খানায় সই করে এবং ব্যাঙ্কনোট কখানা নিয়ে কাগজ টুকরো ভোতর‍্যাঁর হাতে দেয়।

ভোতর্‌্যাঁ বলে যায়, এইবার তাহলে কাজের কথা বলা যাক। আর মাস কয়েকের মধ্যেই এ দেশ ছেড়ে আমি আমেরিকা যাচ্ছি। সেখানে গিয়ে তামাকের চাষ করব। আমাদের বন্ধুত্ব অটুট থাকবে। টাকা আয় করতে পারি তো তোমায় সাহায্য করব। আর আমার কোন সন্তান যদি না হয়, তার সম্ভাবনাই অবিশ্যি বেশী—তাছাড়া এদেশে সন্তান জন্ম দেবার আগ্রহও আমার নেই, তাহলে আমার সম্পত্তি তোমায় দিয়ে যাব। কি হে, কথাটা কেমন মনে হচ্ছে? এটা বন্ধুর কাজ হবে কি? তোমায় আমার ভাল লেগেছে। ভাবাবেগে আর একজনের জন্য আমি আত্মহত্যা করছি। আগেও একাজ করেছি। শোন ছোকরা, অন্যান্য মানুষের চাইতে এক উঁচু স্তরে বাস করি আমি। কাজ আমার কাছে লক্ষ্যে পৌছোবার উপায় মাত্র। লক্ষ্যটাই আমার কাছে সব কিছু। মানুষের প্রাণের কি মূল্য আছে আমার কাছে? বুড়ো আঙুলের নখটা দাঁতের উপর ঠুকে বলে, এর মূল্যও নেই! কোন মানুষ হয় আমার কাছে সব কিছু, আর নয় তো কিছুই নয়। পোয়ারের মত যদি হয় তো তার মূল্য কিছু 'না'র চাইতেও কম। ওকে তুমি স্বচ্ছন্দে ছারপোকার মত পিষে ফেলতে পার—একদম চ্যাপ্টা আর দুর্গন্ধ ভরা; কিন্তু তোমার মত মানুষ দেবতার মত। তাকে আর চামড়ায় মোড়া যন্ত্র বলে গণ্য করা যায় না। ও দেহ থিয়েটারের মত—অপরূপ অভিনয় চলেছে সেখানে। এই অপূর্ব ভাবের খেলা আর মহৎ অনুভূতিই জীবনে আমার একমাত্র কাম্য। চিন্তায় যখন গোটা জগৎ ধরা দেয় তখনই না তাকে অনুভূতি বলে! বুড়ো গোরিওর দিকে চেয়ে দেখ। দুটি মাত্র মেয়ে তার কাছে গোটা ব্রহ্মাণ্ড। ঐ সূত্র দিয়েই এই সৃষ্টির মধ্যে সে পথ খুঁজে পায় আর আমার কথা যদি বল, জীবন আমি উলটে-পালটে দেখেছি, আমার কাছে একটি মাত্র অনুভূতি আছে—সে অনুভূতি মানুষে মানুষে বন্ধুত্ব। পিয়ের আর জাফিয়ে'র মত বন্ধুত্ব চাই আমি। গোটা 'ভেনিসের স্মারক' মুখস্থ আছে আমার। চোখের পাতা পিটপিট না করে কিংবা সদুপদেশ না দিয়ে যে সাথী সরাসরি বলতে পারে, 'এস শবটা কবর দিয়ে যাও', তার মত পোক্ত মানুষ খুব বেশী দেখেছ কি? আমি নিজে তা করেছি। সকলের কাছে এভাবে কথা বলতাম না; কিন্তু তুমি সাধারণ লোক নও, তোমার কাছে সবই বলা চলে, কারণ তার অর্থ তুমি বুঝবে। আমাদের চারপাশের এই পেট-ফাঁপানো বামন ঘেরা পাঁকের মধ্যে বেশীদিন আর তুমি পচবে না। থাক, আর বেশী কথা বলা নিষ্প্রয়োজন। বিয়ে তুমি করবে।

দুজনেই আমরা দুজনের পথে চলতে পারি। আমার পথ নিষ্প্রাণ ইস্পাতের পথ কিন্তু নিজে কখনও চালাই না, হাঃ—হাঃ—হাঃ !

ছাত্রটির প্রতিবাদ এড়িয়ে যাবার জন্য তাড়াতাড়ি বেরিয়ে যায় ভোতর্‍্যাঁ। তাতে বিব্রত হবার সম্ভাবনাও এড়ান গেল। চূড়ান্ত পরাভবের মুখেও যে মানুষ প্রতিরোধ করে এই সত্য সে বুঝতে পেরেছে হয়ত। ছায়ার সঙ্গে এই অর্থহীন মুষ্টিযুদ্ধে আত্মমর্যাদাবোধ কতকটা স্ফীত হয়, আর কুকাজও নিজের চোখে খানিকটা সমর্থন লাভ করে।

—যা খুশি করুক গে', মাদমোয়াজেল তাইফেরকে আমি কিছুতেই বিয়ে করব না। মনে মনে ভাবে ওজেন।

রাস্তিঞ্যাকের দৃষ্টিতে এই লোকটি বিভীষিকার মত। তবু তার বাঁকা চিন্তাধারার অভিনবত্ব আর নিজের উদ্দেশ্যসাধনে সমাজকে ব্যবহার করার ঔদ্ধত্যের জন্য ছাত্রটির মানসদৃষ্টিতে সব সময় তার ছবি ভাসে। তবু তার সঙ্গে চুক্তি করার কথা ভাবতে গায়ে জ্বর আসে। মন কতকটা শান্ত হলে সে বেশবাস পরে নেয় এবং গাড়ি ডেকে মাদাম দ রেস্তোর বাড়ী চলে যায়।

দিন কয়েক হল ক্রমেই যেন ওজেনের দিকে একটু বেশী মনোযোগ দিচ্ছিলেন কঁতেস। তিনি বুঝতে পারেন যে এই যুবকের প্রতিটি পদক্ষেপ সৌখিন সমাজে ধাপে ধাপে সুনিশ্চিত অগ্রগতির সামিল। প্রতিপদে বিজয়ীর মত এগিয়ে যাচ্ছে যেন। এও তিনি আগাম বুঝতে পারেন যে একদিন এই লোকটা হয়ত বিপুল ক্ষমতার অধিকারী হবে। মঁশিয় দ ত্রাই আর মঁশিয় দাজুজার ঋণ শোধ করে দেয় ওজেন, এবং খানিকটা সময় হুইস্ট খেলে আগের হার তুলে নেয়। নিজের পথ যাদের করে নিতে হয় এবং অল্প বিস্তর অদৃষ্টবাদী যারা, তাদের মতই কুসংস্কারাপন্ন ওজেন। ঠিক পথে অধ্যবসায় করার জন্য ভগবান প্রসন্ন হয়ে তার ভাগ্য বদলে দিয়েছেন একথা ভেবেও সে আনন্দ পায়। পরদিন সকালে সব কাজ ফেলে ভোতর্‍্যাঁকে জিজ্ঞাসা করে যে কালকের ঋণপত্রখানা তখনও আছে কিনা। ভোতর্‍্যাঁ সায় দিলে স্বাভাবিক আত্মপ্রসাদ নিয়ে সে তিন হাজার ফ্রাঁ ফিরিয়ে দেয়।

—সব কিছুই ভালভাবে চলছে। তাকে বলে ভোতর্‍্যাঁ।

—কিন্তু আমি তো তোমার সাথী নই। ওজেন জানায়।

—জানি হে, জানি! বাধা দিয়ে বলে ভোতর্‍্যাঁ।—এখনও তুমি ছেলে মানুষের মত করছ। শয়তানের রঙকরা পুতুলকে আটকাতে দিয়েছ তোমার পথ।

দুদিন পরে পোয়ারে আর মাদমোয়াজেল মিশনোকে জারদাঁ্যা দে প্লাঁতের ফুটপাতে রোদের মধ্যে একখানা বেঞ্চির উপর দেখা গেল। যে ভদ্দরলোক মেডিক্যাল ছাত্রটির সন্দেহ উদ্রেক করেছিল, তার সঙ্গে কথা বলছিল এরা। ছাত্রটির সন্দেহের সঙ্গত কারণ যে না ছিল এমন নয়।

—আপনার সঙ্কোচের কোন কারণ আমি দেখছি না মাদমোয়াজেল। মঁশিয় গঁদুরো বলছিল।···পুলিশের মাননীয় মন্ত্রী মশাই···

—তাই নাকি! পুলিশ বিভাগের মাননীয় মন্ত্রী মশাই···। প্রতিধ্বনি করে পোয়ারে।

—হাঁ, মাননীয় মন্ত্রীই এ ব্যাপারে আগ্রহ দেখাচ্ছেন। গঁদুরো বলে।

রুয় ব্যুফঁর এই তথাকথিত শাঁসালো ভদ্দরলোক পুলিশের নাম করবার পর পোয়ারের মত অবসরপ্রাপ্ত কেরানী আর বুদ্ধিহীন মধ্যবিত্ত চরিত্রের মানুষ বেশীক্ষণ তার কথা শুনেছে একথা বিশ্বাস করা কঠিন। কিছুতেই বিশ্বাস হয় না যে সহসা ভদ্দরলোকের মুখোস খুলে রুয় দ জেরুজালেমের গোয়েন্দার রূপ যখন বেরিয়ে পড়ল, পোয়ারের মত লোক তখন স্থির থাকতে পেরেছে। খুবই স্বাভাবিক এ জিনিস। মধ্যবিত্ত চরিত্রের এই দিক সম্পর্কে তেমন কোন আলোচনা হয়নি, তবু কিছু কিছু পর্যবেক্ষক যে সব মন্তব্য করে গেছেন তা থেকেও ভালভাবেই বোঝা যায় যে, নির্বোধের বিশাল পরিবারে পোয়ারের মত বিশেষ শ্রেণীর জীবের স্থান কোথায়।

এক জাতের মসীজীবী আছে বাজেটে যাদের নাম অক্ষাংশের প্রথম ডিগ্রীর কোঠায় স্থান পায়। বারশ' ফ্রাঁ মাইনে এই কোঠায় পড়ে। শাসনতান্ত্রিক জগতে এ যেন অভিনব এক গ্রীনল্যাণ্ড। তৃতীয় ডিগ্রীতে ক্রমেই মাইনের অঙ্ক তিন হাজার থেকে উষ্ণ হতে হতে ছয় হাজার অবধি ওঠে। এই নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের জলবায়ুর সঙ্গে বোনাসের চারাগাছ নিজেকে বেশ খাপ খাইয়ে নিতে পারে এবং চাষ-আবাদের অসুবিধা সত্ত্বেও ভালমতই বেড়ে ওঠে। প্রতিটি মন্ত্রীদপ্তরের প্রধান লামা সম্পর্কে আপনা থেকে এই তাড়াটে শ্রেণীর মধ্যে একটা স্বতস্ফূর্ত শ্রদ্ধার ভাব গড়ে ওঠে এবং চরিত্রের এই প্রবৃত্তিগত বৈশিষ্ট্যের মধ্য দিয়ে এদের মানসিক শক্তির মিয়ানো ভাব আর সঙ্কীর্ণ গণ্ডীবদ্ধতাও ধরা পড়ে। অথচ এই প্রধান লামার সঙ্গে এদের পরিচয় কেবলমাত্র দুর্বোধ্য স্বাক্ষর আর 'হিজ্ এক্সেলেনসি মঁশিয় ল মিনিস্টার' এই উপাধি মারফত! এই শব্দকটি এদের মনে ভোজবাজীর মত বিস্ময়কর

প্রভাব বিস্তার করে। তাছাড়া শব্দ পাঁচটি এই মেরুদণ্ডহীন শ্রেণীর কাছে এমন ক্ষমতার প্রতিভূ যার বিরুদ্ধে কোন আপীল করা চলে না। পোপ যেমন ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের দৃষ্টিতে অভ্রান্ত, এই মাননীয় মন্ত্রীমহাশয়ও ছোটখাটো কর্মচারীদের দৃষ্টিতে শাসন সংক্রান্ত বিষয়ে ভুলের অতীত। তার কথা, তার কাজ কিংবা তার নাম করে যা বলা কি করা হয় তার সব কিছুই অভিনব মহিমামণ্ডিত। সব কিছুই তার নামের মহিমায় প্রোজ্জ্বল। তার আদেশে যা কিছু করা হোক সবই আইনসিদ্ধ। এই 'একসেলেন্সি' উপাধিই তার অভিপ্রায়ের পবিত্রতা আর ইচ্ছার ন্যায়পরায়ণতার স্বাক্ষর। অন্যক্ষেত্রে যে সব কথা পাত্তা পেত না, নামের গুণে তা ছাড়পত্র পেয়ে যায়। নিজেদের স্বার্থের জন্যও যে সব কাজ এই সমস্ত গরীব বেচারি করত না, একসেলেন্সির নাম করে বলা হলে সাগ্রহে তারা সেইসব কাজ করে দেয়। সেনাবাহিনীর মত সরকারী দপ্তরেও নীরবে আদেশ পালনের রীতি আছে। এই ব্যবস্থা বিবেকের কণ্ঠরোধ করে এবং ব্যক্তিসত্তা ধ্বংস করে কালে মানুষকে সরকারী যন্ত্রের স্ক্রু কি নাটে পরিণত করে। মঁশিয় গঁত্যুরো মানুষ চেনে। পোয়ারে যে এই নির্বোধ আমলার একজন একথা বুঝতে পেরে তাকে হকচকিয়ে দেবার উদ্দেশ্যে কামানের মুখোস খুলবার সময় ঠিকমত যাদুভরা একসেলেন্সি শব্দটি প্রয়োগ করেন। পোয়ারেকে সে মিশনোর পুরুষ প্রতিরূপ বলে ধরে নিয়েছে আর মাদমোয়াজেল মিশনোকে মনে করেছে পোয়ারের নারী-মূর্তি।

—একসেলেন্সি নিজেই, মানে মাননীয় মন্ত্রীমহোদয় স্বয়ং যদি আগ্রহী হন তো ব্যাপারটা সম্পূর্ণ আলাদা হয়ে পড়ে। পোয়ারে বলে।

—এই ভদ্দরলোক কি বলেন শুনুন। আমার বিশ্বাস, ওর বিচারবুদ্ধির উপর আপনার আস্থা আছে। ভূঁয়া শাঁসালো লোকটি বলে মাদমোয়াজেল মিশনোকে।—যা বলছি শুনুন, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এ বিষয়ে নিশ্চিত যে, মেজঁ ভোকের এই ভোতরাঁ নামের লোকটা তুলঁ জেলের পলাতক কয়েদী। জেলে সে চীট্-ডেথ নামে পরিচিত।

—সে কি! মৃত্যুকে পর্যন্ত ফাঁকি দিতে পারে এমনি প্রতারক! এমন নাম কেনা তো সৌভাগ্যের লক্ষণ। পোয়ারে বলে ওঠে।

—তা বলতে পারেন বটে। গোয়েন্দাটি বলে।—নিজের চামড়া বাঁচিয়ে চরম বিপজ্জনক সব ষড়যন্ত্র সফল করতে পেরেছে বলেই এ নাম পেয়েছে। খেয়াল রাখবেন, ভয়ঙ্কর লোক। এমন সব গুণপনা তার আছে যা সাধারণ লোকের

মধ্যে দেখা যায় না। কয়েদ হলেও সাকরেদের মধ্যে তার সম্মান প্রতিপত্তি বিন্দুমাত্র লাঘব হয় নি।

—কি বললেন? মানী লোক? তাই নাকি? পোয়ারে বলে ওঠে।

—একদিক থেকে বলতে পারেন। তার নিজের ধ্যান-ধারণা অনুযায়ী মানী লোক নিশ্চয়ই। অন্য একজনের অপরাধের সমস্ত দায়িত্ব সে নিজের কাঁধে নিতে সম্মত হয়েছিল। এই লোকটার প্রিয় একটি চমৎকার ইতালীয় যুবক জালিয়াতি করে। জুয়াখেলার অভ্যাসও ছিল ছেলেটির। কিছুদিন হল সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়েছে—সেখানকার চালচলন ভালই দেখাচ্ছে। এই যুবকের অপরাধই কাঁধে নেয় ভোতর‍্যাঁ।

মাদমোয়াজেল মিশনো তখন বলে ওঠেন, কিন্তু মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যদি নিশ্চিত হন যে মঁশিয় ভোতর‍্যাঁই 'চীট্-ডেথ' তাহলে আমার সাহায্য চাইছেন কেন?

পোয়ারে বলে, তাও তো বটে! নামটা বলে আপনি ভালোই করেছেন, তবু মন্ত্রী মহোদয় যদি নিশ্চিত হন…

—কথাটা ঠিক নিশ্চিত নয়। সন্দেহ করছেন তিনি। আসল ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিচ্ছি। তিনটি জেলের সমস্ত কয়েদীর আস্থা আছে জ্যাক কোল‍্যাঁ মানে চীট-ডেথের উপর। ওকে তারা এজেন্ট আর গচ্ছিত অর্থের রক্ষক সাব্যস্ত করেছে। এই লেনদেনের মারফত বেশ দু'পয়সা কামাই করে লোকটা। অবিশ্যি অমন মার্কামারা…

—ও! কথাটার অর্থ বুঝলে মাদমোয়াজেল? পোয়ারে বলে।—ভদ্দরলোক ওকে মার্কামারা লোক বললেন, তার মানে তার গায়ে ছাপ মারা আছে।

গোয়েন্দাটি বলে যায়, ভোতর‍্যাঁ নামধারী লোকটা কয়েদীদের টাকা গচ্ছিত রাখে, সেই টাকা লগ্নী করে, তদারক করে আর তারা পালিয়ে আসতে পারলে ফিরিয়ে দেয়। তাছাড়া উইল অনুসারেও গচ্ছিত টাকা পরিবার পরিজনকে দিয়ে দেয় কিংবা প্রণয়িনীরা চাইতে এলে তাদেরও দেয়।

—প্রণয়িনী! নিশ্চয়ই স্ত্রীর কথা বলছেন আপনি! পোয়ারে বলে।

—না মশাই, অপরাধীরা সাধারণত প্রণয়িনীদের বিয়ে করে না। এই সব বে-আইনী সম্পর্কের মেয়েদের আমরা রক্ষিতা বলি।

—তাহলে তো সবাই রক্ষিতা নিয়ে ঘর করে।

—অবস্থা সেই রকমই দাঁড়ায় বটে!

—অবাক করলেন আপনি! পোয়ারে বলে।—এ চরম কেলেঙ্কারি। এ অবস্থা সহ্য করা মন্ত্রী মহোদয়ের সাজে না। আপনার চিন্তাধারা মানবদরদী বলেই মনে হচ্ছে। আর মন্ত্রী মহোদয়ের সঙ্গেও আপনার দেখা-সাক্ষাৎ হয়ে থাকে। কাজেই আপনার উচিত, এ সব লোকের চরিত্রহীনতার কথা জানিয়ে দেওয়া। এদের দৃষ্টান্ত সমাজের আর সকলের পক্ষে ক্ষতিকর।

—কিন্তু সরকার তো এদের নৈতিক চরিত্রের অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত বলে আটকে রাখছে না স্যর!

—তা বটে! তাহলেও আমায় বলতে হচ্ছে স্যর···

—আচ্ছা ভদ্দরলোক কি বলতে চাইছেন বলতে দাও না! মাঁদমোয়াজেল মিশনো বলেন।

—ব্যাপারটা শুনুন মাদমোয়াজেল! গঁদুরো বলে যায়।—চোরাই টাকা ধরা সম্পর্কে সরকারের যে আগ্রহ নেই তা নয়। তার পরিমাণও বেশ কিছু। কিন্তু চীট-ডেথ শুধু কয়েদী বন্ধুদের টাকা পয়সাই নাড়াচাড়া করে না, দশ হাজারী সংসদের টাকাও তার হাতে পড়ে।

—দশ হাজার চোরের সভা! সভয়ে বলে ওঠে পোয়ারে।

—না। দশ হাজারী সংসদ উচ্চ-শ্রেণীর হাঙ্গরদের সভা। এরা মোটা টাকার শিকারী। নিজের ভাগে যদি হাজার দশেক ফ্রাঁ না পড়ে তো কোন কাজে এরা হাত দেবে না। আমাদের বাছাইকরা মক্কেলদের মধ্যে বিচারের জন্য সরাসরি যাদের হাইকোর্টে পাঠাই তাদের সবাই এই দলের সভ্য। আইন-কানুন তাদের জানা। ধরা পড়লে যাতে প্রাণদণ্ড হতে পারে এমন কাজের ঝুঁকি তারা নেয় না: কোলাঁ এদের বিশ্বাসী এজেন্ট—এদের আইনের পরামর্শদাতা। তার নিজের প্রভাব-প্রতিপত্তি এত বেশী যে আর একটা পাল্টা গুপ্তচর ব্যবস্থা সে গড়ে তুলেছে। আর তার শাখা-প্রশাখা এত ব্যাপক যে তার সন্ধান বার করা অসম্ভব। অবিশ্যি বছর খানেক ধরে আমরা তার উপর কড়া নজর রেখে আসছি, গুপ্তচরও ছড়িয়ে দিয়েছি চারদিকে, তবু তার চালাকি ধরতে পারিনি। কাজেই তার জমানো টাকা আর বুদ্ধিদাতারা সব সময় পাপের সেবা করে আসছে, টাকা যোগান দিচ্ছে অপরাধ করার জন্য। এইভাবে বদমায়েসের এমন একটি স্থায়ী বাহিনী বজায় রাখা হচ্ছে যারা সমাজের বিরুদ্ধে ক্লান্তিহীন সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে। চীট-ডেথকে গ্রেপ্তার করে যদি তার মজুত টাকা বার করতে পারি তো এ পাপের মূলে

কুঠারাঘাত করতে পারব। এই জন্যই পরিকল্পনাটি রাষ্ট্রীয় গুরুত্ব পেয়েছে। এই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ সরকারী পরিকল্পনা কার্যকরী করতে যারাই সাহায্য করবে, তাদের সকলেরই বিশেষ সম্মান লাভের সম্ভাবনা। আপনাকেও হয়ত কোন পুলিশ বিভাগে সেক্রেটারির কাজ করতে ডাকতে পারে স্যর। তাতে অবিশ্যি আপনার পেনস্ন পাবার কোন বাধা হবে না।

মাদমোয়াজেল মিশনো তখন বাধা দিয়ে বলেন, আচ্ছা, চীট-ডেথ তাহলে টাকা নিয়ে ভাগবার চেষ্টা করে না কেন?

গুপ্তচর বলে, তার উপায় নেই। কয়েদীদের টাকা যদি ও মেরে দেয় তো যেখানেই যাক পেছনে খুনী ধাওয়া করবে। তাছাড়া টাকার সিন্ধুক নিয়ে পালানো তো আর সুন্দরী তরুণী নিয়ে ভেগে পড়ার মত সহজ নয়! কোলঁ্যার মত ছেলে আর যাই হোক অমন কাজ করবে না। তাতে তার সম্মানহানি হবে বলে মনে করবে।

—আপনি ঠিকই বলেছেন মঁশিয়, সত্যিই তাতে সম্মানহানি হবে। পোয়ারে বলে।

—কিন্তু এতে তো ঠিক বোঝা যাচ্ছে না যে কেন আপনারা সরাসরি তাকে গ্রেফ্‌তার করছেন না? মাদমোয়াজেল মিশনো বলেন।

—সবই আপনাকে বলছি মাদমোয়াজেল। কিন্তু দেখবেন, আপনার ঐ ভদ্দর লোক যেন আমার কথার মধ্যে বাধা না দেন! চাপা গলায় জানায় গুপ্তচরটি।—তাহলে কথা শেষ করা যাবে না। এ রামখোকা যদি কোন লোককে কথা শোনাতে বসাতে পারে তো তার বরাতে দুর্ভোগ আছে। হাঁ, যা বলছিলাম। চীট-ডেথ এখানে এসে সৎলোকের ভেক নেয়—অতি সৎ নাগরিক সেজে বসে। বসবাস শুরু করে সাধারণ এক বোর্ডিংএ। বিশ্বাস করুন লোকটা মোটেই বোকা নয়। চট করে তাকে ধরবার জো নেই। তারপর মঁশিয় ভোতরঁ্যা আবার সম্মানী লোক বলে সাধারণের কাছে পরিচিত, তাছাড়া ভাল কারবারও করে।

—খুবই স্বাভাবিক। আপন মনে বলে পোয়ারে।

—মন্ত্রী যদি ভুল করে সাচ্চা ভোতরঁ্যাকে গ্রেপ্তার করেন তো জনমত অমনিই তার বিরুদ্ধে যাবে—পারির প্রতিটি ব্যবসায়ী তাকে নেকনজরে দেখবে। পুলিশের কর্তা উভয় সঙ্কটে পড়েছেন। তার শত্রুর অভাব নেই। যদি কোন ভুল হয়ে যায় তো বিরোধীপক্ষ অমনিই চেঁচামেচি শুরু করে তাকে হটাবার

ব্যবস্থা করবে। আর যে সব লোক তার পদ-প্রার্থী তখন তারাই হবে সব চাইতে সুখী। কইঞার ঘটনাটা, মানে ভুয়া কঁৎ দ স্যাঁৎ এলেনের ঘটনাটা যে ভাবে তদন্ত করা হয়েছে, এ ব্যাপারেও ঠিক সেইভাবে চলতে হবে। সে যদি সত্যিই কঁৎ দ স্যাঁৎ এলেন হত তো আমরা আমাদের নথিপত্র মুছে ফেলতাম। কাজেই যা করতে যাচ্ছি সে সম্পর্কে সম্পূর্ণ নিশ্চিত হওয়া দরকার।

—তা বটে! কিন্তু আপনাদের তো তাহলে সুন্দরী একটি মেয়ে চাই। উৎফুল্লভাবে বলেন মাদমোয়াজেল মিশনো।

—কোন মেয়েকে চীট ডেথ কাছে ঘেঁষতে দেবে না। একটা গোপন রহস্য বলছি শুনুন: স্ত্রীলোক সে মোটেই পছন্দ করে না।

—কিন্তু ধরুন দু-হাজার ফ্রাঁ পুরস্কারের আশায় একাজ করতে আমি রাজী হলাম; কিন্তু তাহলেই বা কি কাজ করতে পারব বুঝছি না।

—ব্যাপারটা খুবই সহজ! আগন্তুক বলে।—আপনাদের আমি বোতলে ভরে খানিকটা তরল পদার্থ দেব। তাই খেলে সাময়িক সংজ্ঞালোপ হয়, কিন্তু কোন অপকার করে না। ওষুধটা আপনারা মদ কি কফির মধ্যে মিশিয়ে দিতে পারেন। যাতে খুশি মেশাতে পারেন। তখন লোকটাকে ধরাধরি করে বিছানায় নিয়ে যাবেন, আর সে মারা যাচ্ছে কিনা দেখবার জন্য পোশাক-আশাক খুলে ফেলবেন। তারপর কেউ যখন থাকবে না সেই সময় তার কাঁধে একটা চাপড় দেবেন তাহলেই দেখবেন ছাপমারা অক্ষর কটি বেরিয়ে পড়েছে।

—এতে আর অসুবিধা কি? পোয়ারে বলে।

—বেশ, রাজী আছেন কি? আইবুড়ো বৃদ্ধাকে জিজ্ঞাসা করে গঁদুরো।

—কিন্তু স্যর, ধরুন কোন অক্ষর যদি না বেরোয় তাহলে দুহাজার ফ্রাঁ পাব কি? মাদমোয়াজেল মিশনো জিজ্ঞাসা করেন।

—না।

—এই যে মেহনত করব, এর জন্য কি দেবেন তাহলে?

—পাঁচ শ ফ্রাঁ।

—অত কম টাকার জন্য এই ঝামেলা করতে বলছেন! ফলাফল যাই হোক বিবেকের সংশয় তো কম হবে না! বিবেকের কথাটা উপেক্ষা করা যায় না মঁশিয়।

পোয়ারে বলে, আমি জানি, এ মহিলাটির যথেষ্ট ধর্মজ্ঞান আছে। তাছাড়া ইনি যেমন অমায়িক তেমনি চতুরও বটে।

মাদমোয়াজেল মিশনো বলে যান, শুনুন, লোকটা যদি চীট-ডেথ হয় তো তিন হাজার ফ্রাঁ দিতে হবে, আর না হয় তো কিছুই চাই না।

—রাজী! গঁহুরো বলে।—কিন্তু একটি শর্ত আছে—কালই করতে হবে কাজটি।

—সে কথা এখন দিতে পারি না স্যর। তার আগে যার কাছে স্বীকারোক্তি করি তার সঙ্গে পরামর্শ করতে হবে।

যাবার জন্য উঠে দাঁড়িয়ে গোয়েন্দাটি তখন বলে, আপনি দেখছি বান মাছের মতই পিছল। বেশ, কাল আবার দেখা হবে তাহলে। আর জরুরী যদি আমার সঙ্গে দেখা করতে হয় তো কুর দ লা স্যাঁৎ শাপেলের মোড়ে পেতি রুয় স্যাঁৎ আনে যাবেন। তোরণের নীচে একটি মাত্র দরজা আছে। সেখানে মঁশিয় গঁহুরোর খোঁজ করবেন।

ক্যুভিয়ের বক্তৃতা শুনে ফিরবার পথে এই চীট-ডেথ নামটা বিয়াশঁর কানে যায়, এবং সে নিরাপত্তা বিভাগের বড় কর্তাকে বলতে শোনে—রাজী!

—পাকা বন্দোবস্তটা করে ফেললে না কেন? বছরে তিনশ' ফ্রাঁ হবে। মাদমোয়াজেল মিশনোকে বলে পোয়ারে।

—কেন করলাম না? জবাবে বলেন আইবুড়ো বৃদ্ধা।—করবার আগে ভেবে দেখতে হবে। মঁশিয় ভোতর্যাঁ যদি সত্যিই চীট-ডেথ হয় তো তার সঙ্গে বন্দোবস্ত করলে আরও ভাল দর কষা যাবে। তাছাড়া টাকার কথা যদি বলা হয় তো ওর মত পাকা লোক ব্যাপার বুঝে এক পয়সা না দিয়ে খসে পড়বে। তাতে আরও ঠকতে হবে।

—ধরো, যদি ওকে আগাম সাবধান করে দাও তাহলে সবই হারাবে। ভদ্দরলোক তো বলেই গেলেন যে তার উপর কড়া নজর রাখা হচ্ছে। পোয়ারে বলে।

মাদমোয়াজেল মিশনো তখন ভাবেন, যাই হোক, লোকটাকে দেখতে পারি না। টিটকিরি না দিয়ে কখনও আমার সঙ্গে কথা বলে না।

—তার চাইতেও ভাল কাজ করতে পার। পোয়ারে বলে যায়।—ঐ ভদ্দর লোক মানুষও যেমন ভাল, তেমনি পোষাক-আশাকেও পারিপাটি আছে। ওর মুখেও তো শুনলে যারা আইন মেনে চলে তাদের পক্ষে এটা অপরাধ নিবারণের নাগরিক কর্তব্যের সামিল, তা সে অপরাধীর যত দোষই থাক। একবার চুরি করলে আর সে অভ্যাস যায় না। আমাদের সবাইকে

খুন করার খেয়াল যদি ব্যাটার মাথায় চেপে বসে তাহলে কি হবে? তাহলেই গেছি! নিজেদের প্রাণ তো আগেই যাবে, তাছাড়া বাকী আর গোটাকয়েক খুনের জন্যও দায়ী হতে হবে।

ফুটো নল থেকে টুপ্ টুপ্ করে ফোঁটা ফোঁটা জল পড়ার মত অবিশ্রান্ত মন্তব্য করে যায় পোয়ারে। মাদমোয়াজেল মিশনো ভাবনায় এত তন্ময় হয়ে পড়েছিলেন যে এদিকে বড় খেয়াল ছিল না। একবার যখন কথার তারে ঝঙ্কার তুলেছে তখন আর তাকে থামায় কে? নিরবচ্ছিন্ন বক্ বক্ করে চলে। তাছাড়া মাদমোয়াজেল মিশনোও বাধা দিয়ে থামিয়ে দিলেন না তো! প্রথম যে কথা সে বলল তার সঙ্গে কোন সম্পর্ক, কোন প্রাসঙ্গিকতা না রেখে একটার পর একটা অসংলগ্ন মন্তব্য করে যায় পোয়ারে। মেজঁ ভোকেতে পৌছোবার সময় গুচ্ছের দৃষ্টান্ত, উদ্ধৃতি আর নানাবিধ নজীরের পথ বেয়ে সিয়োর রাগুলো বনাম দাম্ মরাঁ মামলায় তার সাক্ষীর প্রসঙ্গে এসে পড়ে পোয়ারে। এ মামলায় সে বিবাদী পক্ষে সাক্ষী দেয়।

একান্তে তন্ময় হয়ে মাদমোয়াজেল তাইফেরের সঙ্গে আলাপ করছিল ওজেন দ রাস্তিঞাক। দুজনেই এত তন্ময় হয়ে পড়েছিল যে দুটি ভাড়াটে খাবার ঘরের মধ্য দিয়ে হেঁটে যাবার সময়ও কারও চোখ ফেরাবার হুঁস হল না। ব্যাপারটা মাদমোয়াজেল মিশনোর দৃষ্টি এড়াল না।

—আগেই জানতাম এমন হবে। পোয়ারকে বলেন মাদমোয়াজেল মিশনো।—দিন সাতেক ধরে ওরা এমনভাবে চোখ মারামারি করছে যে দেখলে হাঁ হয়ে যেতে হয়।

—তা বটে! পোয়ারে জবাব দেয়।—শেষ অবধি মেয়েটিই দোষী সাব্যস্ত হল।

—কোন মেয়েটি?

—মাদাম মরাঁ!

—আমি বলেছি মাদমোয়াজেল ভিকতিরনের কথা। খেয়াল না করে পোয়ারের ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়েন মাদমোয়াজেল মিশনো।—আর তুমি বললে মাদাম মরাঁ। সে আবার কে?

—মাদমোয়াজেল ভিকতরিনের অপরাধ কি?

—তার অপরাধ সে মঁশিয় ওজেন দ রাস্তিঞাকের প্রেমে পড়েছে। কোনদিকে চলেছে খেয়াল না করে বেচারি একদম ঝুঁকে পড়েছে।

সেদিন সকালে রাস্তিঞাককে চরম হতাশার মধ্যে ঠেলে ফেলেছে মাদাম দ

যুসাঁজাঁ। ভোতর্‌াঁর মত অস্বাভাবিক মানুষ কোন উদ্দেশ্যে যে তার প্রতি বন্ধুভাব দেখাচ্ছে এবং তার সঙ্গে সখ্যতার ফলাফলই বা কি, সেদিকে বিন্দুমাত্র খেয়াল না রেখে মনে মনে এই রহস্যময় মানুষটির কাছে পুরোপুরি আত্মসমর্পণ করেছে ওজেন। ঘণ্টাখানেক আগে পা পিছলে যে গভীর গহ্বরের মধ্যে সে পড়ে গেছে, তা থেকে এখন শুধু অঘটনই তাকে বাঁচাতে পারে। এই সময় মাদ-মোয়াজেল তাইফেরের কাছে সে প্রেমের মধুরতম প্রতিশ্রুতি দান করে আর বিনিময়ে মাদমোয়াজেলের প্রতিশ্রুতিও পায়।

ভিকতরিনের মনে হয় যেন দৈববাণী শুনছে। সহসা স্বর্গের দ্বার খুলে গিয়ে যেন তাকে ভেতরে ঢুকতে দিচ্ছে। মঞ্চের রূপকারদের হাতে প্রাসাদ যেমন উজ্জ্বল অপার্থিব মহিমামণ্ডিত হয়ে ওঠে, মেজঁ ভোকেও সহসা যেন তেমনি অলৌকিক আভামণ্ডিত হয়ে উঠল। সে ভালবাসে আর তাকেও ভালবাসে। অন্তত তাই তো মনে হচ্ছে। বোর্ডিংয়ের সদা-সতর্ক দৃষ্টির মধ্যে চুরি-করা ঐ ঘণ্টাখানেক সময়ে রাস্তিঞাককে দেখে, কিংবা তার দরদী কণ্ঠস্বর শুনে কোন মেয়ে বিশ্বাস করত না এ কথা? নিজের বিবেকের সঙ্গে লড়াই করে, অন্যায় করছে একথা জেনেও সমস্ত ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করে এই কাজ করছে রাস্তিঞাক। আপন মনে বলে, অন্তত একজন নারীকে সুখী করে সে নিজের ক্ষমার যোগ্য পাপের প্রায়শ্চিত্ত করবে। হতাশা তার মুখে নতুন সৌন্দর্য এনে দেয়। অন্তরে যে নরকের আগুন জ্বলছিল, তারই অপূর্ব আভায় মুখমণ্ডল উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে।

ওজেনের বরাত ভাল, তাই অঘটনও ঘটে গেল। বেশ দিলদরিয়া মেজাজেই ঘরে ঢোকে ভোতর্‌াঁ। নিজের পৈশাচিক প্রতিভা বলে যে দুটি প্রাণ সে একসাথে গেঁথেছে, তাদের অন্তরের কথা বুঝতেও তার বিলম্ব হল না। তাই তার শ্লেষমাখা গাঢ় কণ্ঠস্বর গানের সুরে এদের শান্তির ব্যাঘাত জন্মায়:।

মধুর আমার ফঁ্যাশেতের সরলতা·········

ভিকতরিন পালিয়ে যায়। এতকাল যত দুঃখ সে পেয়ে আসছে, আজকের সুখ তার সব ব্যথা, সব মলিনতা ধুয়ে-মুছে দিয়ে গেছে। বেচারি! রাস্তিঞাক তার হাতে হাত দিয়েছে। গালে লেগেছে তার চুলের ছোঁওয়া। কানের এত কাছাকাছি মুখ এনে সে কথা বলেছে যে তার তপ্ত ঠোঁটের স্পর্শ অনুভব করছে ভিকতরিন। দ্বিধা-কম্পিত একখানি বাহু জড়িয়ে ধরেছে তার কোমর। কাঁধে এখনও রয়েছে চুরি-করা চুম্বনের পুলক-শিহরণ। এই সবই তো তার

পবিত্র বাগ্‌দানের আচার। মুটকী সিলভির সান্নিধ্য আর যে কোন সময়ে এই আলোকোজ্জ্বল খাবার ঘরে ঢুকে পড়ার সম্ভাবনা তাদের প্রথম মিলন এত আবেশভরা মাদকতাতপ্ত, এত প্রগাঢ়, এমন উল্লাসচঞ্চল করে তুলেছিল যে অতি প্রসিদ্ধ প্রেমের গল্পের অনবদ্য বর্ণনাও তার কাঁছে ঘেঁষতে পারে না। আমাদের বাপদাদার আমলের শ্রুতিমধুর একটি শব্দ প্রয়োগ করে বলা যায়ঃ প্রতি পক্ষান্তে যে ধর্মপ্রাণ বালিকা পাপ স্বীকারের জন্য যায়, তার কাছে এই 'মধুর সঙ্কেত' পাপের সামিল। এই সময় নিজের অন্তরের গভীরতম ভাবাবেগের ভাণ্ডার উজাড় করে ঢেলে দিয়েছে সেই মেয়েটি। উত্তরকালে সুখ-সম্পদের মধ্যে যখন সে পুরোপুরি আত্মদান করবে, তখনও এমন উজাড় করে দিতে পারবে না।

—কাজ হয়ে গেছে! ওজেনকে বলে ভোতরাঁ।—বাবু দুটি ঝগড়া করেছে। যথারীতি ব্যাপারটি ঘটেছে—নিছক মতভেদের ব্যাপার। আমাদের পায়রাটি অপমান করেছে আমার বাজপাখীকে। ক্লিঞাকুরে কাল দ্বন্দ্বযুদ্ধ হবে। কাল সকাল সাড়ে আটটায় এখানে বসে কফির সঙ্গে মাখম মাখা রুটির টুকরো খাবার সময় মাদমোয়াজেল তাইফের তার বাবার স্নেহ ও সম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারিণী হবে। এই ভবিষ্যদ্বাণী করা হাস্যকর নয় কি? তাইফেরনন্দন তরোয়াল চালাতে ভারি ওস্তাদ। জয় সম্পর্কে সে এত নিশ্চিন্ত যে সব কটা টেক্কাই যেন তার হাতে! কিন্তু আমি যে কোপের কায়দা আবিষ্কার করেছি, তরোয়াল তুলে মুখে খোঁচা মারার ই কায়দায় বেচারি নিশ্চয় কুপোকাত হবে। দেখবে কায়দাটা? জানা থাকলে খুব কাজে আসবে।

নির্বোধ নীরবতায় শুনে যায় রাস্তিঞাক। একটি কথা বলার শক্তিও তার ছিল না। এই সময় বুড়ো গোরিও, বিয়াশঁ আর জনকয়েক ভাড়াটে ঘরে ঢোকে।

—তোমার যে রকম মানসিক অবস্থা আমার কাম্য ছিল, এতদিনে তা হয়েছে। ভোতরাঁ বলে।—বুঝতে পারছ কিসের পেছনে চলেছ? স্থির হও ঈগল শিশু! মানুষের সমাজে প্রভু হবে তুমি। সবল তুমি—নিজের পায়ে ভর করে দাঁড়াও। তোমার মধ্যে তেজ আছে—গোটা দুনিয়াই তো তোমার।

ওজেনের হাত ধরবার জন্য অঙ্গভঙ্গী করে ভোতরাঁ। কিন্তু চট করে নিজের হাত সরিয়ে নিয়ে চেয়ারে বসে পড়ে রাস্তিঞাক। তার চোখের সামনে চাপ চাপ রক্ত ভেসে উঠছে যেন।

—এখনও সুতিকাগারের কিছু ছেঁড়া নেকড়াকানি লেগে রয়েছে তাহলে! আমাদের ধর্মবুদ্ধির কাদামাখা কিছু নেকড়া এখনও তাহলে একসাথে ঝুলছে! চাপাগলায় বলে ভোতর‍্যাঁ।—কিন্তু পাপা দোলিবাঁর সম্পত্তির পরিমাণ কমপক্ষে ত্রিশ লাখ্। কি পরিমাণ টাকা তার আছে তা আমার অজানা নয়। যৌতুক তোমায় ধুয়ে মুছে বরের পোশাকের মত পরিচ্ছন্ন করে দেবে। এমন কি নিজের চোখেও পরিচ্ছন্ন হয়ে যাবে!

রাস্তিঞাক আর ইতস্তত করল না। মনে মনে স্থির করল, সন্ধ্যাবেলা গিয়ে তাইফের আর তার ছেলেকে সাবধান করে দিয়ে আসবে। ভোতর‍্যাঁ চলে গেলে বুড়ো গোরিও এগিয়ে এসে তার কানে কানে বলে:

তোমায় যে মনমরা দেখাচ্ছে ছেলে! আমার সঙ্গে চল, আমি তোমায় চাঙ্গা করে দেব।

কথাটা বলবার সময় আর একটা প্রদীপ থেকে নিজের মোমখানা ধরিয়ে নিচ্ছিল সেমুই-ব্যবসায়ী। পরম কৌতূহলভরে তার পেছু পেছু উপরে গেল ওজেন।

—তোমার ঘরেই যাই চল। সদাশয় বৃদ্ধ বলে। সিলভির কাছ থেকে সে ছাত্রটির ঘরের চাবি চেয়ে এনেছে। —আজ সকালবেলা তুমি ভেবেছ, দেলফিন তোমায় ভালবাসে না! কি হে, ভাবনি? মাছির ভ্যানভ্যানানি কানে নিয়ে তুমি ফিরে এসেছ আর রাগ দুঃখ দুটোই হয়েছে। আরে বোকা ছেলে! বুঝতে পারছ না, আমার জন্য অপেক্ষা করছিল সে! চমৎকার একটা পাড়ায় তোমার জন্য খানকয়েক ঘর ঠিক করার জন্য এক জায়গায় আমাদের যাবার কথা ছিল। আজ থেকে তিন দিনের মধ্যেই তোমায় উঠে যেতে হবে সেখানে। আমি একথা বলেছি তা প্রকাশ করো না যেন! সে তোমায় অবাক করে দিতে চায়। তাই বলে আর তো আমি তোমায় না জানিয়ে পারি না! রুয় দার্তোয়ায় থাকবে তুমি। রুয় স্যাঁ-লাজার থেকে মাত্র কয়েক পা দূরে। রাজকুমারের মত আরামে থাকবে সেখানে। তোমার জন্য যে সব আসবাব যোগাড় করেছি তা দিয়ে একটা মেয়ের বিয়ে দেওয়া যায়। গত এক মাসে অনেক কিছু করেছি আমরা, অথচ একটি কথাও বলিনি তোমাকে। আমার উকীল লড়াই শুরু করে দিয়েছে। মেয়েটা তার টাকার সুদ বাবদ বছরে ছত্রিশ হাজার ফ্রাঁ পাবে। তাই থেকে জমি কিনতে আট হাজার ফ্রাঁ লগ্নী করার জন্য আমি পীড়াপীড়ি করছি।

ওজেন হতবাক হয়ে যায়। দুই হাতে বুক জাপটে ধরে নীরবে সে নিজের অপরিচ্ছন্ন এলোমেলো ঘরের মধ্যে পায়চারি শুরু করে। ছাত্রটি যখন গোরিওর দিকে পেছন ফেরে সেই সুযোগে আগুনের চুল্লীর উপরের তাকে সোনার অক্ষরে রাস্তিঞ্যাকের নাম লেখা লাল মরক্কো চামড়ার একটি বাক্স রেখে দেয় বৃদ্ধ।

তারপর দরদী বৃদ্ধ বলে, শোন ছেলে, এ ব্যাপারে আমি আকণ্ঠ ডুবেছিলাম। তবে আমার আগ্রহের মধ্যে খানিকটা স্বার্থপরতাও আছে। তোমার বাড়ী বদলের ব্যাপারে আমারও স্বার্থ আছে। একটা জিনিস যদি তোমার কাছে চাই তো অস্বীকার করবে না বল!

—কি জিনিস?

—তোমার ঐ ঘরের উপরে ছয় তলায় একখানা ঘর আছে। সেখানাও এই সঙ্গেই ভাড়া নেওয়া হচ্ছে। ঐ ঘরে থাকব আমি। রাজী আছ? দিন দিন বুড়ো হয়ে যাচ্ছি, অথচ মেয়েদের কাছ থেকে বড় দূরে থাকতে হচ্ছে। তোমার কোন অসুবিধা করব না। শুধু থাকব সেখানে, ব্যস! রোজ সন্ধ্যায় আমার কাছে এসে তুমি দেলফিনের গল্প শুনিয়ে যাবে। তাতে বিরক্ত হবে না বোধহয়, হবে কি? আমি বিছানায় যাবার পর তুমি এসে যখন তার কথা বলবে, শুয়ে শুয়ে আমি শুনব আর মনে মনে বলব, এখুনি আমার দেলফিনকে দেখে এল। তার সঙ্গে বলনাচে গিয়েছিল নিশ্চয়ি! ওর জন্যই মেয়েটা সুখে আছে! আমি যদি অসুস্থ হয়ে পড়ি তো তোমার আসা যাওয়া চলা-ফেরার শব্দ শুনেও প্রাণ জুড়োবে। তোমার মধ্যে আমি মেয়েকে পাব! সাঁ্য-জেলিজে থেকে মাত্র দু'পা দূরে জায়গাটা। ওরা তো ঐ পথেই হামেশা যাতায়াত করে। সেখানে যেতে আর আমার দেরী হবে না কোনদিন। এখন দু'একদিন ঠিক সময়মত যেতে পারছি না। আর সেও সম্ভবত তোমার ঘরে মাঝে মাঝে আসবে। তখন আমি তার কথা শুনতে পাব, বেড়ালছানার মত ছোট ছোট পা ফেলে তাকে সকাল বেলার তুলো-ভরা পোশাকে চলাফেরা করতে দেখতে পাব। গত মাসে আবার সে আমার সেই ছোট্ট মেয়েটি হয়েছে—সেই আগেকার মত হাসিখুশি আগেকার মত চপল হয়ে পড়েছে। আবার নতুন করে গড়ে উঠছে তার প্রাণ। এবং তার সুখের জন্য সে তোমার কাছে ঋণী। বল কি! তোমার জন্য আমি আকাশের চাঁদ এনে দেব! এখুনি আমরা ফিরে আসার সময় সে বলে, বাবা, সত্যিই এখন আমি সুখী!

গম্ভীরভাবে আমায় যখন ওরা পিতৃসম্ভাষণ করে, আমার বুকটা ছ্যাক করে ওঠে। কিন্তু যখনই 'বাবা' বলে ডাক দেয়, তখনই ওদের ছোট বেলাকার কথা মনে পড়ে যায়—সেদিনের সমস্ত স্মৃতি ভেসে ওঠে মনের মধ্যে! তখনই আমি ওদের খাঁটি বাপ হই। আমি ভুলে যাই এখন আর ওরা আমার নয়—অপরের। সত্যিই কেঁদে ফেলে বেচারি! হাত দিয়ে চোখ মোছে।

—বহুদিন ওর বাবা ডাক শুনিনি—বহুদিন আমায় সে জড়িয়ে ধরেনি। হাঁ, মনে পড়েছে, দশ বছরের মধ্যে কোন মেয়ের হাত ধরে আমি পথ চলিনি। ওর সঙ্গে পাশাপাশি চলা, ওর পোশাকের স্পর্শ অনুভব করা কি ওর হাতের উষ্ণ ছোঁয়া লাগা যে কত মধুর! আজ সকালে দেলফিনকে নিয়ে আমি সব জায়গায় ঘুরেছি। মনে রেখ, তোমার কাছাকাছি আমায় থাকতে দিতে হবে। মাঝে মাঝে ছোটখাটো কাজের জন্য লোকের দরকার পড়বে তো। আমিই করে দেব। হায়রে, ঐ আলজাসিয়াঁ গাধাটা যদি মরে যেত! বাতে যদি ওর পাকস্থলী আক্রমণ করত তো মেয়েটা কি সুখীই যে হতে পারত! তখন তুমিই আমার জামাই হতে—তুমিই প্রকাশ্যে ওর স্বামী হতে পারতে! এই সংসার যাকে সুখ বলে, মেয়েটা কোনদিন সেই সুখের স্বাদ পায়নি। আমার মতে সেইজন্যই ওর সমস্ত দোষত্রুটি ক্ষমার যোগ্য। করুণাময় ভগবান নিশ্চয়ি সন্তান-বৎসল বাপেদের পক্ষে। একটু বাদে মাথা নেড়ে বৃদ্ধ বলে ওঠে, তোমায় সে খুব পছন্দ করে—খু-উ-ব ভালবাসে। আজকে একসঙ্গে যাবার সময় বার বার তোমার সম্পর্কে বক্‌বক্ করছে: ও দেখতে ভালই, না বাবা? প্রাণটাও ভাল! তোমার কাছে আমার কথা বলে নাকি?' হুঃ! রুয় দার্তোয়া থেকে পাসাজ দ পানোরামার মধ্যে তোমার সম্পর্কে যত কথা বলেছে তা দিয়ে এক লাইব্রেরি ভরতি বই হয়ে যায়। হাঁ গো হাঁ, প্রাণের কোন কথাই গোপন রাখেনি আমার কাছে। আজকের গোটা সকাল নিজেকে আর বৃদ্ধ বলে মনে হয়নি। নিজেকে এমন হালকা লেগেছে যেন এক আউন্স ওজনও নেই। আমি তাকে বললাম যে হাজার ফ্রাঁর নোটখানা তুমি আমার হাতে দিয়ে দিয়েছ। শুনে মেয়েদের চোখে জল আসে। আরে, তোমার ঐ তাকের উপর কি রয়েছে? শেষমেষ বলে বুড়ো গোরিও। রাস্তিঞাকের অবিচলভাবে দেখে সে অধৈর্য হয়ে পড়েছিল।

খানিকটা কৌতুকভরা দৃষ্টিতে প্রতিবেশীর দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে ছিল ওজেন। প্রকৃতই পুরোপুরি হতবুদ্ধি হয়ে গিয়েছিল রাস্তিঞাক। নিজের প্রিয়তম আশ

পূরণের সংবাদের সঙ্গে আগামী কালের দ্বন্দ্বযুদ্ধের সংবাদের বৈসাদৃশ্য এত বেশী যে মনে মনে সেই বিভীষিকার সমস্ত অনুভূতির অভিজ্ঞতা লাভ করে। আগুনের উপরের তাকের দিকে চেয়ে সে একটা চৌকো বাক্স দেখতে পায়। বাক্সটি খুলে তার মধ্যে ব্রেগের তৈরী কাগজে মোড়া একটি ঘড়ি দেখে। কাগজখানির উপর এই কয়টি কথা লেখা ছিল :

আমি চাই, প্রতি ঘণ্টায় আমার কথা ভাব, কারণ···দেলফিন

এই শেষ কথাটির মধ্যে একটা গোপন ঘটনার সঙ্কেত রয়েছে। সেই সঙ্কেত ওজেনকে উদ্বেল করে তোলে। ঘড়ির কেসের মধ্যে সোনার হরফে তার নাম লেখা। এমন একটি অলঙ্কারের উপর লোভ ছিল ওজেনের। ঘড়িটির চেন, চাবি, তার কারুকার্য আর নক্সার মধ্যে তার কল্পনা যেন মূর্ত হয়ে উঠেছে। আনন্দে বুড়ো গোরিওর মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। ওজেনের উপর এই উপহারের প্রতিক্রিয়া আর তার বিস্ময়ের কথা মেয়েকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জানাবে বলে নিশ্চয়ি হলপ করে এসেছে বৃদ্ধ। সেও এই যুবকের প্রত্যাশা আর উত্তেজনার ভাগীদার হয়ে পড়ে। এবং এই তিনজনের মধ্যে তাকেও কম সুখী মনে করবার কোন কারণ নেই। মেয়ের জন্য আর নিজের জন্য আগে থাকতেই রাস্তিঞ্যাককে ভালবাসে বৃদ্ধ।

—আজই সন্ধ্যায় তার সাথে দেখা করগে। তোমার জন্য সে প্রতীক্ষা করবে। ঐ আলজাসিয়াঁ হোঁতকাটা রাত্রে তার নাচওয়ালীর সঙ্গে খানাপিনা করতে যাবে। আহা, আমার উকীল যখন তাকে তার প্রকৃত অবস্থাটা বুঝিয়ে দেয়, বোকার মত সে হাঁ করে থাকে। আর এদিকে ভক্তের মত মেয়েটাকে ভালবাসে বলে মুখে জাহির করে। করে না? একবার মেয়েটার গায়ে হাত তুলে দেখুক না, নিজের হাতে আমি তাকে খুন করব তাহলে! আমার দেলফিন আজকে ঐ লোকটার একথা মনে হলেই ব্যাটাকে খতম করে দিতে ইচ্ছা হয়। একে তুমি নরহত্যা বলতে পার না। ওটা কি মানুষ নাকি? শূয়োরের ধড়ের উপর একটা বাছুরের মুণ্ড লাগান। আমাকেও তোমার সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছ তো! নেবে না?

—নোবো বাবা গোরিও। আপনি জানেন, আপনাকে কত ভালবাসি!

—তা আর বুঝিনে! আমার সম্পর্কে তুমি বিন্দুমাত্র লজ্জা বোধ কর না। এস, আমার বুকের মধ্যে এস! ছাত্রটিকে দৃঢ়ভাবে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে বৃদ্ধ।

—আমায় কথা দাও, মেয়েটাকে তুমি সুখী করবার চেষ্টা করবে! আজ সন্ধ্যায় যাবে বল! যাবে তো?

—নিশ্চয় যাব! কিন্তু একটা জরুরী কাজে এখন আমাকে যেতেই হবে।

—আমায় দিয়ে সে-কাজ হবে?

—আপনাকে দিয়ে? হাঁ, আপনি পারতে পারেন। আমি যখন মাদাম দ নুসাঁজাঁর ওখানে যাব, বুড়ো তাইফেরের ওখানে গিয়ে আজই সন্ধ্যায় আমার সঙ্গে দেখা করতে বলতে পারবেন? জরুরী একটা বিষয়ে তার সঙ্গে আলাপ করতে চাই।

—যা ভেবেছি তাহ'লে তা সত্যি যুবক! গলা চড়িয়ে বলে ওঠে বৃদ্ধ। সহসা তার মুখখানা কালো হয়ে যায়। —সত্যিই তাহলে তুমি তার মেয়ের পাণিপ্রার্থী! নীচের ঐ ইতরগুলো যা বলে তা তাহলে মিথ্যে নয়! হায় ভগবান, জান না গোরিওর ধাক্কার কত জোর। যদি বুঝতে পারি যে আমাদের চোখে ধুলো দেবার চেষ্টা করছ, তাহলে আমার এই মুঠোর এক ঘুষোয় তোমায় ঠাণ্ডা ক'রে দেব! দূর দূর! এ কি বলছি আমি! না না না, এ কখনও সম্ভব নয়!

ছাত্রটি তখন বলে, আমি হলপ করে বলতে পারি, এ দুনিয়ায় শুধু একটি মেয়েকেই আমি ভালবাসি। অবিশ্যি মিনিট কয়েক হল আমি তা উপলব্ধি করতে পারছি।

—আহা! কি শান্তিই যে পেলাম! আবেগভরা গলায় বলে ওঠে বৃদ্ধ।

—কিন্তু তাইফেরের ছেলে কাল দ্বন্দ্বযুদ্ধ লড়তে যাচ্ছে। ছাত্রটি বলে যায়।—এ যুদ্ধে তার মৃত্যু অবধারিত।

—তাতে তোমার কি?

—কিন্তু বাপকে জানিয়ে দিতে হবে তো যাতে ছেলেকে সে নিবৃত্ত করে! কাতর স্বরে বলে ছাত্রটি!

ভোতর‍্যাঁর কণ্ঠস্বর তাকে বাধা দেয়। তার দরজার চৌকাঠের সামনে দাঁড়িয়ে লোকটা গাইছে:

হায় রিচার্ড! হায় আমার রাজা!
সারা দুনিয়া ছেড়ে গেল তোমায়……
ক্রম্! ক্রম্! ক্রম্! ক্রম্! ক্রম্!

বহু বছর ঘুরেছি জগৎ জুড়ে
লাভালাভ যাই হোক না……
ট্রালা—লা—লা—লা !

ক্রিস্তফ এই সময় জানায়, শুনছেন স্যর, ঝোল ওদিকে ঠাণ্ডা হয়ে গেল ! আর সবাই আপনাদের জন্য অপেক্ষা করছে !

—এই, আমার ঘর থেকে একটা বর্দোর বোতল নিয়ে যা। ডেকে বলে ভোতর‍্যাঁ।

—ঘড়িটা পছন্দ হল তো? গোরিও জিজ্ঞাসা করে।—মেয়েটার রুচি ভাল, কি বল?

ভোতর‍্যাঁ, বুড়ো গোরিও আর রাস্তিঞাক এই তিনজনেই একসঙ্গে নীচে নামে। এবং দেরী হয়ে গেছে বলে তিনজনকেই পাশাপাশি বসতে হয়। খাবার সময় ভোতর‍্যাঁর প্রতি যতটা সম্ভব নির্লিপ্ত উদাসীন ভাব দেখায় বৃদ্ধ। কিন্তু মাদাম ভোকের যাকে ভাল লাগে সেই ভোতর‍্যাঁ আজকের মত এমন দিলদরিয়া, এমন হাসিখুশি ভাব ইতিপূর্বে কোনদিন দেখায় নি। তার বুদ্ধিদীপ্ত রহস্যালাপ বিদ্যুতের মত ঝলসে ওঠে—গোটা টেবিলের লোকজন হেসে লুটোপুটি খায় তার কথা শুনে। কিন্তু তার আত্মপ্রত্যয় আর মনের স্থৈর্য ওজেনকে হতভম্ভ করে দেয়।

—আজ তোমার হল কি? মাদাম ভোকে জিজ্ঞাসা করেন।—আনন্দে ফড়িং-এর মত ফড় ফড় করছ যে বড়!

—ভাল একটা দাও মারতে পারলে বরাবরই আমি খুশি থাকি।

—দাও? ওজেন বলে।

—হাঁ দাও, কেন নয় বল? এখুনি একটা মাল পাঠিয়ে এলাম, তার জন্য ভাল বাট্টাও পাব। কি, আমার মুখখানা ভাল লাগছে না মাদমোয়াজেল মিশনো? মহিলাটি তাকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লক্ষ্য করছেন টের পেয়ে তার দিকে ফিরে জিজ্ঞাসা করে ভোতর‍্যাঁ।—কি হয়েছে যে অমন হাঁ করে চেয়ে আছেন? খারাপ যদি কিছু চোখে লাগে তো বলুন। আপনাকে খুশি করার জন্য এখুনি তা সেরে ফেলেছি। এ নিয়ে ঝগড়া করা উচিত নয়, কি বল পোয়ারে? অবসরপ্রাপ্ত কেরাণীর দিকে আড়চোখে চায় ভোতর‍্যাঁ।

—জুপিটারের নামে হলপ করে বলতে পারি, মাতাল হারকিউলিসের চমৎকার মডেল হতে পারেন আপনি। তরুণ শিল্পী বলে ওঠে।

—বেশ, মাদমোয়জেল মিশনো যদি পের লাসেজের কবরখানায় ভেনাস হতে রাজী হন তো আমি তোমার মডেল হব। ভোতর‍্যাঁ জানাল।

—পোয়ারে কি হবে তাহলে?

—তার আর ভাবনা কি? পোয়ারে পোয়ারের ভঙ্গীতে দাঁড়াবে! ও হবে বাগিচার অধিদেবতা। ভোতর‍্যাঁ বলে ওঠে।—জানেন তো, ওর নামের অর্থ ন্যাসপাতি!

—হাঁ, রসাল ফল বটে! আপনাকে তাহলে ন্যাসপাতি আর পনীরের মধ্যে করে পরিবেশন করা হবে। সহসা বলে ওঠে বিয়াশঁ।

—কি যা তা বলছ! মাদাম ভোকে বলে। —তার চাইতে বরং বোতলটা থেকে বর্দো ঢেলে দাও আমাদের। আরে, ঐ যে বোতলের নাক বেরিয়ে আছে দেখছি! ওতে মনটাও বেশ খুশি হবে, আর পাকস্থলীর তো কথাই নেই!

—ভদ্রমহোদয়গণ! সভানেত্রী আমাকে চুপ করতে বলছেন! মাদাম কত্যুর বা মাদমোয়াজেল ভিক্তরিন শিশ্চয়ি এ রহস্য অন্য অর্থে নেবেন না, তবে বৃদ্ধ গোরিওর নির্দোষ কান দুটোকে তো সম্মান না করে পারা যায় না! এখন আমি এক বোতল বর্দোর প্রসঙ্গ তুলছি। লাফিতের নামের সঙ্গে যুক্ত হয়ে এ জিনিসের খ্যাতি দ্বিগুণ বেড়ে গেছে। কোন রাজনৈতিক প্রসঙ্গের ইঙ্গিত করার অভিপ্রায় আমার নেই। থামের মত নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল ক্রিস্তফ। তার দিকে ফিরে বলে, এই, এদিকে আয় তো ব্যাটা পুতুল! এদিকে আয়! নিজের নাম কি জানিস? বোতলটা বার কর বিধর্মী!

—এই নিন স্যর। বোতলটা বাড়িয়ে ধরে বলে ক্রিস্তফ।

ওজেন আর গোরিওর গ্লাশ ভরতি করে দেয় ভোতর‍্যাঁ। নিজের গ্লাশেও কয়েক ফোঁটা ঢালে। পাশাপাশি বসা অপর দুজন যখন চুমুক দিচ্ছে, সে শুধু তখন চেখে দেখে। সহসা সে ভ্রূকুটি করে।

—দুত্তের ছাই। এটা আবার ছিপি লাগানো। বাকীটা নিজেই খেয়ে নিস ক্রিস্তফ্। আমাদের জন্য আর কয়েকটা নিয়ে আয়। ডানদিকের বোতলগুলো নিয়ে আসবি। পারবি, না পারবি না? এখানে আমরা যোলজন আছি—আট বোতল নিয়ে আয়।

—আজকে আমাদের জন্য তাহলে পকেট উজাড় করছেন নাকি? শিল্পী বলে।—আমি তাহলে একশ চেস্টনাট দিচ্ছি!

—বা! বা!

—বুউ…উ।

—প র-র-র!

বাজীর মত টেবিলের চারপাশে থেকে নানাবিধ উল্লাসধ্বনি ছুটতে থাকে।

—বেশ, দু বোতল শাম্পেন তাহলে এসে যাক, কি বলেন ভোকে মা! চড়া গলায় বলে ওঠে ভোতর‍্যাঁ।

—কি বললে? মাত্র দু বোতল হলেই খুশি? চাইতেই যখন শুরু করেছ তখন গোটা বাড়ীটা চেয়ে বস না! দু বোতল শাম্পেন! দাম কত জান?—বার ফ্রাঁ! এত টাকা আমার টেবিলে আমদানি হয় না যে অত খরচ করতে পারি। তবে মঁশিয় ওজেন যদি দাম দিতে রাজী থাকে তো আমি শুকনো আঙুরের মদের ব্যবস্থা করতে পারি।

—ও মদ আমার জানা আছে। ভারি বিচ্ছিরি—গাড়ির চাকর কালির মত। বিড়বিড় করে বলে ওঠে মেডিক্যাল ছাত্রটি।

—চুপ কর বিয়াশঁ! গাড়ির চাকার কালির কথা আমি শুনতে পারি না। ওতে আমার……হাঁ, শাম্পেনই আসুক, দাম আমিই দেব।

—হাঁরে সিলভি, বিস্কুট আর ছোট ছোট কেক্ নিয়ে আয় তো! মাদাম ভোকে হুকুম করেন।

—আপনার ওই ছোট ছোট কেক এখন বড় হয়ে গেছে…দাড়ি গজিয়েছে। তার চাইতে বরং বিস্কুটই নিয়ে আসুক।

একটু বাদেই বর্দো পরিবেশিত হয়। অভ্যাগতেরা ক্রমেই চাঙ্গা হয়ে ওঠে—রঙ্গরসের মাত্রাও ক্রমেই বেড়ে যায়। হোঃ হোঃ করে কেউ হেসে উঠলেই জন্তু জানোয়ারের ডাক ডেকে তাকে বাধা দেওয়া হয়। যাদুঘরের কর্মচারীটির মাথায় তখন পারির রাস্তার হকারের ডাক নকল করার খেয়াল জাগে। শব্দটির সঙ্গে কামার্ত হলো বেড়ালের মাও মাও ডাকের সাদৃশ্য ছিল।

এই শব্দটি করার সঙ্গে সঙ্গে আটটি কণ্ঠস্বর একসাথে বলে ওঠে:

'ছুরি শাণ দেবে।'

'পাখীর ছানা চাই।'

'ননীর মুকুট চাই মায়েরা—ননীর মুকুট!'

'বাসন ঝালাই করবে বাসন!'

'সবাই চড়েছে! সবাই উঠেছে! সমুদ্রে বেড়াতে যাবে!'
'বউ বুড়িয়ে গেছে! জামা কাপড় খুয়ে গেছে!'
'পুরনো পোশাক, পুরনো লেশ, পুরনো টুপি বেচবে!'
'শেরি! মিঠে শেরি চাই!'

কিন্তু মিহি নাকী স্বরে বিয়াশঁ যেভাবে 'ছাতিওলা' বলে হাঁক দেয় সেই হাঁকই সব ডাকের সেরা।

কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই বুনো জানোয়ারের অদ্ভুত চেঁচামেচির মত কানে তালা লাগা হট্টগোলে ঘর ভরে যায়। এ যেন খাঁটি বেড়ালের জলসা আর ভোতর্যাঁ যেন এই জলসার পরিচালক। সে যেন অরকেস্ট্রা পরিচালনা করছে আর সঙ্গে সঙ্গে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লক্ষ্য করছে ওজেন আর গোরিওকে। ওরা দুজনেই ইতিমধ্যে নেশায় বেসামাল হয়ে পড়েছে। চেয়ারে ঠেস দিয়ে বসে আছে দুজনে; মাঝে মাঝে একটু একটু মদ খাচ্ছে আর গম্ভীর ভাবে লক্ষ্য করছে সামনের এই অদ্ভুত হট্টগোলের দৃশ্য। দুজনেই মনে মনে ভাবছে সন্ধ্যাবেলার কথা। তবু বেশ বুঝতে পারছে যে এখান থেকে উঠে যাওয়া অসম্ভব। ভোতর্যাঁ তাদের চোখের ভাব লক্ষ্য করে যাচ্ছে এবং যে মুহূর্তে গোটা কয়েক টিপ মেরে চোখের পাতা বুজেছে বলে মনে হয়েছে তখনই রাস্তিঞাকের দিকে ঝুঁকে তার কানে কানে বলেছে: পাপা ভোতর্যাঁর উপর টেক্কা দেবার মত পাখা এখনো হয়নি, বুঝলে ছোকরা! পাপা ভোতর্যাঁ তোমায় এত ভালবাসে যে তোমাকে সেধে বোকা হতে দিতে চায় না। একটা কাজ যখন করব বলে মনে মনে স্থির করেছি, তখন একমাত্র ভগবানই তাতে বাধা সৃষ্টি করতে পারেন। আহা! ভেবেছিলাম আজ সন্ধ্যায় গিয়ে বুড়ো তাইফেরকে সাবধান করে দিয়ে আসব! ভাবিনি? স্কুলের ছেলের ফাঁকি দেবার মত সহজ কাজ এ নয়! উনোন তেতে গেছে, ময়দাও মাখা হয়েছে, রুটি এখন রুটিওলার ছাঁচে। কাল আমরা রুটি খাব আর বাজে টুকরো ফেলে দেব। চুল্লীতে সেই রুটি সেঁকায় বাধা দেওয়া উচিত হবে কি? না না, ও সেঁকায় বাধা দিতে পারবে না। এখনও যদি দু' চারটে বিবেকের দংশন থাকে তো রুটির সঙ্গে কালকেই তা হজম হয়ে যাবে। আমরা যখন বিশ্রাম করব সেই সময় কর্ণেল কঁৎ ফ্রাঁশেজিনির তরোয়ালের ডগা মিশেল তাইফেরের উত্তরাধিকার আমাদের হাতে তুলে দেবে। ভাই'র উত্তরাধিকারিণী হিসাবে ভিকতরিন বছরে ষোল হাজার ফ্রাঁ পাবে। ইতিমধ্যেই

আমি খোঁজ নিয়ে রেখেছি, জানি, তার মায়ের সম্পত্তির দাম কমপক্ষে তিন লাখ ফ্রাঁ!

সব কাথাই শোনে ওজেন, কিন্তু জবাব করার ক্ষমতা ছিল না। তার মনে হচ্ছিল যেন জিভটা তালুতে আটকে গেছে আর দুনির্বার একটা ঝিমু ঝিমু ভাব তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলছে। ইতিমধ্যেই তার চোখের সামনে টেবিল আর অভ্যাগতেরা উজ্জ্বল কুজ্ঝটিকার মধ্যে পাক খাচ্ছে যেন। ইদানীং সোরগোল কতকটা কমেছে। একে একে ভাড়টেরা উঠে যায়। মাদাম ভোকে, মাদাম কুত্যুর, মাদমোয়াজেল ভিকতরিন, ভোতর‍্যাঁ আর বুড়ো গোরিও যখন ঘরে ছিল সেই সময় যেন স্বপ্নের মধ্যেই রাস্তিঞাক দেখতে পায় যে প্রতিটি বোতলের তলানি দিয়ে মাদাম ভোকে একটি বোতল ভরতি করছেন।

—আহা! কত উচ্ছল প্রাণ এদের! যৌবন কি মধুর! বিধবা বলে ওঠেন।

এই কয়টি শেষ কথাই তার মাথায় ঢোকে। তারপর সব শূন্য।

—মঁশিয় ভোতর‍্যাঁর মত অমন জমাতে আর কেউ পারে না। সিলভি বলে।

—ক্রিস্তফের দিকে একবার চেয়ে দেখুন না, কেমন কুঁজ বার করে অঘোরে নাক ডাকাচ্ছে।

—তাহলে আসি মা! ভোতর‍্যাঁ বলে।—'ল ম সেভাজ' নাটকে মঁশিয় মার্তির অভিনয় দেখবার জন্য আজ আমি থিয়েটারে যাব। 'ল সলিতের থেকে চমৎকার নাটক করেছে। আপনি যদি যেতে চান তো নিয়ে যেতে পারি।

—আর এই মহিলাদেরও নিয়ে যেতে পারি।

—ধন্যবাদ, অস্বীকার আমায় করতেই হবে। মাদাম কুত্যুর বলেন।

—কি বললেন? মাদাম ভোকে বলে ওঠেন।—আতালা দ শাতোব্রিয়ঁার ল সলিতের থেকে নেওয়া নাটক দেখতে আপনি অস্বীকার করলেন? বইখানা পড়তেই তো কত ভাল লেগেছে! বইটি এত করুণ যে পড়তে পড়তে গত গ্রীষ্মকালেও তো আমরা লাইন গাছের তলায় মাগদালেনদের মত চোখের জল ফেলেছি। তাছাড়া বইখানার মধ্যে এমন সব নীতিকথা আছে যা আপনার ঐ তরুণীর চরিত্রের উন্নতি করতে পারে।

—অভিনয় দেখতে যাবার নিষেধ আছে আমাদের। ভিকতরিন বলে।

—চেয়ে দেখুন, এই দুজন তো এর মধ্যেই আমাদের ছেড়ে গেছে! তেরচা ভাবে মাথা নেড়ে ইশারায় ওজেন আর গোরিওকে দেখিয়ে বলে ভোতর‍্যাঁ।

আবারও ছাত্রটির মাথা চেয়ারের পিঠে ঠিক করে দিয়ে তার কপালে চুমু খায় ভোতর‍্যাঁ। তারপর ঘুমপাড়ানি গান গাইতে শুরু করে :

বাছা আমার, সোনা আমার ঘুমোও অঘোরে,
শিয়রেতে রইব আমি, কে নেবে ঘুম কেড়ে?

—আমার ভয় হচ্ছে হয়ত অসুস্থ হয়ে পড়েছে! ভিক্তরিন বলে।

—তাহলে এখানে বসে একটু দেখাশোনা কর! ভোতর‍্যাঁ বলে। তারপর কানে কানে বলে, পতিব্রতা স্ত্রী হিসাবে সেই তো তোমার কর্তব্য। ছেলেটা তোমায় পূজো করে। কোন ভাবনা নেই, তুমিই স্ত্রী হবে—সৌভাগ্যবতী হতে পারবে। তারপর আবার চড়া গলায় বলে, এক কথায়, গোটা দেশের লোক শ্রদ্ধা করবে, আর বহুদিন সুখে-শান্তিতে ঘর সংসারও করতে পারবে, ছেলে পিলেও হবে অনেকগুলি! এই ভাবেই তো সব প্রেমের পালা শেষ হয়। এর পর মাদাম ভোকের দিকে ফিরে আদর করে তার কোমরে হাত দিয়ে বলে, চলুন মা, আপনার টুপিটা, ফুলতোলা পোশাকটা আর কঁতেসের স্কার্ফখানা পরে নিন! আমি একটা গাড়ি ডেকে আনছি। ভয় নেই, সব খরচ আমার!

আবারও গান গাইতে গাইতে বেরিয়ে যায় ভোতর‍্যাঁ :

রবি, ওগো রবি!
কি মহিমাময় তোমার কিরণধারা!
পুড়ে যায়, ঝলসে যায় লাউয়ের ডগা······

—হা ভগবান! আপনাকে বলেছি মাদাম কুত্যুর, ওই লোকটাকে নিয়ে আমি চিলে কোঠাতেও সুখে থাকতে পারতাম! আর এর দিকে চেয়ে দেখুন! সেমুই ব্যবসায়ীর দিকে ফিরে বলেন, দেখুন বুড়ো গোরিও কেমন অসাড় হয়ে গেছে! আমায় নিয়ে কোথাও যাবার কথা একদিনও ওর মাথায় এল না। কিপটে বুড়ো কাঁহাকার! ভগবানের নামে হলপ করে বলতে পারি, এখুনি হুমড়ি খেয়ে মেজেয় পড়ে যাবে। ওর মত বুড়ো বয়সে এমন বুদ্ধিভ্রংশ হওয়া জঘন্য ইতরামি। আপনি হয়ত বলতে পারেন, বুদ্ধি থাকলে তো সে কথা ওঠে। এই সিলভি, ওকে ধরে ওর নিজের ঘরে রেখে আয় তো!

বগলে হাত দিয়ে বৃদ্ধকে তুলে ধরে সিলভি। তারপর হাঁটিয়ে উপরে নিয়ে গিয়ে যেমনটি ছিল সেইভাবেই পার্সেলের মত আড়াআড়িভাবে বিছানায় শুইয়ে দেয়।

ওজেনের কপাল থেকে এক গোছা চুল সরিয়ে দিয়ে মাদাম কুত্যুর বলেন, বেচারা! ছেলেটা দেখতে ঠিক মেয়ের মত। লাম্পট্যের কুফল যে কি তা আজও জানে না।

মাদাম ভোকে বলেন, একটা কথা আপনাকে বলতে পারি, একত্রিশ বছর আমি এই বোর্ডিং চালাচ্ছি, বহু ছেলে চলে গেছে আমার হাত দিয়ে, কিন্তু মঁশিয় ওজেনের মত আসল অভিজাত চেহারার সুন্দর ছেলে আমার চোখে পড়েনি। ঘুমের মধ্যেও কেমন সুন্দর দেখাচ্ছে দেখুন! ওর মাথাটা আপনার কাঁধের উপর রাখুন মাদাম কুত্যুর। ঐ দেখুন মাদামোয়াজেল ভিক্তরিনের দিকে গড়িয়ে যাচ্ছে! তরুণ-তরুণীদের নিয়তি আলাদা। আর একটু হলেই মাথাটা চেয়ারের কাঠে ঠোক্কর খাবে। ওদের দুটিকে কিন্তু চমৎকার মানাবে

—আস্তে, মাদাম আস্তে! মাদাম কুত্যুর বলে ওঠেন। কি যে বলছেন···

—দূর! ভেবে হয়েছে কি? ওতো আর শুনতে পাচ্ছে না! মাদাম ভোকে বলেন।—চল সিলভি, চল, আমায় পোশকটা পরিয়ে দিবি। সেরা কাঁচুলিটা পরব আজ।

—বলেন কি! ডিনারের পর কাঁচুলি পরবেন! সিলভি বলে। আমায় দিয়ে হবে না, তার চাইতে বরং আর কাউকে ডেকে নিন। আমি আপনার খুনী হতে পারব না। এ মারাত্মক নির্বুদ্ধিতা, আর তাতে আপনার মৃত্যুও হতে পারে।

—ও আমি পরোয়া করি না। মঁশিয় ভোতর‍্যার ইজ্জত আমি রাখবই।

—আপনার উত্তরাধিকারীদের উপরেও অত মমতা আছে কি?

—তর্ক করবিনে সিলভি, চলে আয়! ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে বলেন মাদাম ভোকে।

—এই বয়সেও এত! আঙুল দিয়ে ইশারায় গিন্নীকে দেখিয়ে ভিক্তরিনের দিকে চেয়ে বলে পাচিকা।

মাদাম কুত্যুর, ভিকতরিন আর ওজেন ছাড়া তখন কেউ খাবার ঘরে রইল না। ভিকতরিনের কাঁধে মাথা রেখে তখনও অঘোরে ঘুমোচ্ছে ওজেন। ক্রিস্তফের নাকডাকানির প্রতিধ্বনির সঙ্গে তুলনা করলে ওজেনের নীরব ঘুম আরও গাঢ় বলে মনে হয়। শিশুর মত অঘোরে ঘুমোচ্ছে ছাত্রটি। অসঙ্কোচে এই ধরনের মমতামাখা সেবা করতে পেরে সুখীই হয়েছে ভিকতরিন।

(১) ম্যাগদালেন: সংশোধিত চরিত্রের বারবনিতা।

এই সব সেবার মধ্য দিয়েই মেয়েদের উদ্বেল হৃদয় প্রকাশের পথ পায়। তাছাড়া এই উপলক্ষে সহজ সরলভাবে ওজেন তার এত কাছাকাছি এসে পড়ে যে ভিক্তরিন তার হৃদয়ের স্পন্দন পর্যন্ত অনুভব করতে পারছে। মায়ের মত মমতা আর গরব ফুটে বেরিয়েছে তার মুখে। তাই আরও সুন্দর লাগছে মুখখানা। তার নিষ্কলঙ্ক কচি মনে অগণিত চিন্তা এসে ভীড় করছে, তার মধ্যেও সে স্পষ্ট অনুভব করছে যে বিচ্ছিরিভাবে শোয়ানো এই তরুণ দেহের উষ্ণ স্পর্শে তার নাড়ী যেন বেশ কিছুটা চঞ্চল হয়ে পড়েছে।

—হারে হতভাগী! তার হাতে চাপ দিয়ে মাদাম কুত্যুর বলেন।

সরাসরি তার মুখের দিকে তাকান মাদাম কুত্যুর। বেদনার ছাপ ছিল সে মুখে; কিন্তু এখন যেন তার উপর সুখের ঈষৎ আভা পড়েছে। মনে হয় যেন একটা আলোর ছটা তার মাথা বেষ্টন করে রেখেছে। ভিকতরিনের চেহারার মধ্যে মধ্যযুগের চিত্রকরের আঁকা ভূষণবর্জিত সরল বালিকার ছবির আদল আসে। চিত্তাকর্ষক কোন ব্যঞ্জনাই ছিল না এই ছবিতে। তবু গর্বোন্নত মুখের প্রশান্তির মধ্যে চিত্রকরের তুলির যাদু ফুটে বেরোয়। স্বর্গের সোনালী আলোর ছটা যেন সেই বিবর্ণ মুখ উদ্ভাসিত করেছে।

—কিন্তু ও তো মাত্র দু' গ্লাসের বেশী খায়নি মা! ওজেনের চুলের মধ্যে আঙুল চালিয়ে দিয়ে বলে ভিকতরিন।

—ও যদি বখাটে ছেলে হত তো আর সকলের মত মদ খেয়ে সহ্য করতে পারত। বেসামাল যে হয়ে পড়েছে এইটেই তো ওর স্বপক্ষে যায়।

রাস্তা থেকে এই সময় গাড়ির চাকার শব্দ কানে আসে।

মেয়েটি বলে, ঐ মঁশিয় ভোতর্যাঁ এলেন! এইবার মঁশিয় ওজেনকে তুমি নাও মা! আমি চাই না যে লোকটা এভাবে আমায় দেখতে পাক। এমন সব কথা উনি বলেন যাতে মনে দাগ কেটে যায়। আর ওর চোখের দিকে তাকালেই মনে হয় যেন কোন কথা ওর অজানা নেই।

—না না, ভুল ধারণা করেছিস্! মাদাম কুত্যুর বলেন।—চমৎকার লোক! কতকটা আমার কর্তা মঁশিয় কুত্যুরের মত। আচরণটা কেমন যেন বেখাপ্পা, তাহলেও দয়ামায়া আছে। কামড়ের চাইতে ওর হাঁকডাকের দাপট বেশী।

মাদাম কুত্যুর কথা বলবার সময়ে নিঃশব্দে ঘরে ঢুকে তরুণ-তরুণীর যুগল ছবির দিকে তাকায় ভোতর্যাঁ। প্রদীপের আলোটাও যেন এই ছবিতে ঈষৎ একটু আভা ফেলেছে।

ভোতর্‌ঁ্যা তখন হাত জোড়া করে বলে, এই দৃশ্য দেখলে পল এ ভার্জিনির লেখক বের্ণাদাঁ্যা দ স্যঁা-পিয়ের ভাল ভাল আরও দুচার পাতা লেখার প্রেরণা পেতেন, বুঝলে হে! যৌবনটা বড় মধুর মাদাম কুত্যুর! আহা বেচারি, ঘুমোও—ঘুমোও! ওজেনের দিকে ফিরে বলে।—ঘুমন্ত অবস্থাতেই অনেক সময় বরাত ফিরে যায়। এই যুবকের উপর আমার কিছুটা মায়া পড়েছে মাদাম। দেখুন তো, ওকে পরীর কাঁধে ভরকরা দেবকুমারের মত দেখাচ্ছে না? এমন মানুষকে ভালবেসেও সুখ আছে। আমি যদি মেয়ে হতাম তো ওকে পাবার জন্য প্রাণপণ করতাম। তা সেটা খুব মুর্খ্যোমি হত না। ওদের দুজনকে এইভাবে দেখে আমার কি মনে হয় জানেন মাদাম? নীচু হয়ে চাপা গলায় বিধবাকে বলে, মনে হয় যেন একজনের জন্যই বিধাতা অপরকে সৃষ্টি করেছেন। তারপর জোরে জোরে বলে, ভগবানের কাজের পদ্ধতি রহস্যময়। মানুষের অন্তর তিনি তন্ন তন্ন করে দেখেন আর তার আকর্ষণের সূত্রও খোঁজ করেন। তোমাদের মত সরল নিষ্পাপ দুটি ছেলে-মেয়েকে যখন একসাথে দেখি, তখন বুঝতে পারি যে মানব হৃদয়ের সমস্ত অনুরাগের বাঁধনে তোমরা পরস্পরের সঙ্গে বাঁধা, তখন নিজের মনে মনে বলি, ভবিষ্যতে কোনদিন তোমাদের বিচ্ছেদ ঘটা অসম্ভব। ভগবান ন্যায় বিচার করেন! তারপর ভিক্‌তরিনের দিকে ফিরে বলে, আমার মনে পড়ছে যেন তোমার হাতে একটা সৌভাগ্যের রেখা দেখেছিলাম। হাতখানা দেখাও তো মাদমোয়াজেল ভিকতরিন। হাত দেখতে কিছু কিছু জানি হে! অনেককে ঠিক ঠিক বলে দিয়েছি। এস তো, তোমার হাতখানা দেখি একবার। আরে, ভয় পাবার কি আছে? সেকি হে, এ কি দেখছি! হলপ করে বলতে পারি, অচিরেই তুমি পারির অন্যতম শ্রেষ্ঠ ধনীর উত্তরাধিকারিনী হবে। যে পুরুষ তোমায় ভালবাসবে তাঁকে সুখী করার জন্য তোমার চেষ্টার অন্ত থাকবে না। তোমার বাবা তোমায় ডেকে নেবেন। সম্ভ্রান্ত ঘরের উপাধিওলা এক সুদর্শন যুবকের সঙ্গে বিয়ে হবে তোমার। ছেলেটি তোমায় পূজা করবে।

এই সময় ছেনাল বিধবার নীচে নামার দুপ দুপ শব্দ ভোতর্‌ঁ্যার ভাগ্য গণনায় বাধা সৃষ্টি করে।

—আরে! এই যে ভোকে মা এসে গেছেন! বাঃ, একেবারে ক্রীসমাস্‌ গাছের মত সেজেগুজে এসেছেন যে! অবিকল তারকার মত! মহিলাটির

কাঁচুলির যে জায়গাটা বড্ড বেশী আঁটসাঁট হয়েছে সেখানে হাত দিয়ে বলে, এখানটা একটু বেশী আঁটসাঁট লাগছে না মা? সামনের দিকটা তো ভালভাবেই যতটা সম্ভব চেপে দেওয়া হয়েছে। যদি একটুও টান লাগে তো বিস্ফোরণ অনিবার্য। আমি তাহলে প্রত্নতাত্ত্বিকের মত সযত্নে টুকরো কুড়োবো।

বিধবা তখন নীচু হয়ে মাদাম কুত্যুরের কানে কানে বলেন, লোকটা ফরাসী বীরের ভাষায় কথা বলতে জানে বটে!

—আচ্ছা, তাহলে আসি ছেলে! আসি মেয়ে! ওজেন ও ভিকতরিনের দিকে ফিরে বলে ভোতর্‍্যাঁ।—তাদের মাথার উপর হাত রেখে বলে, আশীর্বাদ করে যাচ্ছি তোমাদের! বিশ্বাস করুন মাদমোয়াজেল, সজ্জনের প্রার্থনা ব্যর্থ হয় না। সে প্রার্থনা সুফল দিতে বাধ্য। ভগবান এ প্রার্থনা শোনেন।

—আচ্ছা, তাহলে আসি সখি। ভাড়াটেকে লক্ষ করে বলেন মাদাম ভোকে। তারপর কানে কানে জিজ্ঞাসা করেন, আমার সম্পর্কে মঁশিয় ভোতর্‍্যাঁর কোন কুমতলব আছে বলে মনে হয় কি?

—রক্ষে করুন! ও আমি বুঝি না!

ওরা চলে গেলে মহিলা দুটি যখন একলা ছিল সেই সময় নিজের করতল পরীক্ষা করে দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে ভিকতরিন বলে, আচ্ছা মা, মঁশিয় ভোতর্‍্যাঁ যা বললেন, ধরুন, তা যদি সত্যি হয়?

—তা এমন অসম্ভবই বা কি, একটি ঘটনা ঘটলেই সব কিছু হ'তে পারে। প্রবীণা বলেন।—ধর, তোমার ঐ জানোয়ার ভাইটা যদি ঘোড়া থেকে পড়ে যায় তাহলেই······

—কি বলছেন মা?

—সে কি গো! তোমার শত্রুর অমঙ্গল কামনা করা বুঝি পাপ! বিধবা বলে যান।—তা বেশ তো, প্রয়োজন হয় তার জন্য প্রায়শ্চিত্ত করব। তাহলেও একথা খুবই সত্যি যে সানন্দে আমি তার কবরে ফুলের তোড়া দিয়ে আসব। অমন পাষাণ-হৃদয় মানুষ আর দুটি আছে না কি? এত ভীরু যে নিজের মায়ের পক্ষ নিয়ে কথা বলতে সাহস করে না! তোমার মা যে সম্পত্তি রেখে গেছেন চালাকি করে তার ন্যায্য অংশ থেকে তোমায় সে বঞ্চিত করছে! আমার এক বোনের ভাল সম্পত্তি ছিল। তোমার দুর্ভাগ্য যে সঙ্গে করে যেটুকু সম্পদ সে নিয়ে আসতে পেরেছে তার পরিমাণ লোকে যা বলে অতটা নয়।

—অপর কোন লোকের জীবনের বিনিময়ে যদি আমায় বড়লোক হতে হয় তো সে বড়লোক আমি হতে চাই না। ভিকতরিন বলে।—আমাকে সুখী করার জন্য যদি ভাইকে মরতে হয়, তাহলে তার চাইতে বরং আজীবন আমি এখানেই থাকব।

—ঐ মশিয়ঁ ভোতর‍্যাঁ যা বললেন তা-ই ঠিক—একমাত্র ভগবানই জানেন কি হবে। মাদাম কুত্যুর বলেন।—তবে উনি যে আর সকলের মত অতটা নাস্তিক নন, এ দেখে ভারি খুশি হলাম। শয়তানকে যতটা শ্রদ্ধা লোকে করে, ভগবানকে ততটুকুও করতে চায় না। হ্যাঁ, সত্যিই তো, ঠিক বলছেন উনি। কি ভাবে আমাদের রাখলে ভগবান খুশি হবেন, কে বলতে পারে বল ?

সিলভির সাহায্য নিয়ে স্ত্রীলোক দুটি শেষ অবধি ধরাধরি করে ওজেনকে তার ঘরে নিয়ে গিয়ে বিছানায় শুইয়ে দেয়। খানিকটা আরাম দেবার জন্য তার পোশাক খানিকটা ঢিলা করে দেয় সিলভি। ঘর থেকে বেরিয়ে আসবার আগে অভিভাবিকা পেছন ফিরেছে দেখেন যে ওজেনর কপালে চুরি করে চুমু খেল ভিকতরিন। এই গোপন পাপে যতটুকু তৃপ্তি পাওয়া সম্ভব পুরোমাত্রায় সেটুকু অনুভব করে মেয়েটি। তারপর সেদিনের হাজারো আনন্দের কথা সুসংহত করে ঘরের চারিদিকে চায় এবং স্মৃতি দিয়ে যে ছবি আঁকা সম্ভব মনে মনে বহুক্ষণ সেই ছবির কথা চিন্তা করে সে ঘুমিয়ে পড়ে। সারা পারি শহরে সে দিন ভিক্তরিনের চাইতে খুশি কেউ ছিল না।

সেদিন হাসি-তামাসার আড়ালে ওজেন আর গোরিওকে ওষুধ মেশান মদ খাইয়ে নিজের সর্বনাশ ডেকে আনল ভোতর‍্যাঁ। এই ভুল তার জীবনের চরম বিপর্যয়ের কারণ হয়ে দাঁড়াল। নেশার ঘোরে চীট-ডেথ্ সম্পর্কে মদমোয়াজেল মিশনোকে প্রশ্ন করতে ভুলে যায় বিয়াশঁ। একবার এই নাম কিংবা তার আসল নাম জাক কোলাঁর কথা উঠলেই ভোতর‍্যাঁ হুঁশিয়ার হতে পারত। কারণ, আসলে সে তো সেই প্রসিদ্ধ কয়েদী! কোলাঁর উদারতা লক্ষ্য করেছেন মাদমোয়াজেল মিশনো। একবার ভেবেছিলেন যে এই ষড়যন্ত্রের কথা জানিয়ে তাকে রাত্রে পালাবার সুযোগ করে দিলে হয়ত বেশী লাভ হতে পারে। কিন্তু পের লাসেজের ভেনাসের সঙ্গে তাকে তুলনা করে উপহাস করার পর তিনি এই দুর্বৃত্তকে ধরিয়ে দেবার সিদ্ধান্ত করেন। পোয়ারেকে সঙ্গে নিয়ে গোয়েন্দার বড় কর্তার খোঁজে তিনি পেতি রুয় স্যাঁৎ-আনের দিকে

রওনা হন। তখনও তার ধারণা যে তিনি গঁতুরো নামে উচ্চপদস্থ এক কর্মচারীর সঙ্গে কথা চালাচ্ছেন। স্বনামখ্যাত লোকটি অতি ভদ্রভাবে তাকে অভ্যর্থনা করে। কিছুক্ষণ তাদের আলাপ হয়। ঠিক কোন পদ্ধতিতে মাদমোয়াজেল মিশনো ভোতর‍্যাঁর ঘাড়ের মারাত্মক ছাপটা বার করতে পারবেন তাও স্থির করা হয়। তারপরে তিনি ওষুধটা চান। এই কথা শুনে গোয়েন্দাটি এমন প্রসন্নভাবে পেছন ফিরে ডেসকের দেরাজ থেকে ওষুধের শিশিটা বার করেন যে মাদমোয়াজেলের সন্দেহ হয়, শুধু পালাতক কয়েদীর গ্রেপ্তার ছাড়াও এই ব্যাপারের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ আরও কিছু জড়িত আছে। এই গোপন রহস্য বুঝবার জন্য তিনি বহু চিন্তা করেন। শেষ অবধি অনুমান করেন যে বিশ্বাসঘাতক কয়েদীরা হয়ত সংবাদ দিয়েছে এবং সেই সংবাদ অনুযায়ী ঠিক মত সময়ে হাজির হয়ে পুলিশ হয়ত বেশ কিছু মোটা টাকা আত্মসাৎ করতে চায়। সন্দেহের আভাস দিতেই পেতি রুয় স্যাঁং আনের ধূর্ত শেয়ালটি হাসতে শুরু করেন। মহিলাটি যাতে এই গন্ধ টের না পান তার জন্যও তিনি চেষ্টার ত্রুটি করলেন না।

বললেন, আপনি ভুল করছেন। দুর্বৃত্তদের মধ্যে কোল্যাঁর মত সর্বনাশা প্রভাবশালী সর্বন বিরল। তাই এতটা আগ্রহ পাজী ব্যাটারা একথা জানে। বলেই তার পতাকাতলে এরা জোট বাঁধে। কোল্যাঁই এদের সমর্থক এবং শেষ নির্ভর। একরকম ওদের 'নাপলেয়ঁ'। সবাই ওর অনুরক্ত। ভাঁড় কখনও প্লাস দ গ্রেভে তার এঁশ ছেড়ে যায় না।

মাদমোয়াজেল মিশনো খানিকটা বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছেন দেখে 'সর্বন' 'আরএঁশ' এই ইতর কথাদুটির ব্যাখ্যা শোনায় গঁতুরো। চোর-বদমায়েসের পরিভাষায় বেশ জোরালো শব্দ এদুটি। নিজের প্রয়োজনে মানুষের মাথার দুটো রূপ বোঝাবার জন্য শব্দ দুটি উদ্ভাবন করেছে এরা। 'সর্বন' শব্দের অর্থ জ্যান্ত মানুষের মাথা—তার মস্তিষ্ক—তার পরামর্শদান ও পরিচালনার ক্ষমতা। আর এঁশ শব্দটির ব্যবহৃত হয় অবজ্ঞেয় অর্থে। এর মানে জহ্লাদের হাতে নিহত মানুষের ছিন্নমুণ্ড।

তারপর গোয়েন্দাটি বলে যান, কোল্যাঁ আমাদের সবাইকে বোকা বানায়। ওদের মত লোকদের সঙ্গে মোকাবিলা করার সময় আমাদের দশা পোক্ত ইস্পাতের ডাণ্ডার মত। একটি মাত্র কাজ আমরা পারি। গ্রেপ্তার করার সময় ওরা যদি বিন্দুমাত্র প্রতিরোধ করে তো অনায়াসে আমরা ওদের খুন করে

ফেলতে পারি। কাল সকালে কোলাঁকে খুন করার মত গোটা কয়েক অছিলা পাব বলে আশা করছি। তাতে বিচারের ঝামেলা থেকে বাঁচা যাবে আর অমন একটা দুর্বৃত্তকে খাইয়ে পাহারা দিয়ে পোষার হাত থেকেও সমাজ রক্ষা পাবে। আইনের দিক থেকে অমন একটা দুর্বৃত্তকে শায়েস্তা করতে অনেক ব্যয়, অনেক আমলাতান্ত্রিক ঝামেলা করতে হয়। তিন হাজার ফ্রাঁ আপনাকে দেওয়া হবে; কিন্তু মামলা চালাতে গিয়ে সাক্ষী ডাকা, তাদের ক্ষতিপূরণ দেওয়া, শাস্তি কার্যকরী করা প্রভৃতি ঝঞ্ঝাটে তার চাইতে অনেক বেশী ব্যয় হয়ে যাবে। তাছাড়া অনেকটা সময়ও বাঁচান যায়। টীট-ডেথের ভুঁড়ির মধ্যে কীরিচ দিয়ে ভালমত একটা খোঁচা যদি মারা যায় তো শ'খানেক অপরাধ বন্ধ করা যায় আর এই দৃষ্টান্ত থেকে পঞ্চাশটা গুণ্ডা হয়ত ভয় পেয়ে আদালতের বাইরে থাকার চেষ্টা করবে। এই তো পুলিশের আসল কাজ। সাচ্চা মানুষ দরদীরা স্বীকার করবেন যে এইভাবে কাজ করে আমরা বহু অপরাধের অনুষ্ঠান রোধ করি।

—তাতে দেশেরও সেবা করা হয়! পোয়ারে বলে।

—আরে! আজ যে আপনি ভাল ভাল কথা বলছেন বড়! গোয়েন্দাটি বলেন।—হাঁ, নিশ্চয়! নিশ্চয় আমরা দেশসেবা করছি। সাধারণ লোকের চলতি ধারণায় আমাদের সম্পর্কে অত্যন্ত অবিচার করা হয়। সমাজের বহু উপকার করছি আমরা, অথচ তার কোন স্বীকৃতি মেলে না। উপরে ওঠার চেষ্টা করা আর কুসংস্কার সম্পর্কে উদাসীন হওয়া শ্রেষ্ঠ মানুষের কর্তব্য। আর প্রচলিত ধ্যান-ধারণা অনুযায়ী যদি কোন ভাল কাজ করা না হয়, এবং সে কাজ করতে গিয়ে একটু আধটু অন্যায় করা যদি অপরিহার্য হয়ে পড়ে তো সাচ্চা খ্রীষ্টানকে সেটুকু মেনে নিতেই হবে। পারি পারি, বুঝলেন? আত্মপক্ষ সমর্থনে এইটুকুই আমার বক্তব্য। এখন আপনার কাছ থেকে বিদায় নিতে হবে মাদমোয়াজেল। কাল আমার লোকজন নিয়ে জারদাঁ্যা দ্যু রোয়ায় থাকব। রুয় দ ব্যুফঁর যে বাড়ীতে আমি থাকতাম, ক্রিস্তফকে সেইখানে পাঠিয়ে দেবেন। বলবেন, সে যেন মঁশিয় গঁন্দুরোর খোঁজ করে। আপনার কাছে আমি কৃতজ্ঞ মঁশিয়। কোনদিন যদি আপনার কিছু চুরি যায় তো আমার কাছে আসেন যেন। হারানো জিনিস বার করার জন্য যথাসাধ্য করব নিশ্চয়। আপনাদের সেবা করাই আমার কাজ স্যর!

পোয়ারে তখন মাদমোয়াজেল মিশনোকে বলে, একদল লোক আছে যারা

পুলিশের নাম শুনলেই কাঁদতে থাকে। কি রকম বিশিষ্ট ভদ্দরলোক দেখলে তো! আর যা করতে বললেন তা তো অ-আ-ক-খ'র মত সহজ।

*   *   *   *

এর পরের দিনটি মেজঁ ভোকের ইতিহাসে চিরস্মরণীয়। এর আগে এই বোর্ডিংএর নির্ঝঞ্ঝাট জীবনে ভুয়া কঁতেস দ আবেরমেনির ধূমকেতুর মত আকস্মিক অন্তর্ধানই সেরা চাঞ্চল্যকর ঘটনা বলে গণ্য হত। কিন্তু এই স্মরণীয় দিনের বিপর্যয়ের সামনে আর সব কিছুই নিষ্প্রভ হয়ে যায়। মেজঁ ভোকের অস্তিত্বের শেষ দিন পর্যন্ত আলোচনা চলছে এই দিনের ঘটনা নিয়ে।

প্রথমত, গোরিও আর ওজেন সেদিন বেলা এগারটা অবধি ঘুমোয়। 'গেতে' থেকে রাত দুপুরে ফিরে অসুস্থ মাদাম ভোকে পরদিন সাড়ে দশটা অবধি বিছানায় পড়ে থাকলেন। গৃহস্থালীর কাজকর্মও পড়ে থাকে। কারণ ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে ভোতর্যাঁর দেওয়া মদের বোতলের নেশা কাটায় ক্রিস্তফ। প্রাতরাশের বিলম্বের জন্য পোয়ারে বা মাদমোয়াজেল মিশনোর কোন অনুযোগের কারণ ছিল না। ভিকতরিন আর মাদাম কুতুরও সেদিন খানিকটা বেশী ঘুমোন। সকাল আটটায় বেরিয়ে যায় ভোতর্যাঁ—ফেরে ঠিক প্রাতরাশ দেবার আগে। কাজেই সিলভি আর ক্রিস্তফ বেলা সাড়ে এগারটার সময় যখন ভাড়াটেদের দরজায় দরজায় টোকা মেরে প্রাতরাশের সংবাদ জানায়, কেউ কোন অনুযোগ করল না।

মাদমোয়াজেল মিশনোই সবার আগে নীচে নামেন। অন্যান্য কাপের সঙ্গে ভোতর্যাঁর কাপেও কফির দুধ গরম হচ্ছিল। সিলভি ও চাকরটির অনুপস্থিতির সুযোগে ভোতর্যাঁর কাপের মধ্যে সবটুকু ওষুধ ঢেলে দেন মাদমোয়াজেল মিশনো। মেজঁ ভোকের এই বিশেষ রীতির সুযোগ নিয়েই কার্যসিদ্ধি করবার মতলব এঁটেছিলেন আইবুড়ো বৃদ্ধা।

অবশেষে অনেক কষ্টে সাতজন ভাড়াটে খাবার ঘরে জমায়েৎ হয়। হাইতুলে আড়মোড়া ভেঙে ওজেনই সবার শেষে আসে। নীচে আসতেই মাদাম দ নুস্যাঁজার এক চাকর তার হাতে একখানা চিঠি দেয়। চিঠিতে মাদাম লিখেছেন:

তোমায় সম্পর্কে আমি কোন মিথ্যা গর্ব বা ক্ষোভ পোষণ করি না সখা। তোমার জন্য রাত দুটো অবধি অপেক্ষা করেছি—অপেক্ষা করেছি যাকে ভালবাসি তার জন্য। এ যন্ত্রণা এত দুঃসহ যে ভুক্তভোগী কোনদিন অপরকে

এত কষ্ট দিতে পারে না। বেশ বোঝা যাচ্ছে, আগে কোনদিন তুমি প্রেমে পড়নি। কি এমন ঘটতে পারে যে এলে না! দুশ্চিন্তা আমায় গ্রাস করছে। অন্তরের গোপন রহস্য ফাঁস করতে যদি ভয় না পেতাম তো নিজে এসে দেখে যেতাম যে কোন সৌভাগ্য বা কোন বিপদের জন্য তুমি আটকা পড়লে! কিন্তু ঐ সময়ে কি করে যাই বলো? সর্বনাশ হয়ে যেত না তাতে? মর্মে মর্মে এখন বুঝছি যে স্ত্রীলোক হওয়া কি দুর্ভাগ্য। গোটাকয়েক আশার কথা শুনিও। আর বাবার কথা শোনার পরেও কেন আসতে পারলে না তাও জানিও। তোমার উপর রাগ করব, কিন্তু ক্ষমাও করব। অসুখ করেছে কি? হায় রে, অত দূরে কেন থাক? দয়া করে একটা কথা অন্তত জানিও। শীগগিরই এসে পড়বে, কেমন তো? যদি ব্যস্ত থাক তো তোমার একটা কথা পেলেই খুশি হব। বল, 'রওনা হয়েছি' কি 'আমি অসুস্থ'। তুমি যদি অসুস্থ হও তো [illegible] উচিত ছিল আমাকে সংবাদ জানান। কি এমন হল?......

—সত্যিই তো, কি হল? আর না পড়ে মুঠোয় চিঠিখানা পাকাতে পাকাতে বলে ওঠে ওজেন। খাবার ঘরে প্রকাশ্যেই তার চোখ দিয়ে জল বেরোয়।

—কটা বাজে এখন?

—সাড়ে এগারটা। নিজের কফিতে খানিকটা চিনি ঢেলে দিয়ে বলে ভোতর‍্যাঁ।

তীক্ষ্ণ শাণিত দৃষ্টিতে ওজেনের দিকে চায় পলাতক কয়েদী। রক্ত জমাট করে বশীকরণ করে ফেলে এ চাহনি। অসাধারণ আকর্ষণী ক্ষমতাবিশিষ্ট মুষ্টিমেয় জনকয়েক লোকের চাহনির মধ্যে এই রহস্যময় বৈশিষ্ট্য [illegible]ছে। লোকে বলে, পাগলা গারদের বদ্ধ উন্মাদকেও এই চাহনি দিয়ে তারা বশীভূত করে। ওজেনের প্রতিটি অঙ্গ থরথর করে কাঁপতে থাকে। বাইরে একখানা গাড়ির শব্দ শোনা যায়। পলকের মধ্যেই মঁশিয় তাইফেরের তকমাপরা ভীতিগ্রস্ত একটি চাকর হন্তে হয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ে। মাদাম কুত্যুর চাকরটিকে চিনতে পারেন।

হাঁপাতে হাঁপাতে চাকরটি বলে, আপনার বাবা আপনাকে খুঁজছেন মাদমোয়াজেল! একটা সর্বনাশ হয়ে গেছে। দ্বন্দ্বযুদ্ধে মঁশিয় ফ্রেদিরকের কপালে তরোয়ালের কোপ লেগেছে। ডাক্তাররা তাকে বাঁচাবার আশা ছেড়ে দিয়েছেন। আপনি গিয়ে তাকে জীবিত দেখতে পাবেন কি না সন্দেহ— তার সংজ্ঞা লোপ পেয়েছে।

—বটে! বেচারি ভোতর‍্যাঁ! বলে ওঠে।—বছরে নীট ত্রিশ হাজার লিভার

আয়ের মানুষ কেন যে ঝগড়াঝাটি করে! এতে কোন সন্দেহ নেই যে আজকালকার যুবকেরা ভব্য আচরণ জানে না।

—মঁশিয় ! ওজেন চীৎকার করে ওঠে।

—কি হে, তোমার আবার কি হল রামথোকা! এক চুমুকে সবটা কফি গিলে শান্তভাবে বলে ভোতর‍্যাঁ। তার এই কফি খাওয়ার ব্যাপারটা এত অস্বাভাবিক উত্তেজনাভরে মাদমোয়াজেল মিশনো লক্ষ করছিলেন যে তাই দেখে সকলেই বিস্ময়ে স্তবাক হয়ে যায়।—পারিতে রোজ সকালে দ্বন্দ্বযুদ্ধ হয় না নাকি ?

—আমিও তোমার সঙ্গে যাব ভিকতরিন। মাদাম কুত্যুর বলেন। টুপি বা শাল না নিয়েই মহিলাদুটি ত্রস্তভাবে বেরিয়ে যায়। যাবার আগে জলভরা চোখে ওজেনের দিকে চেয়ে ভিকতরিন বলে, আমাদের সুখের জন্য যে আমায় চোখের জল ফেলতে হবে কোনদিন কল্পনাও করিনি একথা।

—আপনি ভবিষ্যতদ্রষ্টা মঁশিয় ভোতর‍্যাঁ। মাদাম কুত্যুর বলেন।

—কি না আমি ? জাক কোলাঁ বলে।

—কি আশ্চর্য ব্যাপার! বেশ খানিকটা রঙ চড়িয়ে বলতে শুরু করেন মাদাম ভোকে।—আগে থেকে হুঁশিয়ার না করেই মৃত্যু এসে হাজির হয়। বুড়োদের আগেই চলে যায় যুবকেরা। স্ত্রীলোকদের ভাগ্য ভাল যে দ্বন্দ্বযুদ্ধ করতে হয় না। তবে এমন সব ঝামেলা আমাদের আছে যা পুরুষকে কোনদিন পোহাতে হয় না। সন্তান প্রসব করি আমরা, আর মা হবার জ্বালা বড় কম দিন ভুগতে হয় না। কি জোর বরাত ভিকতরিনের! বাপ এখন ওকে স্বীকার করতে বাধ্য হবে।

ভোতর‍্যাঁ তখন ওজেনের দিকে চেয়ে বলে, এই তো দ্যাখ, কাল ওর কপর্দকও ছিল না, আর এখন বেশ কয়েক লক্ষের মালিক।

—তা তুমি কিন্তু বেশ ভালভাবেই কাজ গুছিয়েছ মঁশিয় ওজেন। মাদাম ভোকে বলে ওঠেন।

এই কথা শুনে ছাত্রটির দিকে তাকায় বুড়ো গোরিও। দেখে, গুলি পাকান চিঠিখানা তার হাতেই আছে।

—একদম পড়নি তো! এর মানে কি ? তুমিও কি তাহলে আর দশজনের মত ? সে বলে।

—মাদমোয়াজেল ভিকতরিনকে কোনদিনই আমি বিয়ে করব না মাদাম।

মাদাম ভোকের দিকে ফিরে বলে ওজেন। তার কণ্ঠস্বরের শঙ্কা ও বিরক্তির ভাব সবাইকে বিস্মিত করে।

ছাত্রটির হাতখানা টেনে নিয়ে সাদরে চেপে ধরে গোরিও। এ হাতে সে চুমুও খেতে পারত।

ভোতর্‌াঁ তখন বলে ওঠে—আহাহা! ইতালিয়দের মধ্যে 'কল তেমপো' বলে একটা কথা চালু আছে, তার মানে কি জান?

—জবাব পাব চিঠির? মাদাম দ নুসাঁজাঁর চাকরটি জিজ্ঞাসা করে।

—বলো, আমি যাব।

লোকটি চলে যায়। এই রকম উত্তেজনার মুহূর্তে ওজেনের মত যুবকের পক্ষে পরিণাম চিন্তা করা অসম্ভব।

—কি করি? সোচ্চারে সে বলে ওঠে।—কোন প্রমাণ নেই যে!

ভোতর্‌াঁ হাসতে শুরু করে। কিন্তু ওষুধটা ইতিমধ্যেই তার পাকস্থলীতে প্রভাব বিস্তার করতে শুরু করেছে। কয়েদীটি এমন শক্তিমান যে তখনও সে উঠে দাঁড়াতে পারছে, রাস্তিঞাকের দিকে চেয়ে শুকনো গলায় বলতে পারছে, শোন যুবক, ঘুমের মধ্যেও কোন কোন সময় বরাত ফিরে যায়।

তারপর সে ধড়াস করে মৃতের মত পড়ে যায়।

—ভগবানের ন্যায়বিচার এখনও আছে তাহলে! ওজেন বলে ওঠে।

—ওমা, এ কি হল! সেকি, কি হল ওর? আহাহা, বেচারি!

—ফিট হয়েছে হয়ত। মাদমোয়াজেল মিশনো বলে ওঠেন।

—সিল্‌ভি, ছুটে গিয়ে ডাক্তার নিয়ে আয় তো! বিধবা বলেন।

—ও মঁশিয় রাস্তিঞাক, ছুটে একবার মঁশিয় বিয়াশঁর ওখানে যাও না। সিল্‌ভি হয়ত ডাক্তার মঁশিয় গ্রঁাপেলকে ধরতে পারবে না।

এই বিভীষিকাময় আড্ডা থেকে বেরিয়ে পড়ার সুযোগ পেয়ে ছুটে বেরিয়ে যায় রাস্তিঞাক।

—ছুটে যা ক্রিস্তফ, ছুটে গিয়ে ওষুধের দোকান থেকে ফিটের একটা ওষুধ নিয়ে আয়।

ক্রিস্তফও বেরিয়ে পড়ে তখন।

—আচ্ছা বাবা গোরিও, ওকে ওর ঘরে নিয়ে যাব—আমাদের সঙ্গে ধরবেন একটু! ভোতর্‌াঁকে কোনমতে তুলে ধরাধরি করে তার নিজের ঘরের বিছানায় শুইয়ে দেওয়া হয়।

—এখানে আর আমায় দিয়ে কোন কাজ হবে না। এখন আমি মেয়ের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি। মঁশিয় গোরিও বলে।

—স্বার্থপর ধাড়ি জানোয়ার কোথাকার! মাদাম ভোকে বলে ওঠেন।—দূর হ! রাস্তায় যেন কুকুরের মত মরে থাকতে হয়!

—কিছু ঈথর যোগাড় করতে পারেন কি না দেখুন তো! মাদমোয়াজেল মিশনো বলেন। পোয়ারের সাহায্যে ভোতর্যাঁর জামা পোশাক তিনি ইতিমধ্যেই খুলে ফেলেন।

মাদাম ভোকে নীচের তলায় তার ঘরে চলে যান। মাদমোয়াজেল মিশনোই তখন একছত্র কর্ত্রী হয়ে পড়েন।

—এস, শার্টটা খুলে চটপট ওকে উপুড় করে দাও! মেয়েছেলে আমি, এ কাজটা আর আমায় দিয়ে নাই বা করালে! পুতুলের মত দাঁড়িয়ে না থেকে তোমাকেও যে কাজে লাগে এ কথাটা প্রমাণ কর না! হাত লাগাও! পোয়ারেকে বলেন মাদমোয়াজেল।

ভোতর্যাঁকে উপুড় করার পর মাদমোয়াজেল মিশনো বেশ ওস্তাদের মত তার কাঁধে চাপড় মারেন। অমনিই লাল-হওয়া চামড়ার উপর সাদা দুটি মারাত্মক অক্ষর ভেসে ওঠে।

—আমি বলিনি! তিন হাজার ফ্রাঁ পুরস্কার পেতে বেশী সময় লাগল না! ভোতর্যাঁকে তুলে ধরে সোল্লাসে বলে ওঠে পোয়ারে। মাদমোয়াজেল মিশনো সেই সুযোগে আবার তার মাথা দিয়ে শার্টটি গলিয়ে দেন।

—ওঃ, বেজায় ভারী! শুইয়ে দিতে দিতে বলে পোয়ারে।

—চুপ! ধরো এখানে যদি কোন সিন্দুক থাকে। সাগ্রহে বলেন আইবুড়ো মহিলাটি। বলবার সময় এমন তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তিনি ঘরের প্রতিটি জিনিস পরীক্ষা করছিলেন যে তার লোলুপতা দেয়াল পর্যন্ত ভেদ করছে বলে মনে হচ্ছিল।—ধর, কোন অছিলায় যদি আমরা লেখার টেবিলের দেরাজটা খুলি!

—ব্যাপারটা খুব ভাল হবে না হয়ত। পোয়ারে বলে।

—কেন নয়? মাদমোয়াজেল বলেন।—এ-জায়গা সে-জায়গা থেকে চুরি করা টাকা এখানে জমা করা হয়েছে তো! এখন আর এর কোন মালিক নেই। কিন্তু সময়ও আর নেই। ঐ ভোকে মাগী আসছে।

—এই যে ঈথর। মাদাম ভোকে বলেন।—হায় যে কপাল! একটার পর

একটা দুর্ঘটনা ঘটছে আজ। সেকি গো! এতো ফিট নয়! মুরগীর ছানার মত একেবারে ফ্যাকাসে হয়ে গেছে যে!

—মুরগীর ছানার মত! পোয়ারে প্রতিধ্বনি করে।

তখন বুকের উপর হাত দিয়ে বিধবা বলেন, না, বুকের স্পন্দন তো ঠিকই আছে।

—ঠিক আছে? বিস্মিত গলায় পোয়ারে জিজ্ঞাসা করে।

—সুস্থই আছে!

—তাই মনে হয় আপনার? পোয়ারে জিজ্ঞাসা করে।

—দেখুন না, যেন ঘুমোচ্ছে বলে মনে হয়। সিলভি ডাক্তার ডাকতে গেছে। দেখুন, দেখুন মাদমোয়াজেল মিশনো, ঈথর টানছে না! দূর, এ সাময়িক ফিট নয়! নাড়ী ঠিকই চলছে। তুর্কীদের মতই কড়া জানের মানুষ। দেখুন মাদমোয়াজেল মিশনো, ওর বুকের উপর কত লোম! এ রকম মানুষ শতায়ু হয়। সব কিছু সত্ত্বেও পরচুলাটা ঠিকই আছে। সেকি, কলপ লাগানো যে! ওর নিজের চুল তো লাল, ওই জন্যই পরচুলা পরে হয়ত। লোকে বলে, লাল চুলের মানুষ হয় দেবতা, না হয় শয়তান হয়। ও হয়ত ভালোর দলে। কি বলেন?

—ফাঁসি দেবার পক্ষে ভাল বটে! পোয়ারে বলে।

—তার মানে সুন্দরী নারীর গলায়! কথাটা ঘুরিয়ে নেবার জন্য চটপট বলে ওঠেন মাদমোয়াজেল মিশনো।—তুমি এখন যাও, পুরুষের অসুখ করলে দেখাশোনার কাজ মেয়েরাই করে থাকে। আর তোমায় দিয়ে যখন কোন কাজ হবে না, তখন নিজের কাজেই যাও! মাদাম ভোকে আর আমি দুজনে মিলে মঁশিয় ভোতর্‍্যাঁর দেখাশোনা করব।

প্রভুর ধমক-খাওয়া কুকুরের মত কোন ওজর আপত্তি না করে নীরবে বেরিয়ে যায় পোয়ারে।

রাস্তিঞাক বেড়াতে গিয়েছিল—দম ফেলতে গিয়েছিল খোলা হাওয়ায়। কারণ দম আটকে আসছে বলে মনে হচ্ছিল তার। আগের দিন সন্ধ্যায় এই খুন বন্ধ করবে বলে সে মনস্থ করেছিল। তা সত্ত্বেও নির্দিষ্ট সময়ে কাজ শেষ হয়ে যায়। কি ঘটেছিল? কি তার করা উচিত এখন? এ ব্যাপারে নিজেও জড়িয়ে পড়তে পারে ভেবে সে শিউরে ওঠে। ভোতর্‍্যাঁর অবিচল ধৈর্যে জিনিসটা আরও বিভীষিকাময় হয়ে উঠেছে।

—কিন্তু কোন কথা বলবার আগেই যদি ভোতর্‌ঁ্যা মারা যায় তো কি হবে ?

লুকসাঁবুরের পথ ধরে দ্রুতপদে সে এগিয়ে চলে—যেন এক পাল শিকারী কুকুর তার পেছু নিয়েছে—তাদের ঘেউ ঘেউ শব্দও যেন কানে শুনতে পাচ্ছে।

—ওরে, পিলৎ পত্রিকা দেখেছিস ডেকে বলে বিয়াশঁ।

পিলৎ চরমপন্থী পত্রিকা। সম্পাদকের নাম মঁশিয় তিসো। দিনের খবরসহ মফঃস্বলের জন্য তার একটি সংস্করণ বেরুত। প্রভাতী পত্রিকা বেরুবার কয়েক ঘণ্টা পরে বেরুত সংস্করণটি। কাজেই স্থানীয় পত্রিকার চব্বিশ ঘণ্টা আগেই পত্রিকাখানি গ্রামাঞ্চলে প্রভাতী সংবাদ পরিবেশন করত।

—চমৎকার একটি সংবাদ বেরিয়েছে পত্রিকাখানায়। মেডিক্যাল ছাত্রটি বলে যায়।—ছোট তাইফের আজ ওল্ডগার্ড দলের কঁৎ ক্রাঁসেজিনির সঙ্গে দ্বন্দ্বযুদ্ধে ঘায়েল হয়েছে—ইঞ্চি দুয়েক তরোয়াল ঢুকে গেছে কপালে। এখন তো ঐ ছোট্ট ভিকতরিন পারির শ্রেষ্ঠ ধনী মহিলা হয়ে পড়ল। আঃ, আগে যদি জানতাম! মৃত্যুটা ঠিক লটারির মত। লেগেও যেতে পারে, আবার নাও লাগতে পারে। শুনলাম, তোর দিকে নাকি ভিকতরিনের খানিকটা সুনজর আছে, সত্যি নাকি ?

—আঃ, ওর কথা ছেড়ে দে বিয়াশঁ। ওকে আমি কখনও বিয়ে করব না। এক সুন্দরীর প্রেমে পড়েছি আমি—সেও ভালবাসে! আমি···

—এমনভাবে কথাটা বললি যেন তার প্রতি বিশ্বস্ত থাকতে অনেক কষ্ট করতে হচ্ছে! যে মেয়ের জন্য বুড়ো তাইফেরের বৈভব তুচ্ছ করা যায় তাকে একবার দেখা তো!

—নরকের সব শয়তানই কি আমার পেছু নিয়েছে? রাস্তিঞাক বলে ওঠে।

—কি হল বল তো! পাগল হলি নাকি? বিয়াশঁ বলে।—দেখি, হাতখানা দে তো নাড়ীটা দেখেনি। আরে, তোর জ্বর-জ্বর ভাব হয়েছে যে!

—রোগী চাস যদি তো ভোকে মার কাছে যা। ওজেন বলে।—কিছুকাল আগে ঐ ভোতর্‌ঁ্যা পাজীটা মরামানুষের মত ধরাস করে পড়ে গেছে।

—এঁ্যা! বিয়াশঁ বলে।—আমার সন্দেহ তাহলে সত্যি? নিশ্চয় যাব। নিজের চোখে দেখে আসব গিয়ে। ওজেনকে একলা ফেলে সে চলে যায়। আপন চিন্তায় মগ্ন হয়ে থাকে রাস্তিঞাক।

মনে মনে বহু বিচার বিবেচনা করে বহুক্ষণ পায়চারি করে আইনের ছাত্রটি।

নিজের মনের এজলাসেই সে নিজের বিবেককে তন্ন তন্ন করে তদন্ত করে। বেশ একচোট ঠেঙানি সহ্য করতে হয় তাকে, শঙ্কা আর নিজের প্রতি অবিশ্বাসের বেদনাও সইতে হয়, তবু এই মর্মান্তিক কঠোর বিচার থেকে তার সততা পরখ করা ইস্পাতের কড়ির মত সসম্মানে অক্ষতভাবে বেরিয়ে আসে।

গত সন্ধ্যায় গোরিও যে সব গোপন কথা বলেছে তার কথা মনে পড়ে। আবারও ভাবে দেলফিনের কাছাকাছি রুম দার্তোয়ায় তার জন্য বাছাই করা বাসার কথা। চিঠিখানা পকেট থেকে বার করে বারবার সে চোখের সামনে ধরে—চুমুও খায় শেষ অবধি।

—এই রকম ভালবাসাই আমার জীবনের একমাত্র অবলম্বন। মনে মনে বলে ওজেন।—বৃদ্ধ বেচারি নিশ্চয় অন্তরে খুব ব্যথা পেয়েছে। নিজের দুঃখকষ্টের কোন কথাই বলে না। কিন্তু যে-কেউ বুঝতে পারে। বেশ, ছেলের মতই ওর দেখাশোনা করব। সুখশান্তি দিয়ে ভরে তুলব ওর জীবন। দেলফিন যদি আমায় ভালবাসে তো দিনের বেলা বুড়োর কাছাকাছি আমার ঘরে থাকবে। ঐ অহঙ্কারী মাদাম দ রেস্তো একটা হৃদয়হীন পিশাচী। বা সে চাকর বানাতে চায়। কিন্তু আমার দেলফিন বুড়োকে ভালবাসে। ওর মত মেয়েকে ভালবেসেও সুখ আছে। আঃ! আজ সন্ধ্যায় কত সুখীই যে হব!

পকেট থেকে ঘড়িটা বার করে সে তার তারিফ করে।—সব কিছু আমার অনুকূলে কাজ করছে। ভালবাসা-বাসির ক্ষেত্রে পরস্পরকে সাহায্য করার মধ্যে কোন দোষ নেই। এটা আমি গ্রহণ করতে পারি। তাছাড়া, নিশ্চয় আমি সফল হব। নিশ্চয়ই হব। তখন শতগুণে এই ঋণ শোধ করে দিতে পারব। এই সম্পর্কের মধ্যে কোন পাপ নেই—এমন কিছুই নেই যাতে নিষ্ঠাবান ধার্মিকেরা ভুরু কোঁচকাতে পারেন। কত মানী লোকের রয়েছে এমন সম্পর্ক। আমরা কেউ কারুককে প্রবঞ্চনা করছি না। আর প্রবঞ্চনাই তো চরিত্র হানিকর। মিথ্যা প্রবঞ্চনা করলে আত্মমর্যাদা হারাতে হয়। নিশ্চয়! দীর্ঘকাল সে স্বামীর সঙ্গে আলাদা বাস করছে। তাছাড়া ঐ আলজাসিয়াঁটাকে একদিন বলে দেব যে স্ত্রীকে যখন সে সুখী করতে পারে না, তখন আমার হাতেই তাকে ছেড়ে দেওয়া উচিত।

দীর্ঘ সময় নিজের মনের সঙ্গে লড়াই করে রাস্তিঞাক। শেষ অবধি যৌবনের বৃত্তির জয় হয়। তবু দুর্নিবার এক কৌতূহল চারটের সময় আবার

তাকে মেজঁ ভোকের দিকে টেনে নিয়ে আসে। তখন সন্ধ্যা হয়ে আসছে। ফিরে এলেও মনে মনে সে সঙ্কল্প করে যে এই বোর্ডিং চিরদিনের মত ছেড়ে যাবে। ভোতর্‍্যাঁ মারা গেছে কিনা শুধু সেই সংবাদটাই সে জানতে চায়।

বিয়াশঁর মনে হয় যেন বমি করাতে পারলে উপকার হয়। তাই সে বমির ওষুধ দেয়। রাসায়নিক পরীক্ষার জন্য বমিটা সে হাসপাতালে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করে। বমিটা ফেলে দেবার জন্য মাদমোয়াজেল মিশানো পীড়াপীড়ি করায় তার সন্দেহ আরও দৃঢ়মূল হয়। তারপর ভোতর্‍্যাঁ এত তাড়াতাড়ি সেরে ওঠে যে তাই দেখে বিয়াশঁ সন্দেহ না করে পারল না যে বোর্ডিংটির প্রাণ এই হাসিখুশি লোকটার বিরুদ্ধে একটা ষড়যন্ত্র চলছে।

রাস্তিঞাক ফিরে এসে ভোতর্‍্যাঁকে খাবার ঘরের স্তোভের পাশে দাঁড়ান দেখল। ছোট তাইফেরের মৃত্যু সংবাদ শুনে ভাড়াটেরা অন্যান্য দিনের চাইতে আগেই খাবার ঘরে জমায়েৎ হয়। ব্যাপারটা বিস্তারিতভাবে জানার জন্য সকলেই কৌতূহলী, সকলেই উদগ্রীব। ভিকতরিনের বরাত এতে কত পালটাবে সে সম্পর্কেও কারও কম উৎকণ্ঠা নেই। বুড়ো গোরিও ছাড়া সবাই ছিল সেখানে। বেশ গুলজার হয়ে আলোচনা করছিল। ঘরে ঢুকে ভোতর্‍্যাঁকে আগের মতই অবিচলিত দেখে ওজেন। ভোতর্‍্যাঁর সঙ্গে তার চোখাচোখি হল। সেই শাণিত দৃষ্টি তার অন্তরের অন্তঃস্তল বিদ্ধ করছে বুঝে আবারও সে শিউরে ওঠে। এ দৃষ্টি যেন আবার পাপ বৃত্তিগুলোকে নতুন করে সতেজ করে তুলছে।

—কি হে ছোকরা, বুড়ো কুত্তার প্রাণটা যায়নি—এখনও থাকবে অনেকদিন, বুঝলে হে! পলাতক কয়েদী বলে।—অত সহজে মৃত্যু আমায় ব্যাগে পুরতে পারবে না। এই সব মহিলাদের মতে আমি এমন এক ধাক্কা সামলেছি যাতে ষাড় পর্যন্ত খতম হয়ে যায়।

—কিম্বা বলদও বলতে পার। বিধবা বলেন।

—এও কি সম্ভব যে আমাকে জ্যান্ত দেখে দুঃখিত হয়েছ? ওজেনের মনের কথা বুঝতে পেরেছে ভেবে তার কানে কানে ফিসফিস করে বলে ভোতর্‍্যাঁ।

—নিজের শক্তি সম্পর্কে নিশ্চয়ি ভুল ধারণা করেছ।

—মাদমোয়াজেল মিশনো গত পরশু চীট-ডেথ নামে এক ভদ্রলোকের কথা বলছিলেন। বিয়াশঁ বলে।—আমার দৃঢ় বিশ্বাস, নামটা আপনাকে খুব মানাবে।

মন্তব্যটি ভোতর্‌্যারে যেন বজ্রাঘাত করে। অমনিই তার মুখ ফ্যাকাশে হয়ে যায়—টলতে থাকে যেন। এক ঝলক উজ্জ্বল আলোর মত তার চুম্বকভরা দৃষ্টি মাদমোয়াজেল মিশনোর উপর পড়ে। লোকটির প্রবল ইচ্ছা শক্তির চাপে আইবুড়ো বুড়ীর পা দুটো অসাড় হয়ে ভেঙে পড়বার উপক্রম হয়। চেয়ারের উপরেই তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়েন। ভোতর্‌্যার ভাবভঙ্গীতে এমন হিংস্রতা ফুটে বেরোয় যে মাদমোয়াজেল মিশনোর বিপদ বুঝে পোয়ারে দুজনের মাঝখানে দাঁড়ায়। যে হাসিখুশি মুখোশ এতদিন কয়েদীটির আসল প্রকৃতি ঢেকে রেখেছিল, সেই মুখোশ খসে পড়ে যায়। অপরাপর ভাড়াটেরা এই নাটকীয় দৃশ্যের তাৎপর্য না বুঝে অবাক বিস্ময়ে চেয়ে থাকে। এই উত্তেজনার মুহূর্তে বাইরে আগুয়ান সৈনিকের পায়ের শব্দ শোনা যায়—সঙ্গে সঙ্গে ফুটপাথের উপর রাইফেল পাতার আওয়াজও শোনা যায়। পলায়নের পথ খোঁজার জন্য জাক কোলাঁ আপনা থেকে যখন প্রতিটি দেয়াল ও জানালার দিকে তাকাচ্ছিল, প্রধান গোয়েন্দার নেতৃত্বে চারটি লোক তখন খাবার ঘরের দোর গোড়ায় হাজির হল।

আগন্তুকদের একজন বলে ওঠে, রাজাদেশ পালনের জন্য…। কথাটি শেষ করবার আগেই বিস্মিত ভাড়াটেদের কলগুঞ্জনে তার কণ্ঠস্বর ডুবে যায়।

আবার নিস্তব্ধ হয় ঘরখানি। তিনজন আগন্তুককে যাবার পথ দেবার জন্য ভাড়াটেরা একপাশে সরে দাঁড়ায়। এদের প্রত্যেকেই পকেটে হাত ভরে বাঁকান পিস্তল ধরে রাখে। গোয়েন্দার পেছু পেছু দুটি পুলিশ এসে দরজা পাহারা দেয়। বাকী আর দুজনকে দেখা যায় সিঁড়ির দরজার পাশে। বাইরে বাগানের কাঁকড় বিছান পথে লোকচলাচলের চুরমুর শব্দ শোনা যায়। জানালার তলা থেকে জনকয়েক সৈনিকের রাইফেল নাড়াচাড়ার আওয়াজও কানে আসে। চীট্‌-ডেথের পলায়নের সমস্ত পথ এইভাবে রুদ্ধ করা হয়। সব কটি চোখ তখন অনিবার্যভাবে তার উপর পড়ে। প্রধান গোয়েন্দা সরাসরি তার দিকে এগিয়ে গিয়ে এমন জোরে মাথায় পিটুনি লাগান যে পরচুলা খসে পড়ে কয়েদীটির বীভৎস মাথা অনাবৃত হয়ে পড়ে। সোজা কথায়, শঠতাভরা মুখব্যঞ্জনার সঙ্গে মিশে তার ইটের মত লাল চুল থেকে শক্তিমত্তার বীভৎস আভাস ফুটে বেরোয়। বলিষ্ঠ কাঁধ ও বক্ষদেশের সঙ্গে সুসমঞ্জস মাথাটি অমিত শক্তির ব্যঞ্জনাময়। লোকটির গোটা ব্যক্তিসত্তা যেন সেই মুহূর্তে তার মুখের ব্যঞ্জনায় মূর্ত হয়ে ওঠে। মনে হয়, নরকের পৈশাচিক অগ্নিশিখার সামনে দাঁড়িয়ে আছে যেন। উপস্থিত

সকলেই তখন ভোতরাঁার আসল রূপ চিনতে পারে। তার অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ, তার নির্মম মতবাদ, তার স্বকপোলকল্পিত ধর্ম, এবং ভালমন্দ নির্বিশেষে যে কোন কাজ করতে প্রস্তুত বেপরোয়া এক প্রতিষ্ঠানের শক্তিবলে রাজার মত শক্তিধর এই মানুষটির অপরের সম্পর্কে অবজ্ঞাভরা দৃষ্টিভঙ্গী আর তাদের প্রতি জঘন্য আচরণের অর্থ সকলের কাছেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

মুখ রাঙা হয়ে ওঠে তার। চোখ দুটো জলে ওঠে, এমন বীভৎস পাশবিক শক্তি সঞ্চয় করে সে ঝাঁপিয়ে পড়তে উদ্যত হয়, এমন হিংস্রভাবে সে চীৎকার করে ওঠে যে তার বীভৎস হিংস্রতা দেখে ভাড়াটেরা আর্তনাদ করে ওঠে। সিংহের মত তাকে আক্রমনোদ্যত দেখে ভয়চকিত সোরগোলের সুযোগ নিয়ে কার্যসিদ্ধির আশায় গোয়েন্দারা পিস্তল বার করে। আগ্নেয়াস্ত্রের ঝিকিমিক দেখে তৎক্ষণাৎ বিপদের মাত্রা উপলব্ধি করে কোলাঁ এবং সঙ্গে সঙ্গে চরম সংযমশক্তির পরিচয় দেয়। তার মুখের ভাবান্তর যেমন বিস্ময়কর আর্কষণীয় তেমনি বীভৎস হয়ে ওঠে। পাহাড় উড়িয়ে দিতে পারে এমনি বাষ্পভরা বয়লারের সঙ্গেই একমাত্র এর তুলনা করা চলে। কয়েক ফোঁটা ঠাণ্ডা জলে এই উত্তাল বাষ্পীয় শক্তি যেমন চোখের পলক ফেলতে না ফেলতে শান্ত হয়ে যায়, কোলাঁর উদগ্র ক্রোধও বিদ্যুত চমকে সহসা তেমনি ঠাণ্ডা হয়ে গেল। বিজুলি ঝিলিকের মত একটি চিন্তা এই ঠাণ্ডা জলের কাজ করে। আচমকা তার মুখে হাসি ফুটে বেরোয়—মাথা নীচু করে তাকায় পরচুলাটার দিকে। তারপর প্রধান গোয়েন্দার দিকে চেয়ে বলে, আজকের দিনটা তেমন নির্ঝঞ্ঝাটে গেল না। পুলিশের দিকে হাত বাড়িয়ে মাথার ইশারায় সে ধরে নিয়ে যাবার ইঙ্গিত করে। বলে, ভদ্রলোকে হাতে হয় ব্রেসলেট পরে, না হয় হাতে হাতকড়ি পরে। আপনারা কিন্তু সবাই সাক্ষী রইলেন যে আমি কোন প্রতিরোধ করলাম না।

কোলাঁর এই আকস্মিক ভাবান্তরে দর্শকদের মধ্যে প্রশংসার গুঞ্জন ওঠে। এতক্ষণ তারা আগ্নেয়গিরির প্রচণ্ড লাভা প্রবাহ প্রত্যক্ষ করেছে। আবার একটু বাদেই প্রত্যক্ষ করল যেন সেই বীভৎস অগ্ন্যুৎপাত চোখের পলকে আয়ত্তাধীনে এল।

—বড়ই আপশোষের কথা, যা আশা করেছিলেন তাতে বাধা পড়ে গেল। প্রধান গোয়েন্দার দিকে চেয়ে বলে কয়েদীটি।

—হয়েছে, হয়েছে, এই জামাকাপড় খুলে ফেল! অবজ্ঞাভরা রূঢ় জবাব আসে পেতি রুয় স্যাঁৎ আনের লোকটির কাছ থেকে।

—সে কি? কোলাঁ বলে—মহিলারা রয়েছেন যে! আমি অবশ্য কোন আপত্তি করছি না—পুরোপুরি আত্মসমর্পণ করেছি।

দর্শকদের তিরস্কার করবার আগে বাগ্মীরা যে ভাবে তাকান, একটু থেমে তেমনি ভাবে চারিদিকে চায় কোলাঁ।

পকেট বই থেকে একখানা কাগজ বার করে টেবিলের এক প্রান্তে বসে চুলপাকা এক বেঁটে বৃদ্ধ গ্রেপ্তারের সরকারী বিবরণ লিখছিল। তাকে লক্ষ্য করে কোলাঁ বলে, সব কিছু লিখে নিও পাপা লাশপেন। আমি স্বীকার করছি যে আমিই বিশ বছর কারাদণ্ডে দণ্ডিত জাক কোলাঁ অথবা চীটডেথ্ নামে পরিচিত ব্যক্তি। আর এখুনি আমি আমার উপাধির সত্যতা প্রমাণ করলাম। তারপর ভাড়াটেদের লক্ষ্য করে বলে, যদি ভোকে মার পবিত্র ঘরে টুকরো টুকরো হয়ে ছিটকে যেত। ঐ তিন ভদ্দরলোক চালাকি করে এই ফাঁদ পেতেছিলেন।

এই কথা শুনে মাদাম ভোঁকে অসুস্থ বোধ করেন। সিলভিকে বলেন, সে কি সব্বনাশ! আমার মাথা ঘুরে যাচ্ছে! এই লোকের সঙ্গে কাল রাত্রে 'গেতে' গিয়েছিলাম!

—আপনার ওই নীতি কথা রাখুন তো মা! অমনিই বলে ওঠে কোলাঁ।

—গেতেতে কাল আমার বক্‌সে বসে আপনার কোন ক্ষতি হয়েছে কি? আর তাছাড়া, আমাদের চাইতে আপনারা ভাল কিসে? আমরা কলঙ্কের ছাপ বয়ে বেড়াই কাঁধে, কিন্তু আপনাদের মত এই নচ্ছার সমাজের নাদুস-নাদুস মানুষের কলঙ্কের দাগ থাকে অন্তরের অন্তঃস্থলে। আপনাদের এই সমাজের সেরা মানুষও আমার সমান নয়।

শেষ অবধি রাস্তিঞাকের উপর তার চোখ পড়ে। হাসি ফুটে বেরোয় কোলাঁর মুখে। এই বীভৎস কর্কশ মুখে প্রসন্ন হাসির ঝিলিক কেমন বেমানান দেখায়।

—আমাদের ছোটখাটো চুক্তিটি কিন্তু এখনও বলবৎ আছে খোকা। তার মানে তুমি মেনে নিলেই হল! বুঝলে সুশীল!

'মধুর আমার ফ্যাঁশেতের সরলতা······'

গান ধরে কোলাঁ। তার পরে বলে, কোন ভাবনা কর না। টাকা পাবার পথ আমার আছে। আমার মত মারাত্মক লোককে ঠকাবার সাহস কারও নেই।

কথাটির মধ্য দিয়ে সহসা জেল জীবনের আভাস ফুটে বেরোয়। নিজস্ব অদ্ভুত রীতিনীতি, অদ্ভুত ভাষা আছে এ জীবনের শান্ত পরিবেশ আচমকা এখানে চটপট বীভৎস রূপ ধারণ করে। ভয়াবহ ক্ষমতা ও গুরুত্ব এখানকার জীবনের। এ জীবনে আছে নীচতা আছে সমস্ত মানুষ আর সমস্ত বিষয়ের প্রতি চরম শ্রদ্ধার অভাব। বক্তাকে তখন আর ব্যক্তিগতভাবে বিচার করার কারণ ছিল না। সে তখন একটা গোটা অধঃপতিত শ্রেণীর মুখ-পাত্র। নিষ্ঠুর তারা, বর্বর তারা, তবু তারা নমনীয়। তবু ধীরস্থির যুক্তিপন্থী সুস্থ মস্তিষ্কের মানুষ তারা। কথা বলতে বলতে কোলাঁ কবি হয়ে ওঠে। একমাত্র অনুশোচনা ছাড়া নরকের এই কবির ভাষায় মানুষের অন্তরের সমস্ত বৃত্তি, সমস্ত ভাবাবেগ রূপ পায়। তার অবস্থা পতিত দেবদূত-শ্রেষ্ঠের মত। চিরন্তন শত্রুতাসাধন ছাড়া অপর কোম বৃত্তি তার অন্তরে ছিল না। রাস্তিঞাকের অন্তরে গোপন পাপ চিন্তা ছিল। তারই স্বীকৃতির প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ দুর্বৃত্তটির জ্ঞাতিত্বের দাবী শুনে সে চোখ নীচু করে। কে আভাষ ধরিয়ে দিল? কোলাঁ বলে ওঠে। তার মারাত্মক ক্রুর দৃষ্টি উপস্থিত জনতাকে বিদ্ধ করে। একে একে সবাইকে নিরীক্ষণ করে সে মাদমেয়াজেল মিশনোর দিকে স্থিরদৃষ্টিতে তাকায়। বলে, হায়রে অর্থলোভী বুড়ী, এ তোরই কাজ। জানি ও সংজ্ঞাহীনতা তোর ভান। যদি দুটি মাত্র কথা মুখ দিয়ে বার করি তো এক সপ্তাহের মধ্যে তোর ঘাড় মচকে দিয়ে যাবে। কিন্তু তোকে ক্ষমা করলাম। কারণ শত হলেও আমি খ্রীস্টান তো! তাছাড়া তুইও যে একলা আমায় বিকিয়ে দিতে পেরেছিস তা মনে হয় না। কে করলে কাজটা? এই সময় দেয়াল আলমারি খুলে পুলিশ অফিসারদের ঘাঁটাঘাঁটি করার শব্দ শুনে বলে ওঠে, আ, ঘাঁটাঘাটি শুরু করে দিয়েছ এর মধ্যে? কিন্তু পাখী তো উড়ে গেছে! কালই বাসা ছেড়ে চলে গেছে। আর তাদের কোন খোঁজ মিলবে না। নিজের কপালে টোকা মেরে বলে, আমায় ধরিয়ে দিল! এ সেই বিশ্বাসঘাতক দেল পোয়ার কাজ। কি, ঠিক বলিনি? প্রধান গোয়েন্দার দিকে ফিরে বলে কোলাঁ। নোটগুলো উপরে থাকবার সময়ে যাতে গ্রেপ্তার করা যায় তারই সুষ্ঠু আয়োজন করা হয়েছিল। কিন্তু সব চলে গেছে শিকারী কুকুর ভায়া, কিছু নেই! আর কি দেল সোয়ার কি হবে বলছি শোন, এক পক্ষের মধ্যে তাকে সাবাড় হতে হবে। সমস্ত পুলিশ দিয়ে যদি তাকে রক্ষা করার আয়োজন কর তাহলেও ত্রাণ পাবার আশা নেই। হাঁ, এই মিশনেৎ মাগীকে কি

দিলে? পুলিশদের জিজ্ঞাসা করে।—মাত্র তিন হাজার ফ্রাঁ! হায়রে নিনঁ! হায়রে ভিখিরি পাঁপাতুর! হায়রে পের লাসাজের ভেনাস, আমার দাম ওর চাইতে অনেক বেশী। আমাকে হুঁশিয়ার করে দিলে আমি তোকে ছ' হাজার ফ্রাঁ দিতাম। কি হে, কখনও মনে হয়েছে এ কথা? মানুষের দেহের কারবার করে তো হাত পাকিয়েছিস, হয়েছে মনে? নিশ্চয় হয়নি—তাহলে তো আমি সে সুযোগ পেতাম। হাঁ, এই যাত্রা এড়াবার জন্য নিশ্চয়ই দিতাম টাকাটা, কারণ, এতে শুধু আমার পরিকল্পনাই ভণ্ডুল হল না, কিছু টাকাও লোকসান গেল! হাতকড়ি পড়াবার সময় সে বলে। —চিরকালের মত ঠাণ্ডা করে দেবার উদ্দেশ্যে এই লোকগুলো আমায় বেশ দুর্ভোগ না দিয়ে ছাড়বে না—মারধর দিয়ে উত্যক্ত করবে। কিন্তু সরাসরি যদি জেলে পাঠায় তো কে দেজরফেন্ডয়ের ঐ বোকাগুলোর শত চেষ্টা সত্ত্বেও অচিরেই ফিরে এসে কাজে লাগতে পারব। জেলখানার কয়েদীরা তাহলে তাদের জেনারেল টীট ডেথকে মুক্ত করার জন্য কোন চেষ্টার ত্রুটি রাখবে না। এখানে এমন আর কেউ আছে যে আমার মত বলতে পারে, দ্বিধাহীন চিত্তে যে কোন কাজ করার মত দশ হাজার ভাই তার আছে! সগর্বে বলে কোলাঁ। তারপর বুকে চাপড় দিয়ে বলে, কিছুটা ভাল জিনিষ এখনও আছে এইখানে। আজ অবধি কারও প্রতি আমি বিশ্বাঘাতকতা করিনি। মাদমোয়াজেল মিশনোকে লক্ষ্য করে বলে, শোনরে গোবরে পোকা, দেখছিস্ তো, সবাই আমায় ডরায়, কিন্তু তোমাদের মত লোক দেখলেই ওদের হিম্মত বাড়ে। যাক, যে দু'পয়সা জিতেছিস্, কুড়িয়ে নে!

পলকের জন্য থেমে সে ভাড়াটেদের মুখের দিকে তাকায়। তারপর বলে, আপনাদের সকলের মাথায় কি গোবর ভরা? জীবনে কি কয়েদী দেখেননি কোনদিন? কোলাঁ নামে যে বিখ্যাত কয়েদীটি আপনাদের সামনে দাঁড়িয়ে আছে, আর সবাইয়ের মত অত ভীরু সে নয়। সামাজিক চুক্তির নামে যে বিরাট ভণ্ডামি চলছে তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার হিম্মত সে রাখে। জাঁ জাক রুশো একে এই নামেই অভিহিত করতেন। এবং তার শিষ্য বলে আমি গর্ব করি। সোজা কথায়, একলা আমি এই আইন আদালত, পুলিশ আর রাজস্বের চাকচিক্যভরা সংগঠিত কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছি—আঘাতের পর আঘাত দিয়ে তার অন্তঃসারশূন্যতা প্রমাণ করছি।

—ওহো! কি অপূর্ব বিষয়বস্তু! চিত্রকর বলে ওঠে।

প্রধান গোয়েন্দার দিকে ফিরে কোল্যাঁ তখন বলে, বল তো জহ্লাদের মোসাহেব, সত্যিই কি ফি দো সোয়া আমায় ধরিয়ে দিয়েছে? লক্ষ্মী ছেলের মত সত্যি কথাটা বল না বিধবার বিধাতা (কয়েদীদের পরিভাষায় গিলোতিনের বীভৎস ক্যাবিক নাম)। আমি চাই না যে অপর কারও অপরাধে সে শাস্তি পাক—সেটা ভাল হবে না।

সে সব লোক উপরে বসে কোল্যাঁর যাবতীয় সম্পত্তির তালিকা তৈরী করছিল, ঠিক এই সময়ে তারা নেমে আসে এবং চাপা গলায় প্রধান গোয়ান্দার কাছে সামান্য কয়েকটি কথা বলে। প্রাথমিক সরকারী কাজকর্ম সম্পূর্ণ হয়ে গেল।

কোঁল্যাঁ তখন ভাড়াটেদের দিকে ফিরে আবারও বলে, আপনারা শুনুন ভদ্রজন! আমায় ওরা সরাসরি নিয়ে যাচ্ছে। এখানে থাকার সময় আপনারা সবাই আমার সঙ্গে ভদ্র ব্যবহার করেছেন। এ কথা আমি ভুলব না। আমার যাবার বেলার শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন। প্রভেন্স থেকে কিছু ডুমুর উপহার পাঠালে নিশ্চয়ি আপনারা তা গ্রহণ করতে আপত্তি করবেন না।

বেরিয়ে পড়বার জন্য সে পা' বাড়ায়, কিন্তু অমনিই ঘাড় ফিরিয়ে রাস্তিঞাকের দিকে চেয়ে বলে, বিদায় ওজেন। তার এই সম্ভাষণের মধ্যে এমন একটা বিষণ্ণ নম্রতা ছিল যা তার একটু আগের রূঢ় স্পষ্ট ভাষণের সম্পূর্ণ বিপরীত। 'যদি কখনও অসুবিধায় পড় তো তোমার জন্য এক অনুগত বান্ধব রেখে গেলাম। হাতকড়ি সত্বেও কায়দা করে সে আত্মরক্ষার ভঙ্গীতে দাঁড়ায় এবং অসি চালকের মত 'এক-দুই' বলে টেনে শ্বাস ছাড়ে। কোনও অসুবিধা যদি বোধ কর তো সেইখানে আবেদন জানিও। লোকজন কি টাকা পয়সার অভাব হবে না।

এই অদ্ভুত লোকটা এমন চমৎকারভাবে ভাঁওতা দিল যেন রাস্তিঞাক ছাড়া তার শেষ কথার গূঢ় অর্থ অপর কেউ বুঝল না।

ঘর থেকে পুলিশ, সৈনিক আর গোয়েন্দার দল চলে গেল হতবাক ভাড়াটেদের দিকে তাকায় সিলভি। গিন্নীর রগে সে ভিনিগার মালিশ করছিল।

সকলেই নির্বাক নিস্পন্দ হয়েছিল এতকাল। এই নাটকীয় দৃশ্যের বিভিন্ন ভাবাবেগের তোড় তাদের অভিভূত করে ফেলেছিল। কিন্তু সিলভির কথায় সেই হতভম্ব ভাব কেটে যায়। সকলেই পরস্পরের মুখ চাওয়া চাওয়ি করে

এইবার। তারপর এক দৃষ্টে তাকায় মাদমোয়াজেল মিশনোর অবসন্ন নিস্তেজ মমির মত বিশুষ্ক চেহারার দিকে। চোখের পাতা নীচু করে স্তোভের পাশে এমন শঙ্কিতভাবে মহিলাটি দাঁড়িয়ে ছিলেন যেন আনত দৃষ্টিও তার চোখের ব্যঞ্জনা লুকোবার পক্ষে যথেষ্ট নয়। মুখের এই অভিব্যক্তির পেছনের কারণ আর তার প্রতি চাপা বিরক্তি এইবার সহসা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ভাড়াটেদের সমবেত বিরক্তি প্রকাশের ফলে একটা চাপা গুঞ্জন ওঠে। মাদমোয়াজেল এ গুঞ্জন শুনতে পান, কিন্তু নড়াচড়া করলেন না। বিয়াশঁই এগিয়ে আসে। পাশাপাশি দাঁড়ান ভাড়াটের দিকে কাত হয়ে চাপা গলায় বলে, ঐ রকম স্ত্রীলোক যদি এই বাড়ীতে থাকে আর এক সঙ্গে খায়-দায় তো আমি এখানে থাকব না।

পলকের মধ্যেই টের পাওয়া গেল যে একমাত্র পোয়ারে ছাড়া সকলেই ছাত্রটির সঙ্গে একমত। সাধারণের সমর্থনে জোড় পেয়ে সে তখন প্রধান ভদ্দরলোককে চেপে ধরে। বলে, আপনি যখন মাদমোয়াজেল মিশনোর বিশেষ বন্ধু, কথাটা তখন আপনাকেই বলতে হবে। ওকে বুঝিয়ে দিন যে এখুনি ওকে চলে যেতে হবে।

—এখুনি? সবিস্ময়ে বলে পোয়ারে।

তারপর স্তোভের কাছে দাঁড়ান মূর্ত্তিটির কাছে গিয়ে কানে কানে কি যেন বলে।

—ঘরের ভাড়া আমি চুকিয়ে দিয়েছি, কাজেই আর সকলের মত আমারও সমান অধিকার আছে এখানে থাকার। শাণিত দৃষ্টিতে ভাড়াটেদের দিকে চেয়ে বলেন মহিলাটি।

—তার জন্য ভাববেন না, সবাই মিলে সে টাকাটা আমরা দিয়ে দেব আপনাকে। রস্তিঞাক বলে।

—কোলঁার পক্ষ টানছে এই ভদ্দরলোক। বিষভরা জিজ্ঞাসু চোখে ছাত্রটির দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চেয়ে বলেন মাদমোয়াজেল। কেন যে টানছে তার কারণ বোঝা কঠিন নয়।

এমনভাবে লাফিয়ে ওঠে যেন আইবুড়ো বুড়ির চাহনির মধ্যে শঠতার আভাস নিতান্তই স্পষ্ট। এই দৃষ্টি ওজেনের মনে চকিতে বীভৎস আলোর ঝিলিক ফেলে।

—ছেড়ে দে ওকে। হেঁকে বলে বিয়াশ।

বুকের উপর হাত চেপে থমকে দাঁড়ায় ওজেন। মুখে কোন কথা বলল না।

চিত্রকর তখন বলে, ঐ অর্থলোভী মাদমোয়াজেলের ব্যাপার আজই চুকিয়ে ফেলতে হবে। শুনুন মাদাম ভোকে, এই স্ত্রীলোকটিকে এখুনি যদি বিদায় করে না দেন তো আমরা সবাই চলে যাব। কেউ থাকবে না এখানে! আর সকলের কাছে বলে বেড়াব যে এখানে যত গোয়েন্দা আর কয়েদীর আড্ডা। আপনি যদি ওকে বার করে দেন তো ব্যবসা সম্পর্কে কোন কথা বলব না। কারণ কপালে ছাপমারবার ব্যবস্থা করে কায়েদীদের ভদ্দরলোক হিসাবে মেলা মেশা করার সুযোগ যতদিন বন্ধ করা না হচ্ছে ততদিন এমন ঘটনা তো বড় বড় মহলেও ঘটতে পারে।

এই কথা কাণে আসতেই যেন যাদুবলে মাদাম ভোকের অস্থিরতা কেটে যায়। গা ঝাড়া দিয়ে সোজা হয়ে বসে তিনি এমন একজোড়া চোখ খোলেন যার মধ্যে অশ্রুর কোন চিহ্ন ছিল না।

—হাঁ গো মঁশিয়, তুমি কি আমার বোর্ডিংটির সর্বনাশ করতে চাও নাকি? এই সবে মঁশিয় ভোতর্যাঁর ব্যাপার ঘটে গেল! হারে কপাল, এখনও ওর ভদ্দরলোকের ছদ্ম নামটা মনে আসছে! যাক, তাতে তো একখানা ঘর খালি হল। তুমি এই অসময়ে আরও দুখানা ঘর ভাড়া দেবার ব্যবস্থা করতে চাও নাকি? কোথায় এখন পাব ভাড়াটে? সবাই তো ঘর ঠিক করে নিয়েছে এখন।

—তাহলে চলুন সবাই, যার যার টুপি নিয়ে আমরা প্লাস সর্বসের ফ্লিকতো থেকে খাওয়া দাওয়া সেরে আসি! বিয়াশঁ বলে।

চোখের পলকে মাদাম ভোকে বুঝতে পারলেন যে কোন পথ তার স্বার্থের অনুকূল। সঙ্গে সঙ্গে তিনি মাদমোয়াজেল মিশনোর দিকে এগিয়ে যান।

—শুনছেন, নিশ্চয়ি আপনি আমার ব্যবসা পণ্ড করতে চান না। দেখতেই পাচ্ছেন ভদ্দরলোকেরা আমায় কি বিপদে ফেলেছেন। আজকের রাতের মত নিজের ঘরে যান না!

—তা হবে না—তা হবে না! সমস্বরে চেঁচিয়ে ওঠে ভাড়াটেরা। এক্ষুনি যেতে হবে।

—কিন্তু বেচারার এখনও খাওয়া হয়নি যে! করুণভাবে বলে পোয়ারে।

—খাওয়া হয়নি তো বাইরে যেখানে খুশি খেয়ে নিক! গুটিকয়েক কণ্ঠস্বর একসঙ্গে বলে ওঠে।

—গোয়েন্দা মাগীকে বার করে দাও !

—দুটোকেই একসঙ্গে বিদেয় করে দিতে হবে !

ভালবাসার জোরে নিরীহ ভেড়াও সাহসী হয়ে ওঠে। তেমনি সাহসে স্ফীত হয়ে পোয়ারে বলে, আপনারা শুনুন, দুর্বল নারীর প্রতি শ্রদ্ধা দেখাতে ভুলে যাবেন না !

—গোয়েন্দা-গোয়েন্দা, তার আবার স্ত্রী-পুরুষ কি ! বিয়াশঁ বলে।

—নারীর বাহার কত !

—দে রাস্তায় বার করে !

—এ কিন্তু ভদ্র ব্যবহার করা হচ্ছে না। কোন লোককে যদি বাড়ীর বার করেও দিতে হয় তো তাও ভদ্র আচরণ দেখিয়ে সবিনয়ে করা উচিত। পাওনা টাকা আমরা মিটিয়ে দিয়েছি—এক পাও নড়ব না এখান থেকে! টুপিটা পরে মাদমোয়াজেল মিশনোর পাশে একখানা চেয়ারে গ্যাঁট হয়ে বসে পড়ে পোয়ারে। মাদাম ভোকে তখন উপদেশ দিচ্ছিলেন মাদমোয়াজেলকে।

—বাহাদুর ছেলে বটে ! এখনও মানে মানে পালাও বলছি। জড়ানো গলায় বলে চিত্রকর।

—বেশ, না যাও তো আমরাই যাচ্ছি ! বিয়াশঁ বলে। ভাড়াটেরা একযোগে তখন বৈঠকখানার দিকে অগ্রসর হয়।

—এই অবস্থায় আমার কাছ থেকে আপনি কি প্রত্যাশা করেন মাদমোয়াজেল ! তারস্বরে চেঁচিয়ে ওঠেন মাদাম ভোকে।—সবই গেল আমার ! না, এখানে আপনি থাকতে পারবেন না। ওদের এখন মাথার ঠিক নেই, একটা মারপিট না করে নিরস্ত হবে না।

মাদমোয়াজেল মিশনো উঠে দাঁড়ান। চারিদিক থেকে তখন ধ্বনি ওঠে; 'ওই চলেছে !' 'কোথায় যাচ্ছে ?' নিশ্চয় যাচ্ছে !' 'যাচ্ছে না !' এইভাবে উক্তি ও প্রতিবাদের এক তুমুল চেঁচামেচি শুরু হয়। এবং এই উপলক্ষ্যে মহিলাটিকে কি কি করা হবে বলে যে সব মন্তব্য করা হয়, সেই প্রসঙ্গে তার প্রতি বিদ্বেষের মাত্রা বেশ কিছুটা চড়ে যায় মাদমোয়াজেল মিশনো বুঝতে পারেন যে চলে যাওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। কিন্তু যাবার আগে মাদাম ভোকেকে চাপাগলায় গুটিকয়েক কড়া কথা না শুনিয়ে ছাড়লেন না। ভয় দেখাবার ভঙ্গীতে বললেন, মাদাম ব্যুনোর ওখানে যাচ্ছি আমি ?

মাদাম ব্যুনের বোর্ডিংটি মাদাম ভোকের বোর্ডিংএর প্রতিদ্বন্দ্বী। স্বভাবতই

মাদাম ভোকে তার প্রতি ঘৃণা পোষণ করেন। আর মাদমোয়াজেলের হুমকির জবাবে তিনি বলেন, যেখানে খুশি আপনি যেতে পারেন মাদমোয়াজেল। ভালই তো, ব্যুনোর ওখানেই যান। ওখানকার মদ পেটে পড়লে রাম ছাগলও নাচতে শুরু করে আর খাবার দাবারও আসে খিড়কির দোরের ফেরিওয়ালাদের কাছ থেকে।

মাদমোয়াজেলকে পথ করে দেবার জন্য ভাড়াটেরা নীরবে দুটি সার বেঁধে দাঁড়াল। এমন সতৃষ্ণ দৃষ্টিতে পোয়ারে মাদমোয়াজেল মিশনোর দিকে তাকায়, তার পেছু পেছু যাওয়া ঠিক হবে কি না স্থির করতে না পেরে এমন অব্যবস্থিত ভাব দেখায় যে মহিলাটি চলে যাওয়ায় প্রসন্ন ভাড়াটেরা পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে মুখ টিপে হাসহাসি করে।

চিত্রকর তখন তার পেছনে লেগে বলে ওঠে, হায় হায় হায়রে! এখনও বসে আছ পোয়ারে! দৌড় দাও···দৌড় দাও!

যাদুঘরের কর্মচারীটি ব্যঙ্গের সুরে সুপরিচিত একটি গান ধরে দেয়:

রূপসী তরুণী দুর্ণোয়া
এখুনি চলে যাবে সিরিয়া···

—আর বসে আছ কেন পোয়ারে! যাবার জন্য তো মন উড়ু উড়ু করছে! বিয়াশঁ বলে।—সবাই নিজের খেয়ালে চলে!

—হাঁ হে, ভার্জিল বলেছেন, সবাই চলে নিজের খেয়ালে! শিক্ষক বলে ওঠে।

মাদমোয়াজেল মিশনো এই সময় পোয়ারের দিকে চেয়ে তার হাত ধরবার মত একটা ভঙ্গী করেন। এই আবেদন উপেক্ষা করা পোয়ারের মত লোকের অসাধ্য। এক পা এগিয়ে সে মাদমোয়াজেলের দিকে বাহু বাড়িয়ে দেয়। সঙ্গে সঙ্গে ভাড়াটেদের মধ্যে তুমুল হর্ষধ্বনি ওঠে এবং পর মুহূর্তেই বিকট হাসির রোল পড়ে যায়।

—সাবাস পোয়ারে!

—বড় ভাল মানুষ পোয়ারে!

—কেন হে, এপোলো বললেই বা দোষ কি?

—মার্স ও বলতে পার!

—সত্যিকারের বীরপুরুষ পোয়ারে।

এই সময় মাদাম ভোকের নামে একখানা চিঠি নিয়ে একটি পিওন আসে। চিঠিখানা পড়ে মাদাম ধপ্ করে চেয়ারে এলিয়ে পড়েন।

—এখন একদিন বাড়ীখানা পুড়িয়ে দিলেই হয়ে যায়। সেইটাই বাকী আছে এখনও। একটার পর একটা বজ্রাঘাত হচ্ছে। তিনটের সময় ছোট তাইফের মারা গেছে। ঐ দুটি মহিলার মঙ্গল কামনা করে শেষ অবধি এই হল। মাদাম কুত্যুর আর ভিকতরিন তাদের জিনিস পত্তর পাঠিয়ে দেবার কথা লিখেছে। এখন থেকে ভিকতরিন বাপের কাছেই থাকবে। আর ভিকতরিনের বাবাও বিধবা কুত্যুরকে মেয়ের সঙ্গিনী হিসাবে রাখতে রাজী হয়েছে। ব্যস, চার চারটি ঘর খালি! পাঁচটি ভাড়াটে গেল!

মাদাম ভোকে সোজা হয়ে বসেন। মনে হল, এখুনি কান্নায় ভেঙে পড়বেন।

—না, আমার এই বোর্ডিংএ অভিশাপ লেগেছে দেখছি।

এই সময় বাইরে একখানা গাড়ি এগিয়ে আসার শব্দ শোনা যায়।

—আবার কার বিপদের সংবাদ এল কে জানে? সিলভি বলে।

দোর গোড়ায় সহসা বুড়ো গোরিওর প্রদীপ্ত মুখখানা দেখা যায়। আনন্দে ফেটে পড়ছে বৃদ্ধ! নতুন জীবন লাভ করেছে যেন।

—গোরিও গাড়িতে এল! মহাপ্রলয়ের দিন এগিয়ে এল নাকি? ভাড়াটেরা বলে।

সরাসরি রাস্তিঞ্চাকের দিকে এগিয়ে গিয়ে তার হাত ধরল বৃদ্ধ। চিন্তিত ভাবে এক কোণে দাঁড়িয়েছিল ওজেন।

—চল হে! সোৎসাহে আহ্বান জানায় বৃদ্ধ।

—এদিকের সংবাদ এখনও শোনেননি তাহলে? ওজেন বলে।—ভোতর‍্যাঁ কয়েদী ছিল, এখুনি তাকে ধরে নিয়ে গেল; আর ছোট তাইফেরও মারা গেছে।

—বেশ তো, তাতে আমার কি? আমাদের কি সম্পর্ক আছে তার সঙ্গে। গোরিও বলে।—তোমার নিজের বাড়ীতে আজ মেয়ের সঙ্গে বসে খাওয়া-দাওয়া করব, বুঝলে? চল, তোমার জন্য সে বসে আছে!

এমন ভাবে সে রাস্তিঞ্চাকের হাত ধরে টান দিল যে তার সঙ্গে না গিয়ে উপায় ছিল না। প্রণয়ী যেমন প্রেমিকাকে হরণ করে ছুটে পালায় তেমনি ভাবেই ওজেনকে নিয়ে চলে গেল বৃদ্ধ।

—এস, এইবার খাওয়া-দাওয়া করা যাক। চিত্রকর ডাক দিয়ে বলে। সবাই তখন চেয়ার টেনে নিয়ে টেবিলে বসে যায়।

—শুনুন, আগে থাকতেই আমি বলে রাখছি, আজ সব কিছুতেই ভণ্ডুল লেগেছে। সিলভি বলে।—ভেড়ার মাংসটাও সস্প্যানে লেগে পুড়ে গেছে। কি করব বলুন! পোড়া লাগা মাংসই আজ খেতে হবে আপনাদের।

টেবিলের চারপাশে যেখানে আঠার জন লোক বসা উচিত সেইখানে দশজন দেখে মাদাম ভোকে এত দমে গিয়েছিলেন যে তিনি কোন কথাই বললেন না। কিন্তু সকলেই তাকে প্রবোধ দিয়ে চাঙ্গা করার চেষ্টা করে। আজকের ঘটনা আর ভোতরঁ্যাকে নিয়ে আলোচনা শুরু হলেও আঁকা বাঁকা পথ ঘুরে অলক্ষ্যে সে কথা শেষ পর্যন্ত দ্বন্দ্বযুদ্ধ, কারাগার, বিচার-ব্যবস্থা কারাজীবন আর আইন-সংশোধনের প্রয়োজনীয়তার আলোচনায় পর্যবসিত হয়। অচিরেই জাক কোলঁা, ভিকতরিন আর তার ভাই এদের মন থেকে বহু দূরে সরে যায়। মাথা গুণতিতে দশজন হলেও চেঁচামেচি এরা বিশজনের মতই করে। আর চেঁচামেচির মাত্রাটাও আজ অন্যান্য দিনের চাইতে বেশ কিছুটা বেড়ে যায়। এই চেঁচামেচিই অন্যান্য দিনের ডিনারের তুলনায় আজকের খাওয়া-দাওয়ায় বিশিষ্টতা দান করে। আগামী কাল এই স্বার্থপর জাহাজীরা নতুন শিকার ধরবে, পারির সেদিনকার ঘটনার মধ্য থেকে কুড়িয়ে আলাদা টুকিটাকি জিনিস চিবোবে। আজকেও অন্যান্যের ভাগ্যের প্রতি এদের স্বাভাবিক উদাসীনতারভাব পূরোমাত্রায় বহাল থাকে। মাদাম ভোকেও মুটকী সিলভির প্রবোধে আশার সান্ত্বনা পেয়ে আশ্বস্ত বোধ করেন।

আজকের গোটা দিনের ঘটনাবলী, নাটকীয় দৃশ্য আর লোকজনের আনাগোনা বিভীষিকার মিছিলের মত ওজেনের হতভম্ব দৃষ্টির সামনে দিয়ে চলে গেছে। দিন এখনও শেষ হয়নি। দৃঢ় ইচ্ছা শক্তি আর সুস্থ মস্তিষ্ক সত্ত্বেও এলোমেলো চিন্তার জট সে কিছুতেই খুলতে পারছে না। প্রথমে বুড়ো গোরিওর পাশে গাড়িতে বসে যখন তার উচ্ছ্বসিত কথাবার্তা শোনে সেই থেকেই এই বিভ্রান্তির সূচনা। ভাবাবেগে মুহ্যমান ওজেনের কাছে সে সব কথা স্বপ্ন বলে মনে হয়েছে।

—আজ সকালেই সব ব্যবস্থা হয়ে গেছে। আজ আমরা তিনজনে একসঙ্গে বসে খাওয়া-দাওয়া করছি। বুঝলে হে, একসঙ্গে বসে। আজ চার বছর হল আমি আমার দেলফিনের সঙ্গে একত্রে খাইনি। সকাল থেকেই আমরা তোমার ঘরে ছিলাম। কোট খুলে আমি কুলির মত খেটেছি। নিজে আসবাবপত্তর আনতে সাহায্য করেছি। তুমি জান না, খাবার সময় সে কি

মধুর ব্যবহার করে। কত যে আদর করবে, কত দেখাশোনা করবে! বলবে, এইটে খেয়ে দেখ বাবা, বড় ভাল জিনিস! তারপর আর আমি খেতে পারি না। আজ সে আনন্দ পাব, বহুদিন তেমন সুখ আমার ভাগ্যে জোটেনি!

—গোটা দুনিয়া আজ ওলট-পালট হয়ে গেল নাকি? ওজেন বলে।

—ওলট-পালট হয়ে গেল বল কি? গোরিও বলে।—আগে কোনদিন দুনিয়া এমন স্বাভাবিক, এত প্রকৃতিস্থ, এমন আনন্দময় হয়নি। রাস্তায় আজ আমি শুধু হাসিভরা মুখ দেখছি। সবাই যেন করমর্দন আর কোলাকুলি করছে। সকলের মুখ এত প্রসন্ন যেন সবাই আজ মেয়ের সঙ্গে খেতে যাচ্ছে। আর আমি নিজের কানে শুনেছি, কাফে দেজাঁগ্‌লে থেকে ভাল খাবার আনার জন্য সে হুকুম দিয়েছে। তা যাই বল, ওর সঙ্গে থাকলে তেতো জিনিসও মধুর মত মিষ্টি লাগবে।

—মনে হচ্ছে, আবার আমি যেন জীবন ফিরে পাচ্ছি। ওজেন বলে।

—জলদি চালাও কোচোয়ান! সামনের জানালা খুলে হেঁকে বলে গোরিও।

—আরও জলদি চল। দশ মিনিটের মধ্যে যদি আমাদের পৌছে দিতে পার তো তোমায় আরও চল্লিশ ফ্রাঁ দেব। কোথায় যেতে হবে তোমার জানাই আছে।

বক্‌শিসের কথা শুনে কোচোয়ান আরও জোরে ঘোড়ার পিঠে চাবুক মারে এবং বিদ্যুতবেগে প্যারির মধ্য দিয়ে ছুটে যায়।

—টোপ গিলেছে লোকটা! গোরিও বলে।

—কিন্তু এ আপনি আমায় কোথায় নিয়ে চলেছেন? ওজেন জিজ্ঞাসা করে।

—তোমার নিজের বাড়ীতে। গোরিও জানায়।

রুম দার্তোয়ায় গাড়ি থামে। বুড়োই আগে নেমে বেহিসেবী লোকের মত কোচোয়ানের দিকে দশ ফ্রাঁ ছুড়ে মারে। ঘরে তো আর বউ নেই যে বেপরোয়া বদান্যতার অতি-ব্যয় বন্ধ করবে! ছোটোখাটো ব্যাপার নিয়ে ওরাই তো বেশী মাথা ঘামায়।

—উপরে যাবে চল। রাস্তিঞাককে ডেকে বলে বৃদ্ধ। তারপর উঠোন পার হয়ে তাকে নতুন একটা বাড়ীর পেছনের দিকের তেতলার পথ দেখিয়ে নিয়ে যায়। দেখতেও ভাল বাড়ীখানি। গোরিও বেল বাজাবার আগেই মাদাম দ নুসাঁজাঁর পরিচারিকা তেরেস্‌ দরজা খুলে দেয়। ভেতরে ঢুকে ওজেন তো অবাক। অবিবাহিতের পক্ষে চমৎকার বাসা! দরদালান সহ বেশ

কয়েকখানি ঘর আছে। শোবার ঘর, ছোট্ট একখানি বৈঠকখানা আর বাগানের মুখোমুখি পড়বার ঘরও আছে একটা। বৈঠকখানার আসবাবপত্র আর সাজ-সজ্জার সঙ্গে পারির যে কোন সেরা মনোরম বৈঠকখানার তুলনা করা চলে। এই ঘরেই মোমবাতির আলোয় সে দেলফিনকে দেখতে পায়। ওজেনকে দেখে আগুনের পাশের একখানা নীচু চেয়ার থেকে উঠে সে চুল্লীর উপরের তাকে পরদা রেখে দেয়। দরদভরা গলায় বলে, মশাইকে ডেকে আনতে হল তো! এখন বুঝছেন কেন?

তেরেস বেরিয়ে যায়। দেলফিনের হাত ধরে গাঢ় আলিঙ্গনে তাকে বুকে টেনে এনে নীরবে আদর করে ওজেন। চোখ দিয়ে জলও গড়িয়ে পড়ে আনন্দে। আজকের এই ঝামেলভরা দিনে তার মন-মেজাজ এত উত্তেজিত এতটা শ্রান্ত হয়ে পড়েছিল যে চোখের সামনের এই দৃশ্য আর আগেকার ঝঞ্ঝাটের বৈসাদৃশ্য তার মনের উপর দুর্বহ বোঝা চাপিয়ে দেয়। ক্লান্ত স্নায়ুমণ্ডলী আর সে বোঝার চাপ সইতে পারল না।

—ভালমতই আমি জানতাম যে ও তোমায় ভালবাসে। চাপাগলায় মেয়েকে বলে গোরিও। এদিকে হতভম্ব ওজেন সোফার উপর নেতিয়ে পড়ে। কথা বলবার ক্ষমতা সে হারিয়ে ফেলেছে। তাছাড়া যে যাদুদণ্ডের প্রভাবে আজকের দিনের এই শেষ পরিণতি সম্ভব হল, তারও মাথামুণ্ডু বোধগম্য হচ্ছিল না।

—বেশ তো! এস, ঘর দেখবে এস! হাত ধরে মাদাম দ নুসঁজাঁ তাকে আর একখানা ঘরের মধ্যে নিয়ে যায়। এ ঘর মোটামুটি মাদামের নিজের ঘরের মত।

—বিছানা নেই তো! রাস্তিঞাক বলে।

—না মশাই, নেই। আরও জোরে তার হাতে চাপ দিয়ে বলে দেলফিন। মুখখানা লজ্জায় রাঙা হয়ে ওঠে।

ওজেন সেই মুখের দিকে তাকায়। এখনও কাঁচা বয়স তার। তাই ভালবাসায় উদ্বেল নারীর অন্তরের আসল লজ্জা উপলব্ধি করতে ভুল হল না।

—তোমার মত মেয়ে চিরদিনই পুরুষের পূজা পায়। কানে কানে বলে ওজেন।

—হাঁ, দুজনের মধ্যে পুরোপুরি সমঝোতা আছে বলেই জোর করে বলতে পারছি। ভালবাসা যত প্রগাঢ়, যত প্রবল হবে ততই সে ভালবাসা আরও প্রচ্ছন্ন আরও রহস্যময় রূপ পায়। আমাদের এই রহস্যের আর কোন ভাগীদার করা চলবে না কিন্তু!

—বাঃ! আমার কথা যে ভুলেই গেলে! মনে হচ্ছে আমি যেন কেউ নই। বুড়ো গোরিও অনুযোগ জানায়।

—আপনি তো জানেন যে আমরা বলতে আপনাকেও বোঝায়!

—এই কথাটাই তো শুনতে চেয়েছিলাম। আমার দিকে কোন খেয়ালই থাকবে না; থাকবে কি? আমি পরীর মত আসা-যাওয়া করব। অদৃশ্যই থাকব; তবে সর্বত্রই আমার উপস্থিতি টের পাবে। আচ্ছা দেলফিনেৎ—নিনেৎ—দেদেল, আমি ঠিক বলিনি যে রুয় দার্তোয়ায় ভাল খানকয়েক ঘর আছে, আয়, আমরা ওর জন্য ঘর কখানা সাজিয়ে গুছিয়ে রাখি! তুই তো প্রথম রাজী হতে চাসনি। দেখলি তো, আমি যেমন তোকে জীবন দিয়েছি, তেমনি সুখের ব্যবস্থাও করে দিলাম। কোন বাপ যদি সুখী হতে চায় তো সব সময় তাকে দিয়ে যেতে হবে! ক্ষান্তিহীন দানের মধ্য দিয়েই সত্যিকারের বাপ হওয়া যায়।

—এই ভাবেই ব্যবস্থা হয়েছিল নাকি! ওজেন বলে।

—তবে, ও তো এ প্রস্তাবে কানই দেয় নি। ভয় হচ্ছিল, লোকে ওর সম্পর্কে যা তা বলবে। যেন সুখের চাইতে লোকের কথার মূল্য বেশী! ও যা করছে, সব স্ত্রীলোকেই তার স্বপ্ন দেখে।

আপন মনেই বলে যাচ্ছিল গোরিও। কারণ মাদাম দ নুসাঁজাঁ ইতিমধ্যে ওজেনকে পড়ার ঘরে নিয়ে গিয়েছিল। সহসা বুড়োর কানে একটি চুমুর শব্দ আসে। খুব সন্তর্পণেই দেওয়া হয়েছে চুমুটি। তবু শব্দ শোনা যায়।

পড়ার ঘরটিও অন্যান্য ঘরের সঙ্গে মানানসই। সত্যিই কোন খুঁত ধরা যায় না।

—তোমার পছন্দ আন্দাজ করতে কোন ভুল করেছি কি? খাওয়া-দাওয়ার জন্য বৈঠকখানায় ফিরে এসে দেলফিন বলে।

—ভুল করবে কি? আন্দাজটা বড্ড বেশী ঠিক হয়ে গেছে। ঘরগুলো এমন সাজান-গোছান যে অনায়াসেই একে স্পেনের প্রাসাদের সঙ্গে তুলনা করা যায়। সৌখীন জীবন সম্পর্কে মনে মনে যুবকেরা যে ছবি আঁকে তার সবটাই তো রয়েছে এখানে। এত ভাল আমার লেগেছে যে নিজের বলে মনে করতে ভরসা হচ্ছে না। কিন্তু তোমার কাছ থেকে এ জিনিস আমি নিতে পারি না। এখনও আমি এত গরীব যে……

—ও, এর মধ্যেই আমার বিরোধিতা শুরু করেছ তাহলে? দুর্ভাবনার অস্তিত্ব

হেসে উড়িয়ে দেবার জন্য মেয়েরা যেমন মধুর ভাবে মুখ কোঁচকায়, ঠিক তেমনি ভাবে ঠোঁট বাঁকিয়ে কতকট বিরক্তিকর কর্তৃত্বের ভঙ্গীতে বলে দেলফিন। কিন্তু এই মধুর ছেনালীতে ওজেনের মন ভিজল না। কিছুতেই সে নিজের ন্যায়-অন্যায় বোধ ত্যাগ করতে পারল না। সকাল বেলার আত্ম বিশ্লেষণের কথা এখনও মনে আছে। ভোতর‍্যাঁর গ্রেপ্তার থেকে বুঝেছে, কি ভয়ঙ্কর অন্ধকার গহ্বরে পতনের হাত থেকে সামান্যের জন্য সে রক্ষা পেয়ে গেছে। তাই সে বুঝতে পেরেছে, নিজের সঙ্কোচ আর সৎ প্রবৃত্তি তাকে যে পথের সন্ধান দিয়েছে সেই পথই ঠিক। গভীর বিষণ্নতা তাকে অভিভূত করে ফেলে।

মাদাম দ নুসাঁজা তখন বলেন, কি গো, সত্যিই নেবে না নাকি? এ আপত্তির মানে কি খেয়াল আছে? এর মানে, ভবিষ্যৎ সম্পর্কে এখনও তুমি সন্দিগ্ধ।

—আমার সঙ্গে জড়িয়ে পড়বার সাহস তোমার নেই। পরে আমি সরে পড়ব বলে ভয় করছ কি? যদি আমায় ভালবাস···আমিও যদি তোমায় ভালবাসি তো এই সামান্য জিনিস গ্রহণ করতে সঙ্কোচ করা উচিত নয়। যদি জানতে, অবিবাহিতের উপযোগী তোমার এই ঘরদোর সাজাতে খুশিমনে আমি কত খেটেছি, নিশ্চয়ি তাহলে এতক্ষণ ইতস্তত করতে না। অনেক আগেই তাহলে এতক্ষণ ইতস্তত করার জন্য মার্জনা চাইতে।

—তোমার টাকা ছিল আমার কাছে। তার সবটাই খরচ করেছি এজন্য। ভাবছ, তুমি মহত্ত্ব দেখাচ্ছ; কিন্তু এ নীচতা। অনেক বেশী পেতে চাও তুমি। ওজেনের আবেগভরা চাহনি দেখে টেনে শ্বাস ছাড়ে দেলফিন। আর এই সামান্য জিনিস নিয়ে বাড়াবাড়ি করছ! অবিশ্যি, আমায় যদি ভাল না বাস তো আপত্তি করার অধিকার তোমার নিশ্চয়ই আছে। তোমার কথার উপর আমার ভাগ্য নির্ভর করছে। কি বলবে বলে ফেল। আপনি ওকে বুঝিয়ে দিন না বাবা! একটু হেসে গোরিওর দিকে ফিরে বলে দেলফিন।—ওর কি ধারণা যে, মেয়েদের ইজ্জৎ সম্পর্কে ওর চাইতে আমি কম সচেতন।

হাসিভরা মুখে বসে বসে প্রেমিক-প্রেমিকার এই কলহ শুনছিল গোরিও।

ওজেনের হাত ধরে আবারও বলে দেলফিন, নেহাৎ ছেলেমানুষ তুমি! জীবনের পথে পা বাড়াতে চলেছ। সামনে যে বাধা দেখছ, অপর লোকের পক্ষে সে বাধা অতিক্রম করা সাধ্যের অতীত। একটি নারী হাত বাড়িয়ে তোমার পথের আগল সরিয়ে দিতে চায়, আর তুমি পিছিয়ে যাচ্ছ! তোমার

সাফল্য অনিবার্য—তোমার কর্মজীবনের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল না হয়ে পারে না। তোমার উন্নত কপাল সাফল্যের স্বাক্ষর বহন করছে। কাজেই আজ যদি কোন সাহায্য আমি করি, ভবিষ্যতে সে ঋণ শোধ করতে পারবে না কি? আগের দিনে নারীর হয়ে লড়াই করার জন্য প্রণয়িনীরা তাদের নাইটদের তরোয়াল, শিরস্ত্রাণ, কবচ, ঘোড়া যোগাত না কি? ভেবে দেখ ওজেন, আজ যা তোমায় দিচ্ছি তা এ যুগের বর্ম। গণ্যমান্য লোক হতে গেলে এই হাতিয়ার একান্ত প্রয়োজন। বাবার ঘরের মত যদি না হয় তো তোমার এখনকার বাসা অবশ্যই মনোরম হবে! আরে, আজ আর খাওয়া-দাওয়া হবে না নাকি? এস, বসি গে' চল! তুমি আমায় পাগল করতে চাও নাকি? বল, জবাব দাও! ওজেনের হাতে কয়েকটা ঝাঁকানি দিয়ে সে জিজ্ঞাসা করে।

—দোহাই ঈশ্বরের বাবা, ওকে মনস্থির করতে সাহায্য কর না। নাহলে আমি এখুনি চলে যাব, আর কোনদিন ওর মুখ দেখব না।

স্বপ্নের ঘোর কাটিয়ে বুড়ো গোরিও তখন বলে, আচ্ছা, তোর হয়ে আমিই সব ঠিক করে দিচ্ছি। আচ্ছা মঁশিয় ওজেন, বলত ডিয়ার, তুমি তো ইহুদি মহাজনের কাছ থেকে টাকা ধার করতে চাইছ। চাইছ না?

—না করে উপায় কি? ওজেন বলে।

—বেশ, তাহলে তো তুমি আমার খদ্দের হলে। পকেট থেকে একখানা নোংরা সস্তা খুয়ে-যাওয়া চামড়ার বাঁধাই নোট বই বার করে সহৃদয় বৃদ্ধ বলে।—নিজেই আমি ইহুদি সেজেছি। এই ছাখ, বিলের টাকা শোধ করে দিয়ে এসেছি। এখানকার কোন জিনিসের জন্য এক কপর্দকও কেউ পাবে না তোমার কাছে। তা খুব বেশী খরচ হয়নি। বড় জোর হাজার পাঁচেক ফ্রাঁ। আমিই ধার দেব তোমাকে। আমার কাছ থেকে নিতে তো আর আপত্তি নেই—আমি স্ত্রীলোক নই। এক টুকরো কাগজে তুমি প্রাপ্তি স্বীকার করে রসিদ দিতে পার, তারপর যখন সম্ভব শোধ করে দিও।

ওজেন ও দেলফিন পরম বিস্ময়ে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে। সহসা উভয়ের চোখেই জল দেখা দেয়। গোরিওর দিকে হাত বাড়িয়ে সাগ্রহে তার হাত চেপে ধরে ওজেন।

—এর মানে কি? তোমরা আমার সন্তান নও? গোরিও বলে।

—কিন্তু বাবা এত টাকা তুমি যোগাড় করলে কি করে? মাদাম দ নুসিঁজা জিজ্ঞাসা করে।

—বলছি। যখনই ওকে তোর কাছাকাছি আনবার প্রস্তাবে তোকে রাজী করাতে পারলাম, আর নিজের চোখে দেখলাম যে কনের ঘর সাজাবার মত আগ্রহ নিয়ে তুই জিনিস-পত্তর কিনছিস, তখনই মনে মনে ভাবলাম, নিশ্চয় তুই অসুবিধায় আটকে পড়বি। উকীল বলছে যে তোর স্বামীর হাত থেকে তোর নিজের সম্পত্তি মুক্ত করতে মাস ছয়েক লাগবে। ভাল কথা। আমি তখন আমার সাড়ে তেরশ লিভার আয়ের লগ্নী টাকা বেচে দিয়ে পনর হাজার ক্রাঁর বিনিময়ে নিজের জন্য বছরে বার শ' ক্রাঁ বৃত্তির ব্যবস্থা করেছি আর বাকী মূলধন দিয়ে তোর দোকানদারদের পাওনা শোধ করেছি। আমার কথা যদি বলিস তো বছরে দেড়শ ক্রাঁ ভাড়ায় আমি উপরের একখানা ঘর ঠিক করেছি আর রোজ দু' ক্রাঁ হলে আমি রাজার হালে থাকতে পারব। তাতেও কিছু কিছু বাঁচবে। কোন পোশাক-আশাক আমার ছেঁড়ে না, কাজেই নতুন পোশাক কেনার ঝামেলা নেই। গত এক পক্ষ ধরে—মনের আনন্দে আমি ভাবছি। কত সুখীই যে হবে ওরা! এখন বল তো তোরা সুখী হয়েছিস কি না?

—বাবা—বাবা! বৃদ্ধের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে মাদাম দ নুস্যাঁজাঁ। বুড়ো তাকে হাঁটুর উপর তুলে নেয়। চুমোয় চুমোয় বৃদ্ধের মুখ ভরে দেয় দেলফিন। তার সুন্দর চুলের খোপনা বাপের গালে লুটিয়ে পড়ে। চোখের জল গড়িয়ে পড়ে বৃদ্ধের আনন্দোজ্জ্বল মুখে।

—কি আর তোমায় বলব বাবা! তুমিই সত্যিকারের বাপ হবার যোগ্য। সারা দুনিয়ায় তোমার জুড়ি নেই। আগে থাকতেই ওজেন তোমায় একান্তভাবে ভালবাসে, এখন সে কি চোখে দেখবে?

দশ বছরের মধ্যে মেয়েকে বুকে জড়িয়ে ধরে তার হৃদয়ের স্পন্দন অনুভব করতে পারেনি বৃদ্ধ। তাই দুঃসহ আনন্দে বলে ওঠে, ওরে খুকী, ওরে দেলফিনেৎ, আমায় কি মেরে ফেলতে চাস্? এত আনন্দ এ বুকে ধরবে কেন? ভেঙে পড়বে, ভেঙে পড়বে! শোন মঁশিয় ওজেন, তোমার ধার শোধ হয়ে গেছে! আত্মহারা বৃদ্ধ তখন এমন দৃঢ়ভাবে মেয়েকে জড়িয়ে ধরে যে দেলফিন চীৎকার করে ওঠে: কি করছ, লাগে যে!

—লাগছে? তোকে ব্যথা দিলাম! হকচকিয়ে উঠে বিষণ্ণভাবে বলে বৃদ্ধ! অমানবীয় ব্যথাভরা কাতর দৃষ্টিতে সে মেয়ের দিকে তাকায়। বৃদ্ধের মুখের ব্যঞ্জনা এমন ব্যথাতুর ছিল যে ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। মানুষের জন্য

মানুষের ত্রাণকর্তা যে ব্যথা সয়েছিলেন, সেরা শিল্পীদের কল্পনায় সেই ব্যথা যে অপরূপ রূপ পেয়েছে, খ্রীস্টের মত এই পিতার ব্যথার সঙ্গে একমাত্র সেই মহান বেদনার সাদৃশ্য আছে। রূঢ়ভাবে আঙুল দিয়ে যে কোমর সে জোরে চেপে ধরেছিল, মৃদুভাবে সেই কোমরে আবার সে চুমু খায়।

—না, না, তোকে আমি ব্যথা দেইনি নিশ্চয়ই! দিয়েছি? জিজ্ঞাসুভাবে হেসে বলে বৃদ্ধ।—তোর ঐ চীৎকারে আমি নিজেই ব্যথা পেয়েছি। জিনিস-পত্তরের দাম ওর চাইতেও বেশী। সন্তর্পণে চুমু খেয়ে মেয়ের কানে কানে জানায় বৃদ্ধ। —কিন্তু ওর চোখে খানিকটা ধুলো না দিলে বিরক্ত হত।

লোকটার অফুরন্ত স্নেহ দেখে হতবাক হয়ে যায় ওজেন। শ্রদ্ধায় অভিভূত হয়ে নির্ণিমেষে চেয়ে থাকে তার দিকে। শুধু ধর্মের ব্যাপারেই এমন প্রবল টান অনুভব করে যুবকেরা।

—আমায় এর যোগ্য হতে হবে। সহসা সে বলে ওঠে।

—সাবাস ওজেন, এই তো কথার মত কথা। ছাত্রটির কপালে চুমু খায় মাদাম দ নুস্যাঁজাঁ।

—তোমার জন্য মাদমোয়াজেল তাইফের আর তার লক্ষ লক্ষ টাকার বৈভব পায়ে ঠেলে ফেলেছে ওজেন। বুড়ো গোরিও জানায়।—হাঁ হে, মেয়েটি তোমার প্রেমে পড়েছিল। এখন তার অবস্থা ভাব, ভাই মরে গিয়ে এখন ক্রিসাসের মত ধনী হয়ে পড়েছে।

—আঃ, সে কথা আর তুলছেন কেন? রাস্তিঞাক আপত্তি জানায়।

দেলফিন তখন তার কানে কানে বলে, আজ সন্ধ্যায় তাহলে আমার একটা দুঃখ রয়ে গেল ওজেন! এই ব্যাপার! আজ থেকে মন-প্রাণ দিয়ে তোমায় ভালবাসব—আজীবন বেসে যাব!

—তোমার আর তোমার দিদির বিয়ের পর এর চাইতে সুখের দিন আমার জীবনে আসেনি। গোরিও বলে ওঠে।—এখন ভগবান আমায় যত খুশি দুঃখ দিতে পারেন। তবে তোমাদের জন্য কষ্ট পেতে হয় না যেন। আমি শুধু বলব, এই ফেব্রুয়ারি মাসে যে সুখ আমি পেয়েছি, গোটা জীবনে মানুষ এত সুখ পায় না। আমার দিকে চাও তো দেলফিন। মেয়েকে বলে বৃদ্ধ।

—সত্যিই রূপসী, তাই না? সত্যি বলত, এমন সুন্দর রঙ আর গালের অমন টোল জীবনে দেখেছ কোনদিন? নিশ্চয় খুব বেশী দেখনি। তাই না? আর একবার ভাব তো, আমারই ঔরসে জন্মেছে এই অপরূপ সুন্দরী! এখন

তোমার সঙ্গ লাভ করে যে সুখ পাবে তাতে ওকে হাজার গুণ সুন্দর দেখাবে। জান পোড়শী, এখন আমি হাসতে হাসতে নরকে যেতে পারি। আমার পুণ্যের ভাগ যদি চাও তো অকাতরে দিয়ে দেব। এস, এইবার যাওয়া যাক! কথার অর্থ খেয়াল না করেই বলে যায় বৃদ্ধ। বলে, সবই আমাদের।

—আহা, বাবা বেচারি কত যে ভাল!

তখন মেয়ের কাছে উঠে গিয়ে, তার হাত ধরে চুলের মধ্যে সস্নেহে চুমু খেয়ে বৃদ্ধ বলে, যদি বুঝতিস মেয়ে যে কত সহজে আমায় সুখী করতে পারিস! যাক্, যখন হয় আমার সঙ্গে দেখা করিস! আমি তোদের উপরেই থাকব। একপা'র বেশী যেতে হবে না। কথা দে, যাবি!

—যাব বাবা! বড় স্নেহময় তুমি!

—আবার বল!

—আবারও বলছি, বড় দয়ালু, বড় স্নেহময় বাপ তুমি!

—ব্যস্, ওতেই হবে। আমার নিজের বুকে যদি কান পাতি তো তোকে হাজার বার বলতে হবে। আয়, এবার যাওয়া যাক।

সেদিন সন্ধ্যায় তিনজনেই ছেলেমানুষীর চূড়ান্ত করে। বুড়ো গোরিও বড় কম আত্মহারা হয় নি। মেয়ের পায়ের কাছে শুয়ে সে তার পায়ে চুমু খায়, একদৃষ্টে চেয়ে থাকে মেয়ের আয়ত চোখের দিকে—তার পোশাক মাথায় রগড়ায়। এক কথায়, কোন তরুণ প্রেমিকও সেদিন গোরিওর চাইতে বেশী দরদ দেখাতে কি বেশী ভাঁড়ামি করতে পারত না।

—একটা কথা শোন। ওজেনকে বলে দেলফিন।—বাবা উপস্থিত থাকলে কিন্তু আমি তার দিকেই সব নজর দেব। ব্যাপারটা মাঝে মাঝে বিরক্তিকর লাগতে পারে।

ইতিমধ্যেই বার কয়েক হিংসার খোঁচা টের পেয়েছে ওজেন। তবু এই মনোভাব সম্পর্কে ঝগড়া করার ইচ্ছা হল না, যদিও কথাটার মধ্যে সমস্ত অকৃতজ্ঞতার বীজ নিহিত।

—ঘর-সাজান কবে শেষ হবে? চারদিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করে ওজেন।

—আজ তো এখানে থাকা চলবে না, তাই না?

—হাঁ। কিন্তু কাল আমার সঙ্গে খেতে আসবে তো! সসঙ্কোচে প্রশ্ন করে দেলফিন।—কালকে আমরা দুজনেই ইতালিয়াঁয় যাব।

—আর আমি যাব গহ্বরে। গোরিও বলে।

দেখতে দেখতে দুপুর রাত হয়ে যায়। মাদাম দুস্ঁ্যাজাঁর গাড়ি বাইরে অপেক্ষা করছিল। বুড়ো গোরিও আর ওজেন একসাথেই হেঁটে মেজঁ ভোকেতে ফিরে আসে। পথে যেতে যেতে দেলফিনের বিষয়ে আলোচনা হয়, এবং উৎসাহের আতিশয্যে সে আলোচনা ক্রমান্বয় সরগরম হয়ে ওঠে। ভিন্নধর্মী দুটি প্রবল আকর্ষণের এ এক অপূর্ব সংঘাত। ভালবাসা ও শ্রদ্ধা প্রকাশে উভয়েই টেক্কা দিতে চায় উভয়কে। ওজেন স্পষ্টই বুঝতে পারে যে অপরিবর্তনীয় একাগ্রতা আর সর্বব্যাপক প্রসারতার দিক থেকে লেশমাত্র স্বার্থহীন পিতৃস্নেহের স্থান তার নিজের ভালবাসার অনেক উর্ধে। বাপের কাছে তার স্নেহের পাত্রী সব ক্ষেত্রে পবিত্র, চিরদিন মনোরম। গোটা অতীত জীবন থেকে এই অকৃত্রিম ভালবাসা শক্তি সঞ্চয় করে। ভবিষ্যতের আশা ও শক্তি যোগায়।

ফিরে এসে দেখে, মাদাম ভোকে স্তোভের পাশে বসে আছেন। সিলভি আর ক্রিস্তফ ছাড়া কেউ নেই সেখানে। কার্থেজের ধ্বংসস্তূপের মধ্যে মারিয়াস যেমন করে বসেছিল, এখানেও তেমনি ভাবেই বসে আছেন বৃদ্ধা বাড়ীউলী। যে দুটি ভাড়াটে এখন অবশিষ্ট আছে, তাদের জন্যই অপেক্ষা করছেন আর সিলভির কাছে নিজের দুর্দিনের জন্য শোক করছেন। অবশ্য তাসোর মুখে লর্ড বায়রণ যে অনবদ্য শোকগাথা জুগিয়েছেন তার তুলনা হয় না; কিন্তু আন্তরিকতার দিক থেকে মাদাম ভোকের আপশোসের কাছে সেই কাব্যিক শোক অনেক ছোট।

—কাল মাত্র তিন কাপ কফি তৈরী করলেই চলে যাবে সিলভি। হায়, হায়, হায় রে! কে জানত এমন করে আমার বাড়ী খালি হয়ে যাবে! এ ব্যথা কি সওয়া যায়? ভাড়াটে ছাড়া এ জীবনের অর্থ কি? কিছুই না! একদম কিছু না। এ যেন ঘর খালি করে আসবাব-পত্তর নিয়ে যাবার সামিল। আসবাব-হীন ঘরের মূল্য কি? আর ভাড়াটে যদি না থাকে তো বোর্ডিংয়েরই বা মূল্য কি? এমন কি অপরাধ আমি করেছি যে ভগবান এমন ভাবে আমায় শাস্তি দিলেন? এদিকে বিশজনের মত বিন আর আলু কুটে রাখা হয়েছে! আমার বাড়ীতে পুলিশ! আলু খেয়েই এখন বাঁচতে হবে দেখছি! ক্রিস্তফকেও আর রাখা গেল না!

অঘোরে ঘুমোচ্ছিল ক্রিস্তফ। সহসা জেগে উঠে জিজ্ঞাসা করে, কি বললেন মাদাম!

—আহা, ছোকরাটা নেহাৎ গোবেচারী—ঠিক মস্ত একটা পোষা কুকুরের মত। সিলভি সমবেদনা জানায়।

—বছরের এই অসময়ে এমন হল! ভাড়াটেরা সকলেই তো এখন একটা না একটা বাসা খুঁজে নিয়েছে। এখন কি আকাশ ফুঁড়ে ভাড়াটে পড়বে? না, এরা আমায় পাগল না করে ছাড়বে না দেখছি। আর ঐ ডাইনী মিশানেৎ বুড়ীও তো পোয়ারেকে সঙ্গে করে নিয়ে গেল। এমন কি গুণ করেছে সে, ও মিনসে আঠার মত লেগে থেকে পোষা কুকুরের মত ওর পেছন পেছন ঘুরছে?

—যা বলেছেন! মাথা নেড়ে সায় দেয় সিলভি।—ও রকম আইবুড়ো বুড়ীদের অসাধ্য কাজ নেই।

বিধবা তখন বলে যায়, মঁশিয় ভোতরঁ্যা বেচারিকে কয়েদী করে ছাড়ল তো! কোন লাভ নেই সিলভি—এ আমি সইতে পারব না। ভেবে দ্যাখ, ওর মত একটা প্রাণবন্ত মানুষ যে কফির সঙ্গে ব্রাণ্ডি খেয়ে মাসে পনের ফ্রাঁ হাতে হাতে দিয়ে দিত, তার এই অবস্থা! না না না, কোন মতেই এ ব্যথা আমার সইবে না।

—তাছাড়া টাকা-পয়সার ব্যাপারে হাতটাও কেমন দরাজ ছিল ভেবে দেখুন! ক্রিস্তফ বলে ওঠে।

—নিশ্চয়ি কোথাও ভুল হয়ে গেছে। সিলভি বলে।

—না রে না! সব সত্যি। নিজের মুখেই তো স্বীকার করল। মাদাম ভোকে বলেন।—ভেবে দ্যাখ তো, যে-মহল্লায় একটা বেড়াল পর্যন্ত নড়াচড়া করে না, সেইখানে আমারই বাড়ীতে এত সব কাণ্ড ঘটে গেল! সাধ্বী স্ত্রীলোক হিসাবে হলপ করে বলতে পারি, নিশ্চয় আমি স্বপ্ন দেখছিলাম। একথা সত্যি যে ষোড়শ লুইর দুর্ঘটনা আমরা দেখেছি। সম্রাটের পতনও না দেখেছি এমন নয়—ফের সিংহাসন দখল করার পর আবার তার পতন হল এও দেখেছি। কিন্তু ও সব তো স্বাভাবিক ঘটনা। অনায়াসেই অমন সব ঘটনা ঘটতে পারে, বুঝলি? কিন্তু মধ্যবিত্তের বোর্ডিং অচলায়তনের মত দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত অপরিবর্তনীয় জিনিস। অত সহজে তার ওলটপালট হয় না। রাজা না থাকলেও চলে, কিন্তু খাওয়া-দাওয়া না হলে একদিনও চলে না। আর দ কর্ন্‌ঁাস বংশের সম্ভ্রান্ত মেয়ে যেখানে ভাল ভাল খাবার ব্যবস্থা করে দেয় এবং লোকের যা চাই তার সবকিছু যেখানে পাওয়া যায়, সেখানকার

বন্দোবস্ত কথনও যদি ওলটপালট হয়ে যায় তো বুঝবি, দুনিয়ার শেষ দিন ঘনিয়ে এসেছে। সত্যি, দেখিস্!

—অথচ যে মাদমোয়াজেল মিশনো আপনার এই বিপদ ঘটাল সে না কি এজন্য বছরে তিন হাজার ফ্রাঁ করে পাবে বলে লোকে বলাবলি করছে। মিলাও জানায়।

—ও ডাইনী মাগীর নাম আর আমার সামনে করিস না! মাদাম ভোকে বলেন।—কাটা ঘায়ে নুনের ছিটা দেবার জন্য উনি আবার ব্যুনোর ওখানে যাচ্ছেন! ওর অসাধ্য কাজ নেই; বয়েস কালে চুরি-বাঁটপারি থেকে শুরু করে খুন-জখম করা পর্যন্ত কোন কাজই ওর বাকী নেই। অমন ভাল লোকের বদলে ওরই জেলে যাওয়া উচিত ছিল।

এই সময়ে ওজেন আর বুড়ো গোরিও ঘণ্টা বাজান।

—এই যে, আমার বিশ্বাসী ভাড়াটে দুটি এসে গেছে। দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলে ওঠেন বিধবা।

কিন্তু বিশ্বাসী এই ভাড়াটে দুটির মনে বোর্ডিংয়ের ঘটনার ক্ষীণ অস্পষ্ট স্মৃতি জাগরূক ছিল। ফস করে কথায় কথায় তারা বাড়ীউলীকে জানাল যে তারা মোসে দাঁত্যায় উঠে যাচ্ছে।

—দেখলি সিলভি, এইবার সব শেষ। আপনারাই আমার মৃত্যুর কারণ হবেন। আপনারা আমার পেটে আঘাত করেছেন—এ ব্যথা যাবার নয়। আজকের এই একটি দিনে আমার দশ বছর বয়স বেড়ে গেল। হলপ করে বলতে পারি, আমি পাগল হয়ে যাব। এ না হয়ে পারে না। এখন আর কি হবে বিন দিয়ে? আর একলাই যদি আমাকে থাকতে হয় তো তুইও কাল সকালে বোঁচকা বাঁধ ক্রিস্তফ। আচ্ছা, আজকের মত আসি মশাইরা!

—ওর হল কি? সিলভিকে জিজ্ঞাসা করে ওজেন।

—আ পোড়া কপাল, এই কথা আবার জিজ্ঞেস করছেন! একটা না একটা কারণে এখানকার সব ভাড়াটে চলে গেছে। সেই ধাক্কাতে ওর মাথার ঠিক নেই। ঐ শুনুন, কাঁদছেন। তা ফোঁস ফোঁস করে বার কয়েক শিকনি ফেললে তেমন ক্ষতির সম্ভাবনা নেই। এখানে আসবার পর এই প্রথম ওকে সত্য সত্য কাঁদতে দেখলাম।

সকালবেলা মাদাম ভোকে খানিকটা অগ্রাহ্যের ভাব দেখাবার চেষ্টা করলেন। সর্বস্বহারা নারীর মুখে যে বেদনার ছাপ থাকে, সমস্ত ভাড়াটে-হারা

এই মহিলার মুখেও তেমনি ক্লিষ্টভাব ছিল। কিন্তু চালাকি-বুদ্ধিটুকু ঠিকই ছিল। স্পষ্টই বোঝা গেল যে রোজগারের ক্ষতি আর জীবনযাত্রার বাঁধা-ধরা ছকের পরিবর্তন তার দুঃখের আসল কারণ। খাবার-টেবিলের শূন্য চেয়ারের দিকে যেভাবে মাদাম তাকালেন, বিদায় নিয়ে যাবার সময় কোন প্রেমিকও তেমন করুণভাবে প্রণয়িনীর বাড়ীর দিকে তাকায় না। ওজেন তাকে খানিকটা উৎসাহিত করার চেষ্টা করে। আশা দেয় যে হাসপাতালে থাকার মেয়াদ শেষ হলে বিয়াশঁ সম্ভবত মেজঁ ভোকেতে একখানা ঘর নেবে; আর যাদুঘরের কর্মচারীটিও নাকি বার কয়েক মাদাম কুত্যুরের ঘরখানা ভাড়া নেবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছে। ওজেনের বক্তব্যের মোদ্দাকথা হচ্ছে, আবার তার বোর্ডিং নতুন লোকে ভরে যাবে।

—ভগবান করুন তোমার কথাই সত্যি হোক মশিয়ঁ ওজেন। কিন্তু এ বাড়ীর পেছনে শনি লেগেছে। দেখ, দশ দিনের মধ্যে কেউ না কেউ মারা যাবে। এই কথা বলেই শঙ্কিত দৃষ্টিতে তিনি ঘরের চারিদিকে তাকান। কার যে ডাক পড়বে ভগবানই জানেন!

—এ জায়গা ছেড়ে যেতে পেরে আমি খুশিই হয়েছি। চাপাগলায় গোরিওকে বলে ওজেন।

সিলভি এই সময় ত্রস্তভাবে ছুটে এসে জানায়, আজ তিন দিন হল মিস্তিগ্রিসের কোন খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না মাদাম।

—ভাল কথা শোনালি! আমার বেড়ালটা যদি মরে থাকে……সে যদি আমাদের ছেড়ে যায় তো আমি……

বিধবা বেচারি কথাটা শেষ করতে পারলেন না। হাত কচলে ভাবী বিপদের শঙ্কায় তিনি চেয়ারে হেলান দিয়ে এলিয়ে পড়লেন।

* * * *

দুপুরের দিকে দামী খামেভরা একখানা চিঠি পেল ওজেন। এই সময়েই পাঁতের মহল্লায় পৌঁছোয় ডাক্ পিয়ন। খামের উপর বোসেয়াঁর শীল-মোহরের ছাপ। খামের মধ্যে নিমন্ত্রণ-পত্র। মাদাম দ বোসেয়াঁর বিরাট বলনাচের আসরে নেমন্তন্ন করা হয়েছে মঁশিয় আর মাদাম দ নুসিঁজাঁকে। একমাস ধরে পারির সৌখিন সমাজ এই নাচের আসরের দিন গুনছিল। নেমন্তন্নের কার্ড-

খানির মধ্যে ওজেনের উদ্দেশ্যেও সামান্য গুটি কয়েক কথা লেখা রয়েছে। মাদাম দ বোসেয়াঁ লিখেছেন :

> 'ভেবেছিলাম, সানন্দে তুমি মাদাম দ নুস্যাঁজাঁকে আমার শুভেচ্ছা জানাবার ভার নেবে। সেইজন্যই তোমার অভিপ্রায় অনুযায়ী এই নিমন্ত্রণ-পত্র পাঠালাম। মাদাম দ রেস্তোর বোনের সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ পেলে খুশি হব। তোমার মনোরমা বান্ধবীকে নিয়ে আসতে ভুল কর না। কিন্তু খেয়াল রেখ, একলা সে-ই যেন তোমার সমস্ত ভালবাসা দখল করে না বসে। তোমার প্রতি স্নেহবশে আমি যা করেছি, তাতে এর অনেক কিছুর জন্য তুমি আমার কাছে ঋণী।'
>
> ভিকঁতেস দ বোসেয়াঁ।

আবারও চিঠিখানি পড়ে মনে মনে বলে ওজেন, বেশ বোঝা যাচ্ছে, মাদাম দ বোসেয়াঁ চান না যে বরেঁ দ নুসাঁজাঁ আসুক।

অমনিই সে দেলফিনের কাছে গেল। তাকে খুশি করবার একটা সুযোগ পেলে ওজেন নিজেও খুশি হয়। অবশ্য এই শুভ সংবাদ জানাবার বকসিসও সে নিশ্চয় পাবে। মাদাম তখন স্নানের ঘরে ছিল। অধীর আগ্রহে তার গোপন কক্ষে অপেক্ষা করে রাস্তিঞাক। যুবকদের পক্ষে এই অধীরতা স্বাভাবিক। বছরখানেক ধরে যে পুরস্কার পাবার আশা ব্যর্থ হয়েছে ; আজবে সেই পুরস্কার লাভের ব্যগ্রতায় এমন অধীরতা খুবই স্বাভাবিক। এই ধর .র মনোভাব যুবকেরা জীবনে দ্বিতীয়বার অনুভব করে না। প্রথম যে নারীর প্রতি পুরুষ আসক্ত হয়, সেই নারী যদি সত্যই রমণীয় হয় আর পারির সমাজের জৌলুসভরা প্রকাশ্য রঙ্গমঞ্চে সে যদি পুরুষের কাছে আত্মনিবেদন করে তো আজীবন সে রমণীর কোন প্রতিদ্বন্দ্বী থাকবে না। অন্য কোন স্থানের ভালবাসার সঙ্গে পারির ভালবাসার মিল নেই। ভব্যতার খাতিরে নিজের স্বার্থপরতা ঢাকবার প্রয়াসে মানুষ তার গতানুগতিক মোহযুক্ত আকর্ষণের উপর চাকচিক্যভরা মধুর আবরণ চড়ায়। কিন্তু পারির পুরুষ কি নারী সে মোহে পড়ে না। এ শহরের নারীর পক্ষে প্রবৃত্তি কি হৃদয়ের চাহিদা পূরণ করাই যথেষ্ট নয়। ভালভাবেই তারা জানে যে বৃহত্তর দাম মেটাতে হবে তাদের—জীবনের প্রতিটি স্তরে হাজারো দিক থেকে যে অহমিকাবোধ অনুপ্রবেশ করে, পূরণ করতে হবে সেই অহমিকাবোধের চাহিদা। মোটের উপর এই শহরের ভালবাসাকে

উদ্ধত অহঙ্কারী দাম্ভিক আর অপব্যয়ী বাক্যবাগীশের সঙ্গে তুলনা করা যায়। চতুর্দশ লুইর দরবারে যখন একজন স্ত্রীলোকও ছিল না, মাদমোয়াজেল দ লা ভালিয়েরের মত বেপরোয়া, অমন উগ্রভাব প্রবণ মহিলাকে তখন কে না হিংসে করত? তার ঐ উগ্র ভাবপ্রবণতার মোহে দিশেহারা হয়েই তো লুইর মত মহান রাজা নিজের মনিবন্ধের ছয় হাজার ফ্রাঁ মূল্যের লেস ছিঁড়ে ডুক দ ভেরমাঁদোয়াকে সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভের সাহায্য করেন। অমন রাজাই যদি এমন কাজ করেন তো সাধারণ লোকের কাছ থেকে আর কি আশা করা যেতে পারে? শুধু যুবক হলে চলবে না—ধন-দৌলত আর উপরিও থাকা চাই। আরও বেশী কিছু যদি থাকে তো আরও ভাল। দেবীর বেদীমূলে যত ধূপ পোড়াতে পারবে ততই তিনি প্রসন্ন হবেন। এখানকার ভালবাসা নতুন এক ধর্মের সামিল। অন্যান্য দেবতাকে সন্তুষ্ট করতে হয়ত ব্যয় হয়, তার চাইতেও অনেক বেশী ব্যয় হবে এই ধর্মাচরণে। চোখের পলকে এখানকার ভালবাসা মিলিয়ে যায়; আর স্বেচ্ছাচারী ফচকে ছোঁড়ার মত চলার পথে রেখে যায় বিধ্বস্ততার স্মৃতিচিহ্ন। শহরের সৌধচূড়ায় যারা বাস করে, ভালবাসার লোক-দেখান কাব্যিক বাহুল্য তাদের জীবনের স্বপ্ন। কাজেই অঢেল ধন-দৌলত যদি না থাকে তো এ জগতের ভালবাসার কি গতি হয়?

পারির এই সামাজিক রীতি এথেনসের ড্রাকোর বিধি-বিধানের মত কঠোর। যদি এই গতির কোন ব্যতিক্রম থাকে তো সেই বিকল্পের দেখা মিলবে নিরালায়। সমাজের রীতিনীতি যাদের পথভ্রান্ত করতে পারেনি, এই রীতির ব্যতিক্রমের সন্ধান পাওয়া যাবে সেই বাছাইকরা দৃঢ়চেতাদের মধ্যে। এরা থাকে নিভৃতে—দূরপ্রান্তে। হয়ত খরস্রোত স্বচ্ছ কোন চিরপ্রবাহমান নির্ঝরের পাশে। সবুজের নিভৃত ছায়াতেই তারা সন্তুষ্ট; আর নিজের অন্তর কি বাইরের সব কিছুর মধ্যে অসীমের সুর শুনে আত্মহারা। ধৈর্য ধরে তারা স্বর্গে যাবার শুভদিনের প্রতীক্ষা করে—এ দুনিয়ার মানুষ তাদের করুণার পাত্র।

অল্পেতেই যে সব যুবক জাঁকজমকের স্বাদ পায় তাদের অধিকাংশের মতই সমাজে সংসারে পূর্ণ প্রতিষ্ঠা চায় রাস্তিঞাক—লড়াই করে করায়ত্ত করতে চায় সবকিছু। এই উন্মাদ সংগ্রামের আবর্তে সে জড়িয়ে পড়েছে। জয় করার শক্তিও নিজের মনে পোষণ করে হয়ত বা। কিন্তু নিজের চরম লক্ষ্য—কিংবা সেই লক্ষ্যে পৌছোবার সুনিশ্চিত পথের হদিস সে আজও জানে না। বুঝে উঠতে পারে না কোন পথে চললে, কোন অস্ত্র প্রয়োগ করলে ইষ্টলাভ হবে।

কোন অকৃত্রিম পবিত্র আকর্ষণ যদি মানুষের অন্তর দখল না করে তো এই ক্ষমতার লোভ তার স্থান দখল করে অভিনব এক মহান জিনিস হয়ে উঠতে পারে। এই বৃত্তি তখন সমস্ত স্বার্থচিন্তা দূরে ঠেলে দিয়ে তাকে শুধু নিজের শ্রেষ্ঠত্বই নয়, গোটা জাতির শ্রেষ্ঠত্ব লাভের ব্রতে উদ্বুদ্ধ করতে পারে। কিন্তু জীবনের খরস্রোত থেকে আলাদা হয়ে নিরাসক্তভাবে বিচার করার মত মানসিক উন্নতি তখনও ছাত্রটির হয়নি। গাঁয়ে শৈশবে কাটালে যুবকদের মনে যে সব প্রভাব থেকে যায় আজও তার মোহ পুরোপুরি কাটাতে পারেনি ওজেন। তাজা সবুজ পাতার মধুর গন্ধের মত আজও যেন সেই মোহ তাকে ঘিরে রেখেছে। পারির সমাজ জীবনের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়বার আগে বহুবার সে ইতস্তত করেছে। নদীর পাড়ে দাঁড়িয়ে ভেবেছে, ঝাঁপ দেবে কি দেবে না। এই জীবনের মধ্যে আকণ্ঠ ডুবে যাবার প্রবল আগ্রহ সত্ত্বেও ঘাড় ফিরিয়ে শেষবারের মত সে পাড়াগাঁয়ের সাচ্চা অভিজাত জীবনের প্রশান্তির দিকে ফিরে চেয়েছে। যাই হোক, আগের দিন সন্ধ্যায় নতুন বাসার চেহারা দেখে তার সব সঙ্কোচ, সব দ্বিধা ঘুচে গেছে। জন্মগত কৌলীন্যের সম্মান বহুদিন ধরে সে ভোগ করে আসছে। কিন্তু যেদিন অর্থ-সম্পদের আরামের স্বাদ পেল, সেই দিনই মফঃস্বলের ময়লা দূরে ফেলে দিয়ে অনায়াসে বিনা-চেষ্টায় সে সমুজ্জ্বল ভবিষ্যতের সম্ভাবনাপূর্ণ একটি স্থান দখল করে বসল।

দেলফিনের প্রতীক্ষায় একলা এই মনোরম নিভৃত কক্ষে বসে তার মনে হল যেন এক বছর আগেকার রাস্তিঞাক থেকে সে আলাদা মানুষ বছরখানেক আগে যে রাস্তিঞাক পারি শহরে এসেছিল, তার সঙ্গে যেন আজকের রাস্তিঞাকের কোন মিল নেই। মনের দূরবীনে সেই রাস্তিঞাককে বিশ্লেষণ করে অবাক হয়ে সে ভাবতে লাগল, সে-ই কি সেদিনকার সেই যুবক।

তেরেসের গলা তার চিন্তার ব্যাঘাত জন্মায়। চমকে ওঠে ওজেন।

—মাদাম তাঁর ঘরে এসেছেন। সে জানায়।

রাস্তিঞাক দেখলে যে আগুনের পাশে নীচু একখানা চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে আছে দেলফিন। ভারি সজীব, ভারি প্রশান্ত দেখাচ্ছে তাকে। ভারতে এক রকম সুন্দর সুন্দর গাছ আছে যাতে ফুলের পাপড়ি ঝড়ে যাবার আগেই ফল ধরে। মসলিনের ঢেউয়ের মধ্যে হেলান দিয়ে বসা দেলফিনকে দেখেও অনিবার্যভাবে সেই ভারতীয় গাছের কথা মনে পড়ে।

—তুমি এসে গেছ তাহলে! কাঁপা গলায় বলে দেলফিন।

—বলতে পার কি খবর নিয়ে এসেছি? তার পাশে বসে বলে ওজেন। দেলফিনের হাতখানা নিয়ে আঙুল কটি সে নিজের ঠোঁটে ঠেকাতে চায়।

চিঠিখানা পড়ে মাদাম দ নুসাঁজাঁ পুলকিত হয়ে ওঠে। চোখ দুটো টলমল করে ওঠে। সেই জলভরা চোখেই সে ওজেনের দিকে তাকায় এবং দুইহাতে তার গলা জড়িয়ে ধরে বুকের কাছে টেনে আনে।

—এর জন্যও তোমার কাছেই আমি ঋণী। তার পর কানে কানে জানায়, তেরেস আমার ড্রেসিং-রুমে, কাজেই একটু হুঁশিয়ার হতে হবে, বুঝলে?।

—হাঁ, এ সুখের কথা সন্দেহ নেই। তুমি যখন আমার জন্য এটা যোগাড় করেছ তখন এর মূল্য যে আমার অহমিকার চাইতে বড় তাতে আর সন্দেহ কি? ঐ সামাজিক পরিবেশে কেউ আমায় পরিচিত করিয়ে দিতে চায় নি। এখন হয়ত তুমি আমায় পারির আর সব চেয়ের মতই চপল বিবেচনাহীন আর সঙ্কীর্ণমনা স্ত্রীলোক বলে গণ্য করবে। কিন্তু মনে রেখ ডিয়ার, তোমার জন্য আমি সব কিছু ত্যাগ করতে প্রস্তুত। ফোবুর স্যাঁ জেরমাঁর অভিজাত মহলে প্রবেশ করার জন্য আজকে যে বেশী আগ্রহ দেখাচ্ছি, তারও পেছনে রয়েছে তোমাকে সেখানে পাবার আনন্দ।

—তোমার কি ধারণা, মাদাম দ বোসেয়াঁ সোজা কথায় আমাদের বুঝিয়ে দিয়েছেন যে বারঁ দ নুসাঁজাঁ তার বলনাচের আসরে যান এটা তার অভিপ্রেত নয়? ওজেন জানতে চায়।

—নিশ্চয়, তাতে আর সন্দেহ কি? ওজেনের হাতে চিঠিখানা ফিরিয়ে দিয়ে বলে বারন্।—ও সব মেয়ের রূঢ় আচরণের একটা আলাদা ধরন আছে। সে যাই হোক, তাতে কিছু এসে যায় না—আমি যাব। দিদিও ওখানে যাবে নিশ্চয়ি। শুনলাম, সে নাকি সুন্দর একটা নতুন পোশাক তৈরী করেছে। তার পর গলা নীচু করে বলে, জান ওজেন, লোকের মুখ বন্ধ করার জন্যই সে যাবে। ওর সম্পর্কে মারাত্মক সব কথা রটছে। যে সব উড়ো খবর রটছে, নিশ্চয় শোননি। আজ সকালেই নুসাঁজাঁ আমায় বলল যে ক্লাবে কাল তার সম্পর্কে আলোচনা হয়েছে আর লোকে রেখে-ঢেকে কিছু বলেনি। হায় ভগবান, কি সামান্য জিনিসের উপরেই যে স্ত্রীলোকের সুনাম আর বংশের ইজ্জত নির্ভর করে! দিদির দুরবস্থার কথা শুনে মনে বড় ব্যথা পেলাম। কেউ কেউ বলছে, মঁশিয় দ ত্রাই লাখ ক্রাঁর মত হাওলাতী বিলে সই করেছে। তার প্রায় সব কখানারই টাকা শোধ করার মেয়াদ পার হয়ে গেছে।—এখন

ভাইর নামে নাকি মামলা করা হবে। এই বিচ্ছিরি পরিস্থিতি এড়াবার জন্য দিদি নাকি এক ইহুদির কাছে তার সব হীরা বেচে দিয়েছে। দেখেছ হয়ত— সে যে-সব সুন্দর সুন্দর হীরা পরে আসত গো! ওর সবই নাকি মঁশিয় দ রেস্তোর মায়ের সম্পত্তি। গত দিন দুয়েক সবারই মুখে এক কথা—কেউ অন্য কোন বিষয়ে আলোচনা করছে না। কাজেই আমার মনে হয়, ওদিন আনাস্তাজি একটা সোনার কাজ করা জমকাল পোশাক পরে আসবে, কারণ মাদাম দ বোসেয়াঁর বলনাচের আসরে হীরা-জহরৎ-পরা পোশাকে সে সব লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চায়। কিন্তু আমি তার কাছে ঢাকা পড়তে চাই না। চিরদিন ও আমার উপর টেক্কা মারতে চেয়েছে। কোনদিন আমার প্রতি এতটুকু দয়া দেখায়নি। অথচ আমি তার জন্য অনেক কিছু করেছি— ঠেকায় পড়ে যখনই এসেছে তখনই টাকা দিয়েছি। সে সব কথা থাক—পরের কথা বলে লাভ নেই! শোন, আজকে আমি পুরোপুরি সুখী হতে চাই।

রাত একটা অবধি মাদাম দ নুসাঁজাঁর সঙ্গেই ছিল রাস্তিঞাক। প্রণয়ী-যুগলের উচ্ছাসভরা বিদায়ের মুহূর্তে—আনন্দের প্রতিশ্রুতিভরা মধুর বিদায়ের স্বপ্নে বিষণ্ণভাবে ওজেনের দিকে চেয়ে বলে দেলফিন, আমার মনটা এমন খুঁতখুঁতে, এমন কুসংস্কারাচ্ছন্ন যে ভয়ে বুকটা সব সময় দুরুদুরু করে। ইচ্ছে হয়, একে ভাবী অমঙ্গলের আভাস বলতে পার। কিন্তু আমার ধারণা, এই সুখের জন্য আমায় এক মারাত্মক বিপদে পড়তে হবে।

—বোকা মেয়ে কোথাকার! ওজেন বলে।

—ও, আজকে রাতে আমায় খুকী বলেই মনে হল নাকি? হেসে বলে দেলফিন।

এই দৃঢ় ধারণা নিয়েই ওজেন মেঁজ ভোকেতে ফেরে যে পরদিনই সে বোর্ডিং ছেড়ে যাবে। এবং আসবার পথে রঙীন কল্পনায় গা ভাসিয়ে দেয়। সুখের স্বাদ ঠোঁটে লেগে থাকবার সময় এমনি রঙীন কল্পনায় সব যুবকের মনই উতরোল হয়ে ওঠে।

—কি হে, খবর কি? ওজেনকে দরজার পাশ দিয়ে যেতে দেখে হেঁকে বলে গোরিও।

—কালকে সব বলব। ওজেন জানায়।

—সব বলবে তো! গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত, কেমন তো? হেঁকে বলে বৃদ্ধ।

—যাও, শোও গে এখন! কাল আমাদের সুখের জীবন শুরু হবে।

*　*　*　*

পরদিন গোরিও আর রাস্তিঞাক বোর্ডিং ছেড়ে যাবার সব আয়োজন শেষ করে ফেলে। এখন শুধু একটা কুলি এলেই হয়। দুপুরের দিকে একখানা জুড়িগাড়ির চাকার শব্দে রুয় নুভ-স্যাঁৎ-জনভিয়েভ সচকিত হয়ে ওঠে। মেজঁ ভোকের ফটকের সামনেই থামে গাড়িখানি। মাদাম দ নুসাঁজাঁ গাড়ি থেকে নেমে জিজ্ঞাসা করে যে তার বাবা তখনও বোর্ডিংয়ে আছে কি না। সিলভি হাঁ বলতেই তরতর করে সে উপরে উঠে যায়।

ওজেন তার ঘরেই ছিল। কিন্তু বুড়ো জানত না সে-কথা। প্রাতরাশের সময় বুড়োকে তার লটবহর নতুন বাড়ীতে নিয়ে যাবার ভার দিয়ে সে জানিয়েছে যে বেলা চারটের সময় রুয় দার্তোয়াতে দেখা হবে। সহৃদয় বৃদ্ধ কুলি খুঁজতে যায়। ওজেন ইতিমধ্যে চটপট ইকল দ দ্রোয়ায় গিয়ে হাজিরা দিয়ে আসে। বোর্ডিংয়ে ফিরে বৃদ্ধের অলক্ষ্যে সে মাদাম ভোকের পাওনা চুকিয়ে দিতে চায়। এ দায় সে বৃদ্ধের উপর চাপাতে চায় নি। স্নেহের আতিশয্যে বৃদ্ধ হয়ত তার বিল শোধ করতে চাইত। যাই হোক, মাদাম ভোকে তখন বাইরে ছিলেন। কোন জিনিস ভুল করে ফেলে গেছে কি না তাই ফের দেখবার জন্য ওজেন নিজের ঘরে যায়। কিছুই পড়ে নেই দেখে সে স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ে। এই সময় দেরাজে টান দিতেই ভোতরাঁর সই করা একখানা সাদা বিল চোখে পড়ে। তার টাকা শোধ করে দেবার দিন তাচ্ছিল্য করে এখানা সে দেরাজের মধ্যে ফেলে রেখেছিল। বিলটা টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলবার ইচ্ছে হয়। কিন্তু ঘরে আগুন ছিল না। এই সময় দেলফিনের গলা কানে আসে। সাড়াশব্দ না দিয়ে স্থির হয়ে সে কান পেতে থাকে। মনে ভাবে, তার অজানা কোন গোপন কথা নেই দেলফিনের। কিন্তু বাপ-মেয়ের আলোচনার প্রথম যে কথাটি কানে আসে তা এত কৌতূহলোদ্দীপক যে এ আলোচনায় বাধা জন্মাবার ইচ্ছে হল না।

দেলফিন বলে, কি বলব বাবা, ভগবানের দয়ায় একেবারে ডুবে যাইনি। ভাগ্যিস আরও দেরিতে হিসেব চাইবার খেয়াল হয়নি। এখানে কথা বলা নিরাপদ হবে তো ?

—হাঁ, কেউ নেই বাড়ীতে। বাধ-বাধ গলায় বলে বৃদ্ধ।

—কি হল ? মাদাম দ নুস্যাঁজাঁ জিজ্ঞাসা করে।

—তোর কথা শুনে আমার মাথা ঘুরে গেছে। ভগবান সাক্ষী দেলফিন, জানিস

না তোকে আমি কত ভালবাসি। তা যদি জানতিস তো আগে থাকতে সাবধান না করে নেহাৎ বিপাকে না পড়লে এমন কথা শোনাতে পারতিস্ না। এমন কি জরুরী ব্যাপার ঘটল যে তাই জানাবার জন্য এখন এখানে ছুটে এলি? মিনিট কয়েক পরেই তো রুয় দার্তোয়ায় দেখাশোনা হতে পারত।

—কি যে বল বাবা, বিপদের সময় প্রথম যে খেয়াল মাথায় চাপে তা সামলানো যায়? আমি হতবুদ্ধি হয়ে গেছি। পরে সবাই জানতে পারলেও তোমার উকীল একটু আগেই গোপন কথা ফাঁস করে দিয়েছে। এখন তোমার দীর্ঘ দিনের ব্যবসায়ের অভিজ্ঞতা একান্ত প্রয়োজন। তাই জলে ডোবা মানুষ যেমন আপনা থেকেই খড়কুটো আঁকড়ে ধরে, আমিও তেমনি সহজ প্রবৃত্তির ইশারায় তোমার কাছে ছুটে এসেছি। নুসাঁজাঁ নানারকম বিঘ্ন সৃষ্টি করছে দেখে মঁশিয়দেরভিল তার বিরুদ্ধে মামলা করার ভয় দেখান। আরও নাকি বলেছেন যে ট্রাইবিউনালের প্রেসিডেন্টের কাছ থেকে গ্রেফ্তারি পরোয়ানা বার করতেও বিশেষ অসুবিধা হবে না। নুসাঁজাঁ আজ সকালে আমার কাছে এসে সরাসরি জিজ্ঞাসা করে যে আমি তাকে এবং আমাকে ধ্বংস করতে চাই কি না। আমি বললাম, ও বিষয়ে আমি কিছুই জানি না। কিছু টাকা-কড়ি আমার ছিল, এখন আমি তার দখল নিতে চাই। বললাম, সব ব্যাপার এখন আমার উকীলের হাতে—আমি তার বিন্দুবিসর্গও জানি না। আর এ নিয়ে তার সঙ্গে আলোচনা করাও আমার পক্ষে অসম্ভব। কেমন, এই কথাই তো আমায় বলতে বলেছিলে।

—হাঁ, ঠিকই বলেছিস।

দেলফিন তখন বলে যায়, তারপর শোন, তখন সে তার ব্যবসার খবর খুলে বলে। আমার ও তার যাবতীয় মূলধন সে এমন ব্যবসায়ে লগ্নী করেছে যা এখনও শুরু হয়নি আর সে ব্যবসা চালু করার জন্যও নাকি প্রচুর টাকা দরকার। আমি যদি তাকে যৌতুক ফিরিয়ে দিতে বাধ্য করি তো তার নাকি দেউলিয়া হতে হবে। আর আমি যদি বছরখানেক অপেক্ষা করতে রাজী হই তো বসবাসের জমি দিয়ে সে আমার টাকার দ্বিগুণ বি তিনগুণ টাকা ফেরত দেবে বলে কথা দিয়েছে। পরে আমিই নাকি সেই গোটা সম্পত্তির একমাত্র মালিক হব। তার কথার মধ্যে কপটতা ছিল না বাবা। তার ভাব দেখে আমি আঁৎকে উঠি। নিজের ব্যবহারের জন্য সে ক্ষমা চায়—আমায় সে স্বাধীনতা দিতেও রাজী। বললে, আমার পক্ষ থেকে যদি তাকে আর্থিক লেনদেন

করার অধিকার পুরোপুরি ছেড়ে দেই তো ব্যক্তিগত ব্যাপারে আমার খেয়ালে সে বাধা দেবে না। তার সদিচ্ছা প্রমাণ করবার জন্য সে আরও বলে যে মঁশিয় দেরভিলকে ডেকে এনে যে কোন সময় আমার নামে জমি কবলা করে দিতে সে রাজী আছে। সোজা কথায়, হাত-পা বেঁধে সে আমার করুণাপ্রার্থী হয়। তার ইচ্ছে, সংসারের বন্দোবস্ত আরও বছর দুয়েক এই ভাবেই চলুক, আর হাত খরচের জন্য যে টাকা আমায় দেয় তার বেশী খরচ না করার জন্যও সে অনুরোধ জানায়। স্পষ্ট আমায় বুঝিয়ে দেয় যে মুখ রক্ষার জন্য এইটুকুই সে করতে রাজী। তার সেই অপেরার নাচওয়ালীকে ছেড়ে দিয়েছে— মুখ বুজে খুব হিসেব করে চলতে বাধ্য হতে হবে তাকে। আমি তাকে জেরা করেছি—যা বললে তার প্রতিটি বিষয় সম্পর্কে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে প্রশ্ন করেছি। ভাবলাম, তাতে যদি বেসামাল হয়ে অন্য কথা বলে বসে। আরও কথা বার করার ইচ্ছাও আমার ছিল। কিন্তু সে আমায় জমা-খরচের বই দেখাল—শেষ অবধি চোখের জল ফেললে! কোন পুরুষের এমন অবস্থা আমি দেখিনি। মাথা খারাপ লোকের মত সে আবোল-তাবোল বকে গেল। আত্মহত্যা করার কথাও বলে। ওর জন্য আমার মায়া হয়!

বুড়ো গোরিও তখন চেঁচিয়ে ওঠে, সত্যিই বিশ্বাস করেছিস্ ঐ ফাঁকিবাজের কথা? ও তোর সঙ্গে চালাকি করছিল। ব্যবসার ক্ষেত্রে জার্মানদের সংস্পর্শে আমায় আসতে হয়েছে। তাদের প্রায় সকলেই সৎ এবং সরল। কিন্তু যে ক্ষেত্রে তারা ভুঁয়া সরলতা আর সদ্ভাব দেখায় সেখানে তাদের চেয়ে জঘন্য দমবাজ মেলা ভার। তোর স্বামী তোর চোখে ধুলো দিচ্ছে। বেকায়দায় পড়ে গেছে বলে সুর নরম করেছে। আসলে নিজের নামে সুবিধা হবে না বলে তোর নাম ব্যবহার করে পোক্ত হয়ে বসে নিতে চায়। ব্যবসায় যে ঝক্কি নিয়েছে, এই অবস্থার সুযোগ নিয়ে তাই চাপা দিতে চায়। ও যেমন ধূর্ত তেমনি বিশ্বাস-ঘাতক। মোটেই ভালমানুষ নয়। না না, এ আমি চুপ করে দেখতে পারব না যে আমার মেয়েকে নিঃস্ব করে দিল। বিভিন্ন ব্যবসায়ে টাকা লগ্নী করেছে বলেছে না? বেশ তো, তাই যদি হয় তো সে টাকার রসিদ, চুক্তিপত্র কি সিকিউরিটি আছে নিশ্চয়। তাই বার করে তোর সঙ্গে একটা বন্দোবস্ত করুক না! যে সব লগ্নীতে লাভের সম্ভাবনা বেশী, আমরা তাই বেছে নেব,— তার পর সে ব্যবসা যদি খারাপ হয়ে যায় তো যাবে! দিক না সেই সব সার্টিফিকেট তোর দেলফিন গোরিও নামে লিখে! বার্ঁ দ নুসাঁজাঁর এস্টেট

থেকে তার সব কিছু আলাদা করে রাখতে হবে। লোকটা কি আমাদের বোকা ঠাউরেছে নাকি? ও কি ভেবেছে যে কপর্দকহীন হয়ে তুই এক দিন থাকবি এও আমি সহ্য করব? একদিন—একরাত্রি কি তুই ঘণ্টাও সইব না। এই আজগুবি গল্প যদি সত্য হয় তো এ ধাক্কা আমি সামলাতে পারব না। বলিস্ কি! চল্লিশটি বছর আমি খেটেছি—নিজের পিঠে থলে বয়েছি, গায়ের ঘামে মাটি কাদা হয়ে গেছে, তবু সারা জীবন আমি কষ্ট করে তোদের জন্য সঞ্চয় করে গেছি। তোদের কথা ভেবে অকাতরে সব বোঝা, সব কষ্ট সয়েছি। তোদের মুখের দিকে চাইলে বোঝা হালকা মনে হত—পরিশ্রমের কষ্ট গায়ে লাগত না। আর আজ কিনা আমার সেই কষ্ট, সেই শ্রম—আমার গোটা জীবনের সাধনা ধোঁয়া হয়ে যাবে! তাই যদি হয় তো উন্মাদ হয়ে যাব। ভগবানের নামে, স্বর্গ ও মর্তের পবিত্র সব কিছুর নামে হলপ করে বলছি, এ ব্যবসার রহস্য নিশ্চয় আমি দিনের আলোয় টেনে বার করব। নিজে আমি হিসেব-পত্র দেখে বার করব কত টাকা লগ্নী হয়েছে। তারপর সেই সব কোম্পানীতে যাব। তোর সমস্ত টাকা নিরাপদ আছে এ কথা না জানা পর্যন্ত আমার ঘুম, খাওয়া-দাওয়া থাকবে না। তবু ভাল টাকাটা তোর নিজের নামে ছিল। আর মেতর দেরভিলের মত সৎলোককে উকীল হিসাবে পাওয়া ভাগ্যের কথা। দেখে নিস, তোর ঐ দশ লাখ থেকে আজীবন তুই বছরে পঞ্চাশ হাজার ফ্রাঁ পাবি। এ যদি না হয় তো আমি দেখে নেব। কোন ভয় করিস না। ট্রাইবিউনালে যদি হেরে যাই তো আমি আইন সভার কাছে আবেদন জানাব। টাকা-পয়সার দিক থেকে তুই সুখে-শান্তিতে আছিস—এই ধারণা আমার সমস্ত দুঃখ-কষ্টের বোঝা লাঘব করেছে। অশান্তির মধ্যেও এ কথা ভেবে সান্ত্বনা পেতাম। অর্থ জীবনের সামিল—সব কিছুর মূল উৎস অর্থ। আলজাসিয়্যা মূর্খটা কি গুল মারতে এসেছে? জানোয়ারটাকে এক কপর্দকও ছেড়ে দিবি না দেলফিন। শেকল দিয়ে বেঁধে তোর জীবনটা দুর্বিসহ করে তুলেছে! যদি তোকে ওর কাজে লাগে তো সম্পূর্ণভাবে আমাদের তাঁবে থাকতে হবে—কি করে চলতে হয় শিখিয়ে দেব। হায় ভগবান! আমার মাথাটা ফেটে যাচ্ছে। মনে হচ্ছে আগুনের তাতে মাথার খুলি পুড়ে যাচ্ছে! আমার দেলফিন আজ পথের ভিখিরি? হায় রে ফিফিন, শেষে তোর এই দশা হল? এখনও আকাশে তারা উঠছে! আমার দস্তানা দুটো গেল কই? চল, আমি নিজে গিয়ে সব হিসেব-পত্তর, নগদ টাকা আর চিঠিপত্র দেখে আসব। নিজের চোখে না দেখলে

আমি শান্তি পাব না। নিজের চোখে আমি দেখতে চাই যে তোর সম্পত্তি নিরাপদে আছে।

—অত উতলা হয়ো না বাবা, ভেবে চিন্তে কর্তব্য ঠিক কর। তোমার কথায় যদি প্রতিশোধ নেবার বিন্দুমাত্র আভাস ফুটে বেরোয়, প্রকাশ্যে যদি তুমি শত্রুতা দেখাও তো আমার সর্বনাশ হয়ে যাবে। তোমায় সে চেনে। সে বুঝে নিয়েছে যে তোমার খোঁ৷'নিতে টাকা সম্পর্কে আমি কিছুটা অস্বস্তি প্রকাশ করব। কিন্তু আমি হলপ করে বলতে পারি, ও টাকা সে আত্মসাৎ করেছে আর ফিরিয়ে দেবার ইচ্ছা নেই। ওর মত লোক অনায়াসে সব টাকা নিয়ে ভেগে পড়ে আমাদের পথে বসাতে পারে। সে জানে যে স্বামীর নামে মামলা করে আমি নিজের উপাধি কলঙ্কিত করব না। ও এখন সবল, তবু আমাকে ওর চাই। আমি নিজে ভালভাবে সবকিছু দেখেছি। ওকে যদি কোণঠাসা করি তো আমারই চরম বিপদ।

—লোকটা কি তাহলে পাকা জোচ্চোর?

—ঠিকই বলেছ বাবা। সত্যিই তাই। চেয়ারে এলিয়ে কেঁদে ফেলে দেলফিন।

—কথাটা তোমায় জানতে দিতে চাই নি। ঐ রকম একটা সর্বনেশে লোকের সঙ্গে আমায় বিয়ে দিয়েছ একথা জানিয়ে তোমার দুঃখের বোঝা আমি বাড়াতে চাইনি। ওর ব্যক্তিগত চরিত্রও ব্যবসায়ের সততাবোধের মতই জঘন্য। তা এত বীভৎস যে বলা যায় না। মনে প্রাণে আমি ওকে ঘৃণা করি। হাঁ, জঘন্য লোকটা আমায় যা শুনিয়েছে, তার পরে একবিন্দু শ্রদ্ধাও আমার নেই। যে সব গোপন কারবার করে বলে জানিয়েছে, নেহাৎ নীতিজ্ঞানহীন লোক না হলে সে-সব কাজ করতে পারে না। ওর মনের কথা টের পেয়েছি বলেই আমার ভয় হয়। না হলে স্বামী হয়ে সরাসরি সে আমায় বলে যে আমি যদি তার হাতের পুতুল হতে রাজী হই, যদি বিপদের সময় আমার সুনাম দিয়ে তাকে রক্ষা করতে রাজী থাকি তো সে আমায় মুক্তি দিতে রাজী আছে! যদি জানতে বাবা, এ কথার অর্থ কি?

—কিন্তু আইন বলে একটা জিনিসও তো আছে। গোরিও বলে ওঠে।—অমন জামাইর জন্য প্রাস্ দ ৻গ্রেভও তো আছে! সরকারী জহ্লাদ যদি ওকে গিলোটিন দিতে অস্বীকার করে তো নিজের হাতে সে-কাজ আমি করব!

—না বাবা, আইন ওকে ছুঁতেও পারবে না। কথাটা ভাল করে শোন, সোজা কথায় সে আমায় বলল, আমায় যদি কাজ করে যেতে না দাও তো

সব ভেঙে যাবে—সর্বনাশ হবে তোমার, এক কপর্দকও পাবে না। কারণ এ কাজে তুমি ছাড়া অপর কোন সঙ্গী আমি পাব না। বুঝলে? এখনও আমার উপর নির্ভর করে। তার দৃঢ় বিশ্বাস, নিজের স্ত্রীর উপর সে নির্ভর করতে পারে। সে জানে, নিজের টাকা পেলেই আমি খুশি হব—তারটা তাকে দিয়ে দেব। যদি সর্বনাশ এড়াতে চাই তো তার সঙ্গে আমায় এক অসৎ সমঝোতা করতে বাধ্য হতে হবে। আমার বিবেক বন্ধক রেখে আমায় সে মুক্তি দিতে চায়—ওজেনের সঙ্গে যে সম্পর্কই আমি পাতাই না কেন তাতে সে আপত্তি করবে না। স্পষ্ট বললে, আমার অন্যায় কাজে যদি বাধা না জন্মাও তো তোমার অপকর্ম সম্পর্কে চোখ বুজে থাকব; কিন্তু অপরের টাকা মারার কাজে আমায় বাধা দেওয়া চলবে না। এইবার বুঝলে? কাকে সে ভাল কারবার বলে জান? প্রথমে সে নিজের নামে পতিত জমি কেনে। তারপর বোকাদের ভাঁওতা দিয়ে সেখানে বাড়ী তৈরী করায়। এই সব লোক কনট্রাক্টরদের সঙ্গে চুক্তি করে লম্বা কিস্তিতে তাঁদের ধার শোধ করে। তারপর অল্প টাকায় আমার স্বামীর কাছে বাড়ীর দখল ছেড়ে দিয়ে এরা দেউলিয়া হয়ে ঠিকাদারদের ফাঁকি দেয়। স্পষ্টই বুঝলাম যে গরীব ঠিকাদারদের ভাঁওতা দেবার জন্যই মুসাঁজাঁ ফার্মের সুনাম ব্যবহার করা হচ্ছে। তাছাড়া এও দেখলাম যে প্রয়োজনের ক্ষেত্রে ধার শোধ করার প্রমাণ দেখাবার জন্য আমস্তারদাম, লণ্ডন, নেপলস আর ভিয়েনার মত জায়গায় মোটা মোটা অঙ্কের বিল পাঠিয়েছে মুসাঁজাঁ। কি করে ঐ সব বিল আমরা আটক করব?

পাশের ঘরে থেকে ধপাস করে পড়ে যাবার একটা শব্দ ওজেনের কানে এল। মনে হল, বুড়ো গোরিও হাঁটু ভেঙে পড়ে গেছে যেন।

—হায় ভগবান, এ আমি কি করলাম তোর! আমার মেয়ে আজ একটা জোচ্চোরের কৃপার পাত্রী? ইচ্ছে মত সে শেষ কপর্দক পর্যন্ত মোচড় দিয়ে আদায় করবে? আমায় মাফ কর মেয়ে! বৃদ্ধ কেঁদে ফেলে।

—সত্যি, আজ যে হতাশার অতলে আমি পড়েছি তার জন্য তুমিও কতকটা দোষী। দেলফিন বলে।—বিয়ের সময় আমাদের এত কম কাণ্ডজ্ঞান থাকে যে দুনিয়া বল, ব্যবসা বল, মানুষ বল কি জীবন বল—এসবের কতটা তখন জানি আমরা? এ ভাবনা তো বাপেদের ভাবা উচিত। তোমায় আমি দোষ দিচ্ছি না বাবা! মোটেই না! অন্যায় কিছু বলে থাকি তো আমায় ক্ষমা কর! এর সব দোষই আমার। না, না, কেঁদ না বাবা! বাপের কপালে চুমু খেয়ে প্রবোধ দেয় মেয়ে।

—তুইও কাঁদিস নে দেলফিন। চোখ তোল, চুমু দিয়ে আমি তোর চোখের জল মুছে নেব। দাঁড়া, আমায় একটু ভাবতে দে। তোর স্বামী যে জট পাকিয়েছে তার কিনারা আমি করবই।

—সে ভার আমার উপরেই থাক। কি করে ওকে বাগে আনতে হয় তা আমার জানা আছে। এখনও কিছু মায়া আছে আমার উপর। ভাল কথা। তার উপর প্রভাব বিস্তার করে আমার নামে স্থাবর সম্পত্তিতে কিছু টাকা লগ্নী করাব। সম্ভবত তাকে দিয়ে আমার নামে আলজাসের ঘুসাঁজাঁ এস্টেট কের কেনাতে পারব। জায়গাটা ওর খুব পছন্দসই। তাহলেও কাল এসে তুমি জমা-খরচের হিসাব আর লেন-দেনের হিসাবটা দেখে নেবে। ব্যবসার কিছুই জানে না মঁশিয়-দেরভিল। আচ্ছা থাক, কাল আসার দরকার নেই। মনটা আমি খারাপ করতে চাই না। পরশু মাদাম দ বোসেয়াঁর বলনাচের আসর। সেদিন যদি মাথা ঠাণ্ডা রাখতে হয়, যদি ওজেনের মুখ রেখে চলতে হয় তো আজ থেকে হুঁশিয়ার হতে হবে। চল না, তার ঘরখানা কেমন দেখে আসি।

এই সময় আর একখানি গাড়ি রুয় নুভ-সঁ্যাৎ জনভিয়েভে ঢোকে। বাইরে মাদাম দ রেস্তোর গলা শোনা যায়। উপরে উঠতে উঠতে সিলভিকে বলছে, বাবা ঘরে আছেন?

মোক্ষম সময়ে বাধা পড়ে। কারণ, ওজেন ভেবেছিল যে বিছানায় সটান হয়ে ঘুমের ভান করা ছাড়া গত্যন্তর নেই।

—ভাল কথা বাবা, আনাস্তাজির খবর শুনেছ? বোনের স্বর চিনতে পেরে দেলফিন বলে। মনে হয়, তার সংসারেও অদ্ভুত সব ঘটনা ঘটেছে।

—কি হল আবার? গোরিও বলে।—এর পরেও যদি কোন খারাপ কথা শোনাস তো আমার মৃত্যু অনিবার্য। এ রকম আর একটা বিপদের ধাক্কা আমি সইতে পারব না।

—সুপ্রভাত বাবা! ভেতরে ঢুকে বলে কঁতেস। আরে, দেলফিনও যে রয়েছিস্ দেখছি।

বোনকে দেখে মাদাম দ রেস্তো খানিকটা অবাক হয়ে যায়।

—সুপ্রভাত নাজি। সম্ভাষণ জানায় বারন।—বাবার ওখানে এসেছি বলে সত্যিই তুমি অবাক হলে নাকি? রোজই তো ওর সঙ্গে দেখা করি।

—কবে থেকে?

—নিজে যদি আসতে তো জানতে পারতে।

—খোঁচা মারবিনে দেলফিন! ধরা গলায় বলে কঁতেস।—বড় অশান্তিতে আছি। আমি ডুবেছি বাবা! এবারে একেবারেই ডুবে যাব।

—কি হল নাজি? ব্যথিত গলায় বলে ওঠে গোরিও।—সব কিছু খুলে বল। আঃ, দেখেছিস মুখখানা কেমন ফ্যাকাশে হয়ে গেছে? আয় দেলফিন, দেখ যদি ওকে সাহায্য করতে পারিস। বোনের উপর যদি মায়া-মমতা দেখাস তো সম্ভব হলে তোকে আমি আরও বেশী ভালবাসব।

—আহা, বেচারি! আস্তে আস্তে দিদিকে চেয়ারে বসিয়ে দিয়ে দরদী গলায় বলে মাদাম দ নুসাঁজা। খুলে বল না সব। গোটা সংসারের মধ্যে আমরা এই দুজনে তোমার সব অপরাধ ক্ষমা করব। এত ভালবাসি তোমাকে! জান তো, রক্তের টান যায় না।

স্মেলিং সল্টের কৌটাটা দিদির দিকে বাড়িয়ে দেয় দেলফিন। কঁতেস খানিকটা সুস্থ বোধ করে।

—আর আমার রক্ষে নেই। গোরিও বলে। এই আঘাতেই শেষ হব। তারপর আগুনটা নেড়ে দিয়ে বলে, আয়, দুজনেই এগিয়ে আয়। আমার গা ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে। কি বিপদ হল নাজি? চটপট বল, আর যে আমি সইতে……

বিপন্না মহিলাটি তখন বলে, শোন তবে, আমার স্বামী সবই জানে। ব্যাপারটা ভেবে দেখ বাবা! কিছুদিন আগেকার মাকসিমের সেই ধারের কথা মনে আছে? কিন্তু সেইটেই প্রথম নয়! তার আগেও কয়েকটা বিল আমি শোধ করেছি। জানুয়ারি মাসের প্রথম মঁশিয় দ ত্রাই বড্ড মনমরা হয়ে পড়ে। আমায় কিছু বলেনি, তবু যাকে ভালবাসা যায়, সামান্য ব্যাপারেই তার মনের কথা টের পাওয়া যায়। তারপর নিজের মনে বিচার করে সব বুঝে নেওয়া যায়। এই সময় আগের চাইতে সে আরও দরদী হয়ে পড়ে। রোজ তার ভালবাসা পেয়ে আমি ধন্য মনে করতাম। কিন্তু মাকসিম মনে মনে তখন আমার কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছে। পরে অবশ্য বলে কথাটা। সে তখন আত্মহত্যা করার ফন্দী আঁটছে। শেষে আমি তাকে উত্যক্ত করে তুললাম। বহু অনুনয় করেছি…একদিন তো পুরো দু'ঘণ্টা নতজানু হয়ে ছিলাম। শেষ অবধি সে আমায় জানায় যে লাখ ফ্রাঁ ধার আছে তার। বুঝলে বাবা, পুরোপুরি লাখ ফ্রাঁ! আমার মাথা ঘুরে গেল। অতটাকা তোমার নেই! যা ছিল, সবই তো আমার পেটে গেছে!

—না, অত টাকা আমি যোগাড় করতে পারতাম না। গোরিও সায় দেয়। এক যদি ভিক্ষে কি চুরি করতাম তো আলাদা কথা। কিন্তু তাও আমি করতাম নাজি! এখনও করব।

অক্ষম বাপের ব্যথাভরা এই কথা এমন মর্মান্তিকভাবে উচ্চারিত হয় যে কথাটা মুমূর্ষু লোকের গলার ঘড় ঘড় শব্দের মত শোনাল। সন্তানবৎসল বাপের এই মর্মভেদী কথা শুনে দুই বোনই চুপ করে। কিছু সময় সবাই নীরব হয়। অতল গহ্বরে ছুঁড়ে মারা ঢিলের শব্দের মত ব্যথিত হৃদয়ের এই মর্মভেদী হতাশ কান্না শুনে কার হৃদয় বিচলিত না হয়ে পারত?

—যা আমার নয়, তাই বেচে আমি টাকা যোগাড় করেছি বাবা! কান্নায় ভেঙে পড়ে কঁতেস।

দেলফিনও বিচলিত হল। দিদির কাঁধে মাথা রেখে সে-ও কাঁদে। বলে, যা শুনেছি তার সবই সত্য তাহলে?

আনাস্তাজি মাথা হেঁট করে। মাদাম দ নুসাঁজাঁ তখন দুই হাতে তার কোমর জড়িয়ে ধরে পরম প্রীতিভরে চুমু খায়। বুকের মধ্যে টেনে এনে বলে, এইখানে চিরদিন তুমি ভালবাসা পাবে। কেউ কোনদিন তোমার বিচার করবে না।

গোরিও তখন ক্ষীণকণ্ঠে বলে, ওরে দুলালী, বিপদ তোদের এক করে দেয় কেন?

এই দরদভরা ভালবাসার সম্পর্কে বুকে জোর পেয়ে কঁতেস তখন বলে যায়, মাকসিমের জীবন বাঁচাতে, আমার নিজের সুখ-শান্তি বজায় রাখতে নিজে আমি পোদ্দারের কাছে গিয়েছিলাম। গবসেককে চেন নিশ্চয়। নরকের মধ্যে লোকটার জন্ম হয়েছে। এমন পাষাণ হৃদয় যে কেউ তা গলাতে পারে না। তার কাছে আমি রেস্তো পরিবারের হীরা-জহরৎ নিয়ে গেলাম। আমার নিজের আর মঁশিয়দ রেস্তোর সব হীরা-জহরৎ নিয়ে গিয়ে ছিলাম। সবটাই বেচে দিলাম। বেচে দিলাম, বুঝলে? মাকসিম অবশ্য রক্ষা পেল, কিন্তু আমি ডুবলাম। সবই টের পেয়েছে রেস্তো।

—কি করে পেল? কে বলে দিলে? তার নামটা বলতো, নিজের হাতে আমি তাকে খুন করে আসব। উত্তেজনায় চেঁচিয়ে ওঠে বৃদ্ধ।

—কাল আমায় তার ঘরে ডেকে নিয়ে যায়। ঘরে ঢুকতেই 'আনাস্তাজি' বলে এমন গলায় ডাক দেয় যে তখনই বুঝতে পারলাম সব টের পেয়েছে। তারপর

সরাসরি জিজ্ঞাসা করে, তোমার জড়োয়ার গয়না কোথায় আনাস্তাজি? আমি বললাম, ঘরেই আছে। আমার দিকে চেয়ে তখন গাঢ়কণ্ঠে বলে, না, নেই। আমার ঐ দেরাজ আলমারির মধ্যে আছে। রুমাল দিয়ে ঢাকা গহনার বাক্সটা বার করে দেখাল তখন। কোত্থেকে এসেছে বলতে পার? আমি তার পায়ের উপর লুটিয়ে পড়লাম—কত কাঁদলাম। বললাম, কি ভাবে আমার মৃত্যু দেখলে সে খুশি হয়!

—এই কথা বললি? গোরিও চেঁচিয়ে ওঠে। ভগবানের পবিত্র নামে হলপ করে বলছি, আমি বেঁচে থাকতে যে তোদের দুই বোনের একজনকেও কষ্ট দেবে তুষের আগুনে আমি তাকে দগ্ধে মারব। সত্যি বলছি, কুচি কুচি করে··· কথাটা আর শেষ হলনা—গলায় আটকে গেল।

—কি বলব, তারপর আমায় দিয়ে যে কাজ সে করিয়ে নিতে চায় তা মৃত্যুর চেয়েও কঠোর। যে কথা আমায় সে শোনাল, ভগবান না করুন, তেমন কথা যেন কোন মেয়েকেই শুনতে হয় না।

—পাজীটাকে আমি খুন করে ফেলব। শান্তভাবে বলে গোরিও।—কিন্তু ওর প্রাণ তো একটা···আমার যে দুটো দরকার। তারপর আনাস্তাজির দিকে চেয়ে বলে, যা বলছিলি, কি হল তারপর?

আনাস্তাজি তখন বলে যায়, তারপর একটু থেমে সে আমার দিকে তাকায় বলে, শোন আনাস্তাজি, চুপ করে যেতে আমি রাজী আছি। বিচ্ছেদের কথাও ভাবব না, কারণ ছেলে-মেয়েরা রয়েছে। মঁশিয় দ ত্রাইকে আ: খুন করতেও চাই না—দ্বন্দ্বযুদ্ধের ফলাফল বলা যায় না। তাছাড়া, অন্যভাবে তাকে সাবাড় করার চেষ্টা করলে আইনের প্যাঁচে পড়তে হবে। তোমার বাহুবন্ধনে যদি ওকে খুন করি তো ছেলে-মেয়েগুলোর দুর্নাম রটবে। কিন্তু সন্তান-সন্ততি, তাদের জনক কি আমার মৃত্যু যদি তুমি দেখতে না চাওতো দুটি শর্তে তোমায় রাজী হতে হবে। একটা কথার জবাব দাও: ছেলে-মেয়েদের কোনোটি আমার সন্তান কি? বললাম, হাঁ।—কোনটি?—বড় ছেলে আরনেস্ট। ভাল কথা, তাহলে এখন থেকে একটি বিষয়ে আমার কথা শুনবার প্রতিজ্ঞা করতে হবে। যখনই আমি বলব, তোমার সম্পত্তি বেচাবার জন্য চুক্তিনামায় সই করতে হবে।

—না, না, করিস নে সই! কাতরস্বরে নিষেধ করে গোরিও।—ওটা কখনও লিখে দিস না। হায় মঁশিয় দ রেস্তো, কি করে বউকে সুখী করতে হয় জানলে

না! তাই তো সে সুখের খোঁজ করে বেড়ায়। তাই দেখে নিজের অসামর্থ্য ঢাকবার জন্য তাকে শাস্তি দিতে চাও! কেমন, তাই তো? কিন্তু আমি এখনও বেঁচে আছি। এখনও থাম বলছি! অত তাড়াতাড়ি এগোলে সুবিধা হবে না। প্রথমে আমার সঙ্গে পাঞ্জা লড়তে হবে। তুই কোন চিন্তা করিস না নাজি! হুঁ, নিজের উত্তরাধিকারীর উপর খুব যে মমতা দেখছি। ভাল, ভাল! ওর ওই ছেলেটাকে হাত করব। আপত্তি করবে কি করে, আমারও নাতি তো! তার সঙ্গে দেখা করা বন্ধ করতে পারবে না! ওকে আমি মফঃস্বলের কোথাও লুকিয়ে রাখব। আমিই তার দেখা শোনা করব, কোন ভাবনা নেই। তারপর একদিন এসে যখন বলব, আমার সঙ্গে একটা চুক্তি করতে হবে। যদি তোমার ছেলে চাও তো আমার মেয়ের সম্পত্তি ফিরিয়ে দিতে হবে···যা খুশি করতে দিতে হবে তাকে। তাহলেই জানোয়ারটা কাবু হবে।

—এ আপনি কি বলছেন বাবা!

—হাঁ রে নাজি, ঠিকই বলছি। তোর বাপ আমি—সেইটেই আমার সব চেয়ে বড়, সব চাইতে খাঁটি পরিচয়। আমার মেয়েদের সঙ্গে ওই বড়লোক পাজী ছুটো খারাপ ব্যবহার না করলেই ভাল করত! মাথায় বাজ পড়বে! জানে না আমার শিরায় শিরায় কি আগুনের হলকা ছুটে বেড়ায়—বাঘের হিংস্রতা আছে আমার রক্তে। ও-ছুটোর হাড় অনায়াসে আমি চিবিয়ে খেতে পারি। হায়রে মেয়ে, শেষ অবধি তোদের জীবনে এই হল? একথা ভাবলেও যে আমার মরতে ইচ্ছে করে! আমি চলে গেলে কি দশা হবে তোদের? সন্তানের সমান আয়ু পাওয়া উচিত বাপেদের। হায় ভগবান, তোমার এ ছুনিয়ার নিয়ম কি যে বিচ্ছিরি! লোকে যা বলে তা যদি সত্য হয়, তাহলে পুত্র তো তোমারও আছে! সন্তানের জন্য যাতে দুঃখ না পেতে হয়, তার ব্যবস্থা তোমার করা উচিত। হায়রে আমার সোনার পুতুলি, ওরে এও আমায় দেখতে হল যে দুঃখের দাহে তোরা আমার কাছে ছুটে আসছিস্! তোদের চোখের জলের কথাই শুধু আমায় জানতে হবে! বুঝতে পেরেছি, বেশ বুঝতে পেরেছি, আমায় তোরা ভালবাসিস্। আয়, এইখানে, এই বুকে এসে চোখের জল ফেল। এ বুকে তোদের সব ব্যথার ঠাঁই হবে। হাঁরে, আমার বুক ভেঙে যদি টুকরো টুকরো হয়ে যায় তো প্রতিটি টুকরো থেকে নতুন করে বাপের প্রাণ জন্মাবে। হায়রে, তোদের সব দুঃখের বোঝা বয়ে তোদের জন্য যদি কষ্ট সইতে পারতাম! যখন তোরা ছোট ছিলি, কি সুখেই যে ছিলি তখন!

—তেমন সুখে আর কোনদিনই থাকতে পারিনি! দেলফিন বলে।—কোথায় গেল সেসব দিন যখন বিরাট গোলাঘরের থলের উপর আমরা গড়াগড়ি খেতাম!

আনাস্তাজি তখন গোরিওর কানে কানে বলে, যা বললাম সেইটুকুই সব নয় বাবা! তাই শুনে বৃদ্ধ বিষম চমকে উঠে।—জড়োয়া বেচে লাখ ফ্রাঁ পাওয়া যায়নি। মাকসিম এখনও দেনার দায়ে আছে। এখনও বার হাজার ফ্রাঁ শোধ করা হয়নি। সে আমায় কথা দিয়েছে, আর জুয়া খেলবে না। এ দুনিয়ায় তার ভালবাসাটুকুই আমার একমাত্র সম্বল। তার জন্য আমায় এত দাম দিতে হয়েছে যে এখন আর তাকে হারাতে পারি না। আমার সম্পদ, ইজ্জত, শান্তি, সন্তান, সবই তার জন্য বিকিয়ে দিয়েছি। মাকসিম যাতে বেইজ্জত না হয়, তাকে যাতে জেলে যেতে না হয় তার কোন একটা ব্যবস্থা করুন বাবা! আমার দৃঢ় বিশ্বাস, সংসারে থাকতে পারলে নিশ্চয় সে উন্নতি করতে পারবে। আজ শুধু আমার শান্তিই বিপন্ন নয় বাবা, সন্তানও আছে আমাদের—তারাও পথের ভিখিরি হবে। ওকে যদি স্যাঁৎ পেলাজিতে পাঠায় তো সব ভেঙে যাবে!—অত টাকা আমার নেই নাজি···কিছুই নেই···এক কপর্দকও না। আজই দুনিয়ার শেষ দিন। দেখিস্, আজই ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে। পালা, ছুটে পালা···বাঁচতে চাস্ তো এখনও ছুটে পালা! হাঁ, মনে পড়েছে, রূপোর বগলসকটা আর থানছয়েক কাঁটা-চামচ রয়েছে। বারশ' ফ্রাঁ'র আজীবন বৃত্তিটি ছাড়া আর কিছুই যে নেই আমার।

—তোমার সেই শেয়ারগুলো কি করেছ?

—নিজের সামান্য প্রয়োজনের জন্য যতটা দরকার, তাছাড়া আর সবই বেচে দিয়েছি। ফিফিনের জন্য গোটা কয়েক কামরা সাজাতে হাজার বার ফ্রাঁ'র দরকার ছিল আমার।

—তোর নিজের বাড়ীতে দেলফিন? বোনকে জিজ্ঞাসা করে মাদাম দ রেস্তো।

—নাই বা হল, তাতে কি এসে যায় বল? সে বার হাজার খরচ হয়ে গেছে। গোরিও বলে।

—বুঝতে পেরেছি, সে-ঘর মঁশিয় দ রাস্তিঞাকের জন্য। কঁতেস বলে।—ওরে দেলফিন, এখনও সময় আছে; ভেবে ছাখ কিসের পেছনে ছুটেছিস। আমার দশা দেখে হুঁশিয়ার হ'।

—মঁশিয় রাস্তিঞাক কোনদিনই প্রণয়িনীকে বিপদে ফেলবে না দিদি!

—সে ভরসা থাকে ভাল। কিন্তু আমার এই মারাত্মক বিপদের সময় তোর কাছ থেকে আরও ভাল ব্যবহার পাব বলে আশা করেছিলাম দেলফিন। এখন দেখছি, আমার কথা কোনদিন তুই ভাবিস না।
—না না ওকথা বলিস না নাজি—নিশ্চয় ভাবে! বাধা দিয়ে বলে গোরিও।
—একটু আগেই বলছিল; তোর কথা নিয়ে আমরা আলোচনা করছিলাম। নিজেকে শোভনা বলে তোকে ও সুন্দরী বলে প্রশংসা করছিল।
—শোভনা! পুনরুক্তি করে কঁতেস।—হিমশীতল বরফের মতই শোভনা ও।

দেলফিনের মুখ রাঙা হয়ে ওঠে। বলে, স্বীকার করলাম, তুমি যা মনে কর আমি তাই। তাহলেও ভেবে ছাখ তো আমার সঙ্গে কি ব্যবহারটা করেছ। আমায় তুমি দূরে ঠেলে ফেলে দিয়েছ। যেখানে আমি যেতে চেয়েছি, সেই দরজাই বন্ধ করার ব্যবস্থা করেছ। আমায় দুঃখু দেবার কোন সুযোগ তুমি ছাড়নি। তুমি যেমন করে দরিদ্র বাপের কাছ থেকে মোচড় দিয়ে টাকা আদায় করেছ, কবে দেখেছ আমাকে সেইভাবে হাজার ফ্রাঁ নিতে? কে দায়ী তার এই বর্তমান দুরবস্থার জন্য? এ কৃতিত্ব তোমারই প্রাপ্য দিদি! যখনই পেরেছি বাবার সঙ্গে আমি দেখা করে গেছি। কিন্তু তাকে বাড়ী থেকে বার করে দিয়ে প্রয়োজনের সময় আবার তার তোয়াজ করতে আমি আসিনি। আমার জন্য যে বাবা বার হাজার ফ্রাঁ খরচ করবে তা আমি জানতামও না। টাকা পয়সার ব্যাপারে আমি যে হুঁশিয়ার আর হিসেবী তা তোমারও অজানা নয়। তা ছাড়া, মাঝে মাঝে বাবা আমায় উপহার দিয়ে এসেছে, কিন্তু একদিনও আমি চাইনি। আমি কাঙাল নই।
—আমার চাইতে তোর অবস্থা ভাল ছিল। মঁশিয় দ মার্সি যে বড়লোক সে কথা জানবার সুযোগ তোর হয়েছে। কিন্তু অর্থলোভী মানুষ যেমন নীচ, যেমন ঘৃণ্য হয়, তুইও বরাবর তেমনি স্বভাবের। বেশ, যাচ্ছি তাহলে। বুঝলাম, আমার বোনও নেই আর···
—চুপ কর নাজি! আর্তস্বরে বলে ওঠে গোরিও।
—কেউ যেকথা বিশ্বাস করে না, তোমার মত বোনের পক্ষেই সে কথার পুনরুক্তি করা সম্ভব, এমন জঘন্য অদ্ভুত মেয়ে তুমি! দেলফিন বলে।
—ওরে থাম্ রে থাম! না থামিস্ তো আমি তোদের সামনেই আত্মহত্যা করব।

মাদাম দ নুসাঁজাঁ তখন বলে, এরপর আর কথা চলে না, তোমায় ক্ষমা করলাম নাজি! তোমার মনে সুখ নেই। কিন্তু আমার প্রাণে মায়ামমতা

আছে। যখন তোমার জন্য কিছু করব বলে ভাবছি, স্বামীর কাছে হাত পাতব বলে যখন মনে করছি সেই সময় এই সব কথা কি করে বললে? আমার নিজের জন্যও আমি তার কাছে হাত পাততাম না, কিম্বা সেই···। যাহোক, তোমার এ নিষ্ঠুর ব্যবহারে আমি বিস্মিত হইনি। গত নয় বছর ধরে যে ব্যবহার করে আসছ তার চাইতে নতুন কিছু ত আর করনি!

—ওরে শোন, আমার কথা শোন! ঝগড়া মিটিয়ে ফেল—খা চুমু খা! তোরা দুটিই পরী! বৃদ্ধ পিতা বলে।

আনাস্তাজির হাত ধরেছিল গোরিও। এক ঝটকায় তার হাতখানা সরিয়ে দিয়ে কঁতেস খেঁকিয়ে ওঠে, না, আমায় একলা থাকতে দাও। বোন হয়ে আমার স্বামীর চাইতেও কম দরদ ওর! অথচ সবাই মনে করে, ও সমস্ত গুণের আধার!

—মঁশিয় দ ত্রাইর জন্য দু লাখ ফ্রাঁ খরচ হয়েছে একথা স্বীকার করার চাইতে মঁশিয় দ মার্সি আমার টাকা দিত একথা মনে করা ঢের ঢের ভাল। দুখের উপর শুনিয়ে দেয় মাদাম দ নুসাঁজাঁ।

—দেলফিন! ধমক দিয়ে এক পা এগিয়ে আসে কঁতেস।

—আমার সম্পর্কে যে মিথ্যা কথা বললে তার বদলে আমি সত্য কথাটাই বলেছি মাত্র! গাঢ় গলায় বলে বারন্।

—দেলফিন! তুই একেবারেই······

কথাটা শেষ হতে না হতেই দুই বোনের মাঝখানে পড়ে আনাস্তাজির কাঁধের উপর এক হাত রেখে অপর হাতে তার মুখ চেপে ধরে বৃদ্ধ।

—ইঃ, কি বিচ্ছিরি বাবা! কি নাড়াচাড়া করেছিলে আজ সকালে? মাদাম দ রেস্তো জিজ্ঞাসা করে।

পাৎলুনে হাত মুছে সসঙ্কোচে বৃদ্ধ তখন বলে, সত্যি; তোর মুখে হাত দিয়ে কাজটা ভাল করিনি। আজ জিনিস-পত্তর বাধা-ছাঁদা করছিলাম, তাই গন্ধ আসছে হাত থেকে। কিন্তু তোরা যে আসবি তা জানতাম না তো!

নিজের ঘাড়ে দোষ নিয়ে মেয়ের ক্রোধের মোড় ঘুরাতে পেরে বৃদ্ধ খুশিই হয়। তারপর ধপ করে চেয়ারে বসতে বসতে বলে, না, তোরা আমার বুক ভেঙে দিয়েছিস। এইবার সব শেষ! মাথাটা ফেটে যাচ্ছে। মনে হচ্ছে, ভেতরে যেন আগুন জেলে দিয়েছে। এখনও ঝগড়াঝাটি বন্ধ কর —পরস্পরকে ভালবাস। তোদের এই ভাব আমায় মেরে ফেলছে। আয়

দেলফিন, আর নাজি, দোষগুণ দু পক্ষেই আছে! বাপ্পনের জল টলমল করা চোখের দিকে চেয়ে বলে, একবার চেয়ে দ্যাখ দেলফিন! বার হাজার ফ্রাঁ ওর চাই। আর, কি করে টাকাটা যোগাড় করা যায় তাই আমরা ভাবি। অমন করে তাকাস নে তোরা! চেয়ার ছেড়ে সে দেলফিনের সামনে নতজানু হয়। তার কানে কানে বলে, আমায় খুশি করার জন্য ওর কাছে ক্ষমা চা'। দেখছিস না, তোর চাইতেও কত বেশী বিপন্ন আনাস্তাজি!

বাপের মুখে মর্মান্তিক বেদনার সকরুণ ব্যঞ্জনা লক্ষ্য করে দেলফিন বলে, দিদি, আমার অন্যায় হয়েছে! আমায় চুমু খাও!

—আঃ; আমার প্রাণটা জুড়লো! গোরিও বলে ওঠে।—কিন্তু বার হাজার ফ্রাঁ এখন কোত্থেকে যোগাড় করি? আচ্ছা ধর, আমি যদি কারও বদলে পল্টনে যেতে চাই তাহলে......

দুই বোনই তখন বাপকে জড়িয়ে ধরে বলে ওঠে, একি বলছ তুমি বাবা! না, না, তা হয় না!

—এ মমতার জন্য ভগবান্ তোমাকে করুণা করবেন। জীবন দিয়েও এ ঋণ আমরা শোধ করতে পারব না, তাই না নাজি? দেলফিন বলে ওঠে।

—আর তাছাড়া এতে কাজও খুব সামান্যই হবে বাবা! কঁতেস জানায়।

বৃদ্ধ তখন হতাশাভরে বলে ওঠে, কিন্তু রক্ত-মাংস দিয়ে কি কিছুই আয় করা যায় না? কেউ যদি তোকে বাঁচাতে পারে তো মনেপ্রাণে আমি তার হব। তার হয়ে খুন করতেও দ্বিধা করব না। ভোতর্াঁ যা করেছে তাই করে আমি জেলে যাব। আমি···। সহসা সে থেমে যায়। মনে হয়, তার মাথায় বজ্রাঘাত হয়েছে বুঝি। চুল ছিঁড়ে সে বলে ওঠে, কিছুই নেই। কোথায় গেলে চুরি করা যায় তা-ও যদি জানা থাকত! কিন্তু চুরি করার জায়গারও তো অভাব। ব্যাঙ্ককে ঠকাতে সময় লাগবে। আর অন্য লোকের সহায়তাও প্রয়োজন। তাহলে আমার মরাই ভাল। মরা ছাড়া আর কিছুই করবার নেই। হাঁ, এখন ঐ একটা কাজই পারি। এখন আর আমায় বাবা বলা উচিত নয়! না, না! বিপদে পড়ে ও আমার কাছে এসেছে আর আমি এত হতভাগা যে ওকে কিছুই দিতে পারলাম না! হায়রে নির্বোধ, নিজের জন্য তুমি আজীবন বৃত্তির বন্দোবস্ত করেছ; ভাবনি যে তোমার দুটি মেয়ে আছে! মেয়েদের উপর কি কোন মমতা নেই যে এমন কাজ করলে? তুমি মর! হায়রে হতভাগা, কুকুরের মত মরাই তোর ভাল! সত্যিই তো, কুকুরের

চাইতেও ঘৃণ্য আমি। কুকুরেও এমন আচরণ করত না। ওঃ, মাথাটা ফেটে গেল!

বৃদ্ধ যাতে দেয়ালে মাথা কুটতে না পারে সেজন্য দুই বোনেই তাকে জড়িয়ে ধরে বলে, বাবা, বাবা, অবুঝ হয়ো না!

বৃদ্ধ তখন ডুকরে কাঁদতে শুরু করে। ভীতিবিহ্বল ওজেন তখন ভোতর‍্যার সই করা বিলখানা তুলে নেয়। তার উপর যত দামের ষ্ট্যাম্প লাগান ছিল তা মোটা টাকার পক্ষে যথেষ্ট। অঙ্কটি বদলে সে যথারীতি বার হাজার ফ্রাঁ'র একখানি বিল তৈরী করে। গোরিও যাতে টাকাটা পায় তার ব্যবস্থাও করল। তারপর ধীরে ধীরে সে পাশের কামরায় যায়। এবং মাদাম দ রেস্তোর হাতে বিলখানা দিয়ে বলে, এই আপনার টাকাটা মাদাম। ঘুমোচ্ছিলাম আমি, কিন্তু আপনাদের কথাবার্তায় ঘুম ভেঙে গেল। তখন বুঝতে পারলাম, মঁশিয় গোরিওর কাছে আমার ঋণের অঙ্ক কত। এই বিলে আমার ধার শোধ হয়ে যাচ্ছে। এটা আপনি ভাঙিয়ে নিতে পারেন। নির্দিষ্ট দিনে এই টাকা আমি শোধ করে দেব।

দলিলখানা আঙুলের মাথায় ধরে পলকের জন্য কঁতেস পাথর হয়ে যায়। তারপর দুর্বিসহ ক্ষোভে, দুঃসহ জ্বালায় বিবর্ণ হয়ে কাঁপতে কাঁপতে বলে, ভগবান সাক্ষী দেলফিন, তোকে আমি ক্ষমা করেছি, কিন্তু এ অপমান কে সইতে পারে? প্রথম থেকেই ভদ্দরলোক ছিল ওঘরে, আর তুই তা জানতিস্। তুই এত নীচ যে এইভাবে শোধ তুললি? এইভাবে আমার জীবনের গোপন কথা, আমার সন্তানের জীবন কথা, আমার লজ্জা, আমার ইজ্জত সব ফাঁস করে দিলি? বুঝলাম, আর তুই আমার কেউ নস্···তোকে আমি ঘৃণা করি। আজ থেকে তোর অনিষ্ট করতে আর কখনও ইতস্তত করব না, আমি···। মাদাম দ রেস্তো এত ক্রুদ্ধ হয়ে পড়েছিল যে কথা শেষ করতে পারল না। ক্রোধে তার গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেল।

বৃদ্ধ তখন চড়াগলায় বলে ওঠে, কিন্তু ওজেন আমার ছেলের সমান··· আমার আদরের সন্তান···তোর ভাই···তোর ত্রাণকর্তা! ওকে চুমু খা' নাজি। এই ত্যাখ, আমি ওকে চুমু খেলাম। বৃদ্ধ এমন দৃঢ় আলিঙ্গনে ওজেনকে জড়িয়ে ধরল যে সে রীতিমত অস্বস্তিবোধ করে। ওরে ছেলে, আজ থেকে প্রকৃতই আমি তোমার বাপ হলাম···সংসারের সমস্ত স্নেহ দিয়ে আমি তোমাকে ঢেকে রাখব। আমি যদি ভগবান হতাম তো গোটা দুনিয়া তোমার পায়ের তলায়

উপহার দিতাম। হায়রে, এখনও ওকে চুমু খেলি না নাজি? ওরে, ও মানুষ নয় ···দেবতা···ভগবানের দূত!

—ওকে একলা থাকতে দাও বাবা! এখন ওর মাথা ঠিক নেই। দেলফিন বলে।

—মাথা ঠিক নেই! আমি পাগল! তুই কি তাহলে···? মাদাম দ রেস্তো চেঁচিয়ে ওঠে।

—ওরে, তোরা যদি এইভাবে ঝগড়া করিস তো আমি মরে যাব। আর্তকণ্ঠে বলে ওঠে বৃদ্ধ এবং সঙ্গে সঙ্গে ধপাস করে বিছানার উপর পড়ে যায়। বুলেট লেগে পড়ে গেল যেন। আপন মনে বিড়বিড় করে বলে, ওরাই আমায় মেরে ফেলছে!

এই নাটকীয় দৃশ্যে হতবাক হয়ে বজ্রাহতের মত দাঁড়িয়ে ছিল ওজেন। কঁতেস তার দিকে তাকাল। বাপের দিকে তার কোন খেয়াল ছিল না, কিংবা দেলফিন যে চটপট তার ওয়েস্টকোট খুলে দিচ্ছিল সে দিকেও তাকাল না। হাবভাবে চোখে কণ্ঠস্বরে খানিকটা সংশয় প্রকাশ করে জিজ্ঞাসা করল, স্যর···।

আভাসেই ওজেন তার মনের কথা বুঝতে পারে এবং সঙ্গে সঙ্গে তার অকথিত প্রশ্নের জবাবে বলে, এ বিল আমি শোধ করে দেব মাদাম, আর যা শুনলাম তার এক বর্ণও প্রকাশ করব না।

—বাবাকে তুমি মেরে ফেলেছ নাজি। বৃদ্ধকে দেখিয়ে বলে দেলফিন। বিছানায় শোওয়া গোরিওকে তখন ব্যাহত সংজ্ঞাহীন বলেই মনে হচ্ছিল। তাই দেখে আনাস্তাজি ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

এই সময় চোখ খুলে বৃদ্ধ বলে, ওকে আমি আন্তরিকভাবে ক্ষমা করলাম। ওর অবস্থা এমন মারাত্মক যে ভাল লোকেরও মাথা ঘুরে যায়। স্থির হ' নাজি। ওর সঙ্গে ভাল ব্যবহার করিস দেলফিন। বল, করবি···মুমূর্ষু বাপকে কথা দে! দৃঢ়ভাবে দেলফিনের হাত ধরে সে মিনতি জানায়।

—ওমা, এ কি হল? ভয় পেয়ে চেঁচিয়ে ওঠে দেলফিন।

—কিছুনা···ও কিছুনা। ভয় পাস নে, এখুনি কেটে যাবে। বাপ বলে।—আমার কপালটা টন টন করছে···মাথাটা বড্ড ধরেছে। আহা, নাজি বেচারির ভবিষ্যৎ কি মর্মান্তিক।

এই সময় আবার ঘরে ঢুকে বাপের পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়ে কঁতেস। কেঁদে বলে, আমায় ক্ষমা কর।

গোরিও বলে, ওরে, এইবার তুই আমায় আরও বেশী ব্যথা দিচ্ছিস!

জলভরা চোখে কঁতেস তখন রাস্তিঞাকের দিকে তাকায়। বলে, দুঃখে মাথা ঠিক রাখতে না পেরে আপনার উপর অবিচার করেছি। আজ থেকে আপনি আমার ভাই হলেন, কেমন তো? ওজেনের দিকে একখানা হাত বাড়িয়ে দেয় কঁতেস।

দিদিকে জড়িয়ে ধরে দেলফিন তখন বলে, নাজি, আয়, আমরা পরস্পরের ভুল ত্রুটির কথা ভুলে যাই।

—না না! তারস্বরে বলে নাজি।—এ আমি ভুলব না।

গোরিও বলে, ওরে, তোরা আমার চোখের সামনের কালো পরদা সরিয়ে নিচ্ছিস···আবার আমি যেন জীবন ফিরে পাচ্ছি! হারে নাজি, এই বিলে তোর বিপদ কাটবে তো, বল না!

—তাই তো মনে হয়। আচ্ছা বাবা, তোমার নামটাও সই করে দাও না!

—এই ছাখ, আমি এত বোকা যে এই কাজের কাজটা ভুলে গেলাম! আমার শরীরটা ভাল লাগছিল না নাজি, রাগ করিস নে! তোর বিপদ কেটে গেলে আমায় খবর দিস। নারে, আমি নিজেই যাব। না, সেটা ভাল হবে না। তোর স্বামীর সঙ্গে ফের দেখা হবার ঝক্কি নিতে পারি না। তাহলে হয়ত সেই সময়েই তাকে খুন করে বসব! হাঁ, তোর সম্পত্তি হস্তান্তর করা সম্পর্কে দু'চার কথা বলার আছে। যারে, তুই চটপট চলে যা! দেলফিন, আর যেন মাকসিম বেয়াড়াপনা না করে!

ওজেন এমন হতবাক হয়ে গিয়েছিল যে কোন কথাই মুখ দিয়ে বেরুল না।

মাদাম দ নুস্যাঁজাঁ বলে, আনাস্তাজির মেজাজটা বরাবরই কড়া। কিন্তু প্রাণটা ভাল।

—ফের কেন এসেছিল জান? তোমার বাবার সইটা বিলে ছিল না যে! চাপা গলায় দেলফিনকে জানায় ওজেন।

—তোমার কি তাই মনে হয় নাকি?

—মনে করতে বাধ্য না হলে সুখী হতাম। ওকে বিশ্বাস কর না। যে কথা মুখে বলা যায় না ভগবানকে সে-কথা জানাবার জন্যই যেন আকাশের দিকে চেয়ে বলে ওজেন।

—হাঁ, বরাবরই ওর কপট স্বভাব। কিন্তু বাবা ওর অভিনয়ে গলে যায়।

—এখন কেমন লাগছে বাবা গোরিও! বৃদ্ধকে জিজ্ঞাসা করে ওজেন।

—ঘুমোতে ইচ্ছে করছে। বৃদ্ধ জানায়।

ওজেন তাকে ভাল করে শুইয়ে দেয়। মেয়ের হাত ধরেই সে ঘুমিয়ে পড়ে। তারপর দেলফিন যাবার উদ্যোগ করে। যাবার আগে ওজেনকে বলে, আজ সন্ধ্যায় ইতালিয়াঁয় দেখা হবে, কেমন? তখন বাবার খবরটা জানিও। কালকেই এ বাসা ছাড়বে তো? হাঁ, চল না তোমার ঘরখানা একবার দেখে আসি! ইস, কি বিচ্ছিরি! ভেতরে ঢুকতে ঢুকতে বলে দেলফিন।—তোমারটা বাবারটার চেয়েও খারাপ! আজ তুমি আদর্শ ভদ্রতা দেখিয়েছ ওজেন। সম্ভব যদি হত তো তোমায় আরও ভালবাসতাম। কিন্তু একটা কথা মনে রাখতে হবে বল্লভ, জীবনে যদি বিত্তবান হতে চাও তো বার হাজার ফ্রাঁ অমনভাবে জানালা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলা চলবে না। পাকা জুয়াড়ী কঁৎ দ ত্রাই। দিদির সে দিকে খেয়াল নেই। আগে যেখানে হাজার হাজার ফ্রাঁ হেরেছে কি জিতেছে, আজও সেইখানে গিয়ে বার হাজার ফ্রাঁ যোগাড় করা উচিত ছিল!

পাশের ঘরে একটা আক্ষেপের শব্দ শুনে দুজনেই ছুটে আসে। গোরিওকে দেখে মনে হয় যেন ঘুমোচ্ছে। কিন্তু প্রণয়ী-যুগল বিছানার কাছে আসতেই তাদের কানে এই কথাটি এল: ওরা সুখী নয়! গোরিও ঘুমিয়ে থাক কি জেগে থাক এই কথা কটির সুর এমন তীক্ষ্ণভাবে মেয়ের অন্তরে বিঁধে বসে যে বিছানার উপর ঝুঁকে সে বাপের কপালে চুমু খায়। বৃদ্ধ তখন চোখ খুলে বলে, ও, দেলফিন নিশ্চয়ি!

—হাঁ, কেমন আছ এখন? মেয়ে জিজ্ঞাসা করে।

—বেশ আছি, কোন ভাবনা করিস না। একটু বাদেই বেরিয়ে পড়ব। যা, এখানে বসে থাকিস না। যারে, আমোদ-আহ্লাদ কর গে!

দেলফিনের সঙ্গে তার বাড়ী অবধি যায় ওজেন। দেলফিন তাকে খাবার নেমতন্ন করে। কিন্তু গোরিওকে ঐ ভাবে ফেলে এসে ওজেন এত অস্বস্তি বোধ করছিল যে রাজী হল না। মেজঁ ভোকেতে ফিরে এল ওজেন। এক-তলায় গোরিওর সঙ্গে দেখা। সবে টেবিলে বসতে যাচ্ছে। বিয়াশঁ এমন জায়গায় বসেছে যেখান থেকে অনায়াসেই দিনের আলোয় সেমুই ব্যবসায়ীর মুখ পরীক্ষা করা যায়। রুটির টুকরো তুলে নিয়ে গন্ধ শুঁকবার জন্য যথারীতি নাকের কাছে ধরল বৃদ্ধ। কিন্তু একাজ সে বিন্দুমাত্র সজ্ঞানে করল না লক্ষ্য করে শঙ্কাভরে মাথা ঝাঁকাল বিয়াশঁ।

—এস, আমার পাশে বসবে এস ডাক্তার! বৃদ্ধও ডাক দেয়।

আগ্রহভরেই বিয়াশঁ এগিয়ে গেল। কেননা আসন বদলী করে সে বৃদ্ধ ভাড়াটের আরও কাছে আসতে পেল।

—ওর কি হয়েছে বল তো! রাস্তিঞাক জিজ্ঞাসা করে।

—আমার ধারণা ওর শেষ হয়ে এসেছে! নিশ্চয়ই ওর দেহে অস্বাভাবিক কিছু ঘটেছে। চাহনি দেখলেই মনে হয় যেন কঠিন সন্ন্যাস রোগে আক্রান্ত হয়েছে। মুখের নীচের দিকটা স্বাভাবিক আছে, কিন্তু উপরের দিকটায় কেমন টানা একটা অস্বাভাবিক ভাব। লক্ষ্য করে গ্যাখ, চামড়াটা যেন জোর করে কপালের দিকে টেনে ধরেছে বলে মনে হবে। তাছাড়া চোখের ভাব দেখেও মনে হচ্ছে যেন মস্তিষ্কে সিরামের আধিক্য ঘটেছে। গ্যাখ, মনে হয় না চোখের মধ্যে মিহি ধূলিকণা পড়েছে? কাল সকালে ভাল করে বোঝা যাবে।

—সারবার কোন চিকিৎসা আছে?

—না। কোন ওষুধ নেই। পায়ের দিকে যদি কোন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করা যায় তো আরও কিছুক্ষণ বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব। কিন্তু কাল সন্ধ্যার মধ্যে যদি এ লক্ষণ লোপ না পায় তো বুড়োর রক্ষে নেই। কেন এই অসুখটা এল বলতে পারিস্? নিশ্চয় প্রচণ্ড আঘাত পেয়েছে, আর সেই আঘাতে মনটা ভেঙে পড়েছে।

নিরবচ্ছিন্নভাবে মেয়েরা যেভাবে বৃদ্ধকে একটির পর একটি আঘাত হেনেছে তার কথা স্মরণ করে রাস্তিঞাক বলে ওঠে, ঠিকই ধরেছিস্। তারপর মনে মনে বলে, তাহলে দেলফিন তো বাবাকে ভালবাসে!

* * * *

সেদিন সন্ধ্যায় ইতালিয়াঁতে ইচ্ছে করেই রাস্তিঞাক এমন সতর্কভাবে কথাবার্তা বলে যাতে মাদাম দ নুস্যাঁজাঁ অযথা বেশী শঙ্কিত হয়ে না পড়ে। কিন্তু সে কথা বলতে আরম্ভ করতে না করতেই দেলফিন বাধা দিয়ে বলে, বাবার জন্য ভেব না। বাবা বেশ পোক্ত আছে। আজ সকালে আমাদের কথা শুনে কিছুটা আঘাত পেয়েছে। এই যা! আমাদের দুজনের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত। কাজেই বুঝতে পারছ ব্যাপারটা কত গুরুতর। এক সময় এই সব বিপদ দুর্বিসহ মনে হয়েছে। কিন্তু তোমার প্রতি আকর্ষণ যদি বিপদ সম্পর্কে আমায় অনুভূতিহীন না করত তো বেঁচে থাকতে পারতাম না। এখন একটি মাত্র বিপদ আমায় কাতর করতে পারে; আর দুঃসহ বিপদও ঐ একটিই আছে। সে বিপদ কি জান? যে ভালবাসার জন্য আজ বেঁচে থাকার আনন্দ অনুভব

করছি তাই হারাবার শঙ্কা। তোমার ভালবাসা ছাড়া আর সব ব্যাপারে আমি উদাসীন। দুনিয়ার আর কিছুর জন্যই পরোয়া করি না—তুমিই আমার কাছে গোটা দুনিয়া। বড়লোক হবার জন্য যদি আনন্দবোধ করি তো সে তোমায় আরও সুখ-শান্তি দিতে পারব বলে। এটা লজ্জার কথা হলেও অকপটে স্বীকার করছি যে কন্যার কর্তব্যের চেয়েও প্রেমিকার আকর্ষণই আমার মধ্যে বড়। কেন তা বলতে পারব না। আমার সারা জীবন তোমার সঙ্গে বাঁধা। বাবা আমায় প্রাণ দিয়েছেন, কিন্তু সে প্রাণে স্পন্দন দিয়েছ তুমি। তুমি যদি আমায় নির্দোষ বল তো সারা দুনিয়া দোষী বললেই বা আমার কি এসে যায়? আর প্রেমের দুর্বার আকর্ষণে যে অন্যায় আমি করছি তার জন্যও নিশ্চয়ই তুমি আমায় দোষ দিতে পার না। কন্যা হিসাবে আমায় অস্বাভাবিক বলে মনে হয় কি? তবে হাঁ, আমার বাবার মত সদাশিব মানুষকে না ভালবেসে পারা যায় না। এ অসম্ভব! কিন্তু আমাদের এই জঘন্য বিবাহের স্বাভাবিক পরিণতি যে তাকে দেখতে হবে, এ আমি কি করে আটকাব বল? কেন সে অনুমতি দিয়েছিল? আমাদের কথা ভাবা উচিত ছিল না কি? এখন বুঝতে পারছি, সেও আমাদের মতই কষ্ট পাচ্ছে। তাকে সান্ত্বনা দেব? যাই কেন আমরা বলি না তাতে সে সান্ত্বনা পাবে না। আমরা গালাগাল দিলে কি অনুযোগ করলে যে ব্যথা সে পায়, তার চাইতেও বেশী ব্যথা পায় আমাদের আত্মসমর্পণে। জীবনে এমন অবস্থাও আসে যখন তিক্ততা ছাড়া আর কিছুই থাকে না।

ওজেন কোন কথাই বলল না। আন্তরিক অনুভূতির এই অকপট স্বীকৃতি শুনে গভীর সমবেদনায় তার অন্তর ভরে ওঠে। পারির মেয়েরা স্বভাবত কপট আর দাম্ভিক। স্বার্থপর, ছেনাল আর দরদহীন তারা। তবু একথা সত্য, তারা যখন প্রকৃতই ভালবাসে, তখন সেই ভালবাসার জন্য অকাতরে সমস্ত হৃদয়বৃত্তি বিসর্জন দিতে পারে। গাঁয়ের মেয়েরা এ ব্যাপারে তাদের কাছে হার মানতে বাধ্য। অনায়াসে তখন এরা সমস্ত নীচতার উর্ধ্বে উঠে যায়, এবং এই সাফল্য তাদের মহত্তর করে তোলে। ওজেন বুঝতে পারল ভালবাসার টানে কোন মেয়ে যখন একটু দূরে সরে যায় তখন কি তীক্ষ্ণ গভীর অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে নিরাসক্ত ভাবে সে স্বাভাবিক মনোবৃত্তি বিশ্লেষণ করতে পারে। এই উপলব্ধি তাকে স্তম্ভিত করে দেয়। কিন্তু ওজেনের নীরবতায় মাদাম দ নুসাঁজী খুশি হতে পারল না।

—কি ভাবছ? জিজ্ঞাসা করল।

—যা বললে তার কথাই ভাবছিলাম। একটু আগেও মনে করতাম যে আমায় তুমি যতই ভালবাস তার চাইতেও আমি বেশী ভালবাসতাম তোমাকে।

দেলফিনের ঠোঁটে স্মিত হাসিরেখা ফুটে ওঠে। কিন্তু এ আনন্দ লুকোবার জন্য পরক্ষণেই সে কঠোরভাব অবলম্বন করে। তার ইচ্ছা, এই আলোচনার ধারা যেন ভব্যতার নির্দিষ্ট নিরাপদ সীমারেখা অতিক্রম করে না যায়। আগে কোনদিন সে কোন তরুণ প্রেমিকের মুখ থেকে আন্তরিক ভালবাসার এমন স্বীকৃতি শোনেনি। আর দু'চারটে কথা বললেই সে আত্মসংযম বজায় রাখতে পারত না।

আলোচনার ধারা পালটে দিয়ে সে বলে, যা ঘটছে তার কিছুই হয়ত তুমি জান না ওজেন। জান কি? পারির গোটা সৌখিন সমাজ কাল মাদাম দ বোসেয়াঁর বলনাচের আসরে আসবে। রশফিদ আর মার্কি দাজুদা পাঁতো সবকিছু গোপন রাখতে সম্মত হয়েছে। কিন্তু রাজা কালকেই তাদের বিয়ের চুক্তিপত্রে সই করবেন। তোমার দিদি বেচারি এখনও এর কিছু জানেন না হয়ত। অভ্যর্থনা আর বলনাচের আয়োজন বন্ধ রাখা হয়ত তার পক্ষে সম্ভব নয়; কিন্তু দেখ, মার্কি সেখানে থাকবে না। লোকের মুখে মুখে শুধু এই কথা।

—এমনি একটা জঘন্য অপরাধ লোকের কাছে মজার ব্যাপার, তাই তারা চোখ টিপে হাসছে। কিন্তু তুমি তো বোঝ, এ রকম একটা কিছু ঘটলে মাদাম দ বোসেয়াঁ মারা পড়বেন।

—না, পড়বেন না! হেসে বলে দেলফিন।—ওদের মত মেয়ে কি ধাতে গড়া তা তোমার জানা নেই। তাহলেও পারির সবাই যখন যাচ্ছে, আমিও যাব নিশ্চয়। অবিশ্যি তোমার জন্যই আমি যেতে পারছি।

রাস্তিঞাক তখন বলে, তুমি ঠিক জান এটা বাজে গুজব নয়! পারিতে তো আর বাজে গুজবের অন্ত নেই।

—কালকেই সত্য কথা জানা যাবে।

মেজঁ ভোকেতে ফিরল না ওজেন। নতুন বাসায় খানিকটা আরাম করার লোভ কিছুতেই সংবরণ করা গেল না। এর আগের দিন রাত্রে সে-ই একটার সময় দেলফিনকে ছেড়ে আসতে বাধ্য হয়েছে। কিন্তু আজ রাত্রে দেলফিনই তাকে ছেড়ে যায়। ফিরতে রাত দুটো হয়ে গেল। পরদিন উঠতে বিলম্ব হল। মাদাম দ নুসাঁজাঁর জন্য সে অপেক্ষা করে; তারপর দুজনেই দুপুরের কাছাকাছি এক সাথে প্রাতরাশ খায়। সমস্ত প্রমত্ত যুবকের মত স্বপ্নের ঘোরে

এইসব মধুময় ঘণ্টাগুলো কাটাবার সময় গোরিওর অস্তিত্বের কথা সে একেবারেই বিস্মৃত হয়েছিল। এত সব সৌখিন জিনিসের মালিক হয়ে তার মনপ্রাণ যেন দীর্ঘ উৎসবের আনন্দে মেতে ওঠে। তার সঙ্গে মাদাম নুসাঁজাঁও থাকত কাছে কাছে। তার উপস্থিতিতে সব কিছুর জৌলুস যেন বেড়ে যেত। যাই হোক, বেলা চারটে নাগাদ গোরিওর কথা মনে পড়ে প্রেমিক যুগলের। মনে মনে ভাবে, এই বাসায় নতুন জীবন আরম্ভ করার কত আশা করছে বৃদ্ধ! ওজেন বলে, বৃদ্ধ যদি অসুস্থ হয়ে পড়েন তো বিলম্ব না করে তাকে এই বাসায় বদলি করতে হবে। কাজেই দেলফিনকে ছেড়ে চটপট সে মেজঁ ভোকেতে ফিরে আসে কিন্তু বুড়ো গোরিও কিংবা বিয়াশঁ এই দুজনের কেউই ছিল না খাবার টেবিলে।

ওজেনকে ঢুকতে দেখেই চিত্রকর বলে ওঠে, ওহে, বুড়ো গোরিও ভেঙে পড়েছে! বিয়াশঁ আছে তার কাছে। ওর এক মেয়ে, কঁতেস দ রেস্তো রামার সঙ্গে দেখা হয় বুড়োর। তার পরেই বাইরে যেতে চায়; তাতে অবস্থা আরও খারাপ হয়েছে। আমাদের সমাজ একটি উজ্জ্বল রত্ন হারাতে বসেছে।

অমনি ওজেন লাফ দিয়ে সিঁড়ির দিকে গেল।—এই! মঁশিয় ওজেন!

—মঁশিয় ওজেন, মাদাম ডাকছেন আপনাকে! ডেকে বলে সিলভি।

বিধবা তখন বলেন, মঁশিয় ওজেন, পনেরই ফেব্রুয়ারি তোমার আর মঁশিয় গোরিওর উঠে যাবার কথা। সে আজ তিনদিন হল। ন্যায়ত তোমাদের কাছ থেকে আমি এক মাসের ভাড়া আদায় করতে পারি। কিন্তু তুমি যদি বুড়ো গোরিওর টাকার জামিন হও তো তোমার কথার উপর নির্ভর করতে পারি।

—কেন, ওকে বিশ্বাস হয় না?

—ওকে বিশ্বাস করব! আজ যদি বুড়োর মাথা খারাপ হয়ে মরে যায় তো কাল ওর মেয়েরা আমাকে এক কপর্দকও দেবে না। আর ওর যথাসর্বস্বের মূল্য দশ ক্রাঁ'ও না। রূপোর বাসন-পত্তরের অবশিষ্ট যা ছিল তাও আজ সকালে নিয়ে গেছে। কেন জানি না। এমন করে সেজেছিল যে পুরুষ বলে ভুল হয়। ভগবান সাক্ষী, মনে হয় রুজ মেখেছিল গালে—হুবহু যুবকের মত দেখিয়েছে।

—তার সমস্ত দায়-দায়িত্ব আমি নিলাম। আশ্বাস দিয়ে বলে ওজেন; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে চরম বিপদের শঙ্কায় শিউরে ওঠে।

উপরে উঠে সে গোরিও'র ঘরে যায়। বিছানায় শুয়ে আছে বৃদ্ধ। বিয়াশঁ তার পাশে।

—গুড্ ইভনিং বাবা ওজেন সম্ভাষণ জানায়।

তার দিকে চেয়ে বৃদ্ধের মুখে মধুর হাসিররেখা ফুটে ওঠে। কিন্তু চোখ দুটো বড্ড বেশী উজ্জ্বল দেখায়।

—তার খবর কি?

—ভাল আছে, আপনি কেমন আছেন?

—তেমন খারাপ কিছু হয়নি।

—ওকে বকাস নে! ওজেনকে ঘরের একপাশে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে বিয়াশঁ বলে।

—ব্যাপার কি বল্ তো! ওজেন জিজ্ঞাসা করে।

—ওকে বাঁচান এখন ভগবানের হাতে। মাথায় অস্বাভাবিক রক্ত জমা হয়েছে। সরষের প্রলেপ দিয়ে দিয়েছি। আশার কথা, এখনও সেটা অনুভব করতে পারছে। কা.. হচ্ছে মনে হয়।

—জায়গা বদল করা সম্ভব?

—সর্বনাশ! সে প্রশ্ন ওঠেই না। এইখানেই রাখতে হবে এবং যাতে চুপচাপ থাকে তার ব্যবস্থা করতে হবে। বিন্দুমাত্র উত্তেজনা হতে পারে এমন কিছু করা চলবে না।

—বিয়াশঁ, ভাই! আমরা দুজনে মিলে ওর দেখাশোনা করব, কেমন? ওজেন বলে।

—আমাদের হাসপাতালের বড় ডাক্তারকে ডেকে পাঠিয়েছি...ম। দেখে গেছেন তিনি এসে।

—কি বললেন?

—কাল সন্ধ্যার আগে মতামত দিতে রাজী হলেন না। দিনের কাজ শেষ করে আবারও একবার আসবেন বলে গেছেন। কি দুর্ভাগ্য দেখ, বুড়ো আজ সকালে একটা অন্যায় কাজ করে বসেছে, অথচ ব্যাপারটা খুলে বলতে চায় না। খচ্চরের মত গোঁয়ার লোকটা। আমি যখন কথা বলি, না-শোনার ভাণ করে থাকে। জবাব না-দেবার জন্য ঘুমিয়ে পড়ে, কিংবা চোখ যদি খোলা থাকে তো কোঁকায়। আজ সকালে একবার বা..রে কোথায় যেন গিয়েছিল। রাস্তায় রাস্তায় হাঁটাহাঁটি করেছে। ভগবান জানেন, পারির কোথায় গিয়েছিল। যাবার সময় মূল্যবান যা কিছু ছিল সব সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিল। মনে হয়, গোপন কোন লেনদেন করে এসেছে। তাতে শরীরের উপর আরও চাপ পড়েছে। ওর এক মেয়ে এসেছিল এখানে।

—কঁতেস ? ওজেন জিজ্ঞাসা করে।—লম্বাপনা ফর্সা এক মহিলা ?—বেশ উজ্জ্বল আয়ত চোখ, সুন্দর পাতলা ছিপছিপে চেহারা ?

—হাঁ।

—আচ্ছা, খানিকক্ষণ ওর সঙ্গে আমায় একলা থাকতে দে। রাস্তিঞাক বলে।

—সব কথা আমি বার করে নেব···কিছুই লুকোবে না আমাকে।

—বেশ তো, আমি তাহলে এর মধ্যে খাওয়াটা সেরে আসি। দেখিস, ওর উত্তেজনা হয় না যেন। এখনও কিছু আশা আছে।

—সেজন্য ভাবিস্ নে।

বিয়াশঁ চলে গেলে ওজেনকে একান্তে পেয়ে বৃদ্ধ বলে, কালকের দিনটা ওদের ভাল যাবে। বিরাট এক বলনাচের আসরে যাচ্ছে!

—আজ সকালে কি করেছেন বাবা যে সন্ধ্যাবেলা এমন ভাবে বিছানায় পড়ে থাকতে হল ?

—কিছুই না।

—আনাস্তাজি এসেছিল ? রাস্তিঞা'ক জিজ্ঞাসা করে।

বৃদ্ধ তখন সমস্ত শক্তি জড়ো করে বলে, আঃ, বড় কষ্টে পড়েছিল। জান ছেলে, সেই জড়োয়ার গহনার ঘটনার পর নাজির হাত একেবারে খালি। বলনাচে যাবার জন্য সে একটা সোনার কাজ করা পোশাকের অর্ডার দিয়েছিল। সে পোশাকে ওকে হীরের টুকরোর মত দেখাবে! কিন্তু ওর ড্রেস-মেকার মাগী এমন নচ্ছার যে ধারে দিতে রাজী হল না। তখন ওর পরিচারিকা হাজার ফ্রাঁ দেয়। শেষ অবধি নাজির এই দশা হল! একথা ভাবতেও আমার বুক ভেঙে যায়! কিন্তু পরিচারিকা যখন দেখল যে মঁশিয় রেস্তোর সঙ্গে ওর মনোমালিন্য চলছে, তখন টাকা হারাবার ভয়ে দরজী মাগীর সঙ্গে একটা গোপন বন্দোবস্ত করে। এই টাকা শোধ না দেওয়া পর্যন্ত সে পোশাক দিতে অস্বীকার করে। কালকেই বলনাচ, আর পোশাকও তৈরী হয়ে গেছে। কি আর করে নাজি ? আমার কাঁটা-চামচ বন্ধক রেখে সে কাজ চালাতে চাইছিল। তার স্বামীর জিদ যে জড়োয়ার গহনা পরে তাকে বলনাচে যেতে হবে। গোটা পারির মুখের উপর সেগুলো দেখিয়ে সে তাদের মুখে ছাই দিতে চায়। কিন্তু নাজি কি সেই জানোয়ারটার কাছে গিয়ে বলতে পারে, হাজার-ফ্রাঁ ধার আছে আমার, ধারটা শোধ করে দাও না! নিশ্চয় পারে না! সে আমি সঙ্গে সঙ্গেই বুঝে নিলাম! ছোট বোন দেলফিন সেখানে চমৎকার

পোশাক পরে যাবে, আনাস্তাজি তার কাছে হার মানতে পারে না! মেয়েটা তখন কেঁদে ভাসাল! কাল বার হাজার ফ্রাঁ দিতে না পেরে আমি এত ছোট হয়ে গেছি যে এই অন্যায়ের প্রতিকারের জন্য আমার বাকী দিনকটা বিসর্জন দিতেও রাজী আছি। বুঝলে হে, এককালে আমার সব সইত, কিন্তু টাকার অভাবে মনটা ভেঙে গেছে। তবে হাঁ, এ নিয়ে আমি ওজর-অপাত্তি করিনি। পোশাক-আশাকের কিছুটা পরিপাটি করে বেরিয়ে পড়লাম। ছয় শ' ফ্রাঁতে আমার যাবতীয় কাঁটা-চামচ আর বগলস বেচে দিয়েছি; তার পর এক বছরের বৃত্তি ছেড়ে দিয়ে পাপা গবসেকের কাছ থেকে আরও চারশ ফ্রাঁ নিলাম। তাতে আর হয়েছে কি বল, আমি রুটি খেয়েও চালিয়ে দিতে পারব। বয়স-কালেও রুটি খেয়ে চালিয়েছি, আর এখনও চলবে! যাই হোক, নাজি তো সুখী হবে! কি সুন্দর দেখাবে তাকে! হাজার টাকার নোটখানা আমার বালিশের তলায় আছে। এই নোটে আমার নাজি সুখী হবে, কাজেই ওখানা মাথার তলায় থাকলেও আমি চাঙ্গা বোধ করি। ভিকতরির মত বদ-মেয়েকে এখন অনায়াসে বিদায় করে দিতে পারবে। এমন কথা শুনেছ কোনদিন যে চাকর-বাকর প্রভুকে বিশ্বাস করে না? কালই আমি ভাল হয়ে উঠব। দশটার সময় আসছে নাজি। আমার অসুখের কথা ওদের বুঝতে দিতে চাই না, কারণ তাহলে বলনাচে না গিয়ে ওরা আমার সেবা-শুশ্রূষায় লেগে যাবে। কাল এসে নাজি আমায় সন্তানের মত আদর করবে। ওর আদরেই সেরে উঠব। আর তাছাড়া আমার শরীরের জন্যও তো হ' গর ফ্রাঁ ব্যয় করতে পারতাম! পারতাম না? তার চাইতে সেটা বরং নাজিকেই দিলাম। সে ডাক্তার হয়ে আমার অসুখ সারিয়ে দেবে! তবু তার দুঃখের সময়কিছুটা সান্ত্বনা দিতে পারলাম তো! নিজের জন্য বৃত্তির বন্দোবস্ত করে যে অন্যায় করেছি, এতে সেই পাপ কিছুটা স্খালন হল। মেয়েটা অকূল পাথারে পড়েছে। আমার এমন সাধ্য নেই যে তাকে টেনে তুলি। না, আবার আমায় ব্যবসায়ে ঢুকতে হবে। ওদেশা গিয়ে আবার গম কিনব। গমের দাম সেখানে এখানকার দামের তিন-ভাগের এক ভাগ। গম সরাসরি আমদানি করার আইনত বাধা আছে। আইন-প্রণেতারা সজ্জন বলে গমজাত জিনিসের আমদানি বন্ধ করেনি। ঠিক!··· আজ সকালবেলাই মতলব এঁটেছি। শ্বেতসারে বেশ ভাল ব্যবসা হবে।

—প্রলাপ বকছে! বৃদ্ধকে লক্ষ্য করে মনে মনে ভাবে ওজেন।—শুনুন, কথা বলা উচিত হবে না, চুপ করে বিশ্রাম করুন।

বিয়াশঁ আবার উপরে এলে ওজেন খেতে যায়। রাত্রে পালা করে তারা বৃদ্ধের দেখাশোনা করে। একজন ডাক্তারি পড়ে আর অপরজন মা ও বোনের কাছে চিঠি লিখে কাটায়। পরের দিন সকালবেলা বিয়াশঁর মতে রোগীর মধ্যে আশার লক্ষণ দেখা যায়। তবু সব সময় তার কাছে লোক থাকা আবশ্যক। এ শুধু ছাত্র দুটিকে দিয়েই সম্ভব। বিস্তারিত ভাবে এদের কাজ-কর্মের বর্ণনা করা এ যুগের মেনিমুখো ভাষার অসাধ্য। বেচারির শীর্ণ দেহে জোঁক লাগান হল। পুলটিস লাগান, গরম জলে পা ডুবিয়ে রাখা, কিংবা চিকিৎসার অন্যান্য কাজকর্মে যুবক দুটির শক্তি ও আন্তরিকতার প্রয়োজন ছিল। মাদাম দ রেস্তো এল না। টাকার জন্য সে লোক পাঠায়।

—ভেবেছিলাম, নিজেই আসবে। না এসে ভাল করেছে। আমার এই অবস্থা দেখলে বিচলিত হয়ে পড়ত। বাবা বলে। তাকে দেখে আদৌ অসন্তুষ্ট মনে হল না।

সাতটার সময় দেলফিনের এক চিঠি নিয়ে তেরেস আসে। দেলফিন লিখেছে:

এমন কি কাজ তোমার থাকতে পারে কান্ত? ভালবাসতে শুরু করেই অবহেলা আরম্ভ করলে কি? মন খুলে যখন আমরা আলাপ করলাম, তখন তুমি যে দরদের আভাস দিয়েছ, তেমন মহৎ প্রাণ প্রেমের অফুরন্ত রীতি ও প্রকরণ অবগত হয়ে চিরদিনের মত না ভালবেসে পারে না। মোজেতে প্রার্থনা শুনবার সময় একদিন তুমি বলেছিলে, কারও কারও কাছে এ প্রার্থনা একটি মাত্র ধ্বনির একঘেয়েমি বলে মনে হবে, আবার অন্য কেউ হয়ত এর মধ্যে অফুরন্ত সঙ্গীতের সন্ধান পাবে। খেয়াল রেখ, মাদাম দ বোসেয়াঁর বল নাচের আসরে তোমাকেই নিয়ে যেতে হবে আমাকে। তোমার জন্য অপেক্ষা করব। রাজা সত্যই আজ সকালে মঁশিয় দাজুদার বিয়ের চুক্তি পত্রে স্বাক্ষর করেছেন। বেলা দুটো পর্যন্তও ভিকঁতেস বেচারি এর কিছু জানতেন না। গোটা পারি আজ তার বাড়ীতে জমায়েত হচ্ছে। এ যেন প্রাণদণ্ডের সময় বধ্যভূমিতে 'জনসমাবেশের মত। তিনি যদি উন্নতশিরে নিজের দুঃখের বোঝা বয়ে নির্ভয়ে প্রাণ দিতে পারেন তো সেই বীভৎস দৃশ্য দেখতে যাওয়া মর্মান্তিক নয় কি? আগে কোনদিন সেখানে যাইনি বলে যাচ্ছি। তা না হলে আমি অন্তত যেতাম না বল্লভ! আর আজকে যদি না যাই তো আমার সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যাবে। অন্য লোকের চাইতে আমার

অবস্থা আলাদা। তাছাড়া, খানিকটা তোমার জন্যও যাচ্ছি! তোমার অপেক্ষায় রইলাম। ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে যদি এখানে না আস তো তোমার অপরাধ ক্ষমা করতে পারব কিনা জানি না।

কলম তুলে নিয়ে রাস্তিঞাক লেখে :

ডাক্তারের জন্য অপেক্ষা করছি।· তিনি না আসা পর্যন্ত বুঝতে পারছি না যে তোমার বাবার প্রাণ বাঁচান সম্ভব হবে কি না। বেজায় অসুস্থ হয়ে পড়েছেন তিনি। ডাক্তারের রায় জেনে তোমার সঙ্গে দেখা করব। শঙ্কা হচ্ছে, তিনি মৃত্যুদণ্ডই দেবেন। ভেবে ছাখ, তার পরেও তুমি বলনাচের আসরে যেতে পার কিনা। ভালবাসা নিও।

ডাক্তার এলেন সাড়ে আটটায়। আশার কথা না শোনালেও এমন কথা তিনি বললেন না যাতে মৃত্যু আসন্ন বলে মনে করা যায়। তার মতে বৃদ্ধের অবস্থার একবার কিছুটা উন্নতির লক্ষণ দেখা যাবে আবার অবনতি হবে। এই উন্নতি-অবনতির মাত্রার উপরেই তার বাঁচা-মরা নির্ভর করে।

—ওর পক্ষে এখন মৃত্যুই শ্রেয়। শেষ অবধি এই অভিমত প্রকাশ করেন ডাক্তার।

গোরিওকে বিয়াশঁর তত্বাবধানে রেখে মাদাম দ মুসঁজাঁকে এই মর্মান্তিক সংবাদ শোনাতে চলল ওজেন। পারিবারিক মায়া-মমতার বন্ধনে আবদ্ধ কোন মানুষ এই সংবাদ শুনে শোকে অভিভূত না হয়ে পারে না।

যাবার সময় গোরিও ডেকে বলে, তাহলে ওকে মনটা খুশি রাখতে বলে দিও। তন্দ্রাচ্ছন্নের মত পড়েছিল বৃদ্ধ, কিন্তু রাস্তিঞাক রওনা হবার মুখে চমকে ওঠে।

বিষণ্ন বিমর্ষভাবে দেলফিনের সামনে হাজির হল যুবকটি। দেলফিন তখন প্রসাধন সেরে নাচের জুতো পরছে। বলনাচের পোশাকটা পরলেই বেশ-বিন্যাস শেষ হয়। তবু চিত্রকরের শেষ তুলির টানের মত তার প্রসাধনের শেষ তুলির টানে গোড়াপত্তনের চাইতে অনেক বেশী সময় লাগবে।

—সেকি। পোশাক-আশাক করে এলে না যে! সবিস্ময়ে বলে ওঠে দেলফিন।

—না, মাদাম। তোমার বাবা……

—আবার বাবার কথা! কড়া মেজাজে বলে মহিলাটি।—বাবার প্রতি কর্তব্যের কথা তোমার না শেখালেও চলবে। তোমার চাইতে ঢের বেশী চিনি বাবাকে।

আর একটা কথাও শুনব না ওজেন। পোশাক-আশাক সেরে নেবার পরেই তোমার কথা শুনতে রাজী আছি। তোমার ঘরে সবকিছু তৈরী করে রেখেছে তেরেস। বাইরে আমার গাড়ি অপেক্ষা করছে, ওটা নিয়ে যাও। বেশবাস সেরে চলে এস। বলনাচে যাবার পথে বাবার কথা আলোচনা করা যাবে। হাতে সময় রেখে রওনা হতে হবে। গাড়ির লাইনে যদি আটকা পড়ে যাই তো রাত এগারটার আগে পোঁছোতে পারব না।

—কিন্তু মাদাম!

—যাও বলছি! আর একটি কথাও বলবে না! নেকলেসের জন্য ত্বরিতপদে গোপন কক্ষে যেতে যেতে বলে মহিলাটি।

—যান মঁশিয়, মাদাম রাগ করবেন না হলে! সৌখিন এই পিতৃঘাতিনীর মায়া-মমতাহীন আচরণে স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়েছিল ওজেন। তাকে দিয়ে তাড়াতাড়ি কাজ সেরে নেবার জন্য বলে তেরেস।

বিষাদভরা মনে পোশাক পরতে গেল ওজেন। মনে মনে বহু ব্যথা-জর্জর চিন্তার উদয় হল। দুনিয়াটাকে মনে হল পাঁকের সমুদ্র বলে। এর মধ্যে পা দিলেই আকণ্ঠ ডুবে যাবে বলে শঙ্কা হল! মনে মনে বলল, অতি নীচ, অতি নীচ, অতি জঘন্য এই সাংসারিক অপরাধ! ভোতর্যাঁ এর চাইতে অনেক মহৎ।

তার বিবেচনায় তিনটি প্রধান রূপ আছে: সংসারের আনুগত্য, সংগ্রাম আর বিদ্রোহ। তার মানে, পরিবার, দুনিয়া আর ভোতর্যাঁ। এই তিনটির মধ্যে যে কোন একটি পথ বেছে নিতে হবে বলে সে মনমরা হয়ে পড়ে। আনুগত্য এককালে বিরক্তিকর লেগেছে। সংগ্রাম বিপজ্জনক, আর বিদ্রোহ সাধ্যাতীত। কল্পনার স্রোতে সে নিজের ঘর-সংসারের পরিবেশে ফিরে যায়। মনে পড়ে, সেই বৈচিত্র্যবর্জিত জীবনের নিখাদ সুখের কথা, প্রিয়-পরিজনের স্নেহ-মমতাভরা হারানো দিনগুলির কথা একে একে মনে হয়। গার্হস্থ্য জীবনের স্বাভাবিক বিধিবিধানের সঙ্গে মিল আছে এই স্নেহময় মানুষগুলির। তাই তারা পরিপূর্ণ ছেদহীন সুখ-শান্তির অধিকারী। ওজেনের মত এমন মানসিক ক্লেশ তাদের ভুগতে হয় না। তবু এই সুমধুর চিন্তা সত্ত্বেও এমন সাহস তার ছিল না যে দেলফিনের কাছে গিয়ে নিষ্কলুষ অন্তরের এই নীতিবাদ ঘোষণা করে—ভালবাসার নামে তাকে সন্তানের পবিত্র কর্তব্য সম্পর্কে অবহিত করে তোলে। সবে পাঠ নিতে শুরু করেছে ওজেন। তবু ইতিমধ্যেই সেই শিক্ষার ফল

ফলছে। স্বার্থবুদ্ধিই তার প্রেমের জনক। তীক্ষ্ণ অনুভবশক্তির বলে ইতি-মধ্যেই সে দেলফিনের মনের গড়ন বুঝে নিয়েছে। আপনা থেকেই তার মনে হয়েছে যে বাপের মৃতদেহ মাড়িয়ে যদি বলনাচে যেতে হয় তো তাতেও কুণ্ঠাবোধ করবে না দেলফিন; অথচ তার ভুল সংশোধনের মত কর্তৃত্ব, কিংবা তার বিরুদ্ধাচরণের সাহস, কিংবা তাকে ছেড়ে যাবার মত মনোবল তার নেই। —এই ব্যাপারে যদি তার ভুল ধরিয়ে দিতে যাই জীবনে আমায় ক্ষমা করবে না। মনে মনে ভাবে রাস্তিঞাক।

তাই সে ডাক্তারের ঘোষণা উপেক্ষা করে। নিজেকে প্রবোধ দেয়, বুড়ো গোরিওর অসুখ যা মনে করেছে অতটা মারাত্মক নয়। মোট কথা দেলফিনের সমর্থনে মনে মনে সে বহু অলীক যুক্তি জড়ো করে। মহিলাটি জানে না যে তার বাপের অসুখ কত মারাত্মক। সে যদি বাপের সঙ্গে দেখা করতে যেত তাহলে সেই স্নেহবৎসল বৃদ্ধই তাকে বলনাচে পাঠিয়ে দিত। ছকেবাঁধা কঠোর সামাজিক বিধানে যে অপরাধ নিন্দনীয়, অসংখ্য জটিলতাভরা পারিবারিক জীবনে হয়ত সেই ত্রুটি ক্ষমার যোগ্য। পারিবারিক পরিবেশের মধ্যে প্রকৃতিগত পার্থক্য, স্বার্থের বিভিন্নতা আর পরিবর্তনশীল অবস্থার তাৎপর্য যারা জানেন, তারাই বুঝতে পারবেন কেন এইসব সুস্পষ্ট অপরাধ ক্ষমার যোগ্য বলে বিবেচিত হয়। আত্মপ্রবঞ্চনা করতে চেয়েছিল ওজেন। প্রণয়িনীর কাছে নিজের বিবেক বন্ধক রাখতে সে প্রস্তুত। গত দু'দিনে তার গোটা চরিত্রের রূপ বদলে গেছে। এক নারীর অস্তিত্বের প্রভাব তার দুনিয়ায় গোলমাল বাঁধিয়ে দিয়েছে—রাহুর মত গ্রাস করেছে তার সমস্ত পরিবারকে। আজ তার সমস্ত সত্তা সেই নারীর উদ্দেশ্যসাধনের বাহন হয়ে পড়েছে।

যে অবস্থায় রাস্তিঞাক আর দেলফিনের মিলন ঘটেছে তাতে পরস্পরের প্রতি প্রবল আকর্ষণ বোধ না করে তারা পারে না। মনে হয়, পরস্পরকে চরম আনন্দ দেবার উদ্দেশ্যেই এই মিলন ঘটেছে বুঝি। এতদিন দুজনেই মনে মনে যে চাপা কামনা পোষণ করে এসেছে, আজকে সম্ভোগের যজ্ঞ বেদীতে সেই কামনা দাউ দাউ করে জলে উঠেছে—পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে। উপভোগেই তো কামনার মৃত্যু! এই নারীকে পেয়ে ওজেন ভেবেছে, এতদিন এর কামনাই সে করে এসেছে। কিন্তু তাকে ভালবাসতে পেরেছে সম্ভোগের পরের দিন। ভালবাসা হয়ত সম্ভোগের কৃতজ্ঞতা বই আর কিছুই

নয়। এই নারী ঘৃণ্যা হোক কি মহীয়সী হোক তাতে তার কিছু এসে যায় না। আনন্দের যে উপাচার সে নিয়ে এসেছে তার জন্যই তাকে পূজা করে রাস্তিঞাক। আর তার মধ্যে মহিলাটি যে আনন্দের সন্ধান পায় তার জন্যও ভাল লাগে। রাস্তিঞাকের প্রতি দেলফিনের ভালবাসা বুভুক্ষু তান্তালাসের মত। কোন দেবতা যদি বুভুক্ষু তান্তালাসের কাছে অন্নজল নিয়ে আসত তো তান্তালাস তাকে যেমন ভালবাসত, দেলফিনও তেমনি ভালবাসে ওজেনকে। রাস্তিঞাক তার বুভুক্ষু প্রাণে দিয়েছে পরিতৃপ্ত ভোজেনের আনন্দ—তৃষ্ণাতুর শুষ্ক কণ্ঠে দিয়েছে অমৃত বারি। তার বুভুক্ষা, তার তৃষ্ণা দুটোই আজ পরিতৃপ্ত।

বলনাচের জন্য পোশাক-আশাক করে ওজেন ফিরে আসতেই মাদাম দ নুসাঁজাঁ জিজ্ঞাসা করে, হাঁ, এইবার বাবার খবর বল।

—সত্যই খুব অসুস্থ তিনি। আমাকে ভালবাসার প্রমাণ যদি দিতে চাও তো কথা দাও, তাকে দেখবার জন্য তাড়াতাড়ি ফিরবে?

—হাঁ, নিশ্চয় ফিরব। দেলফিন বলে।—বলনাচের পরে কিন্তু! হাঁগো ওজেন, এখন ওসব কথা রাখ! নীতিকথা এখন না হয় না-ই শোনালে। যাবে চল!

দুজনেই রওনা হয়। চুপ করে বসে থাকে ওজেন। একটু বাদে দেলফিন বলে, কি হল তোমার?

—তোমার বাবার মৃত্যুযন্ত্রণা কানে বাজছে। খানিকটা ক্ষুব্ধভাবেই বলে ওজেন। তারপর তীব্র তীক্ষ্ণ ভাষায় সে অহমিকায় অন্ধ মাদাম দ রেস্তোর নির্মম নিষ্ঠুরতার কাহিনী শোনাল। বলল, চরম আত্মত্যাগের জন্যই স্নেহ-বৎসল বৃদ্ধ এই মারাত্মক অসুখে পড়েছে। মাদাম দ রেস্তোর পোশাকের কথাও জানাল তাকে। চোখের জল ফেলল দেলফিন। পরক্ষণেই ভাবল, বেজায় বিচ্ছিরি দেখাবে তো! এই শঙ্কায় অমনিই তার চোখের জল শুকিয়ে গেল।

বলল, আমিই বাবার সেবা করব—কখনও তার রোগশয্যা ছেড়ে যাব না।

—এই তো, এই তো চেয়েছিলাম তোমার কাছ থেকে! সোৎসাহে বলে ওঠে রাস্তিঞাক।

পাঁচশ' গাড়ির আলোয় ওতেল দ বোসেয়াঁয় যাবার পথ ঝলমল করছে। আলোকোজ্জ্বল তোরণের উভয় পার্শ্বে জমকাল পোশাকপরা এক একটি শাস্ত্রী সগর্বে দাঁড়ান। মহীয়সী মহিলার পতনের দিকে কৌতূহলী সৌখিন সমাজের এত বেশী লোক সেদিন তাকে দেখবার জন্য ভিড় করেছে যে

মাদাম দ মুসাঁজাঁ আর ওজেন পৌঁছোবার আগেই একতলার বিরাট অভ্যর্থনা কক্ষ ভরে গেছে। চতুর্দশ লুই যেদিন ল গ্রাঁদ মাদমোয়াজেলকে তার প্রণয়ীর কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেন, রাজ দরবারে সবাই সেদিন গিয়েছিল মহিলাটিকে দেখতে। সেই ঘটনার পর কোন প্রেমের কাহিনীর মর্মান্তিক পরিসমাপ্তি পারির অভিজাতসমাজে এত আলোড়ন সৃষ্টি করতে পারেনি তবু এই মর্মান্তিক অবস্থার মধ্যেও বুরগঁর আধা-রাজপরিবারের কনিষ্ঠা কন্যা শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত অভিজাত সমাজের উপর কর্তৃত্ব করে যান। এদের আত্মম্ভরিতার কাছে তখনই তিনি হার মানতে রাজী আছেন যদি মনে করেন, তাতে তার হৃদয়াবেগ জয়ী হবার সম্ভবনা আছে।

মনোরম বেশ-বাস আর সুমধুর হাসি দিয়ে পারির সেরা সুন্দরী সমাজ এই দৃশ্য প্রাণচঞ্চল করে তোলে। রাজদরবারের অতিবিশিষ্ট পারিষদ, রাজদূত, মন্ত্রী আর সর্বস্তরের প্রথিতযশা মানুষ—বিচিত্র রঙের ফিতে, তারকা চিহ্ন কি অন্যান্য সম্মানচিহ্নে ভূষিত হয়ে ভিকঁতেসের চারদিকে ভিড় করে দাঁড়ায়। অরকেষ্ট্রার সঙ্গীত কারুকার্যখচিত ছাতে বাধা পেয়ে কেঁপে কেঁপে প্রাসাদময় ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু প্রাসাদের রাণীর কাছে এর সব কিছুই বেসুরো লাগে।

তথাকথিত বন্ধুদের অভ্যর্থনার জন্য মাদাম দ বোসেয়াঁ প্রথম সালোঁর দরজায় দাঁড়ান। দুধের মত সাদা পোশাক পরেছেন তিনি। সাদাসিধেভাবে বিন্যস্ত চুলেও কোন অলঙ্কার পরেননি। প্রশান্ত তার মুখের ব্যঞ্জনা। দুখ গর্ব কিংবা কৃত্রিম আনন্দের কোন ছাপ নেই সে-মুখে। তার অন্তরের কথা বুঝবার সাধ্য কারও নেই। শ্বেতমর্মরে গড়া নিওবের মূর্তির মত দেখাচ্ছে তাকে। অন্তরঙ্গ বন্ধু-বান্ধবীদের অভ্যর্থনা করার সময় তার স্মিতহাসির মধ্যে কপটতা উঁকি মারে। তবু তিনি স্বাভাবিক ভাব অক্ষুণ্ণ রাখেন। সুখের দীপ্তি অলংকারের মত যখন তাকে ঘিরে রেখেছিল। সেই দিনের বোসেয়াঁর সঙ্গে আজকের বোসেয়াঁর এতটুকু প্রভেদ নেই। এই অটুট স্থৈর্যের জন্য তিনি চরম প্রাণহীন, চরম অনুভূতিহীন মানুষেরও প্রশংসা অর্জন করেন। মৃত্যুমুখী পেশাদার মল্লযোদ্ধার মুখে হাসি দেখে রোমান মহিলারা যেমন করতালি দিতেন, এও সেই ধরনের বাহবা। মনে হয়, অভিজাত সমাজের এক রাণীকে বিদায় সংবর্ধনা জানাবার জন্যই যেন সৌখিন সমাজ জমায়েৎ হয়েছে।

—ভেবেছিলাম, তুমি না আসেতও পার। রাস্তিঞাককে বলেন মহিলাটি।

একে ভৎ´সনা মনে করে আবেগকম্পিত গলায় বলে রাস্তিঞাক, মাদাম, আপনাকে ছেড়ে আমি যাব না! সেইজন্যই এলাম।

—শুনে সুখী হলাম! রাস্তিঞাকের হাত ধরলেন মহিলাটি।—এখানে যত লোক আছে তার মধ্যে একমাত্র তোমাকেই আমি বিশ্বাস করতে পারি। শোন বন্ধু, যখন ভালবাসবে তখন এমন নারীকে ভালবেস যাকে চিরকাল ভালবাসতে পার। নারীকে কোন দিন ছেড়ে যেও না!

রাস্তিঞাকের হাত ধরে তিনি একটা সোফার দিকে যান। অতিথিরা তাস খেলছিল সেই ঘরে।

—তুমি মার্কির কাছে যাও একবার। মাদাম বলেন।—আমার খানসামা জাক তোমার সঙ্গে যাবে। মার্কির নামে লেখা একখানা চিঠি আছে তার কাছে। চিঠিতে আমি আমার আগের চিঠিগুলো চেয়ে পাঠিয়েছি। আমার বিশ্বাস, সে আপত্তি করবে না। আমার চিঠিগুলো পেলে উপরে আমার ঘরে চলে যেও। তারপর যে কারও মারফত খবরটা জানিও।

এরপর তিনি তার অন্তরঙ্গতম বান্ধবী মাদাম দ লাঁজেকে অভ্যর্থনা করতে উঠে দাঁড়ান। এই দিকেই আসছিলেন তিনি। রাস্তিঞাক বেরিয়ে পড়ে। ওতেল দ রশফিদেতেই যায়। তার বিশ্বাস, আজ রাতে খুব সম্ভবত সেখানেই আছে মার্কি দাত্যুজা। তার খোঁজ জিজ্ঞাসা করায় তাকে ভেতরে নিয়ে যাওয়া হয়। ছাত্রটিকে নিয়ে মার্কি নিজের বাড়ীতে যান। তারপর তার হাতে একটি বাক্স দিয়ে বলেন, তিনখানা আছে সব শুদ্ধ।

আর দু'একটা কথা জিজ্ঞাসা করার ইচ্ছা ছিল তার। ভেবেছিল, বলনাচ কি ভিকঁতেসের সংবাদ জিজ্ঞাস করবে ওজেনকে। একবার স্বীকার করার ইচ্ছাও হয়েছিল যে ওজেনের সঙ্গে শেষ দেখার দিন অবধিও বিয়ে সম্পর্কে সে হতাশ ছিল। কিন্তু সহসা তার চোখে গর্বোদ্ধত অহমিকার ঝিলিক খেলে যায়। অবজ্ঞেয় সাহস সঞ্চয় করে সে মনের মহৎ ভাব গোপন করে।

—আমার কথা তাকে বলো ওজেন। সস্নেহে ওজেনের হাতে চাপ দিয়ে বিষণ্ণভাবে বলে মার্কি এবং সঙ্গে সঙ্গেই চলে যায়।

ওতেল দ বোসেয়াঁয় ফিরে এল ওজেন। চাকর-বাকর তাকে ভিকঁতেসের ঘর দেখিয়ে দেয়। এখানে সে প্রবাস যাত্রার আয়োজন লক্ষ্য করল। আগুনের পাশে বসে একদৃষ্টে সে সিডার কাঠের বাক্সটির দিকে চেয়ে রইল।

গভীর দুশ্চিন্তা তাকে অভিভূত করে ফেলে। তার দৃষ্টিতে মাদাম দ বোসেয়াঁর স্থান পার্থিব জাঁকজমকের উর্ধ্বে—ইলিয়াদের দেবী যেন।

—হায় বন্ধু! ভিকঁতেস বলেন। সরাসরি রাস্তিঞাকের কাছে এগিয়ে গিয়ে তার কাঁধে হাত দেন মহিলাটি। বেশ বুঝতে পারেন যে ভাইর চোখ দিয়ে জল গড়াচ্ছে। ওজেনও অনুভব করে যে মহিলাটির হাত কাঁপছে। বাক্সটি নেবার জন্য তিনি অপর হাত বাড়ান। চেয়ে থাকেন উপরের দিকে। সহসা বাক্সটি তুলে নিয়ে তিনি আগুনের মধ্যে ছুঁড়ে মারেন। তারপর একদৃষ্টে চেয়ে থাকেন জ্বলন্ত কৌটাটির দিকে।

—সবাই নাচছে। সকলেই চটপট এসেছে কিন্তু মরণ আসতে আরও দেরী আছে। চুপ কর বন্ধু! রাস্তিঞাক কথা বলতে চাইছে লক্ষ্য করে আঙুল দিয়ে তিনি তার ঠোঁট চেপে ধরেন।—জীবনে আর পারি বা এ দুনিয়া দেখব না। আজ ভোর পাঁচটায় নরমাঁদির এক গণ্ডগ্রামে গিয়ে আত্মগোপন করে থাকব। আজ বেলা তিনটে থেকেই তার আয়োজন করছি—দলিলপত্রে সই করে সব ঠিকঠাক করে যাচ্ছি। আর কোন লোককেই আমি পাঠাতে পারতাম না……। মহিলাটির গলা আটকে যায়।—আমি জানতাম, নিশ্চয়ই আজ সে থাকবে……। ব্যথায় কাতর হয়ে আবারও থামেন তিনি। এই সময়ে সব কিছু বেদনাকাতর হয়ে ওঠে এবং এমন কতগুলি কথা আছে যা কোনক্রমেই মুখে আনা যায় না।

তবু মহিলাটি বলে যান, সোজা কথায়, এই কাজটুকু করার জন্য আমি তোমার উপরেই নির্ভর করছিলাম আজ সন্ধ্যায়। আমাদের বন্ধুত্বের অভিজ্ঞান হিসাবে তোমায় কিছু দিয়ে যেতে চাই। কোনদিন ভুলব না তোমার কথা। আমি তোমাকে সদয় মহৎ আর নিষ্কলুষ চরিত্রের দিলখোলা মানুষ বলেই গণ্য করি। এ সমাজে এই সব গুণপনা সুদুর্লভ। মাঝে মাঝে আমার কথাও মনে কর, কেমন? আর শোন! চারদিকে চেয়ে মাদাম বলেন।—এই বাক্সটায় আমি দস্তানা রাখতাম। বলনাচে কি থিয়েটারে যাবার জন্য যখনই বাক্স খুলেছি তখনই মনে হয়েছে, সুখী বলে আমায় সুন্দর হতে হবে। প্রতিবার এই বাক্স খোলার সঙ্গে এক একটি মধুর স্মৃতি জড়িত। এর মধ্যে আমার অনেক কিছুই রয়েছে—যে মাদাম দ বোসেয়াঁর অস্তিত্ব আজ নেই তার সবটাই রয়েছে এর মধ্যে। এখন এটা তোমার, নেবে? রুয় দার্তোয়ায় এটা যাতে পাঠান হয় তার ব্যবস্থা আমি করব। মাদাম দ নুসাঁজাঁকে আজ

বেশ মানিয়েছে। প্রাণভরে ওকে ভালবেস। আর যদি আমাদের দেখা না হয় তাহলেও চিরদিন আমি তোমার কল্যাণ কামনা করব বন্ধু! চল, নীচে যাই। আমি চাই না যে লোকে মনে করুক, আমি কাঁদছি। সারা জীবন তো পড়ে রইল কাঁদার জন্য। তখন কেউ জিজ্ঞাসাও করবে না কেন কাঁদছি। যাবার আগে শেষবারের মত আর একবার ভাল করে ঘরখানা দেখে যাই।

নীরবে দাঁড়িয়ে থাকেন মহিলাটি। পলকের জন্য করতলে চোখ ঢেকে চোখের জল মুছে ফেলেন। তারপর ঠাণ্ডা জলে হাত ধুয়ে ছাত্রটির হাত ধরেন—যাই চল।

কোন অভিজ্ঞতা রাস্তিঞাককে এমন গভীরভাবে আলোড়িত করেনি। এমন মহান ধৈর্য নিয়ে কোনদিন দেখেনি দুঃখের দহন সইতে।

দুজনেই বলনাচের আসরে ফিরে আসে। ওজেনের হাত ধরে মাদাম দ বোসেয়াঁ সব কটি কক্ষ ঘুরে বেড়ান। এইটিই মহীয়সী মহিলার শেষ সুমধুর সহৃদয়তা। ছাত্রটির দৃষ্টি অবিলম্বেই ভীড়ের মধ্য থেকে মাদাম দ রেস্তো আর মাদাম দ নুসাঁজাঁকে খুঁজে বার করে। হীরা জহরতের অলংকারে ঝলমল করছে কঁতেস। এই অলংকারের দাহে নিশ্চয়ই তার দেহ পুড়ে যাচ্ছে। কারণ, আর দ্বিতীয় দিন এই সব অলংকার তার গায়ে উঠবে না। তার গর্ব, তার ভালবাসা যতই প্রবল হোক না কেন, স্বামীর সঙ্গে চোখাচোখি হতেই তার দৃষ্টি আনত হয়ে আসছে। এই দৃশ্য রাস্তিঞাকের বিশাদভরা চিন্তার গুরুভার লাঘব করতে পারল না। দুই বোনের হীরা-জহরতের চোখে বাঁধানো জৌলুসের পেছন থেকে বুড়ো গোরিওর নগণ্য বিছানা উঁকি মারে। ভিকঁতেস তার বিষণ্ণতার ভুল অর্থ করেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তার হাত ছেড়ে দেন। বলেন, যাও, আমি তোমায় আনন্দ থেকে বঞ্চিত করতে চাই না।

এই অভিজাত মহলের বাহবা পেয়ে বেশ উৎফুল্ল হয়ে উঠেছিল দেলফিন। অবিলম্বেই সে ওজেনকে দখল করে বসে। এই নতুন জগতে প্রশংসা লাভের জন্য ওজেনের কাছে সে কৃতজ্ঞ। ভাবছিল, এই নতুন সমাজ হয়ত তাকে পাঙতেয় করে নেবে। তাই ওজেনের পায়ে লুটিয়ে পড়বার জন্য সে অধীর হয়ে পড়েছিল।

—নাজিকে দেখে কি মনে হয়? সে জিজ্ঞাসা করে।

—বাপের মৃত্যুর বিনিময়ে তার কাজ হয়েছে। রাস্তিঞাক বলে।

রাত চারটের সময় অভ্যর্থনা কক্ষের ভিড় কমে আসে। সঙ্গীতও থেমেছে

সবে। একটু বাদে ডুশেস দ লাঁজে আর রাস্তিঞাক ছাড়া বিরাট বলনাচের কক্ষে অপর কেউ রইল না। ছাত্রটি ছাড়া আর কেউ তখন নেই মনে করে মঁশিয় দ বোসেয়াঁর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে একটু বাদে হল ঘরে ঢোকেন ভিকঁতেস। মঁশিয় দ বোসেয়াঁও তার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে শুতে যান।

—তোমার মত বয়সে নিজেকে অমনভাবে বিচ্ছিন্ন করে রাখা কিন্তু অন্যায় হবে। আমাদের মধ্যেই থাক।

ডুশেসকে দেখে বিস্ময় প্রকাশ না করে পারলেন না ভিকঁতেস।

মাদাম দ লাঁজে তখন বলেন, তোমার মনের কথা আমি বুঝতে পেরেছি ক্লারা! আমাদের তুমি ছেড়ে যাচ্ছ—আর কোনদিনই ফিরবে না; কিন্তু আমার কথা না শুনে কিংবা আমার সঙ্গে বোঝা পড়া না করে যাওয়া চলবে না।

বান্ধবীর হাত ধরে তিনি পাশের ঘরে চলে যান। সেখানে জলভরাচোখে বান্ধবীর দিকে চেয়ে মাদাম দ লাঁজে তাকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে কপালে চুমু খান।

—এমন প্রাণহীনের মত আমাদের ছাড়াছাড়ি হতে পারে না সুচরিতে! তাতে পরে আমাকে দুর্বহ দুখের বোঝা বইতে হবে। নিজের মতই বিশ্বাস করতে পার আমাকে। আজ রাত্রে সত্যই মহত্ত্বের পরিচয় দিয়েছ তুমি। ভাবলাম আমারও অতটা মহৎ হওয়া উচিত। তাহলেই তোমার বান্ধবী হবার যোগ্য হতে পারি। তোমার উপর কোন বিদ্বেষ আমার নেই, তবে স সময় সদয় ব্যবহার করিনি বটে! সেজন্য ক্ষমা কর সুচরিতে! যত ব্যথা তোমায় দিয়েছি তার সবটাই আজ ফিরিয়ে নিচ্ছি। সেই সব কথা আজ যদি ফিরিয়ে নিতে পারতাম! দুজনেই আমরা সমব্যথী। জানি না, কে বেশী অসুখী! মঁশিয় দ মঁত্রিভো আজ এখানে আসেনি, তার অর্থ বুঝতে পারছ? আজকের বলনাচে তোমায় যারা দেখেছে, কোনদিনই তোমায় তারা ভুলতে পারবে না ক্লারা। আর একটা শেষ চেষ্টা আমি করতে চাই। তাতেও যদি বিফল হই তো মঠে চলে যাব। তুমি কোথায় যাচ্ছ ক্লারা?

—নরমাঁদি……কুর্সেলে! ভগবান যতদিন এ দুনিয়া থেকে সরিয়ে নিয়ে না যান ততদিন সেখানে থাকব আর রোজ প্রার্থনা করব।…মঁশিয় রাস্তিঞাক! যুবকটি অপেক্ষা করছে মনে পড়ে কাঁপা গলায় ডাক দেন ভিকঁতেস।

নতজানু হয়ে দিদির হাতে চুমু খায় ছাত্রটি।—তাহলে আসি আঁতোয়ানেৎ!

মাদাম দ বোসেয়ঁা বলেন।—প্রার্থনা করি, সুখী হও! ছাত্রটির দিকে ফিরে বলেন—তোমায় সে কথা বলবার দরকার নেই। এখনও যুবক তুমি, আস্থা বা বিশ্বাস হারাবার বয়স তোমার হয়নি। এই দুনিয়া ছেড়ে যাবার সময় চারপাশের লোকজনের অকপট শ্রদ্ধা আমায় বল দিচ্ছে। মৃত্যু-মুখী সামান্য জনকয়েক ভাগ্যবানের বরাতেই এই সৌভাগ্য জোটে।

মাদম দ বোসেয়ঁাকে ভ্রাম্যমান গাড়িতে তুলে দিয়ে ভোর পাঁচটার সময় বাসায় ফেরে রাস্তিঞাক। শেষ বিদায়ের সময় মাদামের চোখ দিয়ে অঝোরে জল গড়ায়। কারণ উচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত মানুষও তো সাধারণ ভাবাবেগের উর্ধ্বে নয়। লোকে যা-ই মনে করুক, তাদের জীবনেও বেদনার জ্বালা আছে। ভিজে শিরশিরে সকালে হেঁটেই মেজঁ ভোকেতে ফিরল রাস্তিঞাক। এতদিনে তার শিক্ষা সমাপ্ত হতে চলেছে।

* * * *

রাস্তিঞাক পড়শীর ঘরে ঢুকবার সঙ্গে সঙ্গে বিয়াশঁ বলে ওঠে, আর বুড়ো গোরিওকে বাঁচান গেল না ওজেন! পলকের জন্য ঘুমন্ত বৃদ্ধের দিকে তাকায় ওজেন; তারপর বন্ধুর দিকে ফিরে বলে, ভাই বিয়াঁশ, মধ্যবিত্তের জীবনধারা সন্তুষ্টচিত্তে গ্রহণ করে তুই ভালই করেছিস্। এ পথ ছাড়িসনে। আমি নরকে পড়েছি—থাকতেও হবে সেইখানে। এ সংসারের যত কুৎসা কানে আসে সবই বিশ্বাস করিস সবই সত্য! কোন শিল্পীর সাধ্য নেই যে এই সোনায় মোড়া হীরা বসান বিভীষিকার পূরো ছবি আঁকতে পারে।

পরের দিন বেলা দুটোয় তার ঘুম ভাঙায় বিয়াঁশ। কারণ তখন তার একবার বাইরে না গেলে নয়। যাবার আগে সে বৃদ্ধের দিকে লক্ষ্য রাখার কথা বলে যায়। সকালের দিকে তার অবস্থা আরও খারাপ হয়েছে।

—বুড়ো আর দিন দুয়েকও টিকবে না···আর ঘণ্টা কয়েক বাঁচে কিনা সন্দেহ। মেডিক্যাল ছাত্রটি বলে।—তাই বলে রোগের সঙ্গে লড়াই করা ছেড়ে দিলে চলবে না। ওর এখানকার চিকিৎসা ব্যয়-সাধ্য···টাকা না হলে চলবে না। সেবা-শুশ্রূষা আমরা দুজনে মিলে করতে পারি, কিন্তু একটি পেনিও নেই আমার হাতে। আমি ওর পকেট উলটে দেখেছি, দেরাজের মধ্যেও খোঁজা-খুঁজি করলাম—কিছুই পাওয়া গেল না। কিছুটা প্রকৃতিস্থ ভাব ফিরে এলে ওকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। বললে, নিজের বলতে এক কপর্দকও তার নেই। তোর কাছে কি আছে?

—মাত্র বিশটি ক্র্যাঁ। রাস্তিঞাক বলে।—দাঁড়া এই দিয়ে রুলেতের টেবিলে বাজী খেলব। জিত আমার সুনিশ্চিত।

—যদি হেরে যাস ?

—তাহলে ওর মেয়ে-জামাইর কাছে চাইব।

—ধর, তারা যদি কিছু না দেয় ? আবারও জেরা করে বিয়াশঁ। যাই হোক, টাকা যোগাড় করা এখন সব চাইতে জরুরী কাজ। ওর গোটা পা দুটো এখন ফুটন্ত গরম সরষের পুলটিশ দিয়ে মুড়ে দিতে হবে। যদি উঃ—আঃ করে ওঠে তো বোঝা যাবে, এখনও সব আশা শেষ হয়নি। কি করে করতে হয় জানিস্ তো ? তাছাড়া ক্রিস্তফ রইল। সে তোকে সাহায্য করতে পারবে। ডিসপেনসারিতে গিয়ে আমি ধারে সব জিনিস নিয়ে আসছি। বড়ই দুঃখের কথা, ওকে আমাদের হাসপাতালে বদলী করা গেল না। সেখানে গেলে বেচারি আরও ভাল থাকতে পারত। আয়, তোকে সব বুঝিয়ে দিয়ে যাচ্ছি। আমি ফিরে না আসা অবধি ওর কাছ ছাড়া হবি না।

দুজনে বৃদ্ধের ঘরে ফিরে আসে। গোরিওর মুখের পরিবর্তন দেখে ওজেন আরও দমে যায়। চরম-অবসন্ন, পাণ্ডুর আর বিকৃত সে মুখ।

চরম দীন বিছানার উপর ঝুঁকে সে বলে, কেমন আছেন বাবা ?

নিষ্প্রভ চোখ দুটো তুলে ওজেনের দিকে তাকায় বৃদ্ধ। সযত্নে তাকে লক্ষ্য করে, কিন্তু চেনার লক্ষণ প্রকাশ পেল না। এ অবস্থা ছাত্রটির পক্ষে দুঃসহ। তার চোখের পাতা ভিজে ওঠে।

—আচ্ছা বিয়াশঁ, জানালায় পর্দা দিলে ভাল হয় না ?

—দরকার নেই। আলো হাওয়া এখন আর কোন প্রভাব বিস্তার করবে না। যদি শীত কি গরম অনুভব করে তো সত্যি ভাল লক্ষণ বলা যাবে। যাই হোক জল গরম করা কি অন্য কিছু তৈরীর জন্য আগুন একটা চাই। জ্বালানি কাঠ যতক্ষণ না পাওয়া যায় ততক্ষণ কাজ চালাবার জন্য আমি কয়েক আঁটি কাঠি পাঠিয়ে দেবখন। তোর কাঠ আমি কাল রাতে পুড়িয়েছি। বুড়োর যা ছিল তাও শেষ হয়ে গেছে। বুড়োর চুল্লীটা এমন ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছিল যে দেয়াল দিয়ে জল গড়াচ্ছিল। কোনমতে ঘরটা গরম করে রেখেছিলাম। ঘরে দুর্গন্ধ নাশ করার জন্য আমায় জুনিপার পোড়াতে হয়েছিল।

—হায় ভগবান! রাস্তিঞাক বলে। আর ওর মেয়েদের অবস্থা ভেবে দেখ!

—শোন, যদি জল খেতে চায় তো এইটে থেকে খানিকটা দিস্। সাদা মস্তবড় একটা কলসী দেখিয়ে বলে বিয়শ´। যদি কঁকানি শুনিস্ আর পেটে হাত দিয়ে গরম এবং শক্ত লাগে তো ক্রিস্তফকে ডাকিস্। কি করতে হবে জানিস তো! খুব উত্তেজিত হয়ে যদি বক্‌বক্ করে, এমন কি যদি প্রলাপও বকে তো বিচলিত হবি না। সে লক্ষণ খারাপ নয়। তাহলে ওস্পিস কোশঁ্যাতে পাঠিয়ে দিবি ক্রিস্তফকে। আমাদের ডাক্তার কি সতীর্থ কেউ কিংবা আমি নিজে এসে জলুনি ভরা মোক্‌সা পাতা লাগাব। আজ সকালে যখন তুই ঘুমিয়ে ছিলি তখন আমরা বিস্তারিত পরামর্শ করেছি। ডাক্তার গলের এক ছাত্র, আমাদের হাসপাতালের এক জুনিয়র ডাক্তার আর আমাদের বড় ডাক্তার এসেছিল এখানে। এদের সকলেরই ধারণা, এই রোগীর মধ্যে অস্বাভাবিক লক্ষণ আছে; কাজেই রোগের গতি পরিণতি আমরা বিশেষভাবে লক্ষ্য করব, কারণ আরও কয়েকটি বৈজ্ঞানিক সমস্যার নতুন তথ্য পাবার সম্ভাবনা আছে। একজন ডাক্তার বললেন, রক্তের জলীয় অংশের চাপে মস্তিষ্কের একটি বিশিষ্ট অংশ আক্রান্ত হয়েছে বলে এ ব্যাপারে তিনি বিশেষ আগ্রহ দেখাবেন। কাজেই যদি কোন কথা বলে বিশেষভাবে লক্ষ্য করে টুকে রাখিস যে সে কথাগুলো কোন কোন চিন্তা থেকে আসছে। লক্ষ্য করবি, বৃদ্ধ স্মৃতিশক্তি ব্যবহার করছে, না বোধশক্তি প্রয়োগ করছে, না বিচারশক্তি প্রয়োগ করছে। ভবিষ্যৎ সম্পর্কে পরিকল্পনা করছে কি অতীতে ফিরে যাচ্ছে তাও লক্ষ্য করবি। মোট কথা, আমাদের একটা যথাযথ রিপোর্ট দেবার জন্য তৈরী থাকবি। এও হতে পারে যে রক্তের জলীয় অংশের চাপে গোটা মস্তিষ্ক আক্রান্ত হয়ে পড়ল। সে অবস্থায় এই সংজ্ঞাহীন অবস্থাতেই মারা যাবে। এই সব অসুখের স্বাভাবিক সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করা ভারি কঠিন। ধর, চাপটা যদি মস্তিষ্কের এই জায়গায় আসত, রোগীর মাথার পেছনটা দেখিয়ে বলে বিয়াশ´।—তাহলে অদ্ভুত কতগুলি জিনিস ঘটার সম্ভাবনা ছিল। তাতে মস্তিষ্ক আবার তার স্বাভাবিক প্রক্রিয়ার কিছুটা ফিরে পেতে পারে আর মৃত্যুও বিলম্বিত হত। এমন দৃষ্টান্তও আছে। তখন এই জলীয় পদার্থ মস্তিষ্ক থেকে চুঁইয়ে বেরিয়ে যেতে পারে। কোন পথে যে যাবে তা শুধু শবব্যবচ্ছেদ করেই জানা সম্ভব। দুরারোগ্য ব্যাধির হাসপাতালে এক বুড়োর ক্ষেত্রে জলীয় পদার্থটি মেরুদণ্ডের দিকে সরে যায়। বুড়ো এখনও বেঁচে আছে, কিন্তু প্রাণান্তকর যন্ত্রণায় ভুগছে।

—সময়টা ওদের ভাল কেটেছে তো! ওজেনকে চিনতে পেরে বৃদ্ধ বলে ওঠে।

—হায়রে! মেয়ের চিন্তা ছাড়া আর কোন চিন্তাই বেচারির মনে নেই, বিয়াশঁ বলে। —গত রাত্রে দশ বারো বার আমায় শুধু বলেছে: এখন ওরা নাচছে—পোশাকটা পেয়ে গেছে তো! নাম ধরেও ডেকেছিল—কি বলব, চীৎকার করে কাঁদতে ইচ্ছা করছিল আমার। এমন ভাবে বলছিল—'দেলফিন! আমার তুলালী দেলফিন! নাজি!—সে কি আর বলব! সত্যি বলছি, সে কথা শুনলে সবারই কান্না পায়।'

বৃদ্ধ এই সময় বলে ওঠে, দেলফিন? দেলফিন এসেছে, না? জানতাম, সে আছে। গোরিওর চোখে একটা বিভ্রান্ত চঞ্চলতা দেখা দেয়—শূন্য দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে দেয়াল ও দরজার দিকে।

—নীচে গিয়ে আমি সিলভিকে পুলটিস তৈরী করতে বলে দিচ্চি। এখুনি দেবার ঠিক সময় হচ্ছে।

রাস্তিঞাক একলাই তখন বৃদ্ধের কাছে থাকে। বিছানার পায়ের দিকে বসে একদৃষ্টে সে ক্লিষ্ট বীভৎস মুখখানার দিকে চেয়ে থাকে।

—মাদাম দ বোসেয়াঁ শহর ছেড়ে পালালেন; এ লোকটা এখানে মৃত্যু-শয্যায়। মহৎ প্রাণ বেশীদিন এই দুনিয়ার জীবনধারা সইতে পারে না। আপনমনে বলে রাস্তিঞাক। —সত্যিই তো এই অন্তসারশূন্য ঘৃণ্য নীচ সমাজে সুগভীর মহৎ প্রাণের স্থান হবে কি করে?

এই মৃত্যু শয্যার সঙ্গে অদ্ভুত বৈসাদৃশ্য সৃষ্টির জন্যই যেন তার চোখের সামনে গত রাত্রের বলনাচের দৃশ্য ভেসে ওঠে।

সহসা বিয়াশঁ হাজির হয়।

—শোন ওজেন, এখুনি আমাদের হাসপাতালের বড় ডাক্তারের সঙ্গে দেখা করে এলাম। গোটা পথ ছুটে ফিরেছি। তিনি বললেন, বৃদ্ধ যদি প্রকৃতিস্থ ভাব দেখায়—যদি কথা বলে তো সরষের পুলটিশের উপর তাকে শুইয়ে দেবে। দেখ, গলা থেকে মেরুদণ্ডের শেষ অবধি ঢাকা থাকে যেন। তারপর আমাদের খবর দিও।

—বিয়াশঁ, ভাই! ওজেন বলে।

—হাঁরে, চিকিৎসার দিক থেকে ওর অসুখটা ভারি কৌতূহলের বিষয়। নতুন শিক্ষার্থীর আগ্রহ নিয়ে বলে ছাত্রটি।

—ভাল কথা! স্নেহের টানে ওর সেবা করবার জন্য তাহলে একলা আমিই রইলাম। রান্তিঞাক বলে।

—আজ সকালবেলা যদি আমায় দেখতিস তো একথা বলতে পারতিস্ না। ক্ষুণ্ণ না হয়েই বলে বিয়াশঁ। —চিকিৎসকদের দৃষ্টিতে কিছু সময় পরে রোগ আর কিছুই থা.ক না। কিন্তু আমি এখনও রোগীকে দেখতে পারছি বন্ধু!

রোগীর কাছে ওজেনকে একলা রেখে সে চলে যায়। আসন্ন বিপদের একটা শঙ্কাও তার মনে জেগেছিল; আর সে সঙ্কট আসতে বিলম্বও হল না। আরে, তুমি এসেছ ছেলে! ওজেনকে চিনতে পেরে বলে গোরিও।

—আগের চাইতে একটু ভাল লাগছে কি? হাতখানা ধরে জিজ্ঞাসা করে ছাত্রটি।

—হাঁ। মনে হচ্ছে, মাথাটার মধ্যে যেন পাপ বাসা বেঁধেছে। কিন্তু এখন খানিকটা ভাল লাগছে। দেখেছিলে আমার মেয়ে দুটোকে? সরাসরি এখানে চলে আসবে। আমার অসুখ করেছে শুনলে ছুটে আসবে। রুয় দ লা জুমিয়েসে আমার এত যত্ন করত! হায় ভগবান, আমার ঘরটা যদি ওদের অভ্যর্থনা করার যোগ্য হত! এক যুবক ছিল এখানে, সে আমার সব কাঠ পুড়িয়ে ফেলছে।

—ক্রিস্তফ আসছে টের পাচ্ছি। সেই যুবকই ওকে দিয়ে কাঠ পাঠিয়েছে ওজেন জানায়।

—ভাল কথা! কিন্তু কাঠের দাম আমি দেব কোত্থেকে? এক কপর্দকও যে নেই ছেলে! সব কিছু আমি দিয়ে দিয়েছি—সব। আজ আমি ভিখিরি। তবু সোনার কাজ করা পোশাকটা মনোরম হয়েছিল তো! হয়নি? (ওঃ, আবার সেই যন্ত্রণা!) ধন্যবাদ ক্রিস্তফ। ভগবান তোমার কল্যাণ করবেন। নিজের বলতে কিছুই আমার নেই।

—বুড়োর জন্য যা করছ তাতে তোমাকে আর সিলভিকে পরে আমি ভাল বকশিস দেব। ফিসফিস করে বলে ওজেন।

—মেয়েরা আসছে বলেছে তো? কি হে, বলেনি ক্রিস্তফ? আবার তাদের কাছে যাও। তোমার এ মেহেনতের জন্য পাঁচ ফ্রাঁ বকশিস দেব। তাদের বল, আমার শরীরটা ভাল নেই। আমার বড় ইচ্ছে মরবার আগে তাদের একবার দেখে যাই—তাদের চুমো খেয়ে যাই। কথাটা বল। আর শোন, খুব ভড়কে দিও না যেন।

রাস্তিঞাক ইশারা করে তাকে বৃদ্ধের কথা মত কাজ করতে বলে। ক্রিস্তফ চলে যায়।

—নিশ্চয়ই আসবে তারা। আবার শুরু করে গোরিও। ওদের আমি চিনিনে! দেলফিনের প্রাণটা বড় কোমল। আমি মারা গেলে কত দুঃখুই যে পাবে। নাজিও পাবে। না না আমি মরব না—ওরা কাঁদবে তা আমি সইতে পারব না। কিন্তু সত্যিই যদি মারা যাই ওজেন তাহলে আর তো ওদের দেখা পাব না। মৃত্যুর মানেই তাই। বাপের পক্ষে নিঃসন্তান হওয়া নরকবাসের সামিল। আর ওদের বিয়ের পর সে অভিজ্ঞতা আমার হয়েছে। আমার স্বর্গ ছিল রুয় দ লা জুমিয়েসে। বলতো, যদি স্বর্গে যাই তো আমার আত্মা আবার ওদের কাছে ফিরে আসতে পারবে কি? এমন কথা আমি বলতে শুনেছি। সে কি সত্য? রুয় দ লা জুমিয়েসে থাকার সময় যেমন তাদের চোখের সামনে দেখেছি, আজও তেমনি দেখছি মনের চক্ষে। সকাল বেলা নীচ তলায় এসে বলত, সুপ্রভাত বাবা! দুজনকেই আমি কোলে তুলে নিতাম। অনেক রসিকতা করতাম তাদের সঙ্গে—কি খুশিই যে হত। দুজনেই সস্নেহে আদর করে আমার গলা জড়িয়ে ধরত। রোজ সকালে আমরা এক সাথে প্রাতরাশ খেতাম—ডিনারও খেত আমার সঙ্গে। মোট কথা, তখন আমি প্রকৃতই বাপ ছিলাম—সন্তানের গরবে গরবী ছিলাম। রুয় দ লা জুমিয়েসে থাকার সময় কোন বিষয়ে আমার কর্তৃত্বে তারা আপত্তি করত না। সংসারের কোন খোঁজই রাখত না—প্রাণভরে ভালবাসত আমাকে। হায় ভগবান, চিরকাল কেন তারা শিশু হয়ে থাকতে পারল না? (ওঃ! মাথাটা গেল! কি দুঃসহ যন্ত্রণা!)। ওরে, ওরে আমায় ক্ষমা কর মেয়ে। বড্ড যন্ত্রণা, সত্যিই বড় জ্বালা—মাথা ধরা তোরা আমায় সইতে শিখিয়েছিস্। হায় ভগবান, যদি ওদের হাত ধরতে পারতাম তো যন্ত্রণা আমার থাকত না। ওরা রওনা হয়েছে মনে কর কি? ক্রিস্তফটা বড্ড হাঁদা—আমার নিজেরই যাওয়া উচিত ছিল। যাক, ও তো দেখে আসবে! তুমি তো গিয়েছিলে বলনাচে। ওদের কথা বল না! কেমন মানিয়েছিল ওদের? নিশ্চয়ই আমার অসুখের কথা জানত না! জানত কি? জানলে কি আর নাচতে পারত? না, আর আমার অসুখ করে থাকা চলবে না। এখনও আমায় ওদের জরুরী কাজে লাগবে। ওদের সম্পত্তি এখন বিপন্ন। আঃ, কি স্বামীর হাতেই পড়েছে! সারিয়ে তোল! চটপট আমায় সারিয়ে তোল। (ওঃ, কি দুঃসহ যন্ত্রণা! আঃ, আঃ, আঃ)

শোন হে, আমায় সারিয়ে তুলতে হবে, কারণ ওদের টাকা চাই। আমি জানি, কোত্থেকে কি করে সে টাকা সংগ্রহ করা যাবে। ওদেশে গিয়ে আমি শ্বেতসার তৈরী করব। কায়দা আমার জানা আছে...লাখ লাখ টাকা ঐ ভাবে আয় করতে পারব। (নাঃ, আর সইতে পারি না!)

মুহূর্তের জন্য গোরিও নীরব হয়। মনে হয়, যন্ত্রণা সইবার জন্য সমস্ত সহ্য শক্তি জড়ো করছে যেন।

—ওরা যদি এখানে থাকত তো আমি কঁকাতাম না। তাহলে এখনই বা আক্ষেপ করছি কেন?

আবার একটা তন্দ্রার ঘোর আসে। বহুক্ষণ চুপ করে পড়ে থাকে বৃদ্ধ। ক্রিস্তফ এই সময় ফিরে এল। গোরিও ঘুমিয়েছে মনে করে রাস্তিঞাক তাকে জোরে জোরে কাহিনী শোনাবার অনুমতি দেয়।

ক্রিস্তফ বলে, প্রথম গেলাম মাদাম দ কঁতেসের ওখানে। কিন্তু তার সঙ্গে কথা বলতে পারলাম না। স্বামীর সঙ্গে কি জরুরী বিষয়ের আলোচনায় যেন ব্যস্ত ছিলেন! আমি যখন তার সঙ্গে দেখা করার জন্য পীড়াপীড়ি করলাম, মঁশিয় দ রেস্তো তখন বেরিয়ে এসে বলেন, মঁশিয় গোরিও মরতে চলেছে, এই তো? বেশ তো, এখন ওর মরণই মঙ্গল। ঠিক এই ভাবেই বললে স্যর! আরও বললে, জরুরী কাজ শেষ করার জন্য মাদাম দ রেস্তোকে দরকার। কাজ শেষ হয়ে গেলে যেতে পারবেন। ভদ্দর লোককে ভারী ক্রুদ্ধ দেখলাম। আমি যখন বেরিয়ে আসছি সেই সময় আর একটা দরজা দিয়ে দর দালানে এসে মাদাম বললেন, ক্রিস্তফ, বাবাকে বল, ওর সঙ্গে একটা জরুরী ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করছি। এখন তাকে ছেড়ে যেতে পারছি না। ব্যাপারটা আমার সন্তানদের পক্ষে জীবন-মরণের প্রশ্ন। বল, কাজ শেষ করেই আমি চলে আসব। —মাদাম দ বারনের বাড়ীর কথা আলাদা! তার সঙ্গে কথা বলা তো দূরের কথা, দেখা পর্যন্ত পেলাম না। তার পরিচারিকা বললে, আরে ভোর সোয়া পাঁচটার সময় বলনাচ থেকে ফিরেছে মাদাম। এখনও ঘুমোচ্ছে। বারটার আগে যদি ঘুম ভাঙ্গাই তো আমার রক্ষে নেই। আমায় ডেকে পাঠালে বলব যে তার বাপের অবস্থা খুবই খারাপ। দুঃসংবাদ মিথ্যা হয় না, কি বল! ঐ মহিলাটির কাছে অনুনয় বিনয় করা নিরর্থক। তবু সে চেষ্টা যখন করলাম তখন বললে, সেকি সম্ভব ডিয়ার! তখন মঁশিয় দ বারোঁর খোঁজ করলাম। শুনলাম, তিনি বেরিয়ে গেছেন।

—দুটির একটি মেয়েও যদি না আসে তো কি হবে? রাস্তিঞাক বলে ওঠে।
—দুজনের কাছেই চিঠি লিখব।
—কেউ এল না! উঠে বসে তারস্বরে বলে বৃদ্ধ।—একজন ব্যস্ত, আর একজন ঘুমোচ্ছে···কেউ আসবে না! আমি জানতাম। তোমার সন্তান যে কি তাই জেনেই তোমাকে মরতে হবে। হায় বন্ধু, বিয়ে কর না! কোনদিন সন্তানের বাপ হয়ো না! তুমি তাদের জীবন দিচ্ছ, কিন্তু তারা তোমায় দিচ্ছে মৃত্যু। তুমি তাদের সংসারে নিয়ে আসছ, কিন্তু তারা তোমাকে ঠেলে সংসার থেকে বার করে দিচ্ছে। না না, ওরা আসবে না। গত দশ বছর থেকেই যে কথা আমি জানি। মাঝে মাঝে মনে মনে সে কথা বলতামও! কিন্তু বিশ্বাস করতে সাহস পাইনি।

বৃদ্ধের রক্তিম চোখের কোণে জল জমে উঠে; কিন্তু গড়িয়ে পড়ল না।
—হায়রে, যদি বড় লোক হতাম! টাকাটা যদি রেখে দিতাম যদি না দিয়ে দিতাম ওদের, তাহলে দুজনেই আজ এখানে থাকত। কত আদর করত। চুমোয় চুমোয় আমার গাল ভরে দিত! যদি আমি ভাল একটা বাসায় থাকতাম, যদি পাঁচ পাঁচটা ঘর, চাকর-বাকর, চুল্লীতে আগুন থাকত আমার তাহলে আজ তারা এসে চোখের জলে ঘর ভাসাত—মেয়ে-জামাই, নাতি-নাতনী সবাই আসত। সবই আমি পেতে পারতাম। কিন্তু আজ কিছুই আমার নেই। টাকায় সব কেনা যায়—এমনকি কন্যার স্নেহ পর্যন্ত! হায়রে টাকা! কোথায় গেল আমার টাকা! ওদের যদি টাকাকড়ি দিয়ে যেতে পারতাম তো আজ আমার সেবা করত—আমার যন্ত্রণায় সান্ত্বনা দিত। তাদের কণ্ঠস্বর শুনতে পেতাম—মুখ কখনাও দেখতে পেতাম। না হে পুত্র, তুমিই আমার একমাত্র সন্তান! নিঃসঙ্গ দুঃখী হওয়া এর চাইতে ঢের ভাল। কোন গরীব বেচারীকে যখন ভালবাসা যায়, তখন সে স্পষ্টই বুঝতে পারে যে তাকে ভালবাসা হচ্ছে। না, না, বড়লোক হওয়াই ভাল ছিল। তাতে অন্তত ওদের দেখতে তো পেতাম! কে জানে আর দেখতে পাব কি না; দুটোই পাষাণী! ওদের এত বেশী ভাল বেসেছি যে আমাকে ওরা ভালবাসতে পারেনি। বাপেদের সব সময় ধনী হওয়া উচিত, বেয়াড়া ঘোড়ার মত সন্তানদের করায়ত্ত রাখা উচিত। কিন্তু আমি ওদের আমাকে মাড়িয়ে যেতে দিয়েছি! হায়রে পাষাণী, এই শেষের অঙ্ক তোদের গত দশ বছরের ব্যবহার চরম উপযুক্ত পরিণতি লাভ করল। যদি জানতে, বিয়ের পর প্রথম দিকে কতভাবে আমায়

ওরা তোয়াজ করেছে! (ওঃ! বড় নির্মম যন্ত্রণা!)। দুজনের প্রত্যেককে আমি প্রায় আট লাখ ফ্রাঁ করে দিয়েছি। এরপর মেয়েদের কি জামাইদের আমার উপর বিরূপ হওয়া শোভা পায় না। যখনই তাদের বাড়ীতে গেছি, এখানে শুনেছি সহৃদয় বাবা ডাক আর ওখানে শুনেছি সদাশয় বাবা ডাক। তাদের খাবার টেবিলে সবদিন আমার জন্য আসন থাকত। প্রকৃতপক্ষে বহুদিন জামাইদের সঙ্গে এক সাথে খেয়েছি। তারা আমায় শ্রদ্ধাও করত। তখনও ভাবত, আরও কিছু আছে আমার। না ভাবার কারণ কি থাকতে পারে বল! নিজের কোন কথাই আমি বলতাম না। যে বাপ প্রত্যেক মেয়েকে আট লাখ ফ্রাঁ করে দিতে পারে—কে তাকে আদর না করে বল? কাজেই সব সময় আমার তোয়াজ করত। কিন্তু এতো টাকার কদর। ভাল বাপ সব সময় ভাল পাখী হতে পারে না। পরে সে কথা বুঝেছি। ওদের গাড়ি করে ওদেরই সঙ্গে আমি থিয়েটারে যেতাম। যতক্ষণ খুশি ওদের সান্ধ্য মজলিসে থাকতাম। মোট কথা, প্রকাশ্যেই আমায় তারা বাবা বলে স্বীকার করত। কিন্তু তখনও আমার বুদ্ধি ভোঁতা হয়ে যায়নি। বুঝলে হে! কিছুই আমার চোখ এড়াত না। সব কিছু উদ্দেশ্যমূলক। তাই বড় ব্যথা পেতাম অন্তরে। বেশ বুঝতাম, সবটাই কপট ভণিতা। কিন্তু কি করতে পারতাম বল? নীচতলার খাবার টেবিলে বসে যে শান্তি আমি পাই—ওদের টেবিলে বসে কোনদিন তেমন শান্তি পেতাম না। সৌখীন সমাজের কোন কোন বাবু মাঝে মাঝে জামাইদের কানে কানে জিজ্ঞাসা করতেন, ভদ্দরলোক কে? জবাব হত, টাকাওলা শ্বশুর! 'সত্যি?' পালটা প্রশ্ন হত। এই ধরণের আলোচনাই হত। কিন্তু টাকার থলির কথা শুনে সশ্রদ্ধ ভাবে তারা আমার দিকে ফিরে চাইত। জান, নিজে খানিকটা কুৎসিত বলে সে ত্রুটির জন্য আমায় চড়া দাম দিতে হয়েছে। তাছাড়া, কেই বা নিখুঁত বল? (মাথার মধ্যে কাটা ঘায়ের মত জ্বালা!)। আজকে আমি যে যন্ত্রণা ভুগছি, মরবার সময় এমন যন্ত্রণা সকলকেই ভুগতে হয় মঁশিয় ওজেন। কিন্তু—আনাস্তাজি প্রথম যেদিন চোখের ইংগিতে আমায় বুঝিয়ে দেয়, আমার নির্বোধের মত কথায় তার মুখ ছোট হয়েছে, সেদিন যে যন্ত্রণার দাহ সহ্য করেছিলাম আজকের যন্ত্রণা তার কাছে তুচ্ছ। তার চাহনি দেখে আমার রক্তঘাম ছোটে। শিক্ষিত সবজান্তা হতে পারলে আমি সুখী হতাম; কিন্তু একটা কথা নিঃসংশয়ে জানি, এ দুনিয়ায় আমার প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে। পরের দিন সান্ত্বনা পাবার

জন্য দেলফিনের কাছে গেলাম। সেখানেও গোটা কয়েক ভুল করে তাকে চটিয়ে দিলাম। এর জন্য প্রায় পাগল হবার উপক্রম হয়েছিলাম। দিন সাতেক বুঝতেই পারিনি, আমার কর্তব্য কি। ভর্ৎসনার ভয়ে মেয়েদের সঙ্গে দেখা পর্যন্ত করতাম না। সেই থেকেই আমার স্থান ওদের দরজার বাইরে।

—হে ভগবান! যত ব্যথা, যত বেদনা আমায় সইতে হয়েছে—তোমার তো অজানা নয়। একটির পর একটি আঘাত যে ভাবে আমায় বুড়ো করে দিয়েছে, যে ভাবে আমায় বদলেছে, যে ভাবে আমার বুক ভেঙে চুল সাদা করে দিয়েছে, তার সবই তো তুমি শুনেছ! তবে আজ আর আমায় ব্যথা দিচ্ছ কেন? মেয়েদের বেশী করে ভালবাসার পাপের শাস্তি তো পুরোপুরিই ভোগ করেছি। তারাই তো প্রতিশোধের নিমিত্ত হয়েছে—জহ্লাদের মত পীড়ন করেছে আমাকে।

—তবু বাপেরা কি নির্বোধ! তবু তাদের ভালবেসেছি—জুয়াড়ীর মত বারবার ফিরে গেছি জুয়ার আড্ডায়। ওরাই ছিল আমার একমাত্র দুর্বলতা। অন্য লোকে প্রণয়িনী দিয়ে যে স্থান পূর্ণ করে, আমার জীবনে ওরাই দখল করেছিল সেই জায়গা। এই তো মোদ্দা কথা!

—সব সময় ওদের সখ মেটাবার জন্য এটা সেটার দরকার ছিল। পরিচারিকারা তাদের প্রয়োজনের কথা জানাতো আমাকে। আর আমি তাদের হাসিমুখ দেখবার আশায় সেই অভাব পূরণ করতাম। তবু ওরা আমায় ভাল কয়েকটি শিক্ষা দিয়েছে। শিখিয়েছে, কেমন করে ভব্য সমাজে চলতে হয়। হ্যাঁ, তাতে কসুর করেনি। আমার জন্য তারা লজ্জা বোধ করতে আরম্ভ করে। এই তো ভালভাবে সন্তান মানুষ করার প্রতিফল! আমার এই বয়সে স্কুলে ভর্তি হওয়া নিশ্চয়ই সম্ভব নয়। হায় ভগবান! কি দুঃসহ যন্ত্রণা! ডাক্তাররা যদি আমার মাথাটা খুলে ফেলত তাহলে খানিকটা কম কষ্ট পেতাম হয়ত।) আমার কন্যা! আমার দুলালী মেয়ে! আমার আনাস্তাজি—আমার দেলফিন! ওদের আমায় দেখতেই হবে! পুলিশ পাঠিয়ে ওদের ধরিয়ে আন—আসতে বাধ্য কর! ন্যায় বিচার আমার পক্ষে। সবই আমার পক্ষে—স্বাভাবিক বাৎসল্য, আইন সব! আমি প্রতিবাদ করছি! বাপেরা যদি এইভাবে পদদলিত হয় দেশ জাহান্নামে যাবে। এ দিবালোকের মত সুস্পষ্ট সত্য। মানুষের সমাজ, সারা দুনিয়া চলছে পিতৃস্নেহের উপর। সন্তান যদি বাপকে ভাল না বাসে তো সব চুরমার হয়ে যায়। হায়রে, একবার যদি ওদের দেখা পেতাম—ওদের মুখের দুটো কথা শুনতে পেতাম! যে কথাই বলুক না কেন, ওদের কণ্ঠস্বর

শুনলেই আমার বেদনার লাঘব হত—বিশেষ করে দেলফিনের কথায়! কিন্তু বলে দিও, যখন আসবে, আগের মত অমন নিমন্ত্রণ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকায় না যেন। কি বলব মঁশিয় ওজেন! পরমহিতৈষী বন্ধু তুমি! চাহনির সোনার দীপ্তি সহসা যদি নিষ্প্রভ সীমার মত হয়ে যায় তো কি ব্যথাই যে লাগে তা তুমি বুঝবে না। যেদিন ওদের চাহনির সোনালী রোদ মেঘে ঢাকা পড়ল সেইদিনেই আমার জীবনে শীতের দুর্দিন এল। সেই থেকে হতাশা আমার নিত্যসঙ্গী—আমার দৈনন্দিনের রুটির মত। তবু আমি তাই মেনে নিয়েছি। অপমান আর লাঞ্ছনা আমার জীবনের প্রধান অবলম্বন। এত ভাল ওদের বাসতাম যে গোপনে কয়েক মুহূর্ত আনন্দ পাবার আশায় সব অপমান, সব লাঞ্ছনা সহ্য করেছি। গোপনে ঐটুকু কৃপা করে আমায় কৃতার্থ করেছে! ভেবে ছাখ, চোখ দিয়ে মেয়েকে শুধু দেখবে বলে বাপ লুকিয়ে রয়েছে! আমার সারা জীবন উৎসর্গ করেছি ওদের জন্য, আর একটি ঘণ্টা ব্যয় করতেও কুণ্ঠিত। ওদের দেখব বলে বুভুক্ষুর মত আমি ছটফট করছি, গলা শুকিয়ে যাচ্ছে পিপাসায়, বুকের ভেতর দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে—তবু এই মৃত্যু যন্ত্রণায় সান্ত্বনা দেবার জন্যও ওরা আসতে চায় না। এই তো মৃত্যু! বেশ বুঝতে পারছি, আমি মরতে চলেছি। তারা কি জানে না, বাপের মৃতদেহ পায়ে মাড়াবার অর্থ কি? উপরে ভগবান আছেন। এ পাপের শাস্তি পেতেই হবে। বাপেরা সে শাস্তি চায় কি না-চায় তাতে কিছু এসে যায় না। না না, ওরা না-এসে পারে না। আসবেই! আয়, আয়! আয় আমার দুলালী! আয়, আর একবার আমায় চুমো খেয়ে যা—শেষ চুমো দিয়ে যা! তোদের জন্য ভগবানের কাছে আমি প্রার্থনা করব। তাঁকে বলব, মেয়ে হিসাবে তোরা বড় ভাল! মিনতি জানাব তোদের জন্য! তাছাড়া, এ তো তোদের অপরাধ নয়! ওরা নির্দোষ, বন্ধু! সবাইকে বল কথাটা। আমার জন্য যেন কেউ কষ্ট না পায়। সব দোষ আমার, আমিই তাদের শিখিয়েছি আমায় উপেক্ষা করতে। আমিই চেয়েছিলাম। এর মধ্যে অন্য কারও মাথা গলাবার প্রয়োজন নেই। মানুষের বিচার কি ভগবানের বিচারের একতেয়ারের বিষয় এ নয়। আমার প্রতি আচরণের জন্য ভগবান যদি ওদের শাস্তি দেন তো অন্যায় করবেন। আমিই জানতাম না কেমন করে সন্তান পালন করতে হয়। আমিই নির্বোধের মত ছেড়ে দিয়েছি নিজের অধিকার। ওদের জন্য ধুলায় গড়াগড়ি যেতেও আমি কুণ্ঠাবোধ করতাম না এতে আর কি আশা করতে পারি? বাপের এই দুর্বলতায় মহান চরিত্রের

সন্তানও নষ্ট হয়ে যায়। হতভাগ্য আমি, তাই যোগ্য শাস্তি পাচ্ছি। সন্তানের অনুচিত যে আচরণ ওরা করছে তার জন্য আমিই দায়ী—আমিই তার একমাত্র কারণ। আমিই নষ্ট করেছি ওদের! ছেলেবেলা যেমন মিঠাই খেতে চাইত, আজ ওরা তেমনি ভোগের আনন্দ পেতে চায়। ওদের ছেলেমানুষী সমস্ত খেয়াল আমি পূরণ করেছি। পনের বছর বয়সেই দুজনের নিজের নিজের গাড়ি ছিল। কোন খেয়াল এদের অপূর্ণ থাকে নি। আমি, হাঁ আমিই দোষী। কিন্তু এ পাপ আমি করেছি স্নেহের বসে। ওদের কণ্ঠস্বর আমার প্রাণ গলিয়ে দিত।

—আমি শুনতে পাচ্ছি, ওই আসছে ওরা। দেশেরে আইন বলে, বাপের মৃত্যুশয্যার পাশে আসতে হবে ওদের। আইন আমার স্বপক্ষে। তাছাড়া, সামান্য গাড়ি ভাড়াই লাগবে আসতে! তাও না হয় আমি দিয়ে দেব। ওদের লিখে দাও, এখনও ওদের দেবার মত লাখ লাখ টাকা আমার। হলপ করে বলছি, মিথ্যে নয়! গম দিয়ে ইতালীয় পিঠে তৈরী করার জন্য আমি ওদেসা যাচ্ছি। কি করে করতে হয় তা আমার জানা। পরিকল্পনাও তৈরী করে ফেলেছি—লাখ লাখ টাকা মুনাফা হবে। কেউ একথা ভেবে দেখেনি। বুঝলে হে, গম বা ময়দার মত চালান দেবার সময় এ জিনিস নষ্ট হয় না। হাঁ, আবার শ্বেতসারও আছে। ওতেও লাখ লাখ টাকা হবে। বল, লাখ লাখ ফ্রাঁ। তুমি তো আর মিথ্যা কথা বলবে না! লোভের বসেও যদি এখানে আসে তো সে-কথা আমি মনে করব না—যে করেই হোক দেখা করতে হবে! আমার মেয়েদের আমি চাই! আমিই ওদের জনক—ওরা আমার! সহসা উঠে বৃদ্ধ। এমন উদ্ধত ভঙ্গীতে পাকা চুলের মুকুট-পরা মাথা তুলে ওজেনের দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকায় যে সেই মুখের প্রতিটি কুঞ্চনে বিভীষিকার ছাপ ফুটে বেরোয়।

—ও কি করছেন, শুয়ে পড়ুন আবার। এখুনি চিঠি লিখছি আমি। ওরা যদি না আসে তো বিয়াশঁ এলেই আমি নিজে যাব। ওজেন বলে।

বৃদ্ধ তখন বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলে, ওরা না এলে যাবে! তার আগেই আমি মরব—ক্ষোভ সইতে না পেরে মরব। ক্রমে আমার রাগের মাত্রা চড়ছে। এখন আমার গোটা জীবনের ছবি দেখতে পারছি। আগাগোড়া আমি প্রতারিত হয়েছি। আমায় ওরা ভালবাসে না—কোনদিনও বাসত না। এ দিবালোকের মত স্পষ্ট। এখন যদি না আসে তো আর আসবে না। যত বিলম্ব করবে ততই আমাকে এটুকু আনন্দ দিতে অনিচ্ছা বাড়বে। আমি

আর চিনি না ওদের! আমার হতাশা, আমার দুঃখ বোঝার মত বোধ শক্তি ওদের নেই। কিংবা ওদের না হলে যে আমার চলে না তাও বোঝে না। আমার মৃত্যুর কথাও ওরা বুঝতে পারবে না। কারণ আমার স্নেহের প্রকৃতি সম্পর্কে ওদের মন বরাবর অল্প। হাঁ, স্পষ্ট বুঝতে পারছি এখন। কারণ অকাতরে বরাবর আমি আমার অন্তর উজাড় করে ঢেলে দেয়েছি; কিন্তু ওদের চোখে আমার দান বরাবর খেলো বলে মনে হয়েছে। ওরা যদি আমার চোখ উপড়ে ফেলতে চেয়েছে তো আমি এত বোকা ছিলাম যে ওদেরই সে কাজ করতে বলেছি। ওদের ধারণা, সব বাপই ওদের বাপের মত। কখনও নিজেকে খেলো করতে নেই। ওদের সন্তান-সন্ততি আমার এই দুঃখের শোধ তুলবে। বুঝলে হে, নিজেদের স্বার্থের জন্যই এখানে ওদের আসা উচিত। ওদের সমঝে দিও, নিজেদের মৃত্যু-শয্যার শান্তি বিপন্ন করছে ওরা। এই অপরাধ করে ওরা সব অপরাধ করছে। যাও, তাদের বলে এসো, না আসার অর্থ পিতৃহত্যা করা। এ পাপের বোঝা ঘাড়ে না চাপালেও পাপের অন্ত তাদের নেই। গিয়ে এইভাবে চেঁচিয়ে বলো, নাজি! দেলফিন! তোমাদের বাপের কাছে চল। কত স্নেহ করতেন তোমাদের, কিন্তু তিনি যন্ত্রণায় ছটফট করছেন। কোন জবাব নেই! কেউ আসছে না! তাহলে কুকুরের মত এমনি ভাবেই আমায় মরতে হবে? এই কি তাহলে আমার পুরস্কার? সবাই আমায় ত্যাগ করবে? ওহো হো, নীচ—আধ-নীচ পাষাণী ওরা! অমি ওদের অভিসম্পাত দিলাম। ওদের আমি ঘৃণা করি! কবর থেকে উঠে আবারও আমি অভিসম্পাত দেব। বল না বন্ধু, আমি অন্যায় বলছি? অতি জঘন্য আচরণ করছে ওরা, তাই না? এ কি বলছি আমি? তুমি বলেছিলে না দেলফিন ছিল এখানে? দিদির চেয়ে ওর প্রাণটা বড়। তুমি আমার পুত্র ওজেন। ওকে ভাল বেস—বাপের মত ভালবেস। আর মেয়েটা বড্ড অসুখী। ওদের সম্পত্তিরই বা কি হবে? হায় ভগবান, প্রাণ গেল! এত যন্ত্রণা আর সহ্য হয় না! আমার মাথাটা কেটে ফেলে শুধু অন্তরটা রেখে দাও!

বৃদ্ধের কঁকানি আর কান্নায় অস্থির হয়ে ক্রিস্তফকে ডাক দেয় ওজেন। ডেকে বলে, বিয়াশঁকে ডেকে আন তো, আর আমার জন্য একখানা গাড়ি ডেকে এনো। আমি নিজেই আপনার মেয়েদের কাছে যাচ্ছি; আপনি উতলা হবেন না, নিশ্চয় তাদের নিয়ে আসব আপনার কাছে।

—বাধ্য ক'রে—জোর করে নিয়ে এসো। পাহারাওলাদের ডাক।

—কেল্লার ফৌজ তলব কর। যে যেখানে আছে সবাইকে লাগাও! ওজেনের দিকে চেয়ে বলে বৃদ্ধ। তার সে চাহনিতে তখনও সজ্ঞানতার শেষ আভা ছিল।

—গবর্ণমেণ্টের কাছে, সরকারী কৌসুলীর কাছে আরজি পেশ করে বল যে তাদের হাজির না করলে চলবে না। আনতেই হবে তাদের!

—কিন্তু আপনি যে অভিসম্পাত করলেন!

—কে বলে সে কথা? মূঢ় বিস্ময়ে বলে বৃদ্ধ।—তুমি তো জান ওদের আমি কত ভালবাসি, কত আদর করি! একবার যদি ওদের দেখতে পাই তো আমার অসুখ সেরে যাবে। ওদের নিয়ে এস পুত্র! বড় মমতাভরা প্রাণ তোমার! যদি দেখাতে পারতাম, তোমার কাছে আমি কত কৃতজ্ঞ! হায়রে, একবার যদি দেলফিনের দেখা পেতাম তো আমার হয়ে তোমার ঋণ শোধ করতে বলে যেতাম। বড় মেয়েটা যদি না আসতে পারে তো দেলফিনকে নিয়ে এস! তাকে বল, সে যদি না আসে তো আর তুমি তাকে ভালবাসবে না। তোমাকে যা ভালবাসে তাতে না এসে পারবে না। আমার গলায় একটু কিছু ঢেলে দাও তো! মাথার উপর যা হোক একটা কিছু দাও। আমি জানি, মেয়ের সেবা আমায় বাঁচাতে পারত। অস্থি মজ্জায় এ আমি অনুভব করি!···হায় ভগবান, আমি যদি চলে যাই তো কে আবার ওদের টাকা-পয়সার মালিক করে দেবে। নাঃ, ওদের জন্যই আমায় ওদেশা যেতে হবে···ওদেশা গিয়ে আবার সেমুই তৈরী করব।

—এইটুকু খেয়ে নিন মুমূর্ষু বৃদ্ধকে বাঁহাতের উপর তুলে ধরে তার ঠোঁটের কাছে এক পেয়ালা পথ্য এগিয়ে দেয় ওজেন।

কম্পিত দুর্বল হাতে ওজেনের হাত চেপে ধরে বৃদ্ধ বলে, বেশ বুঝতে পারছি, নিজের বাপ-মাকে কত ভালবাস তুমি! তুমি বেশ বুঝতে পেরেছ যে ওদের মুখ না দেখি, আমার নিজের সন্তানের মুখ না দেখি আমি মরতে চলেছি। এ আমার দশ বছরের পিপাসা, কিন্তু কোনদিন ওরা আমার সে পিপাসা মেটাল না। জামাইরা আমর মেয়ে দুটোকে হত্যা করেছে। হাঁগো, যেদিন ওদের বিয়ে হল সেইদিনই আমি কন্যাহারা হলাম। ওরে বাপের দল বিয়ের বিরুদ্ধে আইন পাশ করাবার জন্য আইনসভার কাছে আবেদন জানাও! মেয়েদের যদি ভালবাস তো বিয়ে করতে দিও না। জামাইগুলো এমন শয়তান যে মেয়েদের অন্তরের সমস্ত সুকুমার বৃত্তি ধ্বংস করে দেয়—তাদের গোটা স্বভাব

নষ্ট করে ফেলে। আর বিয়ে হতে দিও না! আমাদের কাছ থেকে মেয়েদের ছিনিয়ে নেয়—ওদের অপহরণ করে, তারপর মরণের সময় আমরা নিঃসঙ্গ হয়ে পড়ে থাকি। মুমূর্ষু বাপেদের জন্য একটা আইন পাশ কর! এ অবস্থা মর্মান্তিক! প্রতিশোধ স্পৃহা জাগে এতে! জামাইরা যদি বাধা না দিত তো আমার মেয়েরা নিশ্চয়ই আসত। ওদের খুন কর! রেস্তোর মাথায় বাড়ি মার, খুন করে েল আলজাসিয়্যাকে—দুজনেই খুনী। হয় খুন কর, না হয় আমার মেয়েদের এনে দাও! হায়রে, এই তো পরিণাম! আমি মরতে চলেছি, কিন্তু ওরা আমার কাছে নেই! ওদের না দেখেই আমায় মরতে হবে! নাজি, দেলফিন, কেন এলি না তোরা? তোদের বাপ চলে যাচ্ছে···

—অত অধীর হবেন না···একটু চুপ করে থাকুন! অত উতলা হয়ে পড়বেন না···অত ভাববেন না!

—ওদের দেখতে না পাওয়াই তো মৃত্যু···এইখানেই তো মৃত্যুর জ্বালা।

—দেখতে পাবেন তো!

—সত্যি বলছ? আধ-পাগলা বৃদ্ধ বলে ওঠে।—বল, পাব দেখতে? আবার দেখতে পাব তাদের? আবার শুনতে পাব তাদের কথা? তা যদি হয় তো মরেও সুখ! সত্যি, আর আমি বাঁচতে চাই না। এ যন্ত্রণা আর আমি সহ্য করতে পারছি না···ক্রমেই দুঃসহ হয়ে উঠছে। কিন্তু যদি শুধু চোখের দেখা পাই···যদি তাদের পোশাকটা ছুঁতে পারি···কি আনন্দই পাব! পোশাকে একবার হাত দিতেই হবে! এ আর এমন কি বেশী চাইছি বল? শুধু ওদের একটা কিছু আমার হাতে দাও! তারপর ওদের চুলে একবার হাত দিতে দিও···অমন সুন্দর চুলে যদি···

সহসা বালিশের উপর তার মাথাটা ভেঙে পড়ে। মনে হয় ঘুষো মেরে ফেলে দিল বুঝি। হাত দিয়ে বিছানার চাদরটা হাতড়ায় বৃদ্ধ—মেয়ের চুলের খোঁজে হাতড়াচ্ছে যেন।

—আমার আশীর্বাদ···রইল আমার আশীর্বাদ···। কষ্টোচ্চারিত কথাটা শেষ করতে না করতেই সহসা বৃদ্ধের কণ্ঠস্বর আটকে যায়।

বিয়াশঁ এই সময় ঘরে ঢোকে। বলে, ক্রিস্তফের সঙ্গে দেখা হল। তোর জন্য গাড়ি ডাকতে গেল।

তারপর সে রোগীর দিকে তাকায়। বোজা চোখের পাতা আঙুল দিয়ে টেনে দেখে। উভয়েই দেখতে পেল যে চোখ দুটো স্থির নিষ্প্রভ হয়ে এসেছে।

—আর এ অবস্থা বদলাবে না। বিয়াশঁ বলে।—অন্তত আমার যা মনে হয় তাতে কোন সম্ভাবনা দেখছি না। নাড়ীটা দেখে হাতখানা সে বুকের উপর রেখে দেয়।

—হৃদ-যন্ত্রের কাজ এখনো ঠিকমতই চলেছে, কিন্তু ওর পক্ষে বড় কষ্টের ব্যাপার। প্রাণটা গেলেই রক্ষে পেত।

—ঠিকই বলেছিস! সায় দেয় রাস্তিঞাক।

—কি হল তোর? মড়ার মত মুখখানা শুকিয়ে গেছে যে!

—কি বলব বিয়াশঁ, দেখিসনি তো কি মর্মান্তিক আর্তনাদ আমায় শুনতে হয়েছে! ভগবান আছেন! নিশ্চয়ই আছেন, আর মানুষের জন্য নতুন এক ভাল জগৎও তৈরী করছেন। আর তা যদি না হয় তো এ সংসারের সব ফাঁকা, সব অর্থহীন। ব্যাপারটা যদি এমন মর্মান্তিক না হতো তো কেঁদে বুকের ভার লাঘব করতে পারতাম! কিন্তু তার উপায় নেই, এই মর্মান্তিক দৃশ্য জগদ্দল পাথরের মত আমার বুকে চেপে বসে আছে।

—বুঝতেই পারছিস, অনেক জিনিষের দরকার হবে। টাকা কোথায়? ঘড়িটা টেনে বার করে রাস্তিঞাক।

—এইটা নিয়ে যা। যেখানে খুশি বন্ধক দিয়ে আয়। রুয় দ হেলদার যাবার পথে আমি থামতে চাই না—একটি মিনিটও নষ্ট করা চলবে না। তাছাড়া ক্রিস্তফের জন্যও অপেক্ষা করতে হচ্ছে। আমার কাছে এক কপর্দকও নেই—আমি ফিরে না আসা অবধি গাড়ি ভাড়ার জন্য কোচোয়ানকে অপেক্ষা করতে হবে।

দুম দাম করে নীচে নেমে যায় রাস্তিঞাক এবং গাড়ী করে সরাসরি রুয় দ হেলদারের দিকে রওনা হয়। সেখানে পৌঁছে যখন মাদাম দ রেস্তোর খোঁজ করে, তাকে জানিয়ে দেওয়া হয় যে মাদামের সঙ্গে তার দেখা হবে না।

—আমি তার বাবার কাছ থেকে এসেছি—তিনি মুমূর্ষু! খানসামাকে জানায়।

—কি করব স্যর, মঁশিয় দ কঁতের কড়া হুকুম!

—মঁশিয় দ রেস্তো যদি বাড়ী থাকেন তো তাকে তাঁর শ্বশুরের অবস্থা জানাও; বলো, এখুনি তার সঙ্গে দেখা করা দরকার।

অনেকক্ষণ বসিয়ে রাখা হয় ওজেনকে মনে মনে সে ভাবে, এতক্ষণে বৃদ্ধ হয়ত মারা গেছে।

খানসামাটি ফিরে এসে ওজেনকে ছোট একটা বৈঠকখানায় নিয়ে যায়।

সেখানে আগুন নেভান একটা চুল্লীর সামনে দাঁড়িয়ে ছিলেন মঁশিয় দ রেস্তো। অভ্যাগতকে তিনি বসতেও বললেন না।

রাস্তিঞ্যাক বলে, মঁশিয় দ কঁৎ, আপনার শ্বশুর গোরিও মৃতুশয্যায়। অতি জঘন্য নোংরা হতদরিদ্র একটা ঘরে তিনি পড়ে আছেন। আগুন জ্বালার কাঠ কেনবার মত পয়সাও তার নেই। এখন তার মুমূর্ষু অবস্থা···মেয়েকে একবার তিনি দেখতে চান!

কঠোর ভাবে কঁৎ বলে, আপনি হয়ত লক্ষ্য করে থাকবেন মঁশিয় গোরিওর জন্য আমি সামান্যই মমতা বোধ করি। মাদাম দ রেস্তোর ব্যাপারে তিনি লজ্জাকারজনক আচরণ করেছেন। আজ যে দুর্ভাগ্য আমার জীবন নষ্ট করেছে, আমার পারিবারিক শান্তির সর্বনাশ করেছে তিনিই তার মূল। তিনি বেঁচে থাকুন কি মারা যান তাতে আমার কিছুই এসে যায় না। এ ব্যাপারে আমি সম্পূর্ণ উদাসীন। মঁশিয় গোরিও সম্পর্কে আমার মনোভাব নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন এখন। জনমত হয়ত আমার সমালোচনা করে, কিন্তু আমি তার পরোয়া করি না। মুর্খ বা অপরিচিত লোক কি ভাববে সে বিষয়ে মাথা ঘামাবার চাইতে অনেক জরুরী কাজ এখন আমার আছে। মাদাম দ রেস্তোর কথা যদি বলেন তো, যাবার মত অবস্থা এখন তার নয়। তাছাড়া আমিও চাই না যে তিনি বাড়ী ছেড়ে যান। তার বাবাকে বলবেন, আমার এবং আমার সন্তানের প্রতি কর্তব্য করে তিনি যাবেন। বাপকে যদি সত্যিই তিনি ভালবাসেন তো কয়েক মিনিটের মধ্যেই তিনি মুক্তি পেতে পারেন। যা ভাল মনে হয় করবেন।

—আপনার আচরণের সমালোচনা করা আমার উচিত নয় মঁশিয় কঁৎ। তাছাড়া এটা আপনার নিজের বাড়ী। তবু জিজ্ঞাসা করছি, যে কথা আমায় দিলেন তা রক্ষা করবেন তো? বেশ, তাহলে মাদামকে বলবেন, তার বাবা আর একদিনও বাঁচবেন কিনা সন্দেহ। তাকে দেখবেন বলে তিনি পথ চেয়ে আছেন, আর যাঁনি বলে অভিসম্পাত দিয়েছেন।

—এ কথা নিজেই আপনি বলে যেতে পারেন। ওজেনের কণ্ঠস্বরে তীব্র ক্ষোভের ঝাঁঝ টের পেয়ে বলেন মঁশিয় দ রেস্তো।

কঁতের পিছু পিছু আর একটি বৈঠকখানায় যায় ওজেন। কঁতেস সাধারণত এই বৈঠকখানাই ব্যবহার করেন। সেখানে গিয়ে দেখে, চোখের জলে একশা হয়ে হতাশভাবে আরাম কেদারায় গুটিশুটি মেরে বসে আছে কঁতেস। মনে হয়,

মৃত্যুকামনা করছে। রাস্তিঞ্যকের দিকে সে তাকাল না। এমন ভীরু সন্ত্রস্ত দৃষ্টিতে স্বামীর দিকে তাকাচ্ছিল যা থেকে স্পষ্টই স্বামীর নিষ্ঠুর পীড়নে তার দেহ মনের চরম অবসাদ ধরা পড়ে। মাথা নেড়ে ইসারা করে কঁৎ। এই ইংগিত মহিলাটি কথা বলার অনুমতি বলে ধরে নেয়।

—আপনার সব কথাই আমি শুনেছি মঁশিয়। বাবাকে বলবেন, আমার অবস্থা জানলে তিনি আমায় ক্ষমা করতেন। এত যন্ত্রণা যে সইতে হবে এতটা আমি আশা করিনি—এ জ্বালা দুঃসহ মঁশিয়। কিন্তু তবু আমি নতি স্বীকার করব না। স্বামীর দিকে ফিরে বলে মহিলাটি। মা আমি। বাবাকে বলবেন, যে ব্যবহার তার সঙ্গে করেছি, তার জন্য প্রকৃত পক্ষে আমি দোষী নই—লোকের চোখে তার যে অর্থই হোক না কেন! মহিলাটির কণ্ঠস্বরে গভীর হতাশার রেশ ছিল।

স্বামী-স্ত্রীকে অভিবাদন জানিয়ে চলে যায় ওজেন। কেমন বিমূঢ় হয়ে পড়ে। মাদাম দ রেস্তোর চরম উভয় সংকট বিপদের কথা আন্দাজ করার চেষ্টা করে রাস্তিঞাক। তার আসার উদ্দেশ্য যে ব্যর্থ হয়েছে তা মঁশিয় দ রেস্তোর কণ্ঠস্বরে সুস্পষ্ট বোঝা যায়। সঙ্গে সঙ্গে এও সে টের পেল যে ইচ্ছামত কাজ করার অধিকার আনাস্তাজির এখন নেই। হন্তদন্ত হয়ে সে মাদাম দ নুসঁজার ওখানে যায়। সে তখনও বিছানায়।

—বড্ড অসুস্থ হয়ে পড়েছি বন্ধু! কি করি বল? বলনাচ থেকে ফি বার পথে ঠাণ্ডা লেগে গেছে—বুকে সর্দি জমেছে বলে সন্দেহ হচ্ছে। ডাক্তার ডাকতে পাঠিয়েছি।

—মৃত্যুমুখে হলেও তোমার যাওয়া উচিত। ওজেন বলে ওঠে। যে করে হোক বাবার কাছে তোমায় যেতে হবে। তিনি তোমায় ডাকছেন। তার আর্তনাদ যদি শুনতে তো অসুস্থতা পালিয়ে যেত।

—ওজেন, যতটা বলছ অতটা অসুস্থ নিশ্চয়ই বাবা নয়। আমার কথার প্রতিবাদে যা বললে তাতে তোমাকে ঘৃণা করা উচিত। যাই হোক, যা বলছ তা-ই করব। আমি জানি, বাবাকে দেখতে গিয়ে যদি আমার অসুখ বাড়ে তো সেই দুঃখে সে মারা যাবে। বেশ, ডাক্তার আসুক, তারপর যাচ্ছি চল। হাঁগো, ঘড়িটা তোমার হাতে দেখছি না যে। চেনটা নেই দেখে সবিস্ময়ে বলে ওঠে দেলফিন।

ওজেনের মুখ রাঙা হয়ে ওঠে।

—ওজেন! ওজেন! সত্যি বল, বেঁচে দিয়েছ, না হারিয়েছ? ছিঃ, যাই করে থাক ভাল করনি।

ছাত্রটি তখন দেলফিনের বিছানার উপর ঝুঁকে কানে কানে বলে, সত্যি কথা শুনতে চাও? শোন তাহলে! শবের আচ্ছাদন কেনার পয়সাও তোমার বাবার নেই, আর আজ রাত্রে তার দরকার হবে। তোমার ঘড়ি এখন বন্দকী দোকানে। আমারও আর কিছু ছিল না।

অমনি বিছানা ছেড়ে লাফিয়ে ওঠে দেলফিন। ছুটে গিয়ে দেরাজ থেকে টাকার থলে বার করে সে রাস্তিঞাকের সামনে বাড়িয়ে দেয়। সঙ্গে সঙ্গে ঘণ্টা বাজায় দেলফিন এবং সেই সঙ্গে বলে ওঠে, আমি যাচ্ছি, এখুনি যাচ্ছি ওজেন! শুধু পোশাকটা পরে নেবার সময় দাও। হায়রে, এই অবস্থায় কোন পাষাণী না গিয়ে পারে? তুমি রওনা হও ওজেন, আমি তোমার আগেই পৌছে যাব। তেরেস মঁশিয় দ নুসঁজাঁকে উপরে এসে আমার একটা কথা শুনে যেতে বল।

অন্তত একজন মেয়েও আসছে বৃদ্ধকে এই সংবাদ শোনাতে পারবার আনন্দে মনে মনে পরম শান্তি অনুভব করে ওজেন। রুয় নুভ্ সঁ্যা-জানভিয়েভে পৌছান অবধি এই খুশির ভাব অক্ষুণ্ণ ছিল। কোচোয়ানের ভাড়া মেটাবার জন্য সে দেলফিনের টাকার থলের মধ্যে হাত দেয়। কিন্তু এই অভিজাত সৌখীন তরুণীর থলেতে মাত্র সত্তরটি ফ্রাঁ ছিল।

উপরে ছুটে গিয়ে দেখে বৃদ্ধ উঠে বসেছে। বিয়াশঁ ধরে আছে তাকে। আর হাসপাতালের হাউস-সার্জন তার পিঠে মোকসাস্ মালিশ করছে। বড় ডাক্তার নিজেই তদারক করছেন। এইটাই শেষ ওষুধ; কিন্তু বৃদ্ধের ব্যাপারে তাও ব্যর্থ হল।

—টের পাচ্ছেন? ডাক্তার জিজ্ঞাসা করেন। কিন্তু ছাত্রটির সঙ্গে চোখাচোখি হতেই বৃদ্ধ বলে ওঠে, ওরা আসছে, কি হে?

—ধাক্কা সামলালেও সামলাতে পারে। সার্জন বলেন। এখনও কথা বলতে পারছেন তো!

—হাঁ, দেলফিন রওনা হয়েছে। রাস্তিঞাক জানায়।

—এ জ্ঞানের কোন মানে নেই। সার্জনকে বলে বিয়াশঁ।—মেয়েদের কথা বলছে। শুনেছি শূলে দেওয়া মানুষ নাকি কেবল জল জল বলে চীৎকার করে, বুড়োও তেমনি করে ডাকছিল মেয়েদের।

—ওষুধ দিয়ে আর কোন লাভ হবে না। বড় ডাক্তার বলেন।—আর কিছুই করবার নেই আমাদের—ওর হয়ে এসেছে।

বিয়াশঁ আর সার্জন মিলে আবার বৃদ্ধকে সেই জঘন্য বিছানার উপর টান করে শুইয়ে দেয়।

—যাই হোক, জামা-কাপড়টা বদলান দরকার। বড় ডাক্তার বলেন।—আশা না থাকলেও দুর্গত মানুষের সেবা করা কর্তব্য। আবারও আমি আসব বিয়াশঁ। ছাত্রটির দিকে বলেন ডাক্তার।—ফের যদি কোন অনুযোগ করে তো পেট আর বুকের মাঝখানের পেশীতে আফিমের আরক মালিশ কর।

ডাক্তার আর সার্জন দুজনেই এক সাথে বেরিয়ে যায়।

—ওরে ওজেন, অত মনমরা হয়ে পড়ছিস্ কেন? ডাক্তার চলে গেলে বলে বিয়াশঁ।

—ধোওয়া একটা শার্ট ওকে পরিয়ে দিতে হবে, আর বিছানার চাদরটা বদলাবার ব্যবস্থা কর তো! সিলভিকে চাদর নিয়ে আসতে বলে দে। এসে আমাদের একটু সাহায্য করে যায় যেন।

এক তলায় যায় ওজেন। দেখে, খাবার টেবিল সাজাতে মাদাম ভোকেকে সাহায্য করেছে সিলভি। রাস্তিঞ্যাক মুখ খুলবার আগেই বিধবা কথা পাড়েন। খদ্দেরকে অসন্তুষ্ট না করে নিজের ষোলআনা আদায় করার জন্য দোকানীরা যেমন মিষ্টি কথায় কাজ সারবার চেষ্টা করে, ওজেন চাদর চাইলে ঠিক তেমনি ভাবেই মোলায়েম ভাষায় মহিলাটি বলেন, আচ্ছা মঁশিয় ওজেন, তুমি তো জান যে বুড়ো গোরিও কপর্দকহীন। কেই না জানে একথা। কাজেই খানিক বাদেই যে লোক মারা যাবে, তার জন্য চাদর দেওয়া ফেলে দেবার সামিল নয় কি? তাছাড়া শব ঢাকার জন্যও তো লাগবে একখানা, তাই না? এখুনি আমার কাছে একশ চুয়াল্লিশ ফ্রাঁ পাওনা আছে; তার সঙ্গে চাদরের দাম বাবদ আরও চল্লিশ ফ্রাঁ যোগ কর। এছাড়া খুঁটিনাটি আরও দুচারটে জিনিস দরকার হবে তো! ধর সিলভি তোমাকে যে মোম দেবে তারও একটা দাম আছে। কাজেই সব মিলিয়ে দুশো ফ্রাঁ হবে। আমার মত বিধবার পক্ষে এত টাকা গচ্চা দেওয়া সম্ভব কি? তুমিই বল মঁশিয় ওজেন, অন্যায় বলেছি? গ্রহের ফেরে গত পাঁচ দিনে আমার অনেক লোকসান গেছে। বুড়ো যদি অন্যত্র চলে যেত তো সে বাবদ আমি দশ ক্রাউন দিতে রাজী ছিলাম। তুমিও তো একবার বলেছিলে যে যাবে। অন্যান্য ভাড়াটেরা জিনিসটা পছন্দ করে না। আমার কিছু ব্যয় হলেও আমিই না হয় ওকে অনাথ আশ্রমে পাঠাবার ব্যবস্থা করতাম। আমার মত অবস্থায় পড়লে তুমি নিজেই কি করতে

ভেবে ছাথ না মঁশিয় ওজেন। মেসের কথাই আমায় সব প্রথম ভাবতে হবে তো! ভেবে ছাথ, এইটাই তো আমার জীবিকা!

ওজেন অমনিই ছুটে গোরিওর ঘরে আসে।

—ঘড়ির টাকাটা কোথায় অছে রে বিয়াশঁ।

—টেবিলের উপর। তিনশ ষাট ক্রাঁ আছে। যা পেয়েছিলাম তার বাকীটা দিয়ে ধার শোধ করে এসেছি। বন্ধকের রসিদখানাও টাকার নীচে আছে।

আবারও হুড়মুড় করে নেমে আসে রাস্তিঞাক। বিরক্তিভরে বলে, এই নিন আপনার টাকা মাদাম, হিসেবটা মিটিয়ে ফেলুন। বুড়ো গোরিও আর বেশীক্ষণ আপনার বাড়ীতে থাকবেন না আর আমিও……

—তা বটে! লোকটা আর বেশীক্ষণ বাঁচবে বলে মনে হয় না। আহা বেচারি! ছশো ক্রাঁ গুণতে গুণতে কতকটা আত্মপ্রসাদ আর কতকটা বিষাদের ছায়া পড়ে মহিলাটির মুখে।

—কাজটা তাহলে এখন চুকিয়ে ফেলুন। রাস্তিঞাক বলে।

—চাদরগুলো নিয়ে আয় সিলভি, আর উপরে গিয়ে ভদ্রলোককে সাহায্য করে আয়। তারপর রাস্তিঞাকের কানে কানে বলে, সিলভির কথা মনে থাকবে তো? আজ দুরাত বসে আছে।

ওজেন পেছন ফিরতেই পাচিকার পেছনে ছুটে যায় বৃদ্ধা। তার কানে কানে বলে, সাত নম্বর থেকে চাদর আনিস।

—যেগুলোর পাশ মুড়ে দেওয়া হয়েছে। মড়া ঢাকতে আর তার বেশী কি লাগবে?

ওজেন এই সময় সিঁড়ির অর্ধেকটা উঠে গেছে। কাজেই বোর্ডিংয়ের মালিকের এই মন্তব্যটা কানে গেল না।

—আয়, এবার শার্টটা বদলে ফেলি। বিয়াশঁ বলে।—সোজা করে ধরে রাখবি।

ওজেন তখন বিছানার শিয়রে গিয়ে মুমূর্ষু বৃদ্ধকে ধরে রাখে আর বিয়াশঁ মাথার উপর দিকে শার্টটা খুলে নেয়। গোরিও এই সময় হাতের এমন একটা ভঙ্গী করে যা থেকে মনে হয় যেন বুকের উপরের কিছু একটা রক্ষা করার চেষ্টা করছে। বেদনার্ত বোবা জন্তুর মত একটা অস্ফুট অস্পষ্ট আর্তনাদ বেরিয়ে যায় মুখ দিয়ে।—বুঝেছি। কি চাইছে বুঝতে পেরেছি। বিয়াশঁ বলে।—মোকাস্

মাখাবার সময় চুলের চেনে ঝুলান একটা লকেট আমরা খুলে নিয়েছি। আহা, বেচারি! ওটা ওকে পরিয়ে দে। চুল্লীর উপরের তাকে আছে।

চুলের বেনীটি আনতে যায় ওজেন। সাদাটে ছাইয়ের মত রঙ। কোন সন্দেহ নেই, এই চুলের গোছা মাদাম গোরিওর। লকেটটির একপাশে আনাস্তাজি আর অপর পাশে দেলফিন লেখা। বুকের ঝুলান এই স্মারক নিধি বৃদ্ধ গোরিওর অন্তরের প্রতীক। লকেটের ভিতরের চুলের থোপনা এত মিহি, এত নরম যে মেয়ে দুটির শৈশবেই কেটে দেওয়া হয়েছে নিশ্চয়। বুকের উপর লকেটটির স্পর্শ অনুভব করে টেনে স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ে বৃদ্ধ। এ দৃশ্য বিভীষিকাময়। দুজ্ঞেয় যে মূলাধার থেকে মানুষের যাবতীয় অনুভূতির উৎপত্তি হয়, যাবতীয় ভাবাবেগে যে মূলাধারে সাড়া জাগায়, মঁশিয় গোরিওর সমস্ত অনুভব শক্তি এখন অন্তর্মুখী হয়ে সেই মূলাধারের রহস্যলোকে ফিরে যাচ্ছে। কাজেই এই স্বস্তির নিঃশ্বাস বস্তু-জগতের সংস্পর্শে তার সাড়া দেবার ক্ষমতার শেষ নিদর্শন। পাগলের মত হাসিতে তার বেদনা ক্লিষ্ট মুখ দীপ্ত হয়ে উঠে। চিন্তা শক্তি লোপ পাবার পরেও অনুভূতির এই বলিষ্ঠ অভিব্যক্তি ছাত্রদুটিকে এমন গভীর ভাবে ব্যথিত করে যে টস্ টস্ করে বৃদ্ধের বুকে চোখের জল গড়িয়ে পড়ে। অমনিই উল্লাসভরে সুতীক্ষ্ণ চীৎকার করে ওঠে বৃদ্ধ।

—নাজি! ফিফিন!

—প্রাণটা এখনও যায়নি! বিয়াশঁ বলে।

—কেন যে বেঁচে আছে! সিলভি বলে।

—কষ্ট পেতে। গাঢ় কণ্ঠে জবাব দেয় রাস্তিঞাক।

বন্ধুকে ইশারা করে নতজানু হয়ে বসে বিয়াশঁ। তারপর বৃদ্ধের উরুতের তলায় হাত চালিয়ে দেয়। রাস্তিঞাকও তার দেখাদেখি নতজানু হয়ে বৃদ্ধের পিঠ তুলে ধরে। সিলভিও এই সময় পিঠের তলার চাদরখানা টেনে নিয়ে সঙ্গের নতুন আর একটা চাদর পেতে দেবার জন্য প্রস্তুত থাকে। চোখের জলের অনুভূতিতে বিভ্রান্ত হয়ে বৃদ্ধও এই সময় সমস্ত শক্তি জড়ো করে দুই হাত প্রসারিত করে। দুই দিকেই ছাত্র দুইটির মাথায় হাত ঠেকে। কম্পিত হাতে তাদের মাথা আঁকড়ে ধরে বৃদ্ধ। ক্ষীণ দুটি অস্পষ্ট কথাও শোনা যায়: ও! আমার দুলালী!

গোরিওর অন্তরের ভাষা মূর্ত হয়ে এই দুটি কথায়—অস্পষ্ট এই দুটি শব্দে। আর সেই সঙ্গে আত্মাও পালিয়ে যায়।

ডাহা মিথ্যা তার অন্তিম কথা দুটি। কিন্তু তার জন্য দায়ী কেউ নয়। ইচ্ছে করে কেউ তাকে প্রতারিত করেনি। তবু এই অন্তিম কথা কটি এমন মর্মান্তিক, এমন বেদনা ভারাক্রান্ত যে সকলেই বিচলিত হয়ে পড়ে। ধরা গলায় সিলভি বলে, আহা, বেচারি!

তবু স্বস্তির নিঃশ্বাস ছেড়েই এই পিতা অন্তিম নিঃশ্বাস ত্যাগ করে। তার গোটা জীবনের আকুতি মূর্ত হয়ে ওঠে এই শেষ স্বস্তির নিঃশ্বাসে। অন্তিম মুহূর্ত পর্যন্ত সে প্রতারিত হল।

আবার সশ্রদ্ধভাবে তাকে সেই জঘন্য বিছানায় শুইয়ে দেওয়া হল। এতকাল তার দেহের মধ্যে জীবন-মৃত্যুর যে সংগ্রাম চলছিল, এইবার মুখমণ্ডলে সেই টানাটানির ক্লিষ্ট ছায়া পড়ে। কিন্তু এই দেহ এখন একটা যন্ত্র ছাড়া আর কিছুই নয়। কারণ মস্তিষ্কের যে অনুভব শক্তি মানুষকে ব্যথা বা আনন্দ সম্পর্কে সচেতন করে তোলে সে শক্তি তো আগেই লোপ পেয়েছে। এখন যা বাকী রইল তার অবলুপ্তি কয়েক ঘণ্টার প্রশ্ন মাত্র।

—কয়েক ঘণ্টা এখন এইভাবে পড়ে থাকবে আর তিলে তিলে অলক্ষ্যে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাবে। যখন চলে যাবে, গলার ঘড়ঘড় শব্দও তখন টের পাওয়া যাবে। মস্তিষ্কের সর্বত্র রক্তের চাপ ছড়িয়ে না পড়া পর্যন্ত কিছু হবে না।

বিয়াশঁ কথা বলবার সময় একটি স্ত্রীলোক উপরে আসার শব্দ শোনা যায়। হন্তদন্ত হয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে আসছিল যুবতী।

—বড্ড দেরী করে ফেলল! রাস্তিঞাক বলে।

কিন্তু এ দেলফিন নয়, এল তার পরিচারিকা তেরেস।

পরিচারিকাটি জানায়, বাপের জন্য মাদাম কিছু টাকা চেয়েছিলেন, তাই নিয়ে মঁশিয় আর মাদামের সঙ্গে তুমুল কাণ্ড হয়ে গেছে মঁশিয় ওজেন। মাদাম অজ্ঞান হয়ে পড়েন! ডাক্তার এনে তার রক্ত বার করে নিতে হয়েছে। আর অনবরত তিনি কাঁদছিলেন, 'আমার বাবা মরে যাচ্ছে! আমি বাবাকে দেখতে যাব!' সে কান্নাকাটি কানে শুনলে বুক ভেঙে যায়!

—আর বলবার দরকার হবে না তেরেস! এখন তার আসা নিরর্থক। মঁশিয় গোরিওর সংজ্ঞা লোপ পেয়েছে।

—আহাহা, এত খারাপ ভদ্দর লোকের অবস্থা! তেরেস বলে।

—আর আমাকে দরকার হবে না বোধ হয়। এখন গিয়ে খাওয়া-দাওয়া সারতে হবে—সাড়ে চারটা বেজে গেছে! কথার মধ্যে বলে ওঠে সিলভি এবং সঙ্গে সঙ্গে

দ্রুত পদে বেরিয়ে যায়। আর একটু হলেই সিঁড়ির মাথায় মাদাম দ রেস্তোর সঙ্গে ধাক্কা খেত।

শোকার্ত বিভীষিকাময় বিদেহী ছায়া-মূর্তির মত দোরগোড়ায় উপস্থিত হয় কঁতেস। একখানি মাত্র মোম জ্বলছিল ঘরে। সেই আবছা ক্ষীণ আলোতেই সে মৃত্যু শয্যার দিকে তাকায়। গোরিওর মুখমণ্ডল মুখোসের মত নিস্পন্দ। মাঝে মাঝে দু একটি মৃদু কম্পন এখনও নিভুনিভু জীবন দীপশিখার অস্তিত্বের সাক্ষ্য দিচ্ছে। বাপের এই অবস্থা দেখে তার চোখ দিয়ে অঝোরে জল গড়িয়ে পড়ে। বিয়াশঁ এই সময় বুদ্ধি করে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

—বড্ড দেরিতে বেরিয়েছি। রাস্তিঞাককে বলে মহিলাটি।

প্রত্যুত্তরে বিষণ্ণভাবে মাথা নেড়ে সায় দেয় ছাত্রটি। মাদাম দ রেস্তো তখন বাপের হাতখানা তুলে ধরে চুমু খায়। ধরা গলায় বলে, আমায় ক্ষমা কর বাবা! তুমি তো বলতে যে আমার কণ্ঠস্বর তোমায় কবর থেকে ফিরিয়ে আনবে। তোমার অনুতপ্ত মেয়ে এসেছে, তাকে আশীর্বাদ করার জন্য আর একবার অন্তত বেঁচে ওঠ বাবা! বাবা, এই তো আমি ডাকছি। শুনতে পাচ্ছ বাবা? বড় দুঃসহ জ্বালা বাবা! তুমি ছাড়া এ সংসারে কেউ কোনদিন আমায় আশীর্বাদ করবে না বাবা! সবাই আমায় ঘৃণা করে—একা তুমিই শুধু ভালবাসতে বাবা! আমার নিজের পেটের সন্তানও আমায় ঘৃণা করবে। আমায় তোমার সঙ্গে নিয়ে চল বাবা! আমি তোমায় ভালবাসব—তোমার সেবা করব। কোন কথাই শুনতে পাচ্ছ না বোধহয়। ওঃ, আমি পাগল হয়ে যাব!

নতজানু হয়ে উদভ্রান্ত দৃষ্টিতে সে বাপের তাপজীর্ণ মুমূর্ষু দেহের দিকে চেয়ে থাকে। ওজেনের দিকে চেয়ে বলে, আমার দুঃখের ষোলকলা পূর্ণ হয়েছে মঁশিয়! প্রচুর ঋণ রেখে মঁশিয় দ তাই ভেঙে পড়েছে। এখন টের পাচ্ছি, আমায় সে প্রতারণা করেছে। কিন্তু আমার স্বামী কোন দিনই আমায় ক্ষমা করবে না। আমার যথাসর্বস্ব আমি তার হাতে তুলে দিয়ে এসেছি। এখন আর কোন মোহ আমার নেই—সব কিছু স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। হায়রে, একটি মাত্র অন্তর আমায় পূজা করত, কিসের মোহে তার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করলাম? কথা বলতে বলতে ইশারায় সে বাপকে দেখিয়ে দেয়—ওকে আমি অবহেলা করেছি, ফিরেও তাকাইনি একবার—কতবার যে রূঢ় ব্যবহার করেছি তার ইয়ত্তা নাই। এমন মায়া মমতা হীন জঘন্য আমি!

—উনিও বুঝতেন! রাস্তিঞাক বলে।

এই সময় সহসা গোরিও চোখ খোলে। এ চোখমেলা পেশী সঙ্কোচের প্রতিক্রিয়া বই আর কিছুই নয়। কিন্তু মুমূর্ষু বৃদ্ধের চোখের দৃষ্টির চাইতে আশার আলোয় চমকিত কঁতেসের ভঙ্গী বড় কম বিভীষিকাময় ছিল না।

—আমার কথা শুনতে পাবে? কঁতেস বলে ওঠে। তারপর বিছানার পাশে বসে আপনমনে বলে—নাঃ।

ওজেন বুঝতে পারে যে বাপের কাছে থাকতে চায় মাদাম দ রেস্তো। কাজেই কিছু খেয়ে নেবার জন্য সে একতলায় নেমে আসে। ভাড়াটেরা সবাই তখন জড়ো হয়েছে।

জিজ্ঞাসু স্বরে চিত্রকর বলে, ওহে, আজকে উপরতলায় একজন অক্কা পাবে বলে মনে হচ্ছে যেন!

—রসিকতার জন্য এর চাইতে কম বেদনাদায়ক একটা বিষয় বেছে নিলেই ভাল করবে চার্লস! ওজেন বলে।

—এখানে আর তাহলে হাসাও যাবে না! ফের বলে চিত্রকরটি।—এতে কি এসে যায় বল? বিয়াশঁ বলছিল, বুড়ো এখন আর নাকি কিছুই গলার তল করতে পারছে না।

—তাহলে যে অবস্থায় বেঁচেছিল সেই ভাবেই মরবে! যাদুঘরের কর্মচারীটি বলে।

—বাবা নেই! কঁতেস আর্তনাদ করে ওঠে।

এই মর্মান্তিক আর্তনাদ শুনেই ওজেন বিয়াশঁ আর সিলভি উপর-তলায় ছুটে যায়। মাদাম দ রেস্তো সংজ্ঞাহীনা হয়ে পড়েছিল। তিনজনে মিলে সেবা শুশ্রূষা করে তার জ্ঞান ফিরিয়ে আনে। তারপর ধরাধরি করে তাকে গাড়িতে তুলে দেয়। গাড়ি বাইরেই অপেক্ষা করছিল। ওজেন তাকে তেরেসের কাছে দিয়ে মাদাম দ নুসিঁজাঁর বাড়ীতে নিয়ে যাবার কথা বলে।

বিয়াশঁ আবার একতলায় ফিরে আসে। বলে, হাঁ, সত্যই মারা গেছেন।

—আসুন আপনারা! বসুন, এখন খাওয়া শুরু করা যাক। মাদাম ভোকে বলেন।

—না এলে ঝোলটা আবার ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।

ছাত্রদুটি পাশাপাশি বসে।

—কি করতে হবে এখন? বিয়াশঁকে জিজ্ঞাসা করে রাস্তিঞাক।

—চোখের পাতা বুজিয়ে আমি ওকে ভালভাবে শুইয়ে দিয়ে এসেছি। প্রথমে

মেয়রের অফিসে মৃত্যু সংবাদ জানাতে হবে, তারপর শবাচ্ছাদন সেলাই করে কবর দিতে হবে। এছাড়া কি আর করবার আছে বল?

গোরিও যে ভাবে নাক কুঁচকে রুটি শুঁকত তার নকল করে একটি ভাড়াটে বলে, আর কোনদিন বুড়ো এইভাবে রুটি শুঁকবে না।

শিক্ষকটি তখন বলে ওঠে, দোহাই আপনাদের দয়া করে বুড়ো গোরিওর কথা তুলে রাখুন। আসুন, খাবার সময় আর যে কোন রসাল বিষয়ে আলোচনা করা যাক। ঘণ্টাখানেক ধরে তো শুধু ঐ বুড়োর কথাই গিলছি। এই মহান পারি শহরের এমনি বৈশিষ্ট্য যে, সেখানে জন্মান, বসবাস করুন কি সরুন, কেউ আপনার দিকে ফিরেও চাইবে না। আসুন, আমরাও সভ্যতার এই আশীর্বাদের সুযোগ নিই। আজ এই শহরে কমপক্ষে ষাটজন লোক মারা গেছে। আপনারা কি চান যে এদের সবারই জন্য আমরা বসে বসে শোক করি? বুড়ো গোরিও যদি অক্কা পেয়ে থাকে তো বেঁচে গেছে! তাকে যদি এমন ভালবাসেন তো যান, তার দেখাশোনা করুন গে,—বাকী আর সবাইকে শান্তিতে খাওয়া-দাওয়া করতে দিন।

—ঠিকই বলেছেন। বিধবা বলে ওঠেন।—সত্যই মরে বেঁচে গেছে লোকটা! আমার ধারণা, বেঁচে থাকতে অনেক ঝামেলা পোহাতে হয়েছে।

যে মানুষটি ওজেনের দৃষ্টিতে পিতৃত্বের প্রতিমূর্তি তার মৃত্যুতে এইভাবেই শোক প্রকাশ করা হয়।

একটু বাদেই পনেরটি ভাড়াটে যথারীতি গল্প-সল্প আরম্ভ করে। ক্ষুন্নিবৃত্তি হবার পর কাঁটা চামচের ঠুনঠান, ভাড়াটেদের রসালাপের গুঞ্জন, তাদের লুব্ধ উদাসীন মুখের নির্বিকার ভাবভঙ্গী—এক কথায় যাদের সমস্ত আচার-আচরণ ওজেন আর বিয়াশঁ দুজনের কাছেই বিরক্তিকর লাগে। দুজনেই ব্যথা পায় মনে। রাত্রির মত বৃদ্ধের পাশে প্রার্থনা করার জন্য তারা এক পুরোহিত যোগাড় করার খোঁজে বেরোয়। নিজেদের হাতে সামান্য যে কটি টাকা আছে তাই ভাগ করেই বৃদ্ধের যাবতীয় শেষকৃত্যের ব্যবস্থা করতে হবে। রাত নটার সময় সেই ঘরের চৌকিখানার চটের উপর শবটি শুইয়ে দেওয়া হয়। দু'খানা মোম জ্বালিয়ে দেওয়া হয় দুইপাশে। রাত্রে জেগে থাকবার জন্য একজন পুরোহিতও আসে। শুতে যাবার আগে অন্ত্যেষ্টির খরচ সম্পর্কে পুরোহিতের কাছে খোঁজ-খবর নেয় রাস্তিঞাক। তারপর সে অন্ত্যেষ্টির খরচের জন্যও প্রতিনিধি পাঠাবার অনুরোধ জানিয়ে বারোঁ দ নুসিঁজা

আর কঁৎ দ রেস্তোর কাছে পত্র লেখে। পত্র বিলি করার জন্য সে ক্রিস্তফকে পাঠায়, তারপর অবসন্ন দেহে বিছানায় শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ে।

পরদিন মৃত্যুর সংবাদ জানাবার জন্য বাধ্য হয়ে রাস্তিঞাক আর বিয়াশঁ দুজনকেই যেতে হয়। বারটা নাগাদ সংবাদটি রেজেষ্ট্রি হল। বেলা দুটো বাজল তবু কোন জামাইর কাছ থেকে টাকা এসে পৌছোল না, কিংবা তাদের নাম করেও কেউ এল না। ইতিমধ্যে পুরোহিতের পাওনা মিটিয়ে দিতে হয়েছে। তার উপর সিলভি আবার বৃদ্ধকে শুইয়ে দেবার আর শবাচ্ছাদনের কাপড় সেলাই করে দেবার জন্য দশ ফ্রাঁ দাবী করে বসে। ওজেন ও বিয়াশঁ হিসাব করে দেখল যে মৃতের আত্মীয়-স্বজন যদি কোন দায়িত্ব নিতে না চায় তো তাদের হাতে যা আছে তাই দিয়ে কোনমতে বৃদ্ধের অন্ত্যেষ্টির খরচ চালান যাবে। মেডিক্যাল ছাত্রটি তাই নিজেই বৃদ্ধের শবটি নিঃস্বের শবাধারে শুইয়ে দেয়। তার হাসপাতাল থেকে কিছুটা সস্তা দরে নিজেই সে কিনে এনেছে শবাধারটি।

তারপর রাস্তিঞাককে বলে, পাজী ব্যাটাদের আচ্ছা জব্দ করে দেওয়া যাক। আয়, পাঁচ বছরের জন্য পেরফামেজে একটা কবর কিনি, তারপর আয়, গীর্জা আর মুদ্দাফরাসের সঙ্গে বন্দোবস্ত করে তৃতীয় শ্রেণীর অন্ত্যেষ্টির বন্দোবস্ত করি। মেয়ে জামাইরা যদি টাকা দিতে অস্বীকার করে তো স্মৃতি-ফলকের উপর আমরা লিখে রাখব: 'কঁতেস দ রেস্তো আর বারঁণ দ নুসাঁজাঁর পিতা মঁশিয় গোরিও এইখানে দুটি ছাত্রের ব্যয়ে সমাধিস্থ।'

ওজেন প্রথম রাজী হল না। কিন্তু আর একবার মঁশিয় আর মাদাম দ নুসাঁজাঁ এবং মঁশিয় আর মাদাম দ রেস্তোর বাড়ী থেকে ব্যর্থ হয়ে ফিরে এসে সে বন্ধুর প্রস্তাবে সায় দেয়। দুটি বাড়ীর মধ্যে কোনটির সদর দরজাই সে পার হতে পারেনি। ইতিপূর্বেই দারোয়ানদের উপর কড়া হুকুম জারী হয়েছে।

দুজায়গার দারোয়ানই বলে, মঁশিয় আর মাদাম কারও সঙ্গে দেখা করছেন না। তাদের বাবা মারা গেছেন—তারা এখন গভীর শোকে অভিভূত।

পারির সমাজে যেটুকু অভিজ্ঞতা ওজেনের হয়েছে তাতেই সে বুঝতে পারে যে পীড়াপীড়ি করা নিষ্ফল। দেলফিনের সঙ্গে দেখা করা সম্ভব হল না বলে মনে মনে সে অদ্ভুত এক সুতীব্র ব্যথা অনুভব করে।

দারোয়ানের ঘরে বসে দেলফিনকে সে এক পত্র লেখে: নিজের গহনা বেচেও বাপের জন্য ভাল অন্ত্যেষ্টির ব্যবস্থা কর।

পত্রখানা আটকে দারোয়ানের হাতে দিয়ে সে তেরেসকে পৌঁছে দেবার অনুনয় জানায়। কিন্তু লোকটি পত্রখানা দেয় বারোঁ দ নুসাঁজাঁর হাতে। তিনি আগুনের মধ্যে ছুঁড়ে ফেলে দেন।

বেলা প্রায় তিনটে বাজে। সাধ্যায়ত্ত সব কিছু করে বোর্ডিংয়ে ফিরে এল ওজেন। বোর্ডিংয়ের ফটকের বাইরে নির্জন রাস্তায় দুখানা চেয়ারের উপর শবাধারটি রাখা হয়েছে। তার দিকে চেয়ে আপনা থেকেই ওজেনের চোখে জল দেখা দেয়। কালো কাপড়ের ঢাকনিতে শবাধারটির সবটাও ঢাকা পড়েনি। রূপোর রঙ করা তামার একটি পাত্র পবিত্র জল ছিটিয়ে দেবার একটি নোংরা পাত্রও আছে পাশে। কিন্তু কোন পথচারী শবাধারে জল ছিটিয়ে যায়নি: মৃতব্যক্তি নিঃস্ব, তাই তার শবযাত্রায় শোকের কোন সমারোহ নেই—কোন বন্ধু, কোন স্বজন তার শবের অনুগমন করবে না।

বিয়াশঁ হাসপাতালে না গিয়ে পারেনি। তাই যাবার আগে রাস্তিঞ্যাককে এক পত্র লিখে অন্ত্যেষ্টির বন্দোবস্তের কথা জানাতে বলেছে। মেডিক্যাল ছাত্রটির পত্রে রাস্তিঞ্যাক বুঝতে পারে যে 'ম্যাস্' প্রার্থনার ব্যবস্থা করা তাদের সাধ্যাতীত, তার চাইতে বরং সাধারণ সান্ধ্য উপাসনার ব্যবস্থা করা যেতে পারে, কারণ তার ব্যয় অনেক কম। বিয়াশঁ আরও লিখেছে যে ক্রিস্তফকে সে মুর্দাফরাসের কাছে চিঠি দিয়ে পাঠিয়েছে। বিয়াশঁর চিঠিখানা পড়া শেষ করে চোখ তুলে, রাস্তিঞ্যাক দেখল যে গোরিওর গলায় ঝুলান তার মেয়ে দুটির চুলভরা সোনার ছোট্ট লকেটটি হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করছেন মাদাম ভোকে।

—কোন সাহসে আপনি ওটা খুলে নিলেন। ওজেন চেঁচিয়ে ওঠে।

—সে কি গো! ওটাও কবরে দেবে নাকি? সিলভি বলে ওঠে! ওটা যে সোনার!

—নিশ্চয় দেব! ক্রুদ্ধভাবে জবাব দেয় ওজেন। ওর দুটি মেয়ের স্মারক ঐ একটি জিনিসই আছে, ওটা ওর সঙ্গে সঙ্গেই থাকবে।

শববাহী গাড়ি এলে শবটিকে আবারও ধরে নেবার ব্যবস্থা করে ওজেন। তারপর শবাধারটি খুলে শ্রদ্ধাভরে বৃদ্ধের বুকের উপর লকেটটি রেখে দেয়। অকলঙ্ক নিষ্কলুশ কিশোরী দেলফিন আর আনাস্তাজির স্মারক এই লকেট। কোন বিষয়ে বাপের কর্তৃত্বে যখন তারা প্রতিবাদ করতে শেখেনি, অন্তিম

যন্ত্রণার মধ্যেও যে দিনের কথা বৃদ্ধ বার বার স্মরণ করেছে, মধুর সেই অতীতের অভিজ্ঞান এটি!

রাস্তিঞাক, ক্রিস্তফ আর মুর্দাফরাসের দুটি লোক, এই চারজন মাত্র শবানুগমন করে স্ত্যাঁ এতিয়েন দু মঁ গীর্জার দিকে যায়। রুয় ন্যাভ্-স্ত্যাঁৎ-জানভিয়েভ থেকে গীর্জাটি বেশী দূর নয়। গীর্জায় পৌছে শবাধারটি চাল-নীচু অন্ধকার ছোট্ট একটি চ্যাপেলের মধ্যে নিয়ে যাওয়া হয়। গোরিওর মেয়ে জামাইদের খোঁজে চারিদিকে তাকায় ছাত্রটি। কেউ ছিল না। ক্রিস্তফ ছাড়া সে একলা। এই লোকটার জন্য এককালে বেশ ভাল বকশিস জুটেছে তাই কর্তব্যবোধে এসেছে ক্রিস্তফ। দুটি পুরোহিত, গায়ক ছেলেটি এবং গীর্জার নিম্নপদস্থ কর্মচারীটির জন্য অপেক্ষা করার সময় সহসা ক্রিস্তফের হাত চেপে ধরে রাস্তিঞাক। এসময় তার মুখ দিয়ে একটি কথাও ফুটল না।

—ঠিক আছে মঁশিয় ওজেন! ক্রিস্তফ বলে। বড় ভাল, বড় দয়ালু লোক বুড়ো। কারও কোন ঝামেলায় থাকত না, কারও অনিষ্ট করত না—এমনকি গলা চড়িয়ে একটা কথাও বলেনি কোনদিন।

এই সময় পুরোহিত দুটি, গায়ক ছেলেটি আর গীর্জার কর্মচারীটি আসে এবং সত্তর ফ্রাঁতে যতটা করা সম্ভব তার মধ্যে কার্পণ্য করল না। কারণ এ যুগের গীর্জার এমন সম্পদ ছিল না যে বিনা পয়সায় সব কিছু করা যায়। পাদরি 'লিবেরা' আর 'দ প্রকাণ্ডিস্' স্তোত্র পাঠ করে। ধর্মীয় অনুষ্ঠানে বড় জোর মিনিট কুড়ি লেগেছিল। পুরোহিত ও গায়ক ছেলেটির জন্য একখানি মাত্র গাড়ি ছিল। চাপাচাপি করে বসে তার মধ্যেই তারা রাস্তিঞাক আর ক্রিস্তফকে তুলে নেয়।

আমাদের অনুগমন করবার কেউ যখন নেই তখন তাড়াতাড়িই যাওয়া যায়। পুরোহিত বলে।—পথে সময় নষ্ট করে কি লাভ? সাড়ে পাঁচটা বাজে।

যাই হোক, শবাধারটি আবার শববাহী গাড়ীতে তুলবার সময় কঁৎ দ রেস্তো আর বাঁরো দ নুসাঁজাঁর বাড়ীর মোহরাঙ্কিত দুখানি গাড়ি হাজির হয় এবং শবযাত্রার অনুগামী হয়ে পোর লাশেজের দিকে যায়। ছটার সময় মেয়েদের চাকরদের উপস্থিতিতে বাপের শবদেহ কবরের মধ্যে নামান হয়। নিজের খরচে সংক্ষিপ্ত প্রার্থনা পাঠের ব্যবস্থা করেছিল ছাত্রটি। প্রার্থনা-পাঠ হয়ে গেল পুরোহিত এবং চাকর-বাকরেরা চলে যায়। কবর খননকারীরা তখন কোদাল দিয়ে মাটি ফেলে শবাধারটি ঢেকে দেয়। তারপর কোমরটান করে তাদের একজন বকশিস্ চায় রাস্তিঞাকের কাছে। পকেট হাতড়ে কিছুই পেল না

জেন। বাধ্য হয়ে তখন ক্রিস্তফের কাছ থেকে পাঁচ ফ্রাঁ ধার করতে হয়। নেহাৎ সামান্য ব্যাপার হলেও ঘটনাটি রাস্তিঞাককে অভিভূত করে ফেলে। দুঃখে মুহ্যমান হয়ে পড়ে ওজেন। রাতের অন্ধকার নেমে আসছে। মনটা যেমন ভারাক্রান্ত তেমন বিক্ষুব্ধ নির্জন কবরের দিকে চেয়ে সে যৌবনের শেষ অশ্রু বিসর্জন করে। নিষ্কলঙ্ক হৃদয়ের পবিত্র বৃত্তি এই চোখের জলের উৎস। মাটিতে পড়লেও এর এক ফোঁটা জলের ঝিকিমিকি ভগবানের দরবারে পৌঁছায়। বুকের উপর হাত চেপে একদৃষ্টে সে মেঘলা আকাশের দিকে চেয়ে থাকে। তার মনের ভাব বুঝে ক্রিস্তফও সরে পড়ে অলক্ষ্যে।

এই নির্জন সমাধিক্ষেত্রে সে তখন একলা। কয়েক পা এগিয়ে সে গোরস্থানের সব চাইতে উঁচু জায়গায় চড়ে। আঁকাবাঁকা সেন নদীর দুই পারে ছড়ান গোটা পারি শহর তখন তার চোখের সামনে। এখানে সেখানে দুচারটে মিটি মিটি আলো সবে জ্বালান হচ্ছে। ভাদোম মনুমেণ্ট আর নাঁপলেয়ঁর সমাধি (স্তম্ভের আঁজালিদ) মাঝখানকার এলাকাটির দিকে লুব্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে রাস্তিঞাক। ঐ বিলাসী জগতকেই তো সে জয় করতে চেয়েছে। এমন দৃষ্টিতে সে তাকায় যেন অচিরেই গুঞ্জনমুখর ঐ মৌচাকের সমস্ত মধু লুটে নেবে—যেন ইতিমধ্যেই নিজের ঠোঁটে ঐ মধুর রসাল স্বাদ সে অনুভব করেছে। তারপর পূর্ব তাচ্ছিল্যভরে আহ্বান জানিয়ে বলে, এইবার তাহলে আমাদের বোঝাপড়া শুরু হল।

সৌখীন সমাজের বিরুদ্ধে এইভাবে যুদ্ধ ঘোষণা করে মাদাম দ্য নুসিঁজাঁর বাড়ি খেয়ে যায় রাস্তিঞাক।

সমাপ্ত